তপোভূমি নর্মদা

তৃতীয় খণ্ড

শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

তপোভূমি নর্মদা

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

গ্রন্থ-সূচী

প্রলয়দাসজীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ — তাঁর নির্দেশে ধাবড়ী কুণ্ডের পথে যাত্রা — প্রলয়দাসজী কর্তৃক একমুখী রুদ্রাক্ষ দান ও তাঁর স্বরূপ বর্ণনা — সীতামায়ীর জঙ্গলে প্রবেশের পথ নির্দেশ লাভ — মহাত্মা সোমানন্দকে দর্শন — শিবমন্দিরে সোমানন্দকৃত বিচিত্র যজ্ঞের অভিজ্ঞতা — সীতামায়ীর মন্দিরে প্রবেশ — সীতামায়ীর আরতি — সোমানন্দের দিব্য সমাধি দর্শন — সোমানন্দজীর নাভি হতে শিবলিঙ্গ বাহির — সোমানন্দজীর নির্দেশে ধাবড়ী কুণ্ডের পথে যাত্রা — ধাবড়ী কুণ্ডে একলিঙ্গস্বামীর সাক্ষাৎ — মহাত্মা সম্বিদানন্দজীর সঙ্গলাভ — সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা — একলিঙ্গস্বামীর বিভূতি — গুরু পূর্ণিমার দিনে ধাবড়ী কুণ্ডে অলৌকিক বিমল জ্যোতি দর্শন ও মূর্ছা — রসিকরাজ সম্বিদানন্দজী কর্তৃক শাস্ত্রের নানা জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা — মহাকবি কালিদাসের উপমা ব্যাখ্যা — ভারবিকৃত কাব্যরস পরিবেশন — একলিঙ্গস্বামী কর্তৃক বাণলিঙ্গ সহ বিভিন্ন শিবলিঙ্গের চিহ্ন নির্ণয়ের পদ্ধতি লাভ — মঙ্গলদায়ী শিবলিঙ্গ নির্ণয়ের অব্যর্থ সংকেত — বাণলিঙ্গের স্বরূপ নির্ণয় — ধাবড়ী কুণ্ড হতে বিদায় — ভেটাখেড়ার জঙ্গল পর্যন্ত সম্বিদানন্দজীর সঙ্গ ও চোখের জলে বিদায় — লক্ষ্য শূলপাণির ঝাড়ি — চব্বিশ অবতারে রাত্রিবাস — মহেশ্বরজীর মন্দিরে চিদাম্বরমজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ — শৈবাচার্যদের পরিচয় লাভ ও শিবতত্ত্ব ব্যাখ্যা — আম্মাজীর দর্শন — মণ্ডলেশ্বরের পথে যাত্রা — মণ্ডলেশ্বরে ভট্টনারায়ণ ভার্গবের গৃহে স্থিতি — মৃচ্ছকটিকের রসাস্বাদন — পাথরগিরি মহারাজের কথা — অগস্ত্যি গুহার পথে যাত্রা — আবার প্রলয়দাসজীর সাক্ষাৎ — গুপ্তেশ্বর শিবের সামনে শৈবাগমের গুরুতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের গুহ্য সাধন-পদ্ধতি লাভ ও অগস্ত্যি গুহা ত্যাগ।

তপোভূমি নর্মদা

ওঁ

॥ হর নর্মদে হর ॥

পথের পরিচয় সাধারণতঃ পথেই শেষ হয়। কিন্তু চলার পথে কখন কখন এমন দু'একজনের সাক্ষাৎ মেলে, যাঁদেরকে স্মৃতি হতে কখনও মুছে ফেলা যায় না। আমার স্মৃতির ফলকে ভজন-আশ্রম ছাপ ফেলেছে। আশ্রমিকদের সদয় ব্যবহার এবং হৃদ্যতা কখনও ভুলব না। নিজের অজান্তেই দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল, যেন একান্ত আপনজনকে ছেড়ে নিরুদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছি।

আকাশে এখন মেঘের সঞ্চার দেখছি না। চারদিক প্রভাত-সূর্যের উদয়-রশ্মিতে ঝলমল করছে। আমার লক্ষ্য এখন মর্কটি-সংগম এবং মণ্ডলেশ্বর। বাবাকে স্মরণ করে রেবামন্ত্র জপ করতে করতে এগিয়ে চলেছি উত্তরতট ধরে।

কিছুটা যাবার পরেই মনে হল একটা পাথরের চাঙড়ের উপর প্রলয়দাসজীর মতন কোন সাধু যেন বসে আছেন! আমার বুক আনন্দে দুলে উঠল। আমি দ্রুতপদে হাঁটতে লাগলাম। কাছাকাছি হতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সেই রহস্যের ঘনীভূত বিগ্রহ-ই বটেন! তিনি হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন — ফিন্ যাত্রা সুরু কর দিয়া বেটা! আমি তাঁকে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলাম। তিনি বলতে লাগলেন — তুমহারা একঠো বড়া ভুল হো গিয়া বেটা! তুম্ যব মহেশ গিরিকা নাগা লোগোঁকা সাথ পেমগড়সে ইধর আতা থা, ধাবড়ী কুণ্ড হোকর আনা আপ্‌কো লিয়ে জরুরী থা। নর্মদা-তটকা ইহ্ প্রসিদ্ধ তীর্থ হৈ। কেঁওকি আসলি নর্মদেশ্বর লিঙ্গ নর্মদাকি ধারামে উধর কুদরতিসে বন্ যাতী হৈ। হিয়াঁসে করীব ৫০ মিল ফিন্ আনা যানা করনেই পড়েগা। ইহ না করনেসে তুম্‌হারা পরিক্রমা মেঁ ত্রুটি হোগা। চলিয়ে হম ভি থোড়া দূর তক্ তুমহারা সাতমেঁ যায়েঙ্গে। আবার চব্বিশ অবতার মহল্লার দিকে হাঁটতে লাগলাম। মহাত্মা প্রলয়দাসজী চলেছেন আগে আগে। তাঁর অঙ্গ সৌরভ হোমের গন্ধ যেন! আমার মন এতই উৎফুল্ল হয়েছে যে, পঞ্চাশ মাইল কেন, একশ মাইলও এইভাবে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করতে রাজী যদি এই মহাত্মাকে এইভাবে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখতে পাই। ইচ্ছে হয়, এইরকম ভুল বারবার করি!

প্রলয়দাসজী কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে, আমি কখন পিছনে, কখন পাশাপাশি হাঁটছি। তিনি বলছেন — তুমি চব্বিশ অবতারের মন্দির ছাড়িয়ে নাগারা যে পথে তোমাকে ওখানে এনেছিল সেই পথ ধরেই হাঁটবে। পেমগড়ের দিকে যে জঙ্গলপথ, সেই পথে দশ বারমাইল হাঁটলেই একটি পাকদণ্ডী দেখতে পাবে, বামদিকে বেঁকে ঘনঘোর জঙ্গলের দিকে

নেমে গেছে, পথ খুব সংকীর্ণ হলেও ছোটবড় পাথর ডিঙিয়ে হাঁটতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। কোন সাধু তিনি স্ত্রী মূর্তি বা পুরুষ মূর্তি যেই হোন তুমি তাঁকে হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করবে — সেলানী রামপুরা কিস্ তরফ? সীতামায়ীকা মন্দির মেঁ যাউঙ্গা। পথের নিশানা পেয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে প্রায় মাইলখানিক পথ হাঁটা হয়ে গেল। প্রলয়দাসজী দাঁড়িয়ে পড়লেন — উস্ তরফ দেখো কুবের ভাণ্ডারী তীর্থ ঔর এরণ্ডীমাতা কী সংগম দেখাই দেতা হৈ। প্রণাম করো জী। আমি যুক্তকরে প্রণাম জানালাম। তিনি তাঁর ঝোলা থেকে একটি বড় চকখড়ি বের করে আমার হাত দিয়ে বললেন — পার্বত্যপথে পাকদণ্ডী যেখানে দেখতে পাবে, পাকদণ্ডী ধরে নিচের দিকে জঙ্গলে প্রবেশ করে হাতের কাছে যেসব বড় গাছ দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে এক একটা গাছে এই খড়ি দিয়ে দাগ দিতে দিতে যাবে। তাহলে পুনরায় ফিরবার পথে পথ চিনতে ভুল হবে না।

একটি তামার ছোট কৌটা ঝোলা থেকে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন —'প্রণাম করো, ইহ্ হ্যায় একমুখী রুদ্রাক্ষ। শিবপুরাণ কী জ্ঞানসংহিতায়মে সাঁইত্রিশ অধ্যায়মেঁ লিখা হ্যায় —

একমুখী চ রুদ্রাক্ষা দুর্লভা ঋষিসত্তমা।
প্রত্যেকঞ্চ স্বয়ং শম্ভুর্নাত্র কার্য বিচারণা॥

অর্থাৎ হে ঋষিশ্রেষ্ঠ ! একমুখী রুদ্রাক্ষ অতি দুর্লভ। একমুখী রুদ্রাক্ষ স্বয়ং শম্ভু। একটি নর্মদেশ্বর বানলিঙ্গকে আমরা যেমন স্বয়ং শিব বলে মানি, একমুখী রুদ্রাক্ষও সেইরকম সাক্ষাৎ শিব-বিগ্রহ। নিত্য জাগ্রত। একমুখী রুদ্রাক্ষ অনেক রকমের হয়। কোনটি বদরীফলের মত (নারকেলীকুল), কোনটি আমলকীর মত, কোনটি চণক ইয়া বুট (অর্থাৎ ছোলা কলাই এর মত), কোনটি গুঞ্জা ফলের মত। যে কোন একমুখী রুদ্রাক্ষ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন —

সার্বভৌমমিদং রাজ্যং ন তেন তুল্যমর্হতি।
দত্ত্বা তু হেমরাশিঞ্চ শতং বা মৌক্তিকোত্তমান্।
ধার্যা সা তু তদামালা নানাথা ঋষিসত্তমা॥

অর্থাৎ একটা সার্বভৌম রাজ্যও একটি একমুখী রুদ্রাক্ষের সমতুল্য নয়। রাশি রাশি সোনা বা শত শত মুক্তার বিনিময়েও একটি একমুখী রুদ্রাক্ষ সংগ্রহ করতে পারলে বুঝতে হবে সুলভ মূল্যেই পাওয়া গেল।

দেখতে পাচ্ছ তোমাকে যে একমুখী রুদ্রাক্ষটি দিয়েছি সেটি চণক বা বুটের মত। এইরকম একমুখী সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি —

চণকেন সমা যা হি রুদ্রাক্ষা বহুপুণ্যদা।
পাপঘ্নী ঋদ্ধিদা চৈব ভোগামোক্ষপ্রদায়িনী॥

এই দুর্লভ বস্তু আমৃত্যু সাবধানে রাখবে। স্বয়ং শিবজ্ঞানে পূজা করবে। নর্মদা পরিক্রমাকালে কোন সাধু সন্ন্যাসী তিনি তোমার যতই শ্রদ্ধার পাত্র এবং বিশ্বাসযোগ্য হোন, কিছুতেই কাউকেই এ বস্তু দেখাবে না। জমায়েতের নাগা সাধুরা জানতে পারলে জোর করে কেড়ে নেবে। যাক্, এই রুদ্রাক্ষই তোমাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করবে। রুদ্রাক্ষটি তোমার অক্ষয় কবচ। এবারে রুদ্রাক্ষের জন্য আমাকে দক্ষিণা দাও।

তাঁর কথা শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম। কারণ কয়েকখানি পুঁথি ছাড়া আমার কাছে একটি কপর্দকও নাই। অসহায়ভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন ঋষিবাক্য অন্যথা করার উপায় নাই। আমি যে মূল্য চাইছি তার কারণ এ সম্বন্ধে ঋষিবাক্য —

মূল্যাভাবে তু একমুখী বিপরীতং ফলং দিশেৎ॥

মূল্য বা দক্ষিণা না দিলে একমুখী ঋষিবাক্যানুসারে যথোচিত ফল দান করে না। বিপরীত ফল দিবে অর্থাৎ নানারকম বিঘ্ন ঘটাবে। অতএব তোমার ঝোলা ঝেড়ে ঝুড়ে দেখ, কোথাও কিছু পাও কি না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঝোলা থেকে বইগুলি নামাতে লাগলাম। কন্দমূল ও ডায়েরী বের করেছি, তিনি বললেন — ঘাবড়াও মত বেটা। তুমি জান না, ঝোলী ঝেড়ে দেখ নি কোনদিন, তুমি জব্বলপুর থেকে আসার সময় মহাত্মা সুমেরদাসজী তোমার অজান্তেই তোমার ঝোলার এক কোণে একটা সোনার তর্জনী সেলাই করে রেখে দিয়েছেন। পথে যদি একান্তই কোথাও কোন খাদ্য না জোটে বা অন্য কোন প্রয়োজনে যদি অর্থের প্রয়োজন হয় এইজন্য স্নেহময় মহাত্মা তোমার ঝোলার এক কোণে সেলাই করে রেখেছেন। তিনি আশা করেছিলেন কোন-না-কোন সময় তোমার চোখে পড়বে। তুমি ঝোলা থেকে বই বের করেছ আবার রেখে দিয়েছ, কোনদিন ঝোলা ঝেড়ে ভিতরটা দেখ নি। দাও ঐ স্বর্ণ অঙ্গুরীয়টিই আমার হাতে রুদ্রাক্ষের দক্ষিণা হিসাবে দান করো। আমি ঝোলা উলটিয়ে দেখলাম সত্যই একটি সোনার তর্জনী কাগজে মুড়ে সেলাই করে রাখা হয়েছে। সূতো ছিঁড়ে তর্জনীটি তাঁর পায়ে অর্পণ করলাম। তিনি সেটি নিয়ে বললেন, নর্মদামায়ীকে পরিক্রমা কর। কপর্দকহীন অবস্থায় নর্মদা-পরিক্রমা করাই ঋষি নির্দিষ্ট বিধি, এর চেয়ে বড় তপস্যা আর নাই। আপ সিধা চলা যাও, অভি হম্ লৌটেঙ্গে। তাকে প্রণাম করে ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে চব্বিশ অবতারের পথে রওনা হলাম। কিছুদূরে গিয়ে একবার ফিরে তাকালাম, তিনি বরাভয় মুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বিশ্বাস জন্মেছে, প্রলয়দাসজী যে কথা দিয়েছিলেন, প্রয়োজন হলেই তিনি দেখা দেবেন, এ কথা ধ্রুব সত্য। নতুন উদ্যমে আমি হাঁটতে লাগলাম। প্রায় সাত-আট মাইল হাঁটার পরেই দূর থেকে চব্বিশ অবতারের মন্দির দেখতে পেলাম। মন্দিরের ঘাটে যখন পৌঁছালাম, তখন প্রায় বেলা এগারোটা বাজে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, দরদর করে ঘাম বইছে। সেই ওঁকারেশ্বরে থাকতে থাকতে যা দুদিন দুপশলা বৃষ্টি হয়েছিল, আর আকাশে মেঘের দেখা নাই। দীনদয়ালের বাড়ীতে বা মন্দিরে ঢুকতে আর ইচ্ছা হল না। মন্দিরের নিকটস্থ ঘাটেই স্নান তর্পণাদি শেষ করলাম। কন্দমূল খেতে খেতে এইখানকার সেই বাঙালী পাগলা সাধুর কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, একবার তাঁর কুটীরে গিয়ে খোঁজ করলে কেমন হয়? পরক্ষণেই ভাবলাম পাগলা অবধূতের কোন ঠিক ঠিকানা নাই, তিনি হয়ত অন্য কোথাও জঙ্গলে গিয়ে বসে আছেন। পণ্ডশ্রম করে কি হবে? আমি আবার গাঁঠরী ঝোলা তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকলাম। চব্বিশ অবতারের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — ভেইয়া! সেলানী রামপুরা কিস্ তরফ যায়েঙ্গে? তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে বললেন — সিধা উহ্ পাহাড়োঁকা তরফ চলা যাইয়ে; চড়াই পড়েগা। চড়াই মে যাকর, যব্ উৎরাই সুরু হোগা, উধর দোনো পথকো সংযোগ দেখাই দেগা। সিধা চলনেসে নেমগড় ঔর বাঁয়ে তরফ মোড় লেনেসে সেলানী রামপুরা পৌঁছ যায়েগী, উস্‌কা বাদ সীতামায়ীকি জঙ্গল।

লোকটির কথায় রাস্তার কোন স্পষ্ট ছবি ভেসে উঠল না। কি আর করা যাবে, আমি মনে মনে নর্মদার কৃপা ভিক্ষা করে হাঁটতে লাগলাম দ্রুতপদে, পার্বত্যপথে ইচ্ছা করলেও দ্রুত হাঁটা যায় না। যাইহোক যতদূর সম্ভব দ্রুত হেঁটে চলেছি; আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের আনাগোনা দেখতে পেলাম। তিনজন নাগা সাধুকে দেখলাম দুটো গমের বস্তা মাথায় নিয়ে আমার দিকে হেঁটে আসছেন। দীর্ঘদেহী নাগা দুজনের বেশভূষা দেখে তারা যে নাগাফণী সম্প্রদায়ের তা চিনতে এক মুহূর্ত দেরী হল না। এই পাহাড়ী পথে প্রায় দু'মনী বস্তা মাথায় নিয়ে অবলীলাক্রমে হেঁটে চলেছেন চব্বিশ অবতারের দিকে। মনে পড়ল, চব্বিশ অবতারেই ত মহেশ গিরিজীর আখড়া। প্রায় দু-ঘন্টা হাঁটার পর পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। এবার চড়াই সুরু হবে। পাহাড়ের উপর বড় বড় গাছের ঘন নীল শোভা বড় সুন্দর লাগছে। ক্রমে চড়াই সুরু হল। বড় বড় পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে প্রায় ছয়শ ফুট উপরে উঠে এলাম। এমন পথ যে চিনে উঠতে পারছি না, ঠিক এই পথেই নাগফনী নাগাদের সঙ্গে তিনমাস আগে চব্বিশ অবতারে পৌঁছেছিলাম কি না! কেন না, ঘনঘোর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ী পথকে সর্বত্র একই রকম মনে হয়। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করার ইচ্ছা হল। কিন্তু আজ আমি সম্পূর্ণ একা, সামনে অজানা দুর্গম পথ। এখন বোধহয় চারটা বেজেছে। নাগফণীদের সঙ্গে যেবারে এসেছিলাম তখন পাহাড়ের ঢালুতে দু'একটা মন্দির চোখে পড়েছিল। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে এই রকম একটা মন্দির পেলে এখন বর্তে যাই। সেখানেই তাহলে রাত্রিটা কোনমতে কাটাতে পারি। পাহাড়ের দুপাশে খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে দুদিকেই ঘুরে তাকালাম। একদিকে দেখলাম আমার চলার পথ থেকে প্রায় একশ গজ দূরে একপাল হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্যদিকে দেখলাম প্রায় সমান্তরাল পথে দশবারটা নেকড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। তারা বোধহয় শিকারের সন্ধান পেয়েছে। আমার মনে ভয় এল। একবার পেছন ফিরে চব্বিশ অবতারের দিকে তাকাতেই নর্মদার যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে চিনতে পারলাম যে ঠিক এই দৃশ্যই পূর্বে দেখেছিলাম নাগফণীদের সঙ্গে আসতে আসতে। সে একইভাবে স্বচ্ছতোয়া কলনাদিনী নর্মদা চলেছেন এঁকেবেঁকে। ভাষায় এই দৃশ্য আঁকা যায় না, বর্ণনাও করা যায় না। মনে ভেসে উঠছে এ যেন পূর্বদৃষ্ট কোন দৃশ্য! সূর্যকিরণ সেই একইরকমভাবে নর্মদার জলে ঝিলিমিলি খেলছে। মনে পড়ছে, এই ত, এই ত সেই পথ যেখানে নাগারা তাঁদের আখড়ার কাছাকাছি ক্রমশঃ পৌঁছাচ্ছেন বলে অস্বাভাবিক উল্লাসে অধীর হয়ে ত্রিশূল ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। আমি তাহলে সঠিক পথেই চলেছি। আমি আর একবার সভয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম। এখন আর সেই হরিণ আর নেকড়ের দলকে দেখতে পেলাম না। আমি রেবামন্ত্র জপ করতে করতে প্রাণপণে হাঁটছি। ঘন ঘন দুদিকে তাকাচ্ছি, কোথায় সেই সংযোগস্থল যেখান থেকে পাকদণ্ডীর পথ মূলরাস্তা থেকে বামদিকে বেঁকে গেছে? বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, শীঘ্রই হয়ত সূর্য অস্তাচলে গমন করবেন। এইসব ভাবনা করতে করতে আরও মাইলখানিক পথ হেঁটে ফেললাম। পাহাড়ের দুধারে অনেক বনফুল ফুটেছে, সুবাস ভেসে আসছে কিন্তু তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার মত মনের অবস্থা নয়। হঠাৎ দূর থেকে দেখতে পেলাম কেউ যেন হেলে দুলে হাত নাড়াতে নাড়াতে যাচ্ছেন। দুর্গম নির্জন পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে অসহায় মানুষ আর একজনকে দেখতে পেলে মনে কি যে ভরসা জাগে তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাউকে বুঝানো যায় না।

আমি সেই অজানা পথচারীর সঙ্গ ধরবার জন্য প্রাণপণে হাঁটতে লাগলাম। তাকে ঠিক হাঁটা বলে না, আমি তখন পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দৌড়াচ্ছি। একটু পরেই হোঁচট খেয়ে পড়লাম। গাঁঠরী আর কমণ্ডলু হাত থেকে ঠিকরে পড়ে গেল। ভাগ্যিস্ ঢালের দিকে গড়িয়ে পড়িনি। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই আমার অগ্রগামী পথিককে আর দেখতে পেলাম না, তিনি গাছপালার আড়ালে, আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছেন। মনটা খুব দমে গেল! বেলা বোধহয় সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। পাহাড়ে গাছপালার উপর তখনও সূর্যের আলো আছে, তবে ম্লান হয়ে আসছে। হয়ত একটু পরেই সমগ্র পাহাড় নিথর অন্ধকারে ঢেকে যাবে। হয়ত বা সূর্য অস্তাচলেই চলে গেছেন, আমি যে আলো দেখছি, তা হয়ত twilight ! আর্তভাবে বাবাকে স্মরণ করতে লাগলাম, এখন আর রেবামন্ত্র মনে আসছে না, অসহায়ের সহায় আমার একমাত্র জীবন-সম্বল বাবার মুখখানাই মনে পড়ছে। মনে ভরসা আনার চেষ্টা করছি — প্রলয়দাসজীর মত মহাত্মা যখন এপথে পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও রাত্রির আশ্রয় জুটবে।

ভয় আর বিপদ মানুষকে সাহসী করে। আমি সাহসে ভর করে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর যাবার পরেই পথের সেই সংযোগস্থল দেখতে পেলাম। স্পষ্টতই বামদিক একটা সংকীর্ণ পথরেখা পাহাড়ের নীচের দিকে ঘোর জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। সন্ধ্যা পার হতে আর দেরী নাই। পাহাড়ের গাছপালা ক্রমেই অন্ধকারে ঢেকে আসছে। কমণ্ডলুর জল ঢেলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলাম। থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন কি করি? সন্ধ্যার মুখে অজানা জঙ্গলের দিকে নেমে যাওয়া ঠিক হবে না, পথের বাঁকে বাঁকে মৃত্যুদাতারা নিশ্চয়ই ওৎ পেতে আছে। চারিদিক তাকিয়ে একটা কোন বড় গাছের তলা খুঁজছি। ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, অগত্যা একটা গাছতলাতে আজ রাত কাটাবো। হিংস্র শ্বাপদের ভয় ছাড়াও বর্ষাকাল এসে গেছে, বৃষ্টি জলে ঠায় বসে বসে, ভিজতে হবে। যদি বেঁচে থাকি, সকালে উঠে বামদিকের এই বাঁকটা ধরেই পাকদণ্ডী পথে নেমে যাবো, সীতামায়ীর জঙ্গলে প্রবেশ করব।

হঠাৎ চমকে উঠলাম মানুষের কণ্ঠস্বরে। কান খাড়া করে শুনতে চাইলাম, স্বরটা কোন্ দিক দিয়ে ভেসে আসছে। শব্দ লক্ষ্য করে বামদিকের পথেই পা বাড়ালাম। একটু এগিয়ে যেতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম — বলি, ওলো ও বেরা! তুই ত মা বিয়েও করিস্নি, বাচ্চাও হয়নি। আঁটকুড়ি, বাঁজি। সন্তানের বেদনা তুই বুঝবি কি করে লো!

এতো চব্বিশ অবতারের সেই পাগলা সাধু! শব্দ লক্ষ্য করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সাবধানে এগোতে লাগলাম। আবছা অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি সেই পাগলা অবধূতই বটেন। আমাকে দেখে অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়ছেন তিনি। তিনি পূর্ব পরিচিত নাহলে এই সুদুর্গম নির্জন পথে তাঁর আবছা মূর্তি ও অট্টহাসি শুনলে যে কোন লোকই প্রেতের ভয়ে মূর্ছা যেতে পারে। তিনি বলে চলেছেন – 'সেই আদ্যিকালের বুড়োটা তোকে এই যমের মুখে পাঠিয়েছে? ওরে বুড়ো আমার রসের গুঁড়া! আয়, আয় যমবেটা দুমুখো থলি, তাইজন্য বেটার আঁতখালি। ও কেবল খাচ্ছে, খাচ্ছে, ওর পেটে কিছু থাকছে? থাকছে, থাকছে।' এই বলতে বলতে তিনি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন।

'আয়, আয়, আমার সঙ্গে আয়। উপর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন — যম বেটা তোর সাহস থাকে ত এগিয়ে আয়! পারিস্ ত তোর খালি আঁত ভরিয়ে যা'! — আবার

সেই অট্টাট্ট হাসি! বড় বড় গাছের শিকড়ে ঠোক্কর খেতে খেতে একটা পোড়ো পাথরের বাড়ীতে এনে তুললেন। আমি ঝোলা হাতড়ে টর্চটা বের করে টিপলাম। টর্চের আলোতে দেখে বুঝলাম কোন কালে হয়ত এটা শিবেরই মন্দির ছিল। কারণ একটা পাথরের ষাঁড় পড়ে আছে, শিবলিঙ্গ নাই। দরজা টরজার কোন বালাই নাই। তবে ঘরখানা খুব প্রশস্ত । যাক্, রাত্রির আশ্রয় তাহলে জুটল, সঙ্গীও জুটিয়ে দিলেন মা নর্মদা, বৃষ্টি হলেও আর ভিজতে হবে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। টর্চটা জ্বেলেই রেখেছি। নিজের কম্বলটা পাতলাম, গাঁঠরী খুলে। ঘরের এক কোণে একটা পাথরের কলসীতে জল আছে।

— জল খাবি ত খানা মুখপোড়া! এইটা নর্মদার জল। তুই মুখপোড়া আমার পীরিতের কুটুম ত ! তর জন্য আমি সব ব্যবস্থা রেখেছি।

আমি কমণ্ডলুর জলটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিলাম। সেই কলসীর জলে কমণ্ডলু ভরে মুখে চোখে দিলাম। তিনি ঘরের মাঝখানে বসে শুধু দুলেই যাচ্ছেন। আর কোন কথা বলছেন না। চব্বিশ অবতারে যেমন বেশভূষায় দেখেছিলাম চব্বিশ অবতারের মন্দিরে বা তাঁর নিজস্ব কুটীরে, মহাপুরুষের গায়ে দেখেচি সেই একই পোষাক—সেই শতচ্ছিন্ন ময়লা একটা জামার উপর ততোধিক ময়লা সোয়েটার, উস্কো খুস্কো চুলে ছোট ছোট জটা ঝুলছে। দুলুনি থামছে না দেখে আমি টর্চটা নিভিয়ে দিলাম।

একটু পরেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলতে লাগলেন 'মুখপোড়া তোর রোশনীটা নিভালি কেন? জ্বাল, জ্বাল, ওঁকারের সেই ঘাটের মড়ার কাছে তাহলে কি শিখে এলি? রাত্রি হয়ে আসছে, হোম করতে হবে না? চল্ চল্ যজ্ঞ করিগে চল্'। ইতিমধ্যেই আমি টর্চটা জ্বেলে দিয়েছি। তড়াক্ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ভগ্ন বারান্দার এক কোণে কিছু কাঠকুটো ছিল, সেগুলো এনে দরজার কাছে জড়ো করতে থাকলেন। আমিও তার দেখাদেখি কাঠগুলো এনে দরজার কাছে ফেলতে লাগলাম। কাঠের মধ্যে অনেকগুলো আধপোড়া কাঠও ছিল। মনে মনে ভাবলাম, কোন পরিক্রমাবাসী হয়ত আমারই মত নিরুপায় হয়ে এই পোড়োবাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি হয়ত হিংস্র জন্তুর হাত হতে আত্মরক্ষার জন্য ধুনি জ্বেলেছিলেন, তারই হয়ত দগ্ধাবশেষ পড়ে আছে। পাগলা কিন্তু সেই পোড়া কাঠগুলোও বাদ দিলেন না। সেগুলোও এক জায়গায় জমা করলেন। তারপর কাঠের স্তূপ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমিও 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' অবলম্বন করলাম। ঘরে ঢুকেই বললেন — ওরে ব্যাটা তোর গায়ে এখনও সখের ব্যামো আছে। নে নে দুহাতে দুমুঠো ধুলো বালি কুড়িয়ে নে। পরে তখন হাত ধুবি। তিনি নিজেও দুহাতে করে চারদিকের চারকোণ থেকে আঁচড়ে আঁচড়ে ধুলো কাঁকড় দরজার কাছে জমা করলেন। পরে হাত দুটো মাথার চুলে মুছে নিয়ে ট্যাঁক থেকে একটা দিয়াশলাই বের করে ফস্ করে আগুন জ্বাললেন; সেই আগুনে একটা আধপোড়া কাঠ যত্নসহকারে ধরিয়ে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। বিড়্ বিড়্ করে কিছু যেন বললেন বলে মনে হল । দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠতেই, সেই জ্বলন্ত কাঠটা কাঠের স্তূপের মধ্যে গুঁজে দিয়ে হাতজোড় করে বসে রইলেন চুপ করে। দেখতে দেখতে কাঠের স্তূপের মধ্যে আগুন গনগনিয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন — ওরে আমার দেশের ঠাকুর আয়, আয়, দুজনে যজ্ঞ করব আয়। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখগুলো যেন ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে, সারা শরীর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে, তাঁর মাথার চুলেও আগুনের রক্তিম আভা দেখতে পেলাম। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন —

১। ওঁ মীঢুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব।
পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিংআচর
পিনাকম্ বিভ্রা গহি।। ওঁ রুদ্রায় স্বাহা।

— বলেই এক মুষ্টি ধূলো কাঁকড় আগুনের উপর ছুঁড়ে দিয়েই অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়লেন। মন্ত্রের অর্থ হল — হে প্রতাপশালী রুদ্র ! তুমি উদারতম মন নিয়ে আমাদের মঙ্গল কর, কবচরূপ চর্ম ধারণ করে সশস্ত্র বা নিরস্ত্র হয়ে আমাদেরকে রক্ষা কর।

২। ওঁ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্রম্॥

অর্থাৎ হে মহেশ্বর! তুমি নিয়ন্তাদের পরম নিয়ন্তা, দেবতাগণের পরম দেবতা এবং প্রভুগণের পরম প্রভু, স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ, তোমাকে আমরা জানতে পারি।

এই বলে আরও একমুঠি ধূলো কাঁকড় আগুনের উপর ছুঁড়ে দিলেন। আমাকেও ইঙ্গিত করলেন আগুনের উপর ধূলো কাঁকর ছুঁড়ে ফেলতে।

আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল। তিনি তাঁর এই বিচিত্র 'যজ্ঞ' সেরেই মন্দিরের ছোট পাথরের ষাঁড়ের উপর মাথা রেখে মেঝের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। গোটা ঘর সুগন্ধে ভরে গেছে, চন্দনের সুবাস। আমি ভেবে আশ্চর্য হলাম, ধূনা কর্পূর চন্দন গুড়ো এবং অন্যান্য সুগন্ধি হোমের মশলা দিয়েও এই রকম গন্ধ ত উঠে না! দু'মুঠো ধুলি কাঁকড় দিয়েই ত পাগলা সাধু তাঁর 'যজ্ঞকর্ম' সমাপ্ত করলেন! এক ফোঁটা ঘি এরও নাম গন্ধ নাই। আরও এই ভেবে আশ্চর্য হলাম, যতই অর্থপূর্ণ ও দ্ব্যর্থবোধক হোক না, সারাদিন ত ইনি আটপৌরে বাংলায় প্রলাপ-বাক্য বকে চলেন। এঁর মুখে বিশুদ্ধ ছন্দ ও সুরে বেদমন্ত্র শুনতে পাবো, এ ত আশাই করা যায় না। তাঁর উচ্চারিত প্রথম মন্ত্রটি হল — কৃষ্ণযজুর্বেদের অর্ন্তগত শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের মহেশ্বর স্তুতিঃ। এরও নম্বর সাত।

হঠাৎ মেঘের কড়্ কড়্ - কড়াৎ শব্দ শোনা গেল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গাছে গাছে, ডালে ডালে সহস্র ধারায় বৃষ্টি পতনের শব্দ শুনতে পেলাম। সেই বিচিত্র যজ্ঞাগ্নির মৃদু শিখায় মন্দির সংলগ্ন বড় বড় গাছের গুঁড়িগুলো যেন প্রেতমূর্তির মত দেখাচ্ছে। বৃষ্টির বিরাম নাই, অঝোরে ঝরে যাচ্ছে, টুপ্‌টাপ্ শব্দে। এই গহন গভীর অরণ্যানীর মধ্যে এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে বসে বসেও আমার বাংলার গীতি কবি অক্ষয় বড়ালের একটি কবিতা মনে পড়ল। বর্ষা-প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

রাতদিন ঝম্‌ঝম্
রাতদিন টুপ-টুপ্,
কী সাজে সেজেছ রাণি!
একী আজ অপরূপ!

সেই বিচিত্র যজ্ঞাগ্নি সমানে জ্বলে চলেছে, বৃষ্টিতেও নিভছে না। ভরভর করে চন্দনের সুগন্ধ বেরোচ্ছে, মনে হচ্ছে সারা বনভূমিই চন্দনের গন্ধে সুবাসিত হয়ে গেছে ; এ গন্ধ যেমনি স্নিগ্ধ তেমনি তৃপ্তিদায়ক ; হঠাৎ আমার মনে উদয় হল, আচ্ছা, এই কাঠগুলো ও চন্দন কাঠ হতে পারে! এর পূর্বে যে পরিক্রমাবাসী এখানে ধুনি জ্বালিয়েছিলেন, তিনি হয়ত চন্দন কাঠ কোথাও হতে সংগ্রহ করে এনেছিলেন, আর তার অবশিষ্ট কাঠই জ্বেলেছি!

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে পাগলা সাধু সঙ্গে সঙ্গে একটুকরো কাঠ অগ্নিকুণ্ডের ধার থেকে এনে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন — লে শালা, জল দিয়ে এই কাঠ পাথরের উপর ঘষে দেখ। ঘষ্, ঘষ্ ঘষতে সুরু কর। নৈলে তোর গলা টিপে এখনই জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিব'। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উম্মাদের মত তাকিয়ে আমাকে পাথরের মেঝেতে জল ঢেলে কাঠ ঘষতে লাগিয়ে দিলেন। মহাবিপদ! পাথরের উপর কাঠ ঘষতে ঘষতে হাত ব্যথা হয়ে গেল, বিন্দুমাত্র চন্দন বেরুল না। আমি বললাম, আমার সন্দেহ করা অপরাধ হয়েছে, আপনি মাপ করুন।

হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন —'আরে নে নে, ন্যাকামি আর করতে হবে না, চুপচাপ শুয়ে পড়! দেখছিস্, আকাশ ত এত জল ঝরালো, আগুন কি নিভেছে? তুই বড় সাধের ঠাকুর দেখেছিস সেই আদ্যিকালের বুড়োটাকে ভাবছিস্ সেই বুড়োর যজ্ঞাগ্নিই কেবল নেভেনা? আরে, আমিও বুড়ো শিবের বুড়ো বয়সের ছ্যানারে (ছেলে)! আমাকেও বাপটা আদর করে।' বৃষ্টি ধরে গেছে, রাত্রি প্রায় এগারটা বারটা হবে, আমি শোবার পূর্বে আমার সতরঞ্চি বা কম্বলটা তাঁর জন্য পেতে দিতে চাইলাম, তিনি আমার কথা গ্রাহ্য করলেন না, পাথরের ষাঁড়টাকে বালিশ করে শুয়ে শুয়ে গান ধরলেন —

ওমা রেবা, তুই চিন্তা করিস্ কেনে,
তোর বুড়া বাপের মতন আর কেউ নাইকো ত্রিভুবনে।
তোর বাপের গুণের বশে ত্রিলোকের লোক ভালবাসে
আসমান হতে লোক আসে তোর বাপের দরশনে।
ওমা, রেবা, তুই চিন্তা করিস্ কেনে॥

গান শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন সকাল হয়ে গেছে। এ নিবিড় অরণ্যে ঘরের ভিতর বসে বেলা অনুমান করা কারও সম্ভব নয়। তবে সূর্যোদয় যে হয়ে গেছে তা বেশ বুঝতে পারছি। গাছপালায় অন্ধকারের আর লেশমাত্র নাই। চারদিকে সূর্যালোকের আভাষ ফুটে উঠেছে। ঘরের মধ্যে পাগলা সাধুকে দেখতে পেলাম না। যেদিকে তাকাই, সেদিকে শুধু বড় বড় বনস্পতির মেলা, পরস্পর জড়াজড়ি করে দিনের বেলাতেই নিরন্ধ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, কতকগুলো বুনো মহিষ গর্জাতে গর্জাতে মন্দিরের পাশ দিয়ে শিং বাঁকিয়ে দৌড়ে গেল।

একটু পরেই পাগলা সাধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বন-বাদাড় ভেদ করে তিনি বলতে বলতে আসছেন —'যেয়েও আছে, থেকেও নাই। তেমনি তুমি আর আমি রে ভাই! আমরা মরে বাঁচি, বেঁচে মরি! গোঁসাই এর এ কী বিষম চাতুরী! গোঁসাই এর এ কি বিষম চাতুরী!' আমি তাড়াতাড়ি উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম কেন না সাধু যে পথে আসছেন, এইমাত্র সেই পথ দিয়ে কালান্তক যমের মত একপাল বুনো মহিষ গর্জাতে গর্জাতে গিয়েছে। উঁকি মেরে দেখি, সাধু একটু ভয়ঙ্কর মহিষের শিং ধরে বলছেন — মরতে এ পথে যাচ্ছিস্ কেন? ওরে আমার কালো বদন, কালো নয়ন মদনা, তুই যার বাহন সেই আঁত-খালি যম বেটা তোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাঘের পেটে ঢুকাবে বলে! মহিষটার গালে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন — ভাগ্ বেটা ভাগ্ — উল্টোপথে দৌড়ে যা!

মহিষটা কি বুঝল জানি না, সত্যি সত্যি উল্টোপথে অর্থাৎ এই মন্দিরের পাশ ঘেঁষে পাহাড়ের উপরের দিকে দৌড়াল। পাগলা সাধু মন্দির দ্বারে তখন সবেমাত্র এসে পৌঁছেছেন, এমন সময় জঙ্গলের মধ্যে একটু দূরে বাঘের গর্জন শোনা গেল। গর্জন শুনেই সাধু সেইখানে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন, হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন — যম বেটা তুই দুমুখো থলি, আজ রইল তোর আঁত্ খালি বড় সাধ করেছিলি মনে, ওরে আজ তোর সে গুড়ে বালি!

হাসি আর থামছে না।

দু' একমিনিট পরেই ঘরে ঢুকলেন। আমার চিবুকটা ধরে বলতে লাগলেন — ওরে, আমার সোনার চাঁদ মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেছে যে! চল্ চল্ তোকে মায়ের কাছে নিয়ে যাই। জগতে একটা মাই আছে সে আমার মা জানকী। নে গাঁঠরী ওঠা। গাঁঠরীর উপর আমার নামাবলীটা ছিল, সেটা তাড়াতাড়ি নিয়ে নিজের কোমরে বেঁধে ফেললেন, এমনভাবে বাঁধলেন যে তার কতকটা অংশ তাঁর পেছন দিকে লম্বা হয়ে ঝুলতে থাকল! আমার লাঠিটাও নিজের হাতে নিলেন। বললেন — চল বেরিয়ে পড়ি, তুই আমার এই লেজটা ধরে থাক। গাঁঠরী বগলদাবা করে বাঁ হাতে কমণ্ডলু নিয়ে, ডান হাতে তার কোমরে বাঁধা নামাবলীটার দোদুল্যমান অংশটা ধরে হাঁটতে লাগলাম। সাল, সাজা, সেগুন, বট, অশ্বত্থ, শিমূল, কেঁদ ও তন্দুগাছের জঙ্গল মোটা মোটা লতার বন্ধনে এমনভাবে ঢেকে আছে যে পথ চলাই দায়। সাধু কথিত সেই 'লেজ' ধরে আমি কোনমতে সাবধানে পা ফেলে ফেলে হাঁটতে লাগলাম। সাধু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলে চলেছেন —

ওমা রেবা, তুই চিন্তা করিস্ কেনে,
তোর বুড়া বাপের মতন আর কেউ নেইকো ত্রিভুবনে।
বলদ-বাহন বুড়ো সেটা সাদা রং তার মাথায় জটা
ভস্মমাখা শরীর মোটা মত্ত সদা গানে।
ওমা রেবা, তুই চিন্তা করিস্ কেনে॥

গান করতে করতে হঠাৎ বনের দুপাশে লাঠি মারতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন — ভাগ্ বেটেরা ভাগ্। বামুনের মাংস তেতো হয় জানিস্ না? কামড় দিবি কি মরবি! দুড়দাড় শব্দে চারটা হায়না এবং নেকড়ে বনবাদাড় ভেদ করে দৌড়ে পালাল। আবার সাধু হো হো করে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন। হাসতে হাসতে তিনি বসে পড়ায়, তাঁর 'লেজে' পাছে টান পড়ে আমাকেও বসে পড়তে হল। একটু পরেই উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — কোন্ জঙ্গলে এসেছিস্ বল্ দেখি?

— সীতামায়ীর জঙ্গলে!

— হাঁ রে হাঁ, না রে না। ঘরের মধ্যে ঘর, ঝাড়ির মধ্যে ঝাড়ি। রায়বাড়ীর অন্দরমহল ভিতরের দিকে, সম্পূর্ণ পৃথক অংশ সেটা, তবু তার নাম রায়বাড়ীই তো বটে! তেমনি এই সীতাবন একটা পৃথক জঙ্গল হলেও এটা ওঁকারেশ্বর ঝাড়িরই অন্দরমহল। মায়ের মন্দিরকে পাহারা দিচ্ছে ভয়ঙ্কর হিংস্র শ্বাপদরা। ওরা এখানে আছে বাজে লোক, যাদের গায়ে আঁসটানি গন্ধ, তাদেরকে ঢুকতেই দেয় না। তুই কোন ভয় করিস্ না, আমরাও মায়ের ছেলে, ওরাও মায়ের ছেলে।

হাঁটতে হাঁটতেই কথা হচ্ছে। ক্রমে পাহাড়ের উপর সংকীর্ণ পথরেখা উঠতে লাগল, উঠছে ত উঠছেই, লতাপাতায় পা জড়িয়ে যাচ্ছে, পাথরে হোঁচট লেগে পা দুটো ভেঙে পড়ছে, এদিকে বন ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে লাগল। জনমানবহীন নির্জন নিবিড় বনানী ক্রমোচ্চ পাহাড়ী পথের পাশে। মুণ্ডমহারণ্য পেরিয়ে এসেছি আমি, ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির অধিকাংশ পথও আমি পরিক্রমা করেছি, কিন্তু তার সীতামায়ীর জঙ্গল অংশটা মনে হচ্ছে মুণ্ডমহারণ্যের মতই ভয়ঙ্কর। একটা মানুষ কি নাই এই পথে? এখন বুঝতে পারছি, কেন মহেশ গিরির জমায়েৎ বা অন্যান্য পরিক্রমাবাসীরা এই পথ এড়িয়ে পেমগড় থেকে যে রাস্তা বেরিয়েছে সেই পথ দিয়ে চব্বিশ অবতারে পৌঁছে! বেলা বোধহয় বারটা বাজতে যায় কিন্তু বনের মধ্যে সূর্যকিরণ পড়ে নি।

এবার সাধু বাঁদিকে মোড় নিলেন। ক্রমে বন পাতলা হয়ে আসছে, পাহাড় বেয়ে কুলকুল্ শব্দে একটা ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে।

— প্রাতঃকৃত্য সারবি ত এইখানেই সেরে নে। বেলা বারটায় প্রাতঃকৃত্য! আচ্ছা পাগলার পাল্লায় পড়েছি বটে !

— আ মলো! আরে বোকারাম! তুই শুদ্ধ ভাষা বুঝিস না কেন? গেঁয়ো ভাষায় বললে তবেই বুঝি মাথায় ঢুকে! আরে তোর হাগা পেয়েছে হেগে নে। তারপর এই ঝর্ণার জলে ছুঁচিয়ে নে। যা যা একটা গাছের আড়ালে বসে পড়। এখানে ভালুকের দঙ্গল আছে, আমি ত ওদেরকে বলে দিয়েছি বামুনের মাংস তোতো! কেউ ছোঁবে না।

সত্যই আমার পায়খানা পেয়েছিল, কাজেই আমার ঝোলা কম্বল রেখে, কাঠের কৌপীন খুলে একটা গাছের আড়ালে বসে 'প্রাতঃকৃত্য' সারলাম। শৌচাদি সেরে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালাম, কিন্তু তিনি চোখ বন্ধ করে দুলেই যাচ্ছেন। চার পাঁচ মিনিট পরে উঠে দাঁড়ালেন।

— আমরা মায়ের খাস মহলে পৌঁছে গেছি, সীতামায়ীর মন্দিরও কাছে, নর্মদাও কাছে। আগে চল, স্নান করব।

আবার তাঁর কোমরে বাঁধা নামাবলীর প্রান্তটা ধরে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। মিনিট দশেক হাঁটার পরেই নর্মদার দর্শন পেলাম। নর্মদার বিস্তার এখানে অনেক বেশী. কাকচক্ষু জলধারা বয়ে চলেছে। মনে স্বস্তি পেলাম। আমি স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তিনি তাঁর ধড়াচূড়া ফেলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে জলে নামলেন। একটা ডুব দিয়েই দিগম্বর বেশে জলের ধারে বসে পড়েই দোল্ খেতে খেতে নর্মদার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন —

ওমা রেবা, তুই চিন্তা করিস্ কেনে
তোর বুড়া বাপের মতন আর কেউ নেইকো ত্রিভুবনে।
হংসে চেপে চারিবদন
হাতীর পিঠে হাজার নয়ন
মহিষেতে বিকট বদন কেই বা সে তা জানে?
কেহ নরে কেহ মৃগে মুষিকেতে কেহ ছাগে
পূজে বুড়ার পদযুগে বিহিত বিধানে।
বাপ্-সোহাগি! বাপের কথাই ভাবছিস্ মনে মনে॥

গানের শেষে উঠে দাঁড়িয়েই হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলেন। আমি ইতিমধ্যে স্নান তর্পণাদি সেরে ফেলেছি। কৌপীনাদি পরছি, তিনি বললেন — আমিও রাজপরিচ্ছদটা পরে নিই।

এই বলে তাঁর সেই শতচ্ছিন্ন ময়লা জামা সোয়েটার গায়ে গলিয়ে নিলেন। আমাকে বললেন — তুই এখানে বসে কিছুক্ষণ রেবামায়ের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে থাক্। আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি। কোথায় যাচ্ছি বল্ দেখি?

— আমি কি করে জানব?

— কি আনতে যাচ্ছি জানিস্? তোর জন্য আনব কয়েক গণ্ডা ছেলে! কার জানিস্?

বারমাস বয়স তার তেরো মাসের কালে।
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগণন ছেলে॥
কহেন কবি কালিদাস হেঁয়ালীর ছলা।
থাকুক মূর্খের কাজ পণ্ডিতে বুঝেন কলা॥

কি রে! কিছু বুঝতে পারলি? উত্তরে আমি ঘাড় নাড়তেই তিনি বলে উঠলেন — আমার সোনার বাংলার গাঁয়ের ছেলে তুই , ছড়ার অর্থ বলতে পারলি না? হাসতে হাসতে তিনি চলে গেলেন। আমি তাঁর নির্দেশমত নর্মদার দিকে নির্মিমেষ নেত্রে তাকিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলাম।

— পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি! আরে মায়ের ভাঁড়ারে কিছু অভাব আছে নাকি? তাঁর কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে পেছন ফিরতেই দেখতে পেলাম, দু ছড়া মোটা মোটা পাকাকলা দু হাতে দুলিয়ে তিনি দোল্ খেতে খেতে আসছেন। এতক্ষণে তাঁর হেঁয়ালীর অর্থ বুঝতে পারলাম। কলাগাছ এক বছরের হলে, তের মাসের সময় তাতে ফুল ধরে, কাঁদি নামে। কয়েক ডজন কলা হয়। সেই কলাগাছের কয়েক গণ্ডা ছেলে অর্থাৎ কয়েকটা কলা আনছেন খাবার জন্য।

চল্, উঠে পড়্ এবারে মায়ের কাছে যাবো। তাঁর পেছনে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরেই জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় মন্দির দেখতে পেলাম। পাগলা সাধু চীৎকার করে ডাক পাড়ছেন — মা, মাগো! তুই চেয়ে দেখ্ তোর লবকুশের মত দুটো ছেলে তোর ঐ রাঙা চরণতলে এসে পৌঁছেছি। আজ তোর পায়ের কাছেই পড়ে থাকব।

ঘোর জঙ্গলের মধ্যে এই বিশাল মন্দির। মন্দিরের দরজা ঠেলে দেখি শ্বেত মার্বেলের মর্মর মূর্তি, নিরাভরণা মা জানকী! দুটি চক্ষু থেকে দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। বলিহারী শিল্পীকে, মনে হচ্ছে এইমাত্র যেন দুটি অশ্রুবিন্দু চোখ থেকে গড়িয়ে এসেছে, এক্ষুনি ঝরে পড়বে। কারুকলা যে এত সজীব হতে পারে, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। মন্দিরের যে কোন কোণ হতে দেখা হোক না কেন, মনে হবে যেন সেই দিকেই মা জানকী অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে আছেন। একটি প্রদীপ জ্বলছে। মায়ের গলায় বনফুলের মালা, চরণকমলেও অজস্র বনফুল। মন্দিরের অভ্যন্তরে সুগন্ধে ভরে আছে। আমি কমণ্ডলুর জল পায়ে ঢেলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। আমি সহসা এই আশ্চর্য জীবন্ত মূর্তি দর্শনে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। পেছন ফিরে দেখি পাগলা সাধু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন আর ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। কতক্ষণ পরে কপালে করাঘাত করতে করতে মূর্তির চরণ দুটিতে হাত রেখে অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বলছেন — দুঃখিনী মা আমার আর কতকাল সেই বেইমানটার জন্য কাঁদবি! মূর্তির

পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন। তারপর পায়চারী করতে করতে আপনমনে বলতে লাগলেন — রামবেটার সঙ্গে দেখা হলে সত্যি বলছি মা, তার তীর ধনুক কেড়ে নিয়ে বলতাম ; যা বেটা! সারা জীবন জটাবল্কল পরে বনে বনে ঘুরে বেড়াবি যা! সব চেয়ে বজ্জাত ঐ দুটো বুড়ো — ঐ বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র। কী শুভলগ্নই না দেখে দিল! বেটাদের বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরে ছিল, জনককে দিয়ে বলাল রামকে — ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরীতব।' — হে রাম, আমার কন্যা সীতা আজ থেকে তোমার সহধর্মিনী হল।

প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রন্তে পানিং গৃহীস্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা॥ (বাল্মীকি রামায়নম্, আদিকাণ্ডম্)

অর্থাৎ হে রামচন্দ্র! তোমার হাত দিয়ে আমার মেয়ের হাত ধর, আমার কন্যা পতিব্রতা হবে এবং তোমাকে চিরকাল ছায়ার মত অনুসরণ করবে।

দুটো বুড়োর কারসাজিতে রাজা জনক কী ভুলই না করেছিলেন! এমন অপাত্রে কেউ মেয়ে দেয় গা! বলিহারী ঐ দেবতা ও মুনিগুলোকে, লগ্ন নির্বাচনের ত্রুটিটা কারও চোখে পড়ল না, আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বলতে লাগল —

সাধু সাধ্বিতি দেবানামৃষীণাং বদতাং তদা।
দেবদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ পুষ্পবর্ষো মহানভূৎ ॥ (বাল্মীকি রামায়নম্, আদিকাণ্ডম্)

'সাধু ! সাধু ! দুন্দুভি বাজিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।' জান মা, রামের সঙ্গে বিয়ে দিবার ফলে তোমাকে যে এত কষ্ট পেতে হবে, তারা তাদের তিন তিনটে চোখ নিয়ে দেখতে পেলে না গা?

পরক্ষণেই হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলেন — এই রাতে বিরাতে আর কোথায় যাবো বল দেখি মা? তোর পায়ের তলেই রাত কাটাবো। বনের জানোয়ারগুলোকে আমি জানিয়ে দিয়েছি যে আমাদের মাংস তেতো! তারা কিছু করবে না। যত ভয় তোর সেই গোঁয়ার গোবিন্দ ভক্তরাজ বীর হনুমানটাকে ! সকালে পূজা করে গেছে, আবার রাত্রে হয়ত আরতি করতে আসবে। মা বৈদেহী। সে তোর খুব সেবা করে বলে আমরা তাকে খুব ভক্তি করি — এ কথাটা তাকে জানিয়ে দিবি। ভুল করে সে যেন আমাদের ঘাড় না মটকায়।

গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন — আয়রে আয়, তোর কচি মুখখানা শুকিয়ে গেছে, খাবি আয়। এই বলে তিনি একটা কলা ছাড়িয়ে দিতে লাগলেন। আমি খেতে লাগলাম। গোটা ছয়েক কলা খাবার পর বললাম — আর আমি খেতে পারব না।

— খুব পারবি, অন্ততঃ আর একটা খা। চব্বিশ অবতারে তুই আমার ঘরে গেছলি, আমি তোর জন্য একভাঁড় দুধ এনে দিয়েছিলাম। তুই খাস নি। সেই থেকে আমার মনে দুঃখ ছিল। আজ তোকে খাইয়ে তৃপ্তি পেলাম।

— আপনি দু'চারটি খান্।

— আমি খাব কিরে? যমবেটা খাচ্ছে , খাচ্ছে , কেবলই খাচ্ছে , জগৎও খাচ্ছে , খাচ্ছে আর যমবেটার পেটে ঢুকছে। যমবেটার দু আঁত্ খালি, তাই আবার জন্মাচ্ছে আর খাচ্ছে , তাই বলে কি আমিও খাবো? এই বলে হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন। বাকী কলাগুলো নিয়ে এক একটা করে বনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে লাগলেন — ইদং পশবে। ইদং পক্ষিণে। যাক্ এবার পেট ভরে গেল। এই নাটমন্দিরে এক কোণে বিছানা পেতে শো্, আমিও

একপাশে থাকছি। বেলা এখন প্রায় পাঁচটা, এখনও সূর্যাস্ত হওয়ার কথা নয় কিন্তু বনের মধ্যে আঁধার নেমে এসেছে।

রাত্রি নেমে আসতেই এই নিবিড় অরণ্যের ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠল। মেঘ গুড়্গুড়্ করে ডেকে উঠল, দিনের বেলাতেই ছায়াঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে অতিকষ্টে আকাশ দেখতে হয়েছে , এখন ত সব অন্ধকারে ঢাকা। হঠাৎ বজ্রপতনের শব্দ হল, বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল বনের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ শুরু হল। গাছের পাতায় পাতায় ছন্দে ছন্দে এক বিচিত্র তাল উঠছে ঝম্‌ঝম্ ঝম্-ঝমাঝম্। হঠাৎ সারাবন মুখর হয়ে উঠল এক বিচিত্র রহস্যময় শব্দে। এ শব্দের কারণ আমি অনুমান করতে পারলাম না। কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরেই বৃষ্টি ধরে গেল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঐক্যতান সুরু হয়ে গেল। জোনাকী পোকা জ্বলছে গাছের ডালে ডালে পাতার পাতায়।

টর্চ টিপে একবার দেখে নিলাম পাগলা সাধু কি করছেন? তিনি যথারীতি দোল্ খাচ্ছেন, সারা শরীর তাঁর দুলছে। হঠাৎ আমাকে বললেন — হ্যাঁরে। তোর কি ভয় পেয়েছে? আমাকে কিছু বলবি?

— আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা জেগেছে। সারা ভারতবর্ষে অজস্র সীতারামের মন্দির আছে লক্ষ লক্ষ ভক্ত সেখানে ভক্তি নিবেদন করে। সীতা ছাড়া রামচন্দ্রকে এবং রাম ছাড়া সীতাদেবীকে এককভাবে কল্পনাও করা যায় না। এখানে এই শিবভূমি নর্মদার তটে নির্জন অরণ্যে একক মা জানকীর বিষাদময়ী অশ্রুমুখী এই প্রতিমা স্থাপন — কোন্ সাধু বা শিল্পীর পরিকল্পনা, সে সম্বন্ধে দয়া করে কিছু বলবেন কি?

— কেন, বাল্মীকি কোথাও কি মা বৈদেহীর একাকী থাকার ছবি আঁকেন নি?

— রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসকালে মারীচ যখন স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে রামচন্দ্রকে পশ্চাদ্ধাবন করতে বাধ্য করে, তারপর সীতার ভর্ৎসনায় লক্ষ্মণও কুটীর ছেড়ে রামের অনুসন্ধানে চলে যান, কেবল তখনই মা জানকীকে কুটীরে একা থাকতে দেখেছি। কিন্তু সে ত দণ্ডকারণ্যে, গোদাবরী নদীর তটে। নর্মদার তটে নয়। আর একবার দেখি, রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে সীতা যখন অশোকবনে বন্দিনী জীবন যাপন করছিলেন, তখনও রামচন্দ্রহীন অবস্থায় ছিলেন বটে! কিন্তু সেও ত সমুদ্রতীরবর্তী লঙ্কায়। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ যখন সীতাকে মহামুনি বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসন দিয়ে আসেন, তখনও তিনি রামচন্দ্রহীন অবস্থায় ছিলেন বটে কিন্তু তখন ত তিনি একা ছিলেন না। তাঁর কোল আলো করে রেখেছিল তাঁর দুই আনন্দ-দুলাল লব ও কুশ। রামবিহনে তাঁর অন্তর যতই পুড়ুক, তাঁর দুই শিশু তাদের কলহাস্যে ও চপল দুষ্টুমিতে মাকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। এখানে যেমন দেখছি, এই রকম চোখে জল নিয়ে বসে থাকার অবসরই পান নি সীতা। লব-কুশ তাঁকে সব শোকতাপ ভুলে থাকতে বাধ্য করেছিল। তাছাড়া মহামুনি বাল্মীকির তপোবন কোনকালেই নর্মদাতটে ছিল না। তাই জানতে ইচ্ছা হয় এই জনমানবহীন বিজন অরণ্যে এই রকম অশ্রুমুখী বিষাদ প্রতিমা গড়ে তোলার Idea কোথা থেকে এল?

আমার কথা শেষ হতে না হতেই পাগলা সাধু তুড়িলাফ দিয়ে উঠেই উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, যে শিল্পী এই মূর্তি গড়েছিল সে বহুৎ আচ্ছা কাজ করেছে। বাহাদুরকা লেড়কা সাবাস, সাবাস্! আরে 'রাম রাম' করে লোকে যতই ভক্তিতে উথলে

উঠ্‌ক রাম কি খুব ভাল লোক ছিল রে? সে আমার মাকে নিজের স্বার্থে অনেক কাঁদিয়েছে। মা বৈদেহী গো, তোর দুঃখে আর অপমানে আমার বুকটা ফেটে যায় মা!

এই বলে হাউহাউ করে সাধু কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতেই ছুটে গেলেন মন্দিরে। জানকী মূর্তির পা দুটিতে সজোরে মাথা ঠুকতে লাগলেন। হাউহাউ করে কান্নারও বিরাম নাই। আমি মহাফাঁপরে পড়লাম। মনে হল, সাধুর হয়ত মাথাটা ফেটেই যাবে! পাগলাকে এভাবে না ঘাঁটানোই উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর কি করা যায়? ভাবলাম, উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরে টেনে আনি কিন্তু সেদিক দিয়েও মনে ভয় হল তাতে পাগল যদি ক্ষেপে গিয়ে রাত্রিবেলা এই ঘোর জঙ্গলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়? আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েই আছি, সাধু তড়াক করে লাফ দিয়ে গর্ভগৃহ হতে বেরিয়ে এলেন, তাঁর নাক মুখ কপাল ফুলে উঠেছে, রক্ত ঝরছে। সেদিকে তাঁর দিক্‌পাত নাই। আমার হাত ধরে বসিয়ে দিয়েই বলতে লাগলেন — লোকে কেন যে রাম রাম করে! সীতা ছাড়া রাম একটা হাঁদারাম। উনি ভাল মানুষটি সেজে থাকেন, অন্তরটা কিন্তু সরল নয়, গাঁঠে গাঁঠে প্যাঁচ, কুজুরগেঁঠে মন। বাল্মীকি রামায়ণ পড়ে দেখবি তিনি দেখিয়েছেন, রাবনবধের পর রাম অশোকবন থেকে সীতাকে আনতে বিভীষণকে পাঠালেন। বিভীষণ মা জানকীকে সাজিয়ে গুজিয়ে আনলেন পাল্কীতে চাপিয়ে। তাই দেখে হাঁদারামের মেজাজ গেল বিগড়ে। বিভীষণের উপর তাগুই মাগুই করতে লাগলেন — 'তুমি কেন আমার মত না নিয়ে এইসকল লোককে কষ্ট দিচ্ছ? এদেরকে উদ্বিগ্ন করো না, এরা আমার স্বজন। ঘরের আড়াল, পর্দার আড়াল বা লোকজনকে দূরে সরিয়ে দিলেই মেয়েছেলের আত্মরক্ষা করা যায় না, এসকল রাজকীয় আড়ম্বর মাত্র, চরিত্রই নারীর একমাত্র আবরণ। তুমি তাঁকে পাল্কী থেকে এঁদের মাঝখানে দিয়ে হেঁটে আসতে বল, এইসকল বনবাসী বানর ভল্লুক আমার সামনেই ওঁকে দেখুক।' ওরে আমার মন জোগানে পার্টিরে, বেটা সকলের মন জোগাচ্ছে! মার যে আমার লজ্জা করছে, সেদিকে হাঁদারামের লক্ষ্য নাই। বাঁদরের সঙ্গে থেকে একেবারে বাঁদর বনে গেছেন!

মা এত লজ্জা এবং গ্লানি সত্ত্বেও হরিণীর মত কাঁপতে কাঁপতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিজের হৃদয়-বল্লভের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তা দেখেও ব্যাটার পাষাণ-প্রাণ গলল না। নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত নির্লজ্জভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে কটুবাক্য বলে যেতে লাগল। বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে ১১৭ অধ্যায়টা পড়ে দেখবি, বেটা বলছে —

> বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোহয়ং রণপরিশ্রমঃ।
> সুতীর্ণং সুহৃদাং বীর্যাৎ ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ॥
> রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদং চ সর্বতঃ।
> প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গং চ পরিমার্জতা॥
> প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
> দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া॥
> রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
> কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্ মহৎ॥
> যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সোহয়মাসাদিতো ময়া।
> নাস্তি মে ত্বয্যভিষঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি॥

তদন্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্॥
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনঃ॥
ন হি ত্বাং রাবণো দৃষ্টা দিব্যরূপাং মনোরমাং।
মর্ষয়ত্যচিরং সীতে স্বগৃহে পর্যবস্থিতাম্॥'

অর্থাৎ হারামজাদা বলছে —'সীতে! তুমি এ কথা জেনে রাখ, আমার সুহৃদগণের বাহুবলে আমি যুদ্ধ জয় করার জন্য বিপুল পরিশ্রম করেছি। আমার এই যে রণশ্রম, এ তোমার জন্য করা হয় নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দুর করার জন্যই এই কাজ করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, নেত্ররোগীর সামনে প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা যেমন অসহ্য, তুমিও আমার পক্ষে তেমনি কষ্টকর। তুমি রাবণের কোলে ধর্ষিতা হয়েছ, সে তোমাকে খারাপ চোখে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে আমি গ্রহণ করি, তবে কি করে আমার মহৎ বংশের পরিচয় দিব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি, তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতিস্থির করে বলছি — লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ যাঁকে ইচ্ছা কর, তাঁর কাছে যাও অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। সীতা তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, তোমাকে নিজের ঘরে পেয়ে রাবণ এতকাল নিশ্চয় ধৈর্য ধারণ করে থাকে নি।'

আমার দিকে তাকিয়ে পাগলা সাধু বলতে লাগলেন — ইতরটার কথা শুনলি? সতীকুলরাণী আমার মাকে যা-নাই-তাই বলল গা ! থাকত তখন যদি মায়ের এই বেটাটা, হাঁদারাম! তোর ছাল-চামড়া তুলে নিতাম না। হ্যাঁ-রে লক্ষ্মণ, ওহে মহাবীর! তোমরা এতগুলো লোক ভ্যাবাগঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের অপমান সইতে পারলে? পোঁদিয়ে বেটার মুখটাকে থোঁতা করে দিতে পারলে না? থু! থু! ওয়াক্ থু — এই বলে মন্দিরের বাইরে থুথু ফেলতে লাগলেন। সাধুর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে, মাথার চুল একদম খাড়া, দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করতে করতে দুহাত বাড়িয়ে যেন কারও গলা টিপতে যাচ্ছেন — এই ভঙ্গীতে এগোতে গিয়ে দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা খেলেন। ধাক্কা কিছুটা সামলে নিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন — কর্তাভজার দল, যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের এই অপমান সইল, তাদেরকেও বেধড়ক পিটুনী দেওয়া উচিত।

তবে হ্যাঁ, মা আমার মুখের মত জবাব দিয়েছিলেন। হাঁদারাম ত আজকালকার রাজনৈতিক নেতার মত বলে গেল, ইংলণ্ডের লর্ড লেডিরা কি বলবে, আমেরিকা রাশিয়া চীন জাপানের লোকরা কি ভাববে, আমার আন্তর্জাতিক সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে ইত্যাদি; মা আমার স্বয়ং আদ্যাশক্তি ! তাঁর তেজ ও সাহসের অভাব কি ? মায়ের তেজে ভর্গদেবতার তেজ, মায়ের তেজেই সূর্যদেবতা জ্বলছেন! তিনি গর্জে উঠে বললেন — ছোটলোক যেমন নীচ স্ত্রীলোককে বলে (প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিয) সেইরকম কথা আমাকে তুমি বলছ কেন? যখন হনুমানকে লঙ্কায় পাঠিয়েছিলে তখন এইসব দোষ দেখিয়ে আমাকে বর্জনের কথা বলেও পাঠাও নি কেন? আমি তখনই জীবন ত্যাগ করতাম, তাহলে তোমাদেরকে অনর্থক কষ্ট পেতে হত না।

পরাধীন বিবশ অবস্থায় জোর করে রাবণ আমার গাত্র স্পর্শ করেছিল, এই দোষ আমার ইচ্ছাকৃত নয় —

মদধীনং তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী ॥
সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেন চ মানদ।
যদি তেহহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্॥
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ ।
মম বৃত্তং চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম॥
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলং চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ॥

অর্থাৎ মা জানালেন — আমার অধীন যে হৃদয় তা তোমারই ছিল; কিন্তু যখন আমি নিজে কর্ত্রী নই , তখন পরায়ত্ত দেহ সম্বন্ধে কি করতে পারি? আমরা দীর্ঘকাল একসঙ্গে ছিলাম, পরস্পরকে ভালবেসে ছিলাম, আমিও তোমাকে জেনেছি, তুমিও আমাকে জানার সুযোগ পেয়েছ, এতেও যদি তুমি আমাকে না বুঝে থাক, তবে তা আমার পক্ষে চিরমৃত্যু। আমার জানকী নামের এ অর্থ নয় যে জনক থেকে আমার জন্ম, বসুধাতল থেকে আমার উৎপত্তি; তুমি চরিত্রজ্ঞ, কিন্তু আমার মহৎচরিত্রের সম্মান করলে না। যে প্রতিজ্ঞা করে বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করেছিলে তোমার সেই প্রতিজ্ঞা তুমি মানলে না, আমার ভক্তি চরিত্রবল এবং সব কিছুর দিকে মুখ ফেরালে'।

মায়ের কথা সব শুনলি ত? মায়ের কথায় কত সংযম ও শালীনতা! অভব্য ও অভদ্রের মুখের মত জবাব তিনি দিলেন, তাও কত বিনম্রভাবে, কত মিষ্টি করে।

হাঁদারামটা মায়ের সম্বন্ধে যে সব ইতর মন্তব্য করেছে, এর জন্য তার মুখে কুঠ ফোটা উচিত। — নয় কি?

পাগলা সাধুর কথা শেষ, হতে না হতেই কোথা থেকে একটা বিরাট গর্জন ভেসে এল, সারা বনভূমি কম্পিত হয়ে উঠল। সোঁ সোঁ করে বাতাস বইতে লাগল। এটা ঝড়ের গর্জন, না মেঘের গর্জন, না দূরে কোন বজ্রপাতের শব্দ তা অনুমান করার চেষ্টা করছি, এমন সময় সাধু 'মা রক্ষা কর, মা রক্ষা কর, ঐ যে মহাবীর আমার দিকে তেড়ে আসছে' এই বলতে বলতে গর্ভগৃহে ঢুকতে গিয়েই দড়াম করে পড়ে গেলেন। তাঁর অর্ধেকটা দেহ গর্ভগৃহের ভিতরে, অর্ধেকটা দেহ বাইরে। চৌকাঠের উপর পেট চেপে পড়ে রইলেন। আমি হকচকিয়ে গেছি, ভয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে দরজার কোণে চুপ করে বসে রইলাম। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে, একটু উঠে গিয়ে যে সাধুর কাছে তাঁর অবস্থাটা দেখতে যাবো, তারও উপায় নাই; হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে। আর কোথাও কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এই নিঃস্তব্ধ গহন অরণ্যের গভীর রাত্রি, এই শ্বাসরোধকারী লোমহর্ষক পরিবেশ, ঘন জমাট থমথমে নৈঃশব্দের মধ্যে প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলাম। ঐ ভাবে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে থাকার ফলে হাতপায়ে খিল্ ধরে গেছে। কোনমতে টেনেটুনে হাত-পা সোজা করে নিলাম।

সাধুর দিক তাকিয়ে দেখি, তিনি একই অবস্থায় পড়ে আছেন। দেহে কোন সাড় আছে বলে মনে হল না। গায়ে হাত দিতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক্ খেয়েছিলাম। সাধুর দেহ শক্তিশালী চৌম্বকশক্তি বা বৈদ্যুতিক শক্তির মতই বিপজ্জনক।

সীতামায়ীর মুর্তির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কেউ অজস্র ফুল দিয়ে মায়ের পূজা করে গেছেন। কে আবার পূজা করে গেলেন! পাগলা সাধু ত অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। যিনিই পূজা করুন, তিনি কিভাবে পূজোটা করে গেলেন? সাধুর দেহ ত দরজা আগলে পড়ে আছে!

যাক্ গে, আমি নর্মদাতে স্নান করে আসি। এইভেবে স্নান করতে চলে গেলাম। নর্মদাতটে গিয়ে সূর্যরশ্মির গতি প্রকৃতি দেখে অনুমান করলাম বেলা আটটা নিশ্চয়ই বেজে গেছে। স্নান তর্পণাদি সেরে এসে মন্দিরে দেখলাম, সাধুর সেই একই নিস্পন্দ অবস্থা। সীতামায়ীর পূজা করা সম্ভব হল না, কারণ পূজা করতে হলে সাধুকে ডিঙিয়ে যেতে হবে। দূর থেকেই মাকে প্রণাম করে বসে রইলাম। বসে থাকতে থাকতেই একদল ময়ূরকে কেকা রব করতে করতে মন্দিরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। কোন কোনটা গাছের ডালে উঠেছে।

অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লাম। কমণ্ডলুর জলটা পূজার উদ্দেশ্যে এনেছিলাম। তাই তা খেলাম না। ধীরে ধীরে লাঠিটা হাতে নিয়ে আবার নর্মদার ধারে গেলাম। পেট পুরে জল খেলাম অঞ্জলি করে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য মাথার উপরে লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে। বুঝলাম বেলা বোধহয় বারটা কিংবা সাড়ে বারোটা হবে। বায়ুকোণে মেঘ সেজেছে হয়ত এখনই বৃষ্টি নামবে। মন্দিরের দিকে ফিরে আসতে লাগলাম সভয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে। দূরে একদল হরিণ চড়ে বেরাচ্ছে। মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে সাধুর সাড়া পেলাম। তিনি উঠে বসে সমানে দুলতে দুলতে বলে চলেছেন — 'দোল্ দোল্ দোল্ — দে দোল্, দে দোল্, কোলে তোল্, কোলে তোল্, বৈদেহী! ব্রহ্মময়ী মাগো, অনেক আদর খেলুম মা, তোমার আদরের চাদর মুড়ি দিয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিলাম মা!

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — আমার হাতটা ধরে বসিয়ে দে দেখি। আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরে সোজা করে বসিয়ে দিলাম। তিনি আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন — যা ভিতরে গিয়ে মায়ের পূজা কর, মায়ের কাছে বসে থাক্। আমি এখনই আসছি। আমার লাঠির উপর ভর দিয়ে টলতে টলতে চলে গেলেন নর্মদার দিকে। আমি মা জানকীর চরণ দুটিতে জল ঢেলে প্রণাম করে বসে বসে জপ করতে লাগলাম। প্রায় আধঘন্টা পরেই দূর থেকে সাধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি আবেগের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে আসছেন—

ওমা রেবা, বাপসোহাগি!
তোর বাপের কথাই দিবারাত্তির ভাবছিস্ মনে মনে।

আমিও বলি —

তোর বুড়ো বাপের মতন আর কেউ নেইকো ত্রিভুবনে।
ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ঝুলে কোমর আঁটা বাঘের ছালে
হাড়ের মালা গলায় দোলে ধুতুরার ফুল কানে।
ভাঙের নেশায় মত্ত থেকেও সব কথাই সে জানে॥

গান গাইতে গাইতে তিনি মন্দিরে এসে পৌঁছালেন। দেখলাম, নিজের শতচ্ছিন্ন সোয়েটার খুলে তাতে কতকগুলো ফল বেঁধে এনেছেন। ফল হাতে ঢুকেই সেগুলো সীতামায়ীর মূর্তির পাদদেশে ঢেলে ফেললেন। মা জানকীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন — নে মা একটা ফল খেয়ে নে। রাজদুলালি! তোর কি রাজভোগের অভাব ছিল? বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র এ দুটোর পাল্লায় পড়ে তুই মা এমন রাজপুত্তুরের হাতে পড়লি যে আজ তোকে বনের ফল খেয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে! নিজের পেটের দিকে ত কোনদিন তাকালি না মা, অথচ আমি ত জানি তোর কৃপাকটাক্ষেই দুনিয়ার তাবৎ প্রাণী পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। হায়, হায়, যাবৎ সীতে, তাবৎ পরীক্ষে। পরীক্ষা দিতে দিতেই তোর সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেল মা।

এই বলে ডুকরে ডুকরে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর ফলগুলো কুড়িয়ে এনে আমার সামনে রেখে বললেন — এবারে ব্রাহ্মণ ভোজন হোক। পেট ভরে খা। একটা ফল নিয়ে আমার মুখে গুঁজে দিলেন। ফলটাতে কামড় দিয়ে দেখলাম, তার রস দুধের মত সাদা, যেমনই মিষ্টি তেমনই উপাদেয়। ফলের নাম জানি না, তিনিও নাম বললেন না, ন্যাসপাতির মত দেখতে, তবে ঈষৎ লালচে। তাঁর পীড়াপীড়িতে আটটা ফল খেলাম, পেট ভরে গেল। তাঁকে হাতজোড় করে বললাম — আর খেতে পারব না। তিনি হাসতে হাসতে বাকী ফলগুলো নিয়ে বনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলতে লাগলেন — ইমানি দেবেভ্যঃ। ইমানি দেবীভ্যঃ। ইমানি পশবে। ইমানি পক্ষিণে। আমার কমণ্ডলুর জলে মুখ ধুয়ে একটা ঢেকুর তুলে বললেন — যাক্ আমারও পেটটা ভরে গেছে। এবারে আয় দুই স্যাঙাৎ (বন্ধু) বসে মনের সুখে গল্প করি। হ্যাঁ, কাল যেন তুই কি জিজ্ঞেস্ করেছিলি, এই বিজন অরণ্যে মা জানকীর এমনতর অশ্রুমুখী বিষাদ-প্রতিমা শিল্পী কেন প্রতিষ্ঠা করেছেন? আরে, লঙ্কাতে যুদ্ধশেষে যখন বেইমানটা কর্কশ ভাষায় মায়ের অপমান করল, তখন মা মনের দুঃখে অগ্নিতে প্রবেশ করেছিলেন, অগ্নিদেব সীতাকে কোলে নিয়ে আবির্ভূত হয়ে রামকে বললেন — তুমি এই নিষ্পাপ বিশুদ্ধ স্বভাবা মহাসতীকে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ কর। হাঁদারামের আর মুরোদ হল না, অগ্নিদেবের আদেশ অমান্য করতে। মাকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরল। কিছুদিন পরে কানাঘুষায় প্রজাদের মুখে মায়ের অপবাদ শুনে হাঁদারামের আবার মেজাজ বিগড়াল, যেমনি হবুচন্দ্র রাজা তেমনি তার গবুচন্দ্র প্রজা। থাকতাম যদি আমি সে সময় তাহলে বেটাদের মুখে নুড়ো জেলে দিতাম! আরে তোর কাছে উমদো লোকগুলোর কথাই বড় হল। এতদিনকার প্রেম ভালবাসার কোন দাম দিলি না! লক্ষ্মণকে বলল, বাল্মীকির তপোবনে বিসর্জন দিয়ে আসতে। ছিঃ ছিঃ হাঁদারাম! তোকে শতধিক্। আবার বেটার আদিখ্যেতা কত! জীবন্ত প্রতিমাকে বনবাসে দিয়ে তাঁর স্বর্ণপ্রতিমা গড়ে পাশে রেখে ধর্মকর্ম করতে লাগল। ঐ ঘটনার বার তের বছর পরে হাঁদারামের ইচ্ছা হল অশ্বমেধ যজ্ঞ করার। বাল্মীকির কাছে দূত পাঠিয়ে খবর দিলেন, সীতা যদি শুদ্ধচারিণী হন, তাহলে তিনি আপনার সঙ্গে এখানে এসে সকলের সামনে পরীক্ষা দিন।

বাল্মীকি মাকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন

তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদবিদ্যার মত বাল্মীকির পশ্চাতে মাকে দেখতে পেয়ে যজ্ঞ সভায় মহান সাধুবাদ উত্থিত হল।

লক্ষ্য করলি মাকে এখানে বলা হয়েছে মূর্তিমতী বেদবিদ্যা। এইটি আমার মায়ের যথার্থ বিশেষণ! বাল্মীকি রঘুচন্দ্রকে সম্বোধন করে বললেন — হে রাম, আমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দিয়ে মা জানকীকে শুদ্ধাচারিণী পতিব্রতা বলেই জানি। লোকপবাদে তোমার চিত্ত কলুষিত হয়েছিল, তাই তোমার প্রিয়তমাকে শুদ্ধা জেনেও ত্যাগ করেছিলে। বাল্মীকির ভৎর্সনায় ঘাবড়ে গিয়ে হাঁদারাম ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগল —

শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে॥

জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হোক। অর্থাৎ সকলের বিশ্বাস হোক যে সীতা শুদ্ধস্বভাবা, সকলের সম্মতিক্রমেই আমি সীতাকে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই। এখনও দেখছিস্ বেটা কেমন ভীতু! লোকে যদি বলে তোর বউ ভাল, তবে তুই গ্রহণ করবি! 'চোপরাও ভীতু কাঁহাকার!' বারবার আমার মাকে সকলের সামনে হেনস্তা করতে চাস্? — এই বলে গর্জে উঠলেন পাগলা সাধু, বনের দিকে তাকিয়ে গর্জাতে লাগলেন।

একটু পরেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — কিরে ভয় পেলি নাকি? শুনলি ত মা আমার, বেটাকে ঘাট মাগিয়ে ছাড়লেন। আরে মা কি আমার হেলা-ফেলার জিনিষ র‍্যা? তোর কি খেলার পাত্রী? হাঁদারামের ঐ সব ন্যাকামিতে মা ভুললেন না, সকলে সমবেত হয়েছেন দেখে কাসায় বস্ত্রধারিণী মা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোবদনে মাটির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন —

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুর্মহতি॥

অর্থাৎ যদি রাঘব ভিন্ন আর কাকেও মনে মনে চিন্তা না করে থাকি, যদি কায়মনোবাক্যে রামকেই অর্চনা করে থাকি, রাম ছাড়া কাকেও জানি না — একথা যদি সত্যি বলে থাকি তবে মাধবী দেবী অর্থাৎ পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন।

সহসা এক আশ্চর্য দিব্য সিংহাসন মাটি বিদীর্ণ হয়ে উত্থিত হল। ধরিত্রী দেবী আমার মাকে দুহাতে জড়িয়ে কোলে বসিয়ে অন্তর্হিতা হলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন, কেউ ধ্যান করতে লাগল, স্থাবর জঙ্গম রোমাঞ্চিত হল।

পাগলা সাধু বসে বসে গোটা গা দোলাতে লাগলেন। আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেন —সব শুনলি ত? বাল্মীকির ঐ বর্ণনা থেকে জানতে পারলি ত মা জানকী বার বার পরীক্ষার জ্বালায় উত্যক্ত হয়ে হাঁদারামের উপর তীব্র অভিমানে পাতালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখন ভাল করে চিন্তা করে দেখ ঐ পাতাল প্রদেশটা কোথায়? অমরকণ্টক

থেকে আসার সময় ত কপিলাশ্রম দেখে এসেছিস্? রামায়ণে এবং মহাভারতে একথাও পড়েছিস্ যে , ইক্ষাকু বংশের রাজা সগর তাঁর শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তখন ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়ে তাঁর যজ্ঞাশ্ব কে চুরি করে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে বেঁধে রেখে আসেন। সগরের পুত্ররা সেই ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে এসে ঘোড়াটি দেখতে পান। তারা মনে করল, মুনিই বোধহয় ঘোড়া চুরি করে এনেছেন। তারা তাঁর অপমান করতে আরম্ভ করতেই কপিলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সবাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সেই পাতাল মানে দশ বিশ হাজার ফুট মাটির নিচে কোন অন্ধকার গহ্বর নয়। ত্রেতাযুগে এই অঞ্চলটাই পাতাল প্রদেশ। পাতালের রাজা ছিলেন দৈত্যরাজ বলি। তাঁরই পুত্র পরম শৈব বাণরাজার যজ্ঞস্থলি হল এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। এখন তার নাম ধাবড়ী কুণ্ড। নর্মদার জল সেই কুণ্ডে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে, তার ফলেই সেখানে হাজার হাজার নর্মদেশ্বর লিঙ্গ স্বতঃই উদ্ভূত হচ্ছে। কাল সকালে তোকে সেই ধাবড়ী কুণ্ডের পথে কতকটা এগিয়ে দিয়ে আসব।

এখন বুঝে দেখ, ধরিত্রীদেবী যে মা জানকীকে কোলে বসিয়ে পাতালে নিয়ে গেছলেন অর্থাৎ আমার মা যে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন, তার অর্থ হল মা নর্মদাতটের এই পাতাল প্রদেশে এসে অবস্থান করেছিলেন। বোকারামটা বেইমানী করলেও ভাল মানুষের বেটি আমার মা জানকী তপোভূমি এই নর্মদাতীরে বসে রাম-তপিস্যে করে চলেছেন। তাঁর নামানুসারেই ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির এই অংশটার নাম — সীতামায়ীর জঙ্গল। শিল্পী সবদিক বিবেচনা করে তাই ঐরকম তপোক্লিষ্টা বিষাদ প্রতিমা গড়েছেন। মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ, মা যেন অনন্ত বিরহের মূর্ত প্রতীক। রাম বিরহে মহাসতী কাতর, তাই তাঁর চোখ হতে জল গড়িয়ে পড়ছে।

পাগলা সাধু কিছুক্ষণ পায়চারি করতে লাগলেন। আবার আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন —মায়ের ঐ রকম মূর্তি দেখে, আমার এই দণ্ডে কি মনে হচ্ছে জানিস্, শিল্পী যেন এই মূর্তি গড়ে বেইমান হাঁদারামকে তার অবিচারের জন্য ধিক্কার দিচ্ছে — ওয়াক্ থুঃ, ওয়াক্ থুঃ। সাধু দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন মন্দিরের বাইরে। রাত্রি হয়েছে , জঙ্গল থেকে নানারকমের বিচিত্র শব্দ উঠছে। সাধুর ওয়াক্ থুঃ, ওয়াক্ থুঃ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এই রকম বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সামনে কখনও পড়ি নি। ভাবছি, কোন রকমে রাত্রি প্রভাত হোক, পাগলকে এড়িয়ে যেকোন ভাবে হোক্ এ স্থান ছেড়ে পালাবো, তাতে কপালে যাই ঘটুক।

কিছুক্ষণ পরে সাধু ফিরে এলেন। তাঁর চোখ দুটো যেন কপালে উঠে গেছে। তিনি থরথর করে কাঁপছেন। সীতামায়ীর দিকে তাকিয়ে বলছেন — রাগ করিস্ না মাগো, পাগল ছেলের উপর তুই যদি রাগ করিস্ তবে আমি কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো? এই দেখ্ আমি কানমলা খাচ্ছি (ঘন ঘন নিজের কান দুটো দু'হাত দিয়ে মোচড়াতে লাগলেন)। আমি নাক ঘষটানি খাচ্ছি মা, আর আমি তোর রামের নিন্দা করব না। (এই বলে মাটিতে শুয়ে পড়ে) পাথরের মেঝেতে নাক ঘষটাতে ঘষটাতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে বলতে লাগলেন — "হে পতিত-পাবন, অধম-তারণ ভক্তবৎসল, ভক্তজনাশ্রয় হে রামচন্দ্র! হে কমল-নয়ন প্রভু ! তুমি অগতির গতি, অপার গুণনিধি, তুমি দয়ার সাগর, এ পাগলটাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর দয়াল,

ক্ষমা কর।'' অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে সাধু চুপ করে গেলেন। একেবারে নিঃস্পন্দ অবস্থা।

অগত্যা আমি এককোণে কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম। নানাকথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, সাধু উঠে দরজার কাছে বসে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আপনমনে গলা ছেড়ে গান গাইছেন, কী মধুর ভক্তি-বিহ্বল কণ্ঠ! সাধু গাইছেন —

'ভাসায়ে দিয়েছি অজানার পথে প্রেমের বেসাতি ভরি
অসীম অতল সিন্ধু সলিলে চলিয়াছে নেচে তরি।
গগনে জ্বলিছে শশী বর্তিকা
দূর বন্দরে আলোকের শিখা
প্রোজ্বলি কালো নিশা-বিভীষিকা নিয়েছে আঁধার হরি।
তম-যবনিকা সরায়ে দেখেছি সত্যের মহাকাশ
হৃদয়ে আমার উঠিয়াছে জ্বলি উর্ধ্বের অভিলাষ।
অন্তর আলো সিন্ধুর সাথে
নাচিছে খেলিছে এ জ্যোছনা রাতে
এসেছে নামিয়া জ্যোতির প্রপাত আনন্দ উল্লাসে।'

গানের প্রত্যেকটি কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাধু গাইছেন। তাঁর দুই চোখ ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু, চোখে-মুখে আনন্দের উচ্ছল আবেগ ফুটে উঠেছে। নির্জন গভীর রাতে এই ঘনঘোর অরণ্যের মধ্যে সমগ্র বনপ্রকৃতি যেন শ্বাসরুদ্ধ করে সাধুর মাদকতাময় মধুর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য উপভোগ করছে, একটা মায়াময় পরিবেশই যেন সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি শুয়ে শুয়েই মনে মনে হিসাব করলাম, আটই আষাঢ় বুধবার ওঁকারেশ্বর হতে যাত্রা করে সেলানী রামপুরার জঙ্গলে সেই পোড়ো মন্দিরে এই পাগলা সাধুর সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলাম, সেদিন ছিল, ত্রয়োদশী তিথি। গতকাল চতুর্দশীতে এই সীতামায়ীর মন্দিরে এসে পৌঁচেছি, পাঁজির হিসাবে আজ দশই আষাঢ় ঘোর অমাবস্যা। কিন্তু সাধুর চোখে 'জ্যোছনা রাত', তিনি 'জ্যোতির প্রপাত' দেখছেন!

তা তিনি দেখুন, কিন্তু আমার একি হল? আমার নীরস ও পাষাণ প্রাণও সুরের মূর্ছনায় এমন আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে। আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিবশ হয়ে আসছে।

সাধুর স্পর্শে আমি জেগে উঠলাম। তিনি আমাকে ঠেলা দিয়ে বলছেন — ওঠ্, ওঠ্ সকাল হয়ে গেছে। ধাবড়ী কুণ্ডে রাবড়ী খেতে যাবি যে! আমি ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। কমণ্ডলুর জলে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। ভোর হয়েছে বটে গাছেপালায় এখনও আবছা অন্ধকার জড়িয়ে আছে। পাগলা সাধু সহসা তাঁর 'রাজ পোষাক' খুলে খালি গায়ে লম্বা হয়ে শুয়ে নিজের পেটে ধীরে ধীরে টোকা মারতে লাগলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন — হাঁরে, আমাদের শরীরের কটা দরজা আছে জানিস্?

— আমাদের কোন কোন শাস্ত্রে আছে 'নবদ্বারে পুরে দেহী', আবার কোন কোন অনুভবী মহাত্মা বলে গেছেন ত্রিকুটী বা আজ্ঞাচক্রও একটা দ্বার, দশম দুয়ার। কিন্তু কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত কঠোপনিষদ্ বলেছেন — আমাদের দেহ একাদশ দ্বার বিশিষ্ট। এই বেদবাক্যই আমার কাছে মান্য। কঠোপনিষদের কোথায় ঐ কথা আছে? মন্ত্রটা যদি মনে থাকে, আমাকে শোনা দেখি?

কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীতে প্রথম মন্ত্রটি হচ্ছে,

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥

অর্থাৎ জন্মরহিত নিত্যচৈতন্যস্বরূপ একাদশ দ্বারযুক্ত একটি নগর আছে। সেই নগরের যিনি অধিষ্ঠাতা, তাঁকে ধ্যান করে লোকেরা শোকাতীত হয়, মুক্ত হয়, আর তার পুনর্জন্ম হয় না। ইনিই সেই আত্মা।

— দরজাগুলোর নাম গোদা বাংলায় ঝটপট করে বল্ দেখি?

— ব্রহ্মরন্ধ্র, দুই চোখ, নাকের দুই ফুটো, দুই কানের দুই ফুটো, মুখের ফুটো মলমূত্র ত্যাগের দুটো দরজা এবং নাভি — এই মোট এগারটা দরজা আছে।

— বেশ বেশ, নাভিও তাহলে একটা দরজা তোর জানা আছে। নাভি যে কেমন দরজা তোকে দেখাচ্ছি দেখ।

এই বলে তিনি নিজের নাভির উপর গুণে গুণে তিনটা থাপ্পড় মারলেন সশব্দে। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম, তাঁর নাভি ধীরে ধীরে ফুলে উঠে বিস্ফারিত হয়ে গেল, সেই বিস্ফারিত রন্ধ্র পথে বেরিয়ে আসতে লাগল নানা বিচিত্র বর্ণের ছোট ছোট শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গগুলি নাভিদ্বার হতে বেরিয়ে ঠুক ঠুক শব্দে এক একটি করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ছে আর তিনি এক একটি করে তা মুখে পুরে গিলে গিলে নিচ্ছেন। আমার দুই চোখ কপালে উঠবার জোগাড়! আমি রীতিমত ঘামতে সুরু করেছি। তাঁর বিস্ফারিত নাভি আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে জুড়ে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠল.........।

— যা না বেটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছিস্ কেন? উঠে সীতামায়ীকে প্রণাম করে এসে আমাকেও একটনা পেন্নাম ঠোক্। আমার পঞ্চেন্দ্রিয়গুলোর পাঁচকুড়ি বয়স হয়ে গেল!

আমি তাঁর নির্দেশে গর্ভগৃহে ঢুকে মাকে প্রণাম করে এসে দেখি, তিনি কপালে করাঘাত করতে করতে মৃদুকণ্ঠে বলে চলেছেন — তুমি যাই, তিনি তাই। যাই তুমি, তাই আমি। তিনি তুমি, আমিও তিনি। তুমি আমি ভেবে হায়রে, মোরা অধোগামী! আমি তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতেই তিনি চমকে উঠলেন।

বললেন — নে নে, বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। গাঁঠরী কাঁটরী নিয়ে রেডি হয়ে যা, তোকে ধাবড়ী কুণ্ডের পথে কতকটা এগিয়ে দিয়ে আসি। সীতামায়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন — এখন তাহলে আসি মা, তুই কিছু ভাবিস্ নি, আমি কিছুক্ষণ পরেই তোর কাছে ফিরে আসব।

তিনি জঙ্গলের পথে পা বাড়ালেন। সেদিনকার মত তাঁর কোমরে বাঁধা নামাবলীর দোদুল্যমান অংশটা জাপটে ধরে আমি তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলাম। জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে এসে পড়েছে। ঘন বন, মোটা মোটা লতা শিকড় গাছগুলোকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। তারই মধ্যে একটা পথরেখা ধরে রাস্তার দুদিকে ঘন ঘন লাঠি আছড়াতে তিনি ক্রমশঃও উৎরাই এর পথে উঠতে লাগলেন। যেখানেই পাথরের চাঙড় পড়ে সেখানেই আমার হাত ধরে টেনে তোলেন আর বলতে থাকেন — হেইও জোয়ান হেইও, ভৃগুর বেটা হেইও। শাল ও সাজা গাছ থাকলেও সেগুলই বেশী

সেগুন গাছ যে এত মোটা হয়, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত। আরও কতকটা চড়াই এর পথে উঠলাম, মনে হল পাহাড়ের একটা স্তর অতিক্রম করে আর একটা স্তরে উঠে এসেছি। নানারকম লতাগাছে নানারকম বনফুল ফুটেছে। পাহাড়ের এই স্তরটার দেখছি, সেগুন গাছের ফাঁকে ফাঁকে একরকম গাছ যেগুলোর কাণ্ড একেবারে সাদা। পাগলা সাধু বললেন — এই গাছগুলোর নাম শিববৃক্ষ, দেখছিস্ না ন্যাংটা ভোলানাথের গায়ের মতই এগুলোর গুঁড়ি সাদা। এইভাবে প্রায় দেড় দু ঘন্টা হাঁটার পর বন কতকটা পাতলা হয়ে এল। চড়াই এর পথে আর কতকটা যাবার পরেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'নামাবলীর খুঁটটা ছেড়ে দে ত?' আমি নামাবলীর অংশ ছেড়ে দিতেই তিনি কোমরে সেটা জড়িয়ে নিয়েই বললেন — চুপ করে দাঁড়া, ভয় করবি না, আমি এখনই আসছি। তাঁর চলার পথ অনুসরণ করে যা দেখলাম, তাতে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড়। দেখলাম, একটা বিরাট কালো ভালুক টলতে টলতে আমাদের দিকেই আসছে। মাঝেই আবার দাঁড়িয়ে পড়েই থপ্ থপ্ করে নাচছে। পাগলা সাধু তার কাছাকাছি যেতেই সেই দীর্ঘদেহী লোমশ ভালুক তার হাতের বড় বড় নখ বের করে মুখব্যাদন করে থপ্ থপ্ করে এগিয়ে আসতে লাগল। মুখের ভিতর কী টকটকে লাল! তিনি ভালুকের গালে তড়িৎ গতিতে একটা থাপ্পড় মেরেই বললেন — কি রে বেটা জাম্বুবান্! নিরামিষ্যি বোষ্টম হয়েও মনে হিংসা পুষে রেখেছিস্? মানুষকে আঁচড়ে কামড়ে রক্তপাত ঘটিয়ে কী মজা তোরা পাস্? ভালুকের দুটো হাত ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বললেন — কি রে বেটা সাত সকালেই ধাতুপ ফুলের মধু খেয়ে নেশা করেছিস্? টলে পড়ে গেলেই যে খাদে পড়ে অক্কা পাবি! চল চল্ ওদিকে চল্। এই বলে ভালুকটাকে ঠেলতে ঠেলতে একটা শিববৃক্ষের গোড়ায় নিয়ে গিয়ে তার হাত দুটোকে গাছের গুঁড়িটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য করলেন। পিঠে আবার একটা থাপ্পড় মেরে বললেন — থাক্ বেটা এইরকম ভাবে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আদৌ নড়বি চড়বি না। পাগলা সাধুর ভাষা পশুটা কি বুঝল জানি না, তবে ভয়ঙ্কর জন্তুটা শান্ত-শিষ্ট নিরীহ বালকের মত গাছটা আঁকড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমাকে বললেন — এবার চলে আয়, কোন ভয় নাই। ভয়ে বিস্ময়ে আমার হাত-পা তখন অসাড়। ভয়ে ভয়ে ভালুকটার দিকে তাকাতে তাকাতে আমি কোনমতে তাঁর কাছে এসে পৌঁছলাম। এবার আর তাঁর কোমরের নামাবলী ধরতে হল না, অধিত্যকার কতকটা সমতল পথে এসে পৌঁছেছি। বন এখানে যথেষ্ট পাতলা! একটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পার্বত্যপথের সুস্পষ্ট রেখাও চোখে পড়ল। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন — এবার আমি বিদায় নেব। এই পথ ধরে সোজা চলে যা। ধাবড়ী কুণ্ড এখান থেকে মোটে তিন মাইল। মাইল দুই গেলেই জলপ্রপাতের গর্জন শুনতে পাবি। ঐটাই ধাবড়ী কুণ্ড! কিছু ভয় নাই, ওখানে গেলেই দলবল জুটে যাবে। বর্ষা ঘনিয়ে আসছে। বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐখানেই থাকবি।

আমি বললাম — আমার আর পরিক্রমায় দরকার নাই, আমি সারাজীবন আপনার কাছেই থাকতে চাই।

— দূর শালা, এ কি অলক্ষুণে কথা! আপনি রামা ভাত পায় না গোবিন্দাকে ডাকে! আমার নিজের শালা কোন চালচুলো নাই। পাগল লোক, কখন কোথায় থাকি তার ঠিক

ঠিকানা নাই। মা নর্মদা তোকে চোখে চোখে রেখেছেন। ঘাবড়াবি না। আ মল্লো! তুই কাঁদছিস কেন?

— সারাজীবন আমার সাথী হয়ে থাকুন। দয়া করুন।

আমার চিবুক ধরে নাড়াতে বললেন — তুইও দেখছি রামমুখ্যু! আরে, শিবসুন্দরই ত তোর আমার সবারই নিত্যকালের সাথী। আমি চললাম, ফিরে যাচ্ছি মায়ের মন্দিরে। তারপর চব্বিশ অবতারে আমার কুটীরটাতে গিয়ে থাকব। তুই আমার সঙ্গে কোনদিন দেখা করার জন্য হাঁকপাক করবি না। দরকার পড়লে আমি দেখা করব।

এইবলে পেছন ফিরে তিনি হাঁটতে লাগলেন। কিছুটা যাবার পরেই দেখলাম তিনি বসে পড়লেন। আমি সেইখানে পাঁঠরী লাঠি কমণ্ডলু ঝোলা ইত্যাদি ফেলে রেখে তাঁর কাছে দৌড়ে গেলাম। শুনলাম তিনি জঙ্গলের দিকে মুখ করে দোল্ খেতে খেতে আপন মনে বলে চলেছেন — দে দোল্, দে দোল্। বুকে তোল্, বুকে তোল্। বলি বুকে তুলে লুটোপুটি খেলে তোমার রসের খেলাটি জমবে কি করে? রসের লীলা তখন যে শুকিয়ে চচ্চড়ি হবে!

আমার পায়ের শব্দে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন —'সোনা ছেলে আমার কথা শোন্। ধাবড়ী কুণ্ডে চলে যা, আমার মত পাগলের পাল্লায় পড়লে বেঘোরে তোর প্রাণটা যাবে।' পরক্ষণেই আমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন — 'হারামজাদা, পরিক্রমার কঠিন শপথ নিয়েছিস্ না? তোর বাবার মুখটাও কি তোর মনে পড়ছে না? তিনি তোর মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তোর এই বেআক্কেলে কথাবার্তা শুনে। ফিরে যা, নাহলে এবারে আমি ক্ষেপে যাবো!' এইবলে জঙ্গল পথে নেমে যেতে লাগলেন। আমার চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে, অপলকনেত্রে আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে গাইতে গাইতে যাচ্ছেন —

ওমা রেবা, তোর বুড়া বাপের নাই কি কোন কাম?
ঘুরে বেড়ায়, দয়া বিলায় চায় না কোন দাম!
সিংহের উপর কে সুন্দরী দশহাত তাঁর কী মাধুরী!
(তোর) বুড়া বাপ্‌কে জড়িয়ে ধরি মধুচালে অবিরাম।
ওমা রেবা, তোর বুড়া বাপের নাই কি কোন কাম?

ধীরে ধীরে সাধু সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরও আর শুনতে পাচ্ছি না। বুকের ভিতরটা যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে। বড় অসহায় এবং একা মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সূর্যের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে বেলা বোধহয় সাড়ে আটটা কিংবা নটা হবে। পাগলা সাধুর কথা যেন এখনও কানে বাজছে—'পরিক্রমার কঠিন শপথ নিয়েছিস্ না?' তমোহরী জ্যোতির্ময় সূর্যনারায়ণকে প্রণাম করে পাঁঠরী ঝোলা ও কমণ্ডলু হাতে নিয়ে ক্লান্ত পদে এগোতে লাগলাম ধাবড়ী কুণ্ডের দিকে।

মনের মধ্যে এমনই একটা বিষাদ এসে ঘিরে ধরেছে, খুব জোরে হাঁটতে পারছি না! পার্বত্য পথের পথচিহ্ন ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। এখন আর পথের দুপাশের মনোরম দৃশ্য কোনমতেই মনকে আকর্ষণ করছে না। কেবলই পাগলা সাধুর মুখখানা মনে পড়ছে। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ একের পর এক যেন চোখের সামনে ভাসছে। খুব

ঘন্টাখানিক হাঁটার পর দেখলাম একটা ঝরণা পথকে প্লাবিত করে প্রবল বেগে নিচের দিকে নামছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যে উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটা পড়ছে, তার চারপাশে ঘন বনানী, পাথরের প্রাচীর, সে পাথর গ্রানাইট হতে পারে, কোয়ার্জ কিংবা চুনা পাথরও হতে পারে। অমরকন্টকে শুনেছিলাম সেখানের পর্বতগাত্রে যে পাথর তার থেকে দামী অ্যালুমিনিয়ম নিষ্কাসিত হয়, সেই অ্যালুমিনিয়ম দিয়ে নাকি এরোপ্লেনের বহিরাবরব প্রস্তুত হতে পারে। এখানে পর্বতগাত্রে যে পাথর দেখছি এ পাথর সেইরকম বহুমূল্য পাথরও হতে পারে।

গবেষণায় কাজ নাই, আমি লাঠি ঠুকে ঠুকে ঝর্ণার উপল বিছানো পথটা অতি সাবধানে অতিক্রম করলাম। ঝর্ণার বিস্তৃতি বড় জোর পঁচিশ ত্রিশ ফুট হতে পারে। ঝর্ণাটা পেরিয়ে চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিলাম। যতদূর দৃষ্টি গেল, দেখলাম ঝর্ণার ধারে ধারে অজস্র ল্যান্টেনা ক্যামেরা ফুলের গাছ আর ফুল ফুটে আছে।

আরো কিছুদুর এগোনোর পর এইবার দূর থেকে জলপতনের গর্জন শোনা গেল। বুঝলাম ধাবড়ী কুণ্ডের সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছি। যতই এগোচ্ছি গর্জন ক্রমেই দীর্ঘতর ও স্পষ্টতর হচ্ছে। প্রায় ঘন্টাখানিক হাঁটার পর চোখে পড়ল পেঁজা তুলার বস্তার মত নর্মদার জল এক বিশাল কুণ্ডগাত্রে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। আর সেখানটা ঘন ধুঁয়ায় ভরে আছে। জব্বলপুরের ভিড়াঘাটে, ধুঁয়াধারা দেখে এসেছি কিন্তু জলময় কুণ্ড হতে প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু পর্যন্ত এই কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার কাছে ধুঁয়াধারের কোন তুলনাই হয় না। নর্মদার বিস্তার এখানে অনেক অনেক বেশী। প্রায় আড়াই হাজার ফুট উঁচু পর্বতগাত্র হতে একটা বিশাল জলপ্রপাত এমন প্রবল বেগে এসে পর্বতগাত্রে এমন ধাক্কা দিচ্ছে যে, সেই প্রচণ্ড গতির প্রভাবে এখানে এক সুবিশাল কুণ্ড তৈরী হয়ে গেছে। এখানে যে জলপ্রপাত দেখলাম এতবড় জলপ্রপাত নর্মদাতটে আর কোথাও দেখি নি। পুর্বেই মহাত্মা প্রলয়দাসজীর কাছে শুনেছি, এই কুণ্ড দৈত্যরাজ বলীর পুত্র মহাশৈব বাণ রাজার যজ্ঞকুণ্ড। এখানে পাথর নর্মদার জলে প্রচণ্ডবেগে বিঘূর্ণিত হয়ে আপনা হতেই লিঙ্গাকার হয়ে পড়ে। এখানকার লিঙ্গই আসল নর্মদেশ্বর বাণলিঙ্গ। পরবর্তীকালে এই যজ্ঞকুণ্ডের নাম ধাবড়ী কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে এবং এই কুণ্ডে যেসব শিবলিঙ্গের আবির্ভাব ঘটে তার অধিকাংশই দুগ্ধ ফেননিভ অমল ধবল, যেন প্রত্যেকটিই স্ফটিক লিঙ্গ। সাদা শিবলিঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য রং এরও হাজার হাজার খাঁটি নর্মদেশ্বর লিঙ্গও এখানে পাওয়া যায়।

কুণ্ডের কাছাকাছি গিয়ে দেখতে ইচ্ছা হল। কিন্তু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত অজস্র জলকণার অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণে আমার সারা গা ভিজে যাচ্ছে। আমি বেশ কতকটা পিছিয়ে এসে যেখানে জলকণা ছিটকে এসে পড়ছে না, এমন এক স্থানে একটা বড় পাথরের চাঙড়ের আড়ালে নিজের গাঁঠরী ও ঝোলা প্রভৃতি রেখে কুণ্ডের কাছাকাছি গিয়ে সবকিছু নিজের চোখে দেখবার সংকল্প করলাম। ভিজে যাই যাবো, বেলা বোধহয় এগারটা বাজতে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ ভিজে স্নান করে নিলেও কোন ক্ষতি নাই। মনে মনে আমি এই ভেবে আমি মুখে চোখে মাথায় জলের ছিটাকে অগ্রাহ্য করে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে কুণ্ডের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম। একী বিশাল কুণ্ড! পর্বতগাত্র ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় ষাট ফুট লম্বা, পঞ্চাশ ফুট বিস্তৃত, গভীরতা যে কত তা নির্ণয় করা অসম্ভব -- এইরকম এক বিরাট গহ্বরে নর্মদা উত্তাল

বেগে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে, সংখ্যাতীত ভারী জিনিস দুড়দাড় শব্দ করে এই কুণ্ডে পড়ছে, নর্মদাগর্ভ থেকেও আরও অনেকগুলি ভারী জিনিষ দুড়দাড় শব্দ করে এই কুণ্ডে পড়ছে, নর্মদাগর্ভ থেকেও আরও অনেকগুলি ভারী পাথর যেন ঘূরপাক খেয়ে উপরের দিকে ঠিকরে ঠিকরে উঠছে আবার গড়িয়ে পড়ছে নর্মদার জলে! আমি কুণ্ডের আরও কাছাকাছি যাবার জন্য এগোতে লাগলাম। স্তরে স্তরে নেমে গেছে পাথরের ধাপ — যেন পুকুরের শান বাঁধানো ঘাট। সম্পূর্ণ ভিজে গেছি। মনে হচ্ছে যেন অবগাহন স্নান করে এইমাত্র নর্মদা থেকে উঠেছি। কুণ্ডের কাছে গিয়ে একটা ধাপে গিয়ে বসে পড়লাম। এখানকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে অবাক হলাম যে অবিরত জলকণায় এস্থান সিক্ত হলেও পাথরে বিন্দুমাত্র পিচ্ছিলতা নাই। কালো কুচকুচে পাথর যেন এইমাত্র কেউ ঘি দিয়ে ঘষে ঘষে মেজে গেছে। ঘিএ মাজলেও তাতে পিচ্ছিলতা থাকে, কিন্তু এখানকার পাথরে তাও নাই অথচ অত্যন্ত মসৃণ। কুণ্ডের কাছে বসে দেখতে পেলাম অজস্র তুষার ধবল শিবলিঙ্গ নর্মদার জলে সেই কুণ্ডের মধ্যে ভাসছে। জলের স্রোতে কিছু কিছু আবার পশ্চিম সমুদ্রগামিনী নর্মদাগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কয়েকটি সাদা শিবলিঙ্গ জল থেকে ঠিকরে আমার আশেপাশে পড়ল, কুণ্ডগাত্রে ধাক্কা লেগে আবার গড়িয়ে পড়ল জলে। আমার মনে ভয় হল জলের তোড়ে যদি এইভাবে শিবলিঙ্গ ঠিকরে এসে আমার নাকে মুখে বুকে বা কপালে ঠোক্কর মারে তাহলে ত বিষম কাণ্ড ঘটবে। আমি উপর দিকে আরও তিনধাপ পিছু হটে বসলাম। দুচোখ ভরে দেখতে লাগলাম শিবলিঙ্গের উৎক্ষেপ ও নর্তনলীলা। অকল্পনীয় এই দৃশ্য দেখে বলাবাহুল্য আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে পড়ল বাবার কথা এবং কাশী কামরূপমঠাধীশ স্বামী ভোলানন্দ তীর্থের কথা। তাঁদের উভয়ের মুখেই শুনেছিলাম যে নর্মদাতটের এই ধাবড়ী কুণ্ডেই বাণলিঙ্গ পাওয়া যায়। বাণলিঙ্গের একমাত্র উদ্ভবস্থল এটি। কুণ্ডের চারিদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। অমরকন্টকে নর্মদা-উদ্গম মন্দিরে দেখেছিলাম নর্মদার উদ্গম ক্ষেত্রে যে সরোবর, যাকে অনেক সন্ন্যাসী কোটিতীর্থের দ্বার বলে মান্য করেন, ধাবড়ী কুণ্ডও সেইরকম একাদশমুখী যন্ত্রের আকারে নিখুঁত জ্যামিতিক মাপে স্বতঃই একটি সিদ্ধ যন্ত্রের আকৃতি নিয়েছে। নর্মদা-উদ্গম মন্দিরে নর্মদা মাতার প্রধান পূজারী আচার্য রামাধীন দ্বিবেদী আমাকে বলেছিলেন নর্মদা যেখানে উদ্গত হয়েছেন সেখানে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বংশেশ্বরের আধার পট একটি সিদ্ধযন্ত্র, তার নাম ত্রিকূট। ত্রিকূট নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে আমাকে দেখিয়েছিলেন যে নর্মদা মন্দিরের পূর্ব দিকে দিয়ে গায়ত্রী এবং পশ্চিম দিক দিয়ে সাবিত্রী নদী এসে নর্মদাতে মিলিত হয়েছে। নর্মদা গায়ত্রী ও সাবিত্রী এই তিনের সংগম হয়েছে বলেই ত্রিকূট। মৈকাল বা অমরকণ্টক পর্বতের তাই অপর নাম ত্রিকূট। মহাকবি কালিদাস অমরকন্টককে ত্রিকূট পর্বত নামেই অভিহিত করেছেন।

যাইহোক, এখানে কিন্তু ত্রিধারার কোন সংগম চোখে পড়ল না। তবে কুণ্ডের আকৃতি যে একাদশ কোণ বিশিষ্ট তা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়।

প্রায় ঘন্টাখানিক হয়ে গেছে। কুণ্ডের তীরে বসে বসে স্নানের বাড়া হয়ে গেছে অবিরত জলকণার ছিটায়। কুণ্ডের মধ্যে শিবলিঙ্গের যা তাণ্ডবলীলা চলছে, তাতে কুণ্ডের জল হাতে নিয়ে তর্পণ করতে সাহস হল না। অঞ্জলি পেতে জলের কণা ধরে কোনমতে তর্পণের কাজ

সেরে উঠে এলাম উপরে, তিনটা বেলগাছের পাশ দিয়ে। গাঁঠরী থেকে শুকনো আলখাল্লাদি বের করে মাথা মুছে বেশবাস বদলাচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে কেউ গম্ভীর গলায় শুনতে পেলাম বলছেন — তুম্ কৌন্ হো? ইস ধাবড়ী কুণ্ডমে ক্যায়সে আ গয়ি?

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একজন জটাজুট দণ্ডী সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। শান্ত সৌম্য মূর্তি, মুখে মৃদু হাসি। বললাম —

— ম্যয় পরিক্রম্মাবাসী হুঁ।

— ইস্ শরীরকা নাম হ্যায় অভয়ানন্দ আরণ্য। ম্যয় যোগিরাজ একলিঙ্গস্বামীজী মহারাজকী সেবক হুঁ। বর্ষাৎ মেঁ পরিক্রম্মা করনা নিষিদ্ধ হৈ। ঠারেঙ্গে কাঁহা।

— ইধারই ঠারনেকা বিচার হৈ। নর্মদা মাইকী যো মৌজ হোগা, ওহি করনে পড়েগা।

— বহোৎ খুশী কা বাত হৈ। ইধর ঠারনাই আচ্ছা হৈ। আপ্ হমারো সাথমেঁ আইয়ে, সব ইন্তেজাম হো যায়েগা।

নীরবে তাঁর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম ধাবড়ী কুণ্ডেরই পাশ দিয়ে কিছুটা চড়াই এর পথে। প্রপাতের বিকট গর্জনে পাশাপাশি দুজন হাঁটলেও কারও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছি না। প্রপাতের আশেপাশে নানা গাছের জঙ্গল। অভয়ানন্দ স্বামীই অনেকগুলি গাছ আমাকে চিনিয়ে দিলেন। বেলগাছ ছাড়াও মেহরিন্, ধাওয়া হরিতকী এবং রুদ্রাক্ষের গাছ অজস্র। হাঁটতে হাঁটতেই দেখতে পেলাম ধাবড়ী কুণ্ড ছাড়াও এখানে আরও অনেক কুণ্ড আছে। এইসব কুণ্ডেও শিবলিঙ্গ ভাসছে। সাধুর সঙ্গে মিনিট কুড়ি চড়াইএর পথে হাঁটার পরেই কতকগুলি সারি সারি গুহা দেখতে পেলাম। সাধুই বললেন ইধর সবলোগ্ গুফামেই ঠারতা হৈ। আপকো লিয়ে ভি এক ছোটাসা গুফা মিল্ যায়েগা। একটি বহু প্রাচীন একতলা পাথরের বাড়ীও দেখলাম। সাধুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম — এটি পাকশালা। প্রায় পনেরজন সন্ন্যাসী এখানে বাস করছেন। সকলেই একলিঙ্গস্বামীর শিষ্য। একলিঙ্গস্বামী গত পাঁচ বছর ধরে এখানেই সশিষ্যে বাস করছেন। আগে চল্লিশ বছর ধরে গিরণার পাহাড়ে ছিলেন। তাই অনেকে একে গিরনারী বাবা নামেও অভিহিত করে থাকেন। এঁর গুহার সামনে নিয়ত একটা বাঘ পাহারা দিয়ে থাকে।

— আভি আপ্ খুদ আঁখসে দেখেগা।

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট গুহার সামনে এসে বললেন —ইস্ গুফামে আপ বিরাজিয়ে। কোঈ তক্লীফ নাহি হোগা। তাঁর সঙ্গে গুহার মধ্যে মাথা নুইয়ে ঢুকলাম। তিনি একে 'ছোটাসা গুফা' বললেও আমি দেখলাম গুহার ভিতরটা বেশ প্রশস্ত। দুতিনজন লোক অবলীলাক্রমে এখানে শুয়ে বসে আরামেই থাকতে পারেন। অভয়ানন্দজীর নির্দেশে গুহার মধ্যে আমার ঝোলাঝুলি গাঁঠরী রেখে তাঁর সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম। প্রত্যেকটি গুহারই মুখ নর্মদার দিকে। অন্যান্য গুহার মুখে গেরুয়া কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। গাছের ডালে ডালে ঝুলছে গেরুয়া বস্ত্র এবং কৌপিন। সন্ন্যাসীরা কাপড় শুকোতে দিয়েছেন। অভয়ানন্দজী উচ্চৈস্বরে হাঁক দিলেন — 'হর নর্মদে'। গুহার অভ্যন্তর হতে বেরিয়ে এলেন সন্ন্যাসীর দল 'হর নর্মদে' বলতে বলতে।

আমি তাঁদেরকে 'হর নর্মদে' বলে যুক্তকরে অভিবাদন ও দণ্ডবৎ জানালাম।

একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী সন্ন্যাসীকে উদ্দেশ্য করে অভয়ানন্দজী বললেন -- হরিস্বামীজী, ঔর এক নারায়ণ আ গিয়া। ভোজনকা প্রবন্ধ হোগা ত?

গুরুজীকা অখুট ভাণ্ডারা, ইধর কোই চিজ্ কমী হৈ ?

— অভি হম্ ইনকো গুরুজীকা পাশ লে যাতা হুঁ। অভি লৌটেঙ্গে। দেখতে পেলাম প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে একটা গেরুয়া পতাকা পত্‌পত্ করে উড়ছে, অনুমান করলাম, ঐখানেই একলিঙ্গস্বামীর গুহা। নিকটবর্তী হতেই পাহাড়ের গায়ে এক বিশাল গুহামুখ চোখে পড়ল। কিন্তু গুহার দরজার কাছেই এক বিকটাকার বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখেই আমার বুকের রক্ত যেন হিম হতে লাগল। হাত পা ভয়ে অসাড়। ব্যাঘ্ররাজের কাছ হতে দশ বার ফুট দূরে দাঁড়িয়ে অভয়ানন্দজী হাঁক পাড়লেন — হর নর্মদে। বাঘটা উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্ গর্ শব্দে বিকট আওয়াজ করতে লাগল।

গুহার অভ্যন্তর হতেই একলিঙ্গস্বামীর আওয়াজ শুনতে পেলাম — বেটা বটুকনাথ। শান্ত হো যাইয়ে। ওহ্ লোক্ আপনা আদমী হ্যায়। হর নর্মদে।

মহাত্মার কথায় বাঘটা শান্ত হয়ে পা ও লেজ গুটিয়ে বসে পড়ল। মহাত্মা গুহার বাইরে বেরিয়ে আসতেই অভয়ানন্দজী ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। আমিও সাষ্টাঙ্গ দিলাম; প্রণাম করে উঠেই দেখলাম — প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা শ্যামলকান্তি তেজোদৃপ্ত মূর্তি ; চোখ দুটি অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল ; সারা শরীরে আনন্দ ও লাবণ্যও যেন উছলে পড়ছে। বিশাল জটাভার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পড়েছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বন্দনা করলাম —

সৌম্য অবয়বে তব প্রীতি যেন ধরিয়াছে কায়া।
সর্বাঙ্গে ক্ষরিছে ক্ষান্তি আঁখিপাতে প্রশান্তির ছায়া।

— মৈঁ ন সমঝ লিয়া। সব প্রাণীয়োঁকো ভাব পাকড়ানেকে লিয়ে হমলোগকো অন্তরমেঁ বহুৎ powerful এক transmitter হ্যায়। ভাষা কোঈ অন্তরায় হো নেহি সকতি। তুমকো দেখ কর হম্ বহুৎ খুশ হ্যায়। জিতা রহো বেটা। অভয়ানন্দ, তুম্ আচ্ছিতরেসে ইনকা দেখ্‌ভাল্ করনা। পহেলে পহেলে দু'চার রোজ আপ্ নেহি তো সম্বিদানন্দ ইনকা সাথ রহনা। বাচ্চা হ্যায়, দেখিয়ে ইনকা কোঈ তকলিফ না হোয়। মহাত্মা প্রলয়দাসজী মুঝে Internal message ভেজা, উনোনো বাতায়া ইহ্ লেড়কা 'উৎসঙ্গবদর' নেহি উর্ধ্বমুখকুম্ভমিতি। হর নর্মদে।

এই বলে তিনি গুহার মধ্যে দ্রুতপদে ঢুকে গেলেন। আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে পুনরায় প্রণাম জানিয়ে সেখান থেকে নেমে আসতে লাগলাম। একলিঙ্গস্বামীর মুখে মহাত্মা প্রলয়দাসজীর নাম শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমি তাঁর কৃপার কথা ভেবে অভিভূত হলাম। তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। হঠাৎ অভয়ানন্দজী বলে উঠলেন — হম্‌লোগকা ইধর এক কট্টর নেম (নিয়ম) হৈ। গুরুজীকা পাশ একেলা কভি মৎ যাইয়ে, উনোনে খুদ বুলানে সে তব হমলোগ্ উনকা পাশ যাতে হৈ।

আমি মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সম্মতি জানালাম। সন্ন্যাসীদের গুহার কাছে নেমে এসে আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। প্রত্যেকের পাতায় দেখলাম একটি করে আমলকী সিদ্ধ, দুখানি করে রুটি এবং পর্যাপ্ত ঘন দুধ। আচমন করে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বললাম —

ব্রহ্মার্পনং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্মসমাধিনা ॥

আহারান্তে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা যে যার গুহায় গিয়ে ঢুকলেন। অভয়ানন্দজী জনৈক সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করে বললেন — সম্বিদানন্দজী! গুরুজীনে হুকুম দিয়া ইনকো দেখভাল করনে পড়েগা। দুচার রোজ ইনকা গুফামে আপ নেহি তো হম্ ইন্‌কা সাথমেঁ লেটেঙ্গে। অভয়ানন্দজীর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সম্বিদানন্দজী তড়াক্ করে ঘুরে পড়ে একলিঙ্গস্বামীর গুহার দিকে মুখ করে মুসলমানরা যেমন ভাবে কোন মহামান্য ব্যক্তিকে কুর্নিশ করে থাকেন, সেইভাবে তিনবার মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন — শিরোধার্যম্, শিরোধার্যম্, শিরোধার্যম্। অভয়ানন্দজীর চিবুকটা নাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন — আরে ভেইয়া! হমারা লিয়ে নর্মদামায়ীকা গোদ, গুফাকা কোদ, শ্মশান ঔর মসান সব হি বরাবর হৈ। আপ্‌কা ঔর গুরুজীকা দৃষ্টিমেঁ ইনোনে লেড়কা হৈ। লেকিন্ হম জানতা হৈ, ইনকা লগ্নমে কেতু হৈ, মকরমেঁ মঙ্গল ঔর রাহু ভি তুঙ্গী হৈ , ভয়ডর ইন্‌সে কম্-সে-কম্ এক যোজন দূর মেঁ খাড়া হোকর দণ্ডবৎ করতে হৈ।

এই বলে আমার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

সাধুর মুখে আমার নির্ভুল রাশিচক্রের কথা শুনে তাৎক্ষণিক চমক লাগলেও আমি মোটেই আশ্চর্য হলাম না। কারণ যোগীমাত্রেই যোগজ্যোতিষের গুহ্যতত্ত্বে পারংগম হয়ে থাকেন। ইনি যোগী হিসাবে কত বড় আমার জানা নাই তবে যে ইনি দৈবজ্ঞ হিসাবে অতি উচ্চকোটির তা সহজেই ধারণা করতে পারলাম। যাইহোক্ এঁকে প্রথম দর্শনেই আমার খুব ভাল লাগল। হাসি-খুশী মানুষটি, সদাই আনন্দময়। রসালাপে সিদ্ধ। যোগী হতে হলেই গোমড়ামুখো হতে হবে, এমন কোন বিধান আমাদের শাস্ত্রে আছে কিনা আমার জানা নাই। বয়স অনুমান করলাম ষাট বা পঁয়ষট্টি হবে, সুগঠিত স্বাস্থ্য, গৌরকান্তি, মাথা জুড়ে টাক, শ্বেতশ্মশ্রু। ডানহাতের মণিবন্ধে শিখদের মত একটা বালা।

আমি তাঁকে 'হর নর্মদে' জানিয়ে নির্দিষ্ট গুহায় এসে ঢুকলাম। তখন বেলা বোধহয় আড়াইটা হবে। আমি বিছানা পেতে বসে বসে নর্মদার শোভা দেখতে লাগলাম। যাঁদের গুহাবাসের অভিজ্ঞতা নাই , তাঁদের অবগতির জন্য জানাই গুহা অনেক আরামপ্রদ। বর্ষা বাদল বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে গুহা নিরাপদ, গুহাতে আলো বাতাসের কোন অভাব অনুভব করা যায় না, চরম গ্রীষ্মে গুহার অভ্যন্তরভাগ শীতল থাকে আবার শীতকালেও গুহার মধ্যে উষ্ণতা অনুভব করা যায়। আমি কম্বলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে। কিছুক্ষণ পরেই ঝম্‌ঝম্ করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ঘন্টাখানিক পরে বৃষ্টি থেমে যাবার পরেই 'হরি ওঁ তৎসৎ , হর নর্মদে, বলতে বলতে সম্বিদানন্দজী গুহার মধ্যে এসে ঢুকলেন। তাঁর ডান হাতে একটা টর্চ লাইট, বাঁ হাতে একটা কম্বল। আমি তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ালাম, আমাকে হাতের ইঙ্গিতে বসতে বলে গুহার মেঝেতে নিজের কম্বলটি পেতে বসলেন।

— লেকিন্ ঘর ছেড়ে বেরিয়েছ, পাঁজিপুঁথি দিনক্ষণের কোন হিসাব জানো কি? আজ ১৩৬১ সালের ১৩ই আষাঢ় সোমবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি। আর তিনদিন পরেই রথযাত্রা। ঐ দিন গুরুজী গুহা থেকে নিচে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে বসে ৮ তিনঘন্টা যাবৎ শাস্ত্রার্থ

করেন। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে তিনি এইরকমভাবে শাস্ত্রার্থ ও বিচারবিমর্শাদি করতে ভালবাসেন। লেকিন্, তুমি আমার দিকে ঐরকম ফ্যাল্ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছো কেন?

— আমি আপনার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে অবাক হয়ে গেছি। আপনি কি বাঙালী?

— নেহি জী। অযোধ্যা মেঁ সরযূ নদীকে উস্ তরফ এহি শরীর পয়দা হুয়া থা। হমারা পিতাজী সরযূপারীণ্ ব্রাহ্মণ থে। লেকিন, আমি তোমাদের বাংলাদেশে গঙ্গাসাগর সংগমে ত্রিশ বৎসর কাটিয়েছি। ইস্‌লিয়ে বাংলা বুলি হমারা আচ্ছিতরেসে ইস্তেমাল হো গয়ি।

— আমার পক্ষে খুব ভালই হল। আপনার সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলে আমি খুব তৃপ্তি পাবো। আপনি দয়া করে আপনার গুরুজী সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন। আপনার সঙ্গে আপনার গুরুজীর কিভাবে যোগাযোগ ঘটল?

— লেকিন্ সব হি পরমাত্মা কি ইচ্ছা। বাচপন মেঁ আমি অযোধ্যার এক উদাসী সাধুর সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। তাঁর সঙ্গে বার বছর কাল চারধাম 'পরিকরমা করকে' গঙ্গাসাগরে যাই। মকর সংক্রান্তি কা লগ্ন থা। ঐখানে সেই উদাসী সাধুর দেহান্ত ঘটে। আমি তাঁরই ঝোপড়াতে ত্রিশ সাল কাটিয়ে দিই। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ি। ঘুরতে ঘুরতে গিরনার পাহাড়ে পৌঁছি জুনাগড়ে নেমে। সেইখানেই গুরুজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। চল্লিশ বছর হয়ে গেল, সেই থেকে আমি গুরুজীর চরণতলে পড়ে আছি। আমাদের গুরুজী মহাযোগী, দিনের পর দিন ইনি সমাধিমগ্ন থাকেন। আমাদের কারও কোনও প্রয়োজন থাকলে কিংবা কোন বিষয়ে অনুমতি নিতে হলে আমরা কুর্নিশ করতে করতে মৃদুকণ্ঠে নিজেদের প্রার্থনা জানাই। তিনি সব জানতে পারেন — এ আমাদের সকলেরই নিত্য পরীক্ষিত সত্য। তাঁর প্রয়োজন হলে তিনি ঘন্টা বাজিয়ে ডাকেন। তখন তাঁর কাছে কেবল অভয়ানন্দই যেতে পারেন। সেইরকমই তাঁর হুকুম আছে। অমরকন্টকের কাছে কবীর চবুতরার জঙ্গলে মুড়িয়া মহারণের (মুণ্ডমহারণ্যের) মধ্যে এবং এখানে (ওঁকারেশ্বর ঝাড়িতে) সীতামায়ীকা বনমেঁ জ্যোতিষ্মতী নামে এক কিসিম কা লতা আছে। সেই গাছ রাত্রে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। তার এমনই ভেষজগুণ যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তার রসায়ন সেবন করলে শরীর জরা ব্যাধি হতে মুক্ত হয়। বিনা কায়কল্পসে, জ্যোতিষ্মতী লতার এমনই প্রভাব যে আমাদের গুরু জ্যোতিষ্মতী লতার প্রয়োগে জরা ব্যাধি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন।

— আপনার গুরুজীর তাহলে এখন প্রকৃত বয়স কত হয়েছে?

— লেকিন, তুমি ত বিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি ভাববে শিষ্যরা ত আপন আপন গুরুর বয়স ইচ্ছামত দুশ তিনশ চারশ বছর বলে থাকে। তোমাকে মোটামুটি একটা হিসাব দিচ্ছি। তুমি কি নর্মদা-পঞ্চাঙ্গ, চমৎকার নির্ণয়, নর-নারায়ণ, সর্বাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা প্রসিদ্ধ যোগী মায়ানন্দ সরস্বতীজীর নাম শুনেছ?

— হ্যাঁ, আমি তাঁর নাম শুনেছি। তাঁর দু একখানা বইও পড়েছি। তিনি ও গীতোক্ত বিশ্বরূপ দর্শনের দিব্যদৃষ্টিযোগ নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা ও সাধনা করে গেছেন। কাশীর অদ্বিতীয় বৈদান্তিক স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের কাছে তিনি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। ওঁকারেশ্বর হতে কয়েক মাইল দূরে মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে তাঁর আশ্রম ছিল শুনেছি।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনা সহি বাত শুনা হৈ। উহ্ মায়ানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল রামচন্দ্র দেশাই। গোয়ালিয়রের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৯২৫ সম্বতে জন্মেছিলেন। এখন চলছে

২০১২ সম্বৎ, আংরেজী ১৯৫৪ সাল। আজ থেকে কুড়ি বৎসর আগে আংরেজী ১৯৩৪ সালে ৬৭ বৎসর বয়সে মায়ানন্দজী পরমধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স সাতাশী বৎসর হ'ত। মার্কণ্ডেয় শিলা হতে তিনি একবার আমাদের গুরুজীকে দর্শন করতে গিরনার পর্বতে গিয়েছিলেন। সে সময় উভয়ের বার্তালাপ হতে আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমাদের গুরুজী তাঁর প্রপিতামহের জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমার এই বিবরণ থেকেই তুমি গুরুজীর বয়স অনুমান করে নাও। ঔর কুছ্ পুছেঙ্গে?

— দয়া করে আপনি আমার আর একটা জিজ্ঞাসার জবাব দিন। আজ দুপুরে অভয়ানন্দজী যখন আমাকে তাঁর সামনে উপস্থিত করেন, তখন তিনি কথাপ্রসঙ্গে অভয়ানন্দজীকে বলেছিলেন — 'ইহ্ লেড়কা উৎসঙ্গবদর নেহি, উর্ধমুখকুম্ভমিতি।' এ কথার তাৎপর্য আমি বুঝতে পারি নি। আপনি দয়া করে বুঝিয়ে দিন।

আমার কথা শুনেই সচ্চিদানন্দজী হো হো করে হাসতে লাগলেন। বললেন — লেকিন্ তুমি ভেবেছ বুঝি কোন দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষায় তোমার সম্বন্ধে কোন তীক্ষ্ণ মন্তব্য করা হয়েছে! নেহি জী! নেহি জী! গুরুজীর শ্রীমুখ থেকে এইরকম কোন মন্তব্য শুনলে আমি ত ধন্য হয়ে যেতাম! বুদ্ধদেবের উপদেশে আছে যে, কোন যোগীগুরুর কাছে যেসব শিষ্য বা জিজ্ঞাসু আসেন, তাঁরা সাধারণতঃ তিনশ্রেণীর হয়ে থাকেন। তাদের অধিকাংশ হয় 'অধোমুখকুম্ভ' শ্রেণীর। কলসীকে উপুড় করে জলে ডুবালে তাতে যেমন জল ঢোকে না, জলে ডুবানোর পূর্বেও যেমন খালি থাকে, জল থেকে উঠিয়ে নেবার পরেও খালি থেকে যায়, তেমনই মহাপুরুষদের কাছেও এমন সব ধর্মার্থী আসে, যারা মহাপুরুষদের উপদেশ শুনে, সেই উপদেশানুসারে লেকিন্ নিজেদের জীবনকে গঠন করার চেষ্টা করে না। দীর্ঘকাল সৎসঙ্গ করেও তারা খালি থেকে যায়। এরা হল অধমশ্রেণীর।

মধ্যমশ্রেণীর শিষ্যদেরকে বলা হয় 'উৎসঙ্গবদর।' বদর মানে কুল। কোন কুলগাছের তলায় কেউ ধর কাপড়ের খুঁট বা শাড়ীর আঁচল পেতে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকল। গাছ থেকে টুপ্‌টাপ্ করে কুল পড়ছে। লেকিন্ সে যদি উঠবার সময় কুলগুলোকে ভাল করে বেঁধে না নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তাহলে কুলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাছের তলাতেই পড়ে থাকবে; তেমনই একধরণের শিষ্য আছে যারা সাচ্চা মহাপুরুষের দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সঙ্গ করে, উপদেশ শুনে কিন্তু কোন কিছুই গলাধঃকরণ করে না, হৃদয়ঙ্গম করে না, জপ তপ সাধন ভজন করে না, নিজেদের অন্ধ সংস্কার টেক্ জিদ্ বা অহংকারও ত্যাগ করে না, কেবল গুরুমুখে কিছু কিছু বাছা বাছা বুলি শিখে নিয়ে, টুকে নিয়ে ভাব-চোরা বকমবাজ তালবাজ এবং চালবাজ হয়ে উঠে, তারা হল উৎসঙ্গবদর। কুলগাছের তলায় সারাদিন বসে থেকেও গাছের কুল গাছের তলাতে ফেলে রেখে শূন্য হাতে শূন্য কোঁছড়ে তারা ফিরে আসে।

ধর্মার্থী শিষ্যদের মধ্যে আবার কেউ কেউ এমন থাকে, যারা যথার্থ ধর্ম জীবন লাভের জন্য যথোচিত আর্তি ও শরণাগতি বুকে নিয়ে মহাপুরুষের কাছে আসে। আন্তরিকভাবে গুরু বা মহাপুরুষের উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ভাবে নিজেদের জীবনকে গঠন করার চেষ্টা করে; সাধনায় তাদের কোন শৈথিল্য থাকে না। প্রাণপণে মহাপুরুষের বাণী ও উপদেশানুসারে নিজেদের জৈব জীবনের যেসব ত্রুটি বা ভ্রান্ত সংস্কার তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা

করে। অক্ষম হলে চোখের জলে প্রাণের ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানায়। এই প্রকৃতির ধর্মার্থীদেরই ধীরে ধীরে শিব-জীবনে উত্তরণ ঘটে। একটা শূণ্য কলসীকে ভরে তুলতে হলে তাকে যেমন ঊর্ধ্বমুখ করে জলে ডুবাতে হয়, তবেই তা যেমন ধীরে ধীরে জলে ভরে যায়, তেমনই যারা নির্বিচারে গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর জীবন ও বাণীর অনুকরণ অনুশীলন ও অনুবর্তন করতে পারে তারাই সর্বোত্তম শ্রেণীর শিষ্য। তাদেরকেই বলা হয় 'ঊর্ধ্বমুখকুম্ভ'।

লেকিন রাত অনেক হয়ে গেছে। প্রায় নটা বাজতে যায়, আভি লেট যাইয়ে। জয় মা রেবা! হর নর্মদে! সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। সম্বিদানন্দজীর কম্বল গুটনো আছে। তিনি কখন চলে গেছেন জানতে পারি নি। গুহা মুখের কাছে দাঁড়িয়ে মা নর্মদাকে দর্শন করলাম, প্রণাম করলাম। চারিদিকে অপূর্ব শোভা, 'আকাশের নীলমেঘ যেন সমগ্র পর্বত জুড়ে নীল বনানীর সঙ্গে কোলাকুলি করছে। পর্বতের শিখর হতে বেগে জল গড়িয়ে আসছে। অনুমান করলাম, রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর নিশ্চয়ই প্রবল বর্ষণ হয়ে গেছে , এখন বৃষ্টির বেগ কমে গেছে , একটু পরেই হয়ত বৃষ্টি থেমে যাবে, তখন সূর্যের প্রকাশ হলেও হতে পারে। অন্যান্য গুহার দিকে উঁকি মেরে দেখলাম, কোন কোন সন্ন্যাসী নর্মদাস্নান সেরে কমণ্ডলু হাতে নিজ নিজ গুহায় ফিরছেন উদাত্ত কণ্ঠে শিব বন্দনা করতে করতে। অভয়ানন্দজীকে দেখলাম নিজের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে ধাবড়ী কুণ্ডের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে যুক্ত করে বন্দনা করছেন —

ওঁ বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো।
নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তে ব্যক্তযোনয়ে॥

তাঁর কণ্ঠনিসৃত মন্ত্রের শেষ অক্ষরটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশের গুহা থেকে আর এক সন্ন্যাসী যেন পূর্বোচ্চারিত মন্ত্রের জের টেনে বলে উঠলেন —

ওঁ সংসারকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপ ধৃক।
প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ॥

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর এক সন্ন্যাসী লাফিয়ে অন্য গুহার ভিতর থেকে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন —

ওঁ দহনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে যোগকারিণে।
ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমো নমঃ॥

পরের গুহা থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে সমতালে সমছন্দে আর এক সন্ন্যাসী যুক্তকরে স্তব পাঠ করলেন —

ওঁ নমঃ কামাঙ্গনাশায় নমঃ কল্মষহারিণে।
নমো বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্বরূপিণে॥

এর পরের গুহা থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে এলেন সম্বিদানন্দজী, তার একহাতে শিঙা, আর একহাতে ডম্বরু। তিনি পূর্বোচ্চারিত মন্ত্রগুলির-জের টেনে খুব আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন —

ওঁ পরমাত্মস্বরূপায় লিঙ্গমূলাত্মকায় চ।
সর্বেশ্বরায় সর্বায় শিবায় নির্গুণায় চ॥

মন্ত্রপাঠের পরেই তিনি একজন সন্ন্যাসীর হাতে ডম্বরু দিয়ে শিঙা বাজাতে লাগলেন, শিঙা ডম্বরুতে নাদ তোলার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা মন্ত্রপাঠে যোগ দেন নি, এইরকম আর পাঁচজন দণ্ডী সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন নিজেদের গুহা থেকে তাঁদের কারও হাতে পুষ্পপাত্র, কারও হাতে বড় বড় ধুনুচী, সেগুলোর কোনটাতে ধূনা জ্বলছে কোনটাতে দাউ দাউ করে জ্বলছে কর্পূর। সারিবদ্ধ হয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে সবাই এগিয়ে চললেন ধাবড়ী কুণ্ডের দিকে; সর্বাগ্রে রয়েছেন অভয়ানন্দজী। শিঙা ডম্বরুর শব্দে, ধূপধূনা ও কর্পূরের গন্ধে সমগ্র বনস্থলী বা এই তপস্থলীতে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। আমি তাড়াতাড়ি ছুটলাম তাঁদের পিছনে কমণ্ডলু এবং স্নানবস্ত্রাদি নিয়ে।

এতক্ষণে বৃষ্টি থেমেছে, আকাশের কতকাংশ মেঘমুক্ত হয়েছে; সূর্যকিরণ উঁকি মারছে মেঘ এবং পর্বতান্তরাল ভেদ করে। যতই এগুচ্ছি, ততই জলপ্রপাতের ভীম গর্জন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। আমরা যেসব গুহাতে থাকি, সেখানে গুহার ভিতরে বসে প্রপাতের শব্দ কম শোনা যায়, কিন্তু এখন যতই প্রপাতের নিকটবর্তী হচ্ছি, ততই কর্ণপটহ ছিন্ন হবার যোগাড়। যাইহোক, ধাবড়ী কুণ্ডের ধারে এসে পৌঁছলাম। প্রপাতের গর্জনে সন্ন্যাসীদের মন্ত্রপাঠ বা শিঙা ডম্বরুর নাদ স্পষ্টভাবে কারও কানে ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে না।

অভয়ানন্দজী পিছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন — 'আইয়ে আপকো হম্ স্নানকা ঘাট মেঁ লে যাতা হুঁ। আমার হাত ধরে তিনি নিয়ে চললেন প্রপাতের ধারাবর্ষণ এড়িয়ে ধাবড়ী কুণ্ডের পাশের ঘাটে। আমি তখন ভিজে গেছি , তিনিও ভিজে গেছেন; সন্ন্যাসীরা জলের অবিশ্রান্ত ছিটা অগ্রাহ্য করে সমানে মন্ত্রপাঠ করে চলেছেন, শিঙা ডম্বরু বাজছে। পাথরের আড়ালে ধুনুচী রাখা আছে।

পাথরের ধাপে ধাপে সাবধানে পা ফেলে ফেলে তিনি একটি নির্দিষ্ট ঘাটে নামিয়ে বললেন — ইধর্ সবসে কম খতারনাক হৈ। কোমরতক্ উৎরো, জ্যাদা নেহি। আমি কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ডুব দিয়ে উঠলাম। বললেন — অভি মন্ত্রপাঠ করিয়ে,

অধ্যাত্মকী চিৎশক্তি জো সর্বাত্মময় শৈবী ছটা।
অধিদৈবময় কল্পান্তমেঁ মুনিনে লখী দৈবী ঘটা॥
অধিভূতমেঁ অদ্ভুত এহি শ্রীনর্মদা ভূপর বহী।
হে তীর্থজননি! আজ ভী ত্রৈবিদ্য দর্শন দে রহী॥

আমি হাত জোড় করে প্রণাম করলাম। মন্ত্রের অর্থ আমি যা বুঝলাম, মা নর্মদাকে বলা হচ্ছে — মাগো! তোমার আধ্যাত্মিক রূপ হল তুমি সর্বাত্মময় স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের চিৎশক্তি, তোমার শৈবী ছটায় ত্রিভুবন ভরে আছে। কল্পান্তকালে যখন সকলই প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন ছিল তখন মুনি-ঋষিরা তোমার আধিদৈবরূপ অক্ষয় ব্রাহ্মীদীপ্তি দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন। মর্ত্যলোকে পৃথিবীর উপর নদীরূপে এই যে অবতরণ বা অবির্ভাব, এটি তোমার আধিভৌতিক রূপ। হে তীর্থজননি! এখনও মহর্ষিগণকে ত্রৈবিদ্যরূপ অর্থাৎ ঋক্-সাম্ যজুর্বেদোক্ত তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি দান করে চলেছ।

তর্পণাদি সেরে তাঁর হাত ধরে উঠে এলাম কুণ্ডের কাছে। আমাদের না ফেরা পর্যন্ত অপরাপর সন্ন্যাসী শিঙা ও ডম্বরু বাজিয়ে নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, হর নর্মদে, হর নর্মদে করছিলেন। এইবার অভয়ানন্দজী সকলের হাতে ফুল বেলপাতা দিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন।

সেই একই পূর্বোচ্চারিত মন্ত্র। সকলেই অঞ্জলি ভরে কুণ্ডের মধ্যে ভাসমান ও নিমজ্জমান শিবলিঙ্গদের উপর পুষ্পাঞ্জলি সমর্পন করলাম। পূজান্তে সকলেই গুরুস্তোত্র পাঠ করতে করতে সিক্ত বস্ত্রে ফিরে এলাম আশ্রমে। সকলেই একলিঙ্গস্বামীর গুহার দিকে তাকিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। তারপর যে যার গুহায় গিয়ে ঢুকলেন।

আমিও নিজের গুহায় গিয়ে গা, মাথা মুছে বস্ত্র পরিবর্তন করে বসেছি এমন সময় সচ্চিদানন্দজী একটা পুরানো গৈরিক বস্ত্র, একটা লম্বা কাঠের সরু লাঠি এবং কিছু দড়ি নিয়ে ঢুকলেন আমার গুহায়। গুহায় পদার্পণ করেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন — আবাভিঃ যতোক্তং মন্ত্রাণি তৎ সর্বানি ইতি শ্রী যাগসারে সর্বাগমোত্তমে পার্বতী বাণলিঙ্গস্তোত্রং অর্থাৎ আমরা ইতিপূর্বে যেসব মন্ত্র পাঠ করে কুণ্ড থেকে ফিরলাম সেগুলি আগমগ্রন্থ যোগসারের অন্তর্ভুক্ত বাণলিঙ্গস্তোত্র, শিবপার্বতী সংবাদে বিধৃত। এই বলে তিনি গুহামুখে পুরাণো মরচে ধরা দুটো হুকে লাঠিটি লম্বালম্বি রেখে গেরুয়া কাপড় দিয়ে পর্দা ঝুলাতে তৎপর হলেন।

তাঁর পর্দা টাঙানো শেষ হয়েছে, এমন সময় কলকণ্ঠে হর নর্মদে ধ্বনি উঠল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — আবার কোন কার্যক্রম সুরু হল নাকি ?

— নেহি জী ! লেকিন্, গাভীমাতানে আয়া হৈ হম্‌লোগকা মাফিক শ্রীমান্ বৎসগুলি কে দুধ পিলানে কে লিয়ে।

তাঁর রহস্যময় কথা বুঝতে পারলাম না। গুহার বাইরে উঁকি মেরে দেখলাম একদল আদিবাসী, বোধহয় তারা পান্‌কা বা বাইগা হবে, দশ বারোটা গাভী নিয়ে পাকশালার কাছে মাটির হাঁড়িতে 'হর নর্মদে' বলতে বলতে দুধ দুইছে। প্রশ্নভরা চোখে তাকাতেই সচ্চিদানন্দজী বললেন — লেকিন্ আমাদের লীডার অভয়ানন্দজী হচ্ছেন একটা রাজার বেটা। উন্‌কা মাতাজী আভিতক্ জিন্দা হৈ। তিনি একবার গুরুজীর গুহার কাছে ব্যাঘ্রভয় উপেক্ষা করে ধর্না দিয়ে পড়েছিলেন। অগত্যা গুরুজী তাঁকে দর্শন দিলে তিনি বলেন, আমার লেড়কা আপনার অভয় আশ্রয়ে আছে, তার সন্ন্যাস-ব্রতকে কোন মতেই ক্ষুণ্ন করতে চাইনা, তবে এখানকার সন্ন্যাসীদের দুধপানের জন্য আমি পানকা ও বাইগাদের পল্লীতে কয়েকটা দুগ্ধবতী গাভী রেখে যাচ্ছি, তারাই গরুর পরিচর্যা করবে এবং প্রতিদিন একবার আশ্রমে এসে দুধ দুইয়ে দিয়ে যাবে তার ব্যবস্থাও করে যাচ্ছি, আপনি দয়া করে অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ করুন। গুরুজী সেই মায়ীকে যোগক্ষেমবহাম্যহং ইত্যাদি মন্ত্র শুনিয়ে অনেকভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে ভগবতী রেবাই তাঁর তটবাসী সন্তানদের ভরণ-পোষণ করবেন, তাঁকে কিছু ভাবতে হবে না কিন্তু মায়ী গুরুজীর কথায় কর্ণপাত করেন নি। অগত্যা গুরুজী সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। সেই থেকে গরুগুলি এইখান থেকে দুমাইল দূরে বনের মধ্যে আদিবাসীদের পল্লীতে থাকে, শীত গ্রীষ্ম বার মাসই বেলা ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে তারা এসে দুধ দুইয়ে দিয়ে যায়। এর অন্তরালে আর কি ব্যবস্থা আছে, উহ্ মুঝে পাতা নেই।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — এখানে এতগুলি সন্ন্যাসীর জন্য আটা, পূজার সামগ্রী ধূপ ধুনা কর্পূর ইত্যাদি কোথা হতে আসে ?

সচ্চিদানন্দজী উত্তর দিলেন — লেকিন্, হমারা গুরুজীকে পাশ, আমরা সন্ন্যাসী হয়েও কাছে ঘেঁষতে পাই না, গৃহীর ত কোন কথাই নাই। ইনি কোন গৃহী শিষ্য করেন না। তুমি হয়ত ভাবছ, গৃহীশিষ্যেরা বোধহয় এই খরচ বহন করেন, লেকিন্ একথা সত্য নয়। তবে

কোথা হতে চলে? এ কথার উত্তরে কেবল বলতে পারি, দেবাঃ ন জানন্তি, কুতোঃ মনুষ্যা?

সচ্চিদানন্দজী চলে গেলেন। যাবার আগে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, পাকশালার পেটা ঘড়িতে তিনবার শব্দ হলেই আমি যেন পাকশালায় ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্ করতে চলে যাই। আমি হাসতে হাসতে বললাম — আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, উদর পূজার কথা ভুলব না। ঠিক সময়েই হাজির হব।

যথাসময়ে পেটা ঘড়িতে তিনবার শব্দ হতেই বেলা প্রায় একটার সময় খেতে গেলাম। সেই একই খাদ্য প্রত্যেকের পাতে দুখানা করে রুটি, একটা করে আমলকী সিদ্ধ এবং সেরখানিক করে ঘন দুধ। আজ মঙ্গলবার, সকলের খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি এল, তার সঙ্গে মেঘগর্জন। মুহুর্মুহু বজ্র বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই দেখলাম ভিজে ভিজেই অভয়ানন্দজী তাঁর গুহাতে ঢুকে একটা বিচিত্র ধরণের শাল পাতার বৃহদাকার টুপি মাথায় দিয়ে প্রত্যেক গুহাতে ঢুকে প্রায় দশ বারখানা একই রকমের শিরস্ত্রাণ নিয়ে পাকশালাতে ফিরে এলেন। উড়িষ্যায় দেখেছি গ্রামের লোকেরা রোদ বৃষ্টিতে এইরকমই টুপি ব্যবহার করে, উৎকলবাসীদের ভাষায় এর নাম 'টোকা'। বাংলাদেশে চাষীদেরকে দেখেছি বর্ষা বা রৌদ্রে মাঠে কাজ করবার সময় তালপাতা দিয়ে তৈরী একরকমের আচ্ছাদন ব্যবহার করে তার নাম 'পেখ্যা'। সেইসব পাতার 'টোকা' মাথায় দিয়ে সন্ন্যাসীরা যে যার গুহায় গিয়ে ঢুকলেন। অভয়ানন্দজী আমাকেও ঐরকম একটি পাতার ঢাক্‌না দিয়ে বললেন — আপ্‌কা পাশ ইহ্ 'টোপী' রাখ্ দেনা।

আমি তাঁকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে ফিরে এলাম গুহায়। প্রতিদিনই একই কার্যক্রম, সকালে নর্মদাস্নান, ধাবড়ী কুণ্ডে গিয়ে বাণলিঙ্গের পূজা, নির্দিষ্ট সময়ে ভোজনপর্ব, তারপর গুহাতে পড়ে থাকা। বৃষ্টির বিরাম নাই, নর্মদার বিস্তারও বেড়ে গেছে, পর্বতের চারধারে অজস্র জলের ধারা বয়ে আসছে। পর্বতের শোভা হয়েছে অপূর্ব। বৃষ্টির সময় ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বাষ্পের কুণ্ডলী যখন পর্বতচূড়াকে ঢেকে ফেলে, তখন যে চমকপ্রদ দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় তার যথার্থ রূপ বর্ণনা করার মত কবি-প্রতিভা আমার নাই। প্রতি সন্ধ্যাতেই সচ্চিদানন্দজী আসেন, কিছুক্ষণ গল্পগুজবে (অধিকাংশই তত্ত্বালোচনা) সময় কাটে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতে আমার গুহাতে ঢুকে জানালেন — লেকিন্ বিহানমেঁ (আগামীকাল) শুক্রবার ১৭ই আষাঢ়, শুক্লা দ্বিতীয়া, রথযাত্রাকী পর্ব হ্যায়। অভয়ানন্দজী জানাতে বলেছেন কাল গুরুজী বেলা দশটার সময় আমাদের কাছে এসে কিছুক্ষণ বসবেন। শাস্ত্রার্থ হোগা। অতঃ আপ্ সুবা সুবা উঠ যানা। ন' সাড়ে ন' কা অন্দর হমলোগ ধাবড়ী কুণ্ডসে লৌটেঙ্গে।

এই বলেই তিনি শুয়ে পড়লেন। কোন আলোচনা হল না। মধ্যরাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল এক বিচিত্র শব্দে। ধীরে ধীরে উঠে পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখলাম বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘরের মধ্যে ওঁ-ওঁ-বম-বম্ ববম্ ধ্বনি উঠছে। কার্যকারণ নির্ণয়ের জন্য মোমবাতি জ্বাললাম। আলোতে যা দেখলাম, তাতে আমার বাকস্ফূর্তি হল না। স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি দেখলাম, সচ্চিদানন্দজী স্থির হয়ে যোগাসনে বসে আছেন। তাঁর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, তাঁকে ঘিরেই ওঁকারনাদ উঠছে, অথচ তাঁর ওষ্ঠাধর সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। আমার বিছানা এবং পার্শ্বস্থ দেওয়ালে কান পাতলাম, সেখানে কোন শব্দ নাই কিন্তু তিনি যেখানে বসে আছেন, তার কাছাকাছি গুহার মেঝেতে কান পাততেই শুনতে

পেলাম, সেখানে অবিরামভাবে ওঁ-ওঁ-বম-ববম্-ববম্ ধ্বনি উঠছে। একটু পরেই দেখলাম, তাঁর শরীর থর থর করে কাঁপছে। আমি বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। একটু পরেই তাঁর শরীরকে ঘিরে একটা জ্যোতির আভা ফুটে উঠতে দেখলাম। মনে মনে ভাবছি, যোগশাস্ত্রে ওঁকারনাদ নিজের মধ্যে প্রকট করার অন্তরঙ্গ সাধন পদ্ধতি আছে বটে কিন্তু তাতে ত সাধক নিজের মধ্যেই অনাহত নাদ শুনতে পান বা অনুভব করে থাকেন। সাধককে ঘিরে ওঁকারনাদের এইরকম বহিঃপ্রকাশ ঘটে বলে আমার জানা নাই, কখনও শুনিও নি, কোথাও কোন যোগের বই-এ পড়িও নি। প্রায় ঘন্টাখানিক পরে সেই দিব্যনাদ অপ্রকট হল, তাঁর দেহ থেকে যে আভার বিকিরণ ঘটছিল, তারও সমাপ্তি ঘটল। ভোরের দিকে সচ্চিদানন্দজী ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে দেওয়ালের কাছে গেলেন। দেওয়াল ধরে ধরে টলতে টলতে গুহার দরজার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। দরজার কাছেই আমার লাঠিটা ছিল, সেইটা ঠুকে ঠুকে তিনি চলে গেলেন তাঁর গুহার দিকে। আমি উঁকি মেরে দেখলাম, লাঠিতে ভর দিয়েও তিনি টলতে টলতে যাচ্ছেন। আমি নীরবে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। তখনও বাইরে আবছা অন্ধকার আছে। আমার ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে নিজের মনে হাসতে লাগলাম এই ভেবে যে — 'ঠাকুর, এবার তুমি ধরা পড়ে গেছ। সারাদিনই তুমি হাসিখুশীতে রসালাপে মেতে থাকলেও তোমার অন্তরঙ্গ স্বরূপটি ধরা পড়ে গেছে। বাহ্যতঃ তুমি চটুল স্বভাবের 'গোপাল ভাঁড়' সেজে থাকলেও তুমিও যে একজন উচ্চকোটির যোগী তা আমি বুঝতে পেরেছি'।

সকাল হতেই আমি শৌচাদি ক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেলাম। ফিরবার সময় দেখলাম, তিনি আমার গুহার দরজায় ঢুকে চুপিচুপি আমার লাঠিটা দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে পর্দাটা গুটিয়ে ফেললেন। আমি কাছাকাছি হতেই বললেন — লেকিন্, তোমার মনে আছে ত আজ গুরুজী আসবেন? সবাই কুণ্ডে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। চল, সবাই মিলে তাড়াতাড়ি স্নান ও পূজা সেরে আসি। আমি তাঁর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। তিনি লাঠির কথা কিছু বললেন না, আমিও সব বিষয় চেপে গেলাম। আমার সঙ্গে থাকতে যে তাঁর অন্তরঙ্গ সাধনায় কিছু বিঘ্ন ঘটছে তা অনুভব করে আমি বললাম — স্বামীজী! কয়দিন ত কেটে গেল, একা তো গুহায় থাকতে আমার কোন ভয় করবে বলে মনে হয় না। পরিক্রমা করতে করতে আমি ত এতদূর এসে পৌঁচেছি। ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে কতবার ত একাই কাটিয়েছি। কাজেই আমি বলছিলাম কি, আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তবে আজ থেকে আমার গুহায় আপনাকে আর রাত্রে শুতে আসতে হবে না। সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সচ্চিদানন্দজী বললেন — লেকিন, গুরুজীকা হুকুম হ্যায়, ইস্‌লিয়ে হম্ হররোজ সামকো বখৎ আপ্‌কা গুফামেঁ আকর্ রাত্ ন বাজে তক আপ্‌কা সাথমেঁ রহেঙ্গে! আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম — ওহি আচ্ছা হোগা!

অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যথারীতি বানড়ী কুণ্ডে স্নান ও পূজা করে এসে আমরা একলিঙ্গস্বামীর গুহা থেকে অবতরণের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। একটা বড় পাথরের উপর তাঁর বসার জন্য কৃষ্ণসার মৃগচর্ম পাতা হয়েছে, একটা রুদ্রাক্ষ গাছের তলায়। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে তাঁর 'নটুকনাথকে' কিঞ্চিৎ আদর করে তরতর করে নেমে আসছেন, সচ্চিদানন্দজী তাঁর বয়সের যা হিসাব দিয়েছিলেন তাতে অনুমান করেছিলাম,

তাঁর বয়স প্রায় দুইশত বৎসর হওয়া উচিত। কিন্তু কাছাকাছি আসতে তাঁর ঋজু বলিষ্ঠ ও লাবণ্যমণ্ডিত দেহ এবং দীপ্ত চক্ষু দেখে মনে হল তিনি যে চল্লিশ বৎসরের যুবক! একে একে সবাই প্রণাম করতে যেতেই সকলের সঙ্গে কিছু-না-কিছু তিনি রসিকতা করতে লাগলেন। সচ্চিদানন্দজীর টাকে তিনবার টোকা দিয়ে বললেন — আপ্‌কো ইন্দ্রলুপ্তকা লুপ্তি নেহি হোতা হৈ, উদারকা স্ফীতি হ্রাস হোতা হৈ কেঁও? অভয়ানন্দ! ইনকো পুরা খানা দেতা হ্যায় কি নেহি দেতা? আমাকে বললেন — আপ্ আরাম মেঁ হৈ ত?

আমি উত্তর দিলাম — হমারা কোঈ তকলিফ নেই, আরাম মেঁ হৈ।

তিনি অভয়ানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললেন — দেখো বেটা, ইন্‌কো আচ্ছিতরেসে দেখভাল কর্‌না, এ্যায়সা দেখনেমেঁ ত এ লেড়কা হৈ, লেকিন্ ইহ্ কট্টর সমালোচক হৈ, আগে পিছে দোনো তরফ্ ইনকা আঁখ সদৈব সব কুছ দেখরাহা হৈ, কোঈ গলদ হোগী ত ভবিষ্যমেঁ যব ইনোনে কেতাব লিখেগা, তব একলিঙ্গস্বামীকো ভি ঠোক্ দেগা! ★

সন্ন্যাসীরা কেউ কোন কথা বলছেন না, সবাই করজোড়ে সসম্ভ্রমে বসে আছেন, তাঁদের মুখ চোখে শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেন উছলে পড়ছে। সবাই যেন তাঁর দর্শনে কৃতার্থ!

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন — আপ্ পরিক্রমাবাসী হৈ, ইস্‌লিয়ে আপ্‌কো দর্শনমেঁ হমারা বহুৎ আনন্দ হোতি হৈ। নর্মদা মাতাকী কৃপা যিস্‌কা উপর হৈ, কেবল ওহি মাতাজীকো পরকরমা কর্ সকতি, দুসরা নেহি। মহামুনি মার্কণ্ডেয়জীনে যুধিষ্ঠিরজীকো পাশ নর্মদা মাতাজী কা স্বরূপ উদঘাটন কিয়া থা—

ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা মহেশ্বরতনূদ্ভবা।
প্রোক্তা দক্ষিণ গঙ্গেতি ভারতস্য যুধিষ্ঠির॥ ১
জাহ্নবী বৈষ্ণবী গঙ্গা ব্রাহ্মী গঙ্গা সরস্বতী।
ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা রেবা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ২

অর্থাৎ মহেশ্বরের দিব্য শরীর হতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য হে যুধিষ্ঠির! নর্মদাকে মাহেশ্বরী গঙ্গা বলা হয়। মধ্যপ্রদেশের যে অংশ দিয়ে এখন নর্মদাকে প্রবাহিত হতে দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রপ্রস্থ (বর্তমান দিল্লী থেকে) হতে তা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় 'দক্ষিণ গঙ্গা' বলে নর্মদাকে অভিহিত করেছেন। বিষ্ণুর চরণকমল হতে উদ্ভূতা বলে ভাগীরথী গঙ্গার নাম বৈষ্ণবী গঙ্গা, ব্রহ্মার পত্নীর নামানুসারে সরস্বতী নদীর নাম ব্রাহ্মী গঙ্গা আর মহেশ্বরের তেজোময় তনু হতে নর্মদার উৎপত্তি বলে নর্মদাকে নিঃসন্দেহে মাহেশ্বরী গঙ্গা বা শাঙ্করী গঙ্গা বলা যায়।

যথা হি পুরুষে দেবস্ত্রৈমূর্তত্বমুপাশ্রিতঃ।
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাখ্যং ন ভেদস্তত্র বৈ যথা॥

জিস্ প্রকার এক হি পরমেশ্বর পুরুষ বিগ্রহ মেঁ ব্রহ্মা বিষ্ণু ঔর শিবরূপ তিনমূর্তিবালা হো যাতা হৈ, স্বরূপসে উন মেঁ ভেদ নহী হৈ। উসী প্রকার ইন্ তিন দেবনদীয়োঁ মেঁ ভেদবুদ্ধি

★ মহাপুরুষের এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। ১৩৬১ সালে ধাবড়ী কুণ্ডে বসে মহাপুরুষ এই কথাগুলি বলেছিলেন। নর্মদা পরিক্রমা করে ফিরে এসে ১৩৬৫ সালে আমি 'আলোকতীর্থ' এবং ১৩৬৬ সালে 'আলোক বন্দনা' নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করি। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য জানি না, ঐ দুখানি গ্রন্থই ধর্মজগতে কঠোরতম সমালোচনা গ্রন্থ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। সমালোচকদের মতে এই দুখানি গ্রন্থ নাকি ধর্মধ্বজীদের পক্ষে 'মরণ শেল'। — লেখক।

নহী করনী চাহিয়ে। কেঁও কি দেব ভী তিন হৈঁ ঔর উনকী অনুগ্রহমূর্তি নদী ভি (সরস্বতী, গঙ্গা, নর্মদা) তিন হী হৈঁ। অর্থাৎ, এক পরমেশ্বরের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে তিনটি বিগ্রহমূর্তি আমরা দেখতে পাই। বিগ্রহমূর্তি গুলির আকার প্রকার সাজসজ্জা অস্ত্র ও বাহনে ভেদ থাকলেও স্বরূপতঃ কিন্তু তাঁরা এক এবং অভিন্ন; তেমনই সরস্বতী, গঙ্গা এবং নর্মদা এই তিনটি দেবনদীর মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই ; যেমন দেবতা তিনজন — ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর — নদীও তেমন তিনটি। তাঁদের বহিরঙ্গ রূপ এবং উৎপত্তিস্থল আলাদা আলাদা হলেও তাঁরা একই পরমেশ্বরের অনুগ্রহশক্তির দ্রবীভূত ধারা।

একলিঙ্গস্বামীর কথা শেষ হতেই আমি প্রশ্ন করলাম — আপ্‌কো বাত্ হম্ মানতা হুঁ। লেকিন্ এহি তিন নদীয়ো একহি পরমাত্মাকো করুণাঘন প্রকাশ হোতে হুয়ে ভি ইন্ তিনোকা মহিমামেঁ কোঈ বৈশিষ্ট্য হ্যায় কি নেহী?

— জরুর হৈ। নর্মদামাতাকি মহিমা সবসে জ্যাদা হৈ। ঋষিয়োঁনে বতায়া,

ত্রিভিঃ স্রস্বতং পুণ্যং সপ্তাহেন তু যামুনম্।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নর্মদা॥

অর্থাৎ সরস্বতী নদীর জলে তিনদিন স্নান করলে, যমুনার জলে এক সপ্তাহ ধরে স্নান করলে এবং গঙ্গাজলে সদ্য স্নান মাত্রই মানুষ পবিত্র হয় কিন্তু নর্মদার জলে স্নান করার পূর্বে কেবল দর্শন মাত্রেই মানুষ তৎক্ষণাৎ পাপ তাপ হতে মুক্ত হয়। নর্মদা মাতাকী দোস্‌রা বৈশিষ্ট্য এহি হ্যায়,

গঙ্গা কনখলে পুণ্যা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদিবারণ্যে পুণ্যা সর্বত্র নর্মদা॥

অর্থাৎ গঙ্গার পুণ্যমহিমা হরিদ্বারস্থ কন্‌খলে বেশী কারণ সেখানে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ করেছিলেন; সরস্বতী নদীতটের বিভিন্ন স্থানে বেদজ্ঞ ঋষিরা বেদপাঠ এবং বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেও কুরুক্ষেত্রে যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন এবং একবার মহারথী ভীষ্মের বাণে জর্জরিত অর্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাত অর্থাৎ অনিবার্য মৃত্যু থেকে রক্ষা করবার জন্য সুদর্শন চক্র ধারণ করে স্বীয় ভগবৎ-সত্ত্বা প্রকট করেছিলেন, সেই জন্য কুরুক্ষেত্রেই সরস্বতী নদীর মহিমা বেশী। কিন্তু নর্মদার জল গ্রাম বা বনাঞ্চল যেখান দিয়েই প্রবাহিত হোক না কেন সর্বত্রই নর্মদার জলের সমান মহিমা, সর্বত্রই তিনি সমানভাবে পতিতোদ্ধারিণী।

প্রশ্নোত্তরের সুযোগ পেয়ে এবং মহাত্মাকে প্রসন্ন মেজাজে দেখে আমি সাহস করে তাঁকে আর একটি প্রশ্ন করলাম — রেবানদীকো নর্মদা নাম কেঁও হুয়া। নর্মদা নামকা তাৎপর্য কা হ্যায়?

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি হাসতে হাসতে বললেন —

সমুদ্রাঃ সরিতঃ সর্বাঃ, কল্পে কল্পে ক্ষয়ং গতাঃ।
সপ্ত কল্প ক্ষয়ে ক্ষীণে ন মৃতা তেন নর্মদা॥

প্রলয়কালমেঁ সমস্ত সাগর এবং সভী সরিতায়েঁ স্বরূপসে ক্ষীণ হোকর নষ্ট হো যাতী হৈঁ কিন্তু সাতকল্প পর্যন্ত য়হ্ রেবা নষ্ট নহীঁ হুয়ী অতঃ ইসকা নাম নর্মদা (ন মরণেবালী) হুয়া অর্থাৎ প্রলয়কালে পৃথিবীর সমস্ত নদী এবং সমুদ্র প্রলয়পয়োধি জলে সর্ববিধ্বংসী মহাসমুদ্রে

লয় হয়ে যায়, তাদের স্ব স্ব সত্তার বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু সাতসাতটি কল্পান্তেও দেখা গেছে, মানে সপ্তকল্পান্তজীবী মহামুনি মার্কণ্ডেয় দেখেছেন, কল্পান্তের মহাপ্রলয়েও নর্মদার সমগ্র সত্তার বিলুপ্তি ঘটে নি. সমস্ত কল্পেই তিনি স্ব মহিমায় নিজের রূপ ও আকার নিয়ে বিরাজিত থাকেন: 'ন মৃতা তেন নর্মদা', কোন অবস্থায় তিনি ক্ষীণ হন না, তাঁর মৃত্যু ঘটে না, তাই তাঁর নাম নর্মদা।

মহাত্মার কথা শেষ হতে না হতেই অভয়ানন্দজী হাতজোড় করে বললেন — ভগবন্! আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, এখনই প্রবল বৃষ্টি নামবে। আপনি এখনই দয়া করে গুহাতে ফিরে যান।

এতক্ষণ তন্ময় হয়ে মহাত্মার কথা শুনছিলাম, আমরা কেউই আকাশের দিকে তাকাই নি। অভয়ানন্দজীর কথায় আমরা উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশে মেঘের ঘনঘটা, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে , কড়্-কড়্ কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল। মেঘাচ্ছন্ন কালো আকাশের বুক চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ ; দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেও আরম্ভ করছে। একলিঙ্গস্বামী উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন — আজ রথযাত্রাকী পুনীত অবসর পর প্রভু জগবন্ধুকা কুছ্ প্রসঙ্গ হমলোগ মনন করেগা কি নেহী? একলিঙ্গস্বামী হাতজোড় করকে বিনতী করতা হৈ, দো ঘন্টাকে লিয়ে আপ্ রুক্ যাইয়ে। সন্ন্যাসীয়োঁকো ভোজন ভি আভিতক্ নেহি হুয়া।

এই কথাগুলি বলেই তিনি জনৈক সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন — বিদ্যানন্দ! আপতো বহোৎ সাল তক্ শ্রীক্ষেত্রমেঁ থে। আপ্ ভগবান জগবন্ধুকা বারেমে কুছ্ শুনাইয়ে।

আদেশ মাত্রই বিদ্যানন্দজী গদ্‌গদ কণ্ঠে প্রথমেই জগবন্ধুর স্তব করতে লাগলেন —

ধ্যেয়ং বদন্তি শিবমেব হি কেচিদন্যে
শক্তিং গণেশমপরে তু দিবাকরং বৈ।
রূপৈস্তু তৈরপি বিভাসি যতস্ত্বমেব
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম জগবন্ধো!
বেদেষু ধর্মবচনেষু তথাগমেষু
রামায়ণেঽপি চ পুরাণকদম্বকে বা।
সর্বত্র সর্ববিধিনা গদিতস্ত্বমেব
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম জগবন্ধো!

স্তবের অর্থ হল, কেউ বলেন জগতের একমাত্র ধ্যেয় হলেন মহাদেব, কারও মতে আদ্যাশক্তি, কারও মতে সিদ্ধিদাতা গণেশ বা প্রভু সূর্যনারায়ণ। কিন্তু আমি জানি, একই তুমি রূপে রূপে বহুরূপে বিরাজ করছ, অতএব হে জগবন্ধুরূপী নারায়ণ! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। চতুর্বেদে, সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে আগমগ্রন্থে, রামায়ণ এবং মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থগুলিতে হে জগবন্ধু! সর্ববিধ উপায়ে তোমারই মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব হে নারায়ণ! আমি তোমার চরণেই আশ্রয় নিলাম।

স্তবপাঠের পরেই বিদ্যানন্দজী যা বললেন তার সারমর্ম এই — প্রভু জগবন্ধু পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। ওঁকারকে আড়াআড়িভাবে রাখলে যে আকারটি দেখা যায়, প্রভু জগবন্ধুর প্রতীক সেইভাবেই পুরীধামে প্রতিষ্ঠিত। কোন বস্তুর মধ্যে সমস্ত রং যখন একাকার হয়ে যায়, তখন

তাকে কালো দেখায়। ভগবানের সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের, সমস্ত রূপ ও রঙের সমাহার ঘটেছে, তিনি ত্রিগুণাতীত, রূপাতীত। তাই প্রভু জগবন্ধুর মূর্তির রং কালো। ভগবান স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ জগতের প্রতি বস্তুর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত থাকলেও, সমস্ত কর্মে বিধাতা এবং ত্রিজগতের মূল নিয়ন্তা হলেও তিনি কোন কর্মে লিপ্ত নন। দ্রষ্টাস্বরূপে তিনি বিরাজিত, তাই জগন্নাথ দেবকে ঠুঁটো অর্থাৎ হস্তপদহীনরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, শুধু তাঁর চোখ দুটি খোলা অর্থাৎ তিনি দ্রষ্টা মাত্র। আজ রথযাত্রা। শাস্ত্রে আছে,

রথে চ বামনং দ্রষ্টা পুনর্জন্মং ন বিদ্যতে।

আমাদের চিদ্‌গুহায় তিনি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষরূপে নিত্য বিরাজিত। কূটস্থ হয়ে আজ্ঞাচক্রে, ত্রিকুটিতে 'অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ' সেই চিদ্‌পুরুষের দর্শনলাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না! উপনিষদ ও যোগশাস্ত্র বর্ণিত সেই পরমগুহ্যতত্ত্ব প্রভু জগবন্ধুর শ্রীমূর্তিতে প্রকটিত। জয় জগবন্ধু !

বিদ্যানন্দজীর কথা শেষ হতেই একলিঙ্গস্বামীজী আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন — আপ্ পুরীধামমেঁ জগন্নাথদেবকো দর্শন কিয়া?

আকাশের দিকে একপলক তাকিয়ে দেখলাম, সমস্ত পর্বত জলভারে নত। টলটলে মেঘে ঢাকা থাকলেও বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বিনম্রকণ্ঠে উত্তর দিলাম — খুব কম সংখ্যক বাঙালী এই দুরধিগম্য মহাতীর্থ নর্মদাতটে আসতে পেরেছেন বলে মনে হয়। আমি যে আসতে পেরেছি তার মূলে বাবার আশীর্বাদ এবং প্রেরণা। তা বাঙালী এখানে আসতে পারুক আর না পারুক, প্রায় অধিকাংশ বাঙালী গয়া কাশী এলাহাবাদ এবং পুরীধামে দলে দলে গিয়েছেন, এখনও যান। কাজেই আমিও দুবার গিয়েছি। কিন্তু পুরী বা জগন্নাথ আমাকে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করতে পারে নি, যেখানে গিয়ে আমার কোন ভাবান্তর ঘটে নি, পুরীতীর্থের যে কোন মহিমা আছে তা আমি বুঝতে পারি নি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং অপর বাঙালী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী জগন্নাথদেবের অনেক অপ্রাকৃত লীলা বর্ণনা করে গেছেন, সে সব ভালভাবেই পড়েছি, বিদ্যানন্দজী এইমাত্র জগন্নাথ মূর্তির যেসব আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন তাও আমি জানি। এইসব জেনে শুনেও আমি এই নর্মদাতটে আপনার মত মহাত্মার সামনে বসেই অকপটে বলছি, শ্রীক্ষেত্র আমার ভাল লাগে নি। গয়া মাহাত্ম্য এবং কাশীখণ্ডের মত পুরীতীর্থ নিয়ে ওড়িয়া ভাষায় 'মাত্‌লা পঞ্জী' নামে একটি গ্রন্থ আছ, তাতে জগন্নাথদেবের অনেক লীলা খেলার বর্ণনা আছে, পড়ে আমার বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাস বরং বেশী করে বেড়ে গেছে। আমি অনুসন্ধানে জেনেছি, এই জগন্নাথ মূর্তি পূর্বে শবরদের (উৎকল প্রদেশের বন্য উপজাতি চণ্ডালদের) পূজিত দেবতা ছিলেন। শবরদের 'দৈতাপতি' উপাধিধারী ব্রাহ্মণরা তাঁর পূজা করতেন। শবররা তাঁর নাম দিয়েছিল — নীলমাধব। বৌদ্ধধর্মের জগৎব্যাপী অভ্যুত্থানে এই মন্দিরে বুদ্ধের ত্রিমূর্তি স্থাপিত ছিল। শংকরাচার্যের সময়ে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের কালে এই মন্দিরে শবরদের সেই নীলমাধবকে এখানে জগন্নাথরূপে স্থাপন করা হয় এবং ত্রিমূর্তির অনুকরণে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে স্থাপন করা হয়। তারপর 'মাতলা পঞ্জী' নামক উৎকল দেশের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের রচিত এক উপপুরাণে তাঁতে নারায়ণত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখনও স্নানযাত্রার সময় ১০৮ কলসী জলে স্নান করানোর পর এঁর মূর্তিকে পনের দিন যাবৎ মন্দিরের গর্ভগৃহে অর্গলবদ্ধ

করে রাখা হয়। ভক্তেরা তখন ঠাকুর দর্শন করতে পান না। এত জলে স্নান করার ফলে নাকি জগন্নাথের প্রবল জ্বর হয়, তখন তাঁকে পাঁচন খাওয়ানোর জন্য সেই শবরজাতির 'দৈতাপতি' উপাধিধারি ব্রাহ্মণরাই নাকি তাঁর কাছে বোতল বোতল পাঁচন রেখে আসেন, দৈতাপতিরা ঐ সময় ক্ষৌরকার্য করেন না, তারা অশৌচ পালন করেন। এখন অবশ্য দৈতাপতিরা পাণ্ডা শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত হয়েছেন। আসল রহস্য এই কাঠের মূর্তিতে যে রঙ থাকে, ১০৮ কলসী জলের ধারা বর্ষণে তা উঠে যায়, পনের দিন ধরে বন্ধ গর্ভগৃহে কাঠের মূর্তিতে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার তিনটি মূর্তিকে নূতন করে রঙের প্রলেপ কার্য চলে। রঙ্ শুকিয়ে গেলে তখন আবার ভক্তদের দর্শনের জন্য মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। মূর্তি গড়া নিয়েও অনেক প্রবাদ উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। একদলের মতে, বার বৎসর ছাড়া সমুদ্র জলে নিমগাছ ভেসে আসে কারও মতে স্বপ্নে মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা একটি দৈবচিহ্নে চিহ্নিত নিমগাছ দেখতে পান। সেই নিমকাঠে জগন্নাথের নব কলেবর তৈরী করা হয়। যাইহোক, কতকগুলি আচার ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব ঐ ঠাকুরের উপর আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বিশ্বাস জন্মায়নি। মনুষ্য নির্মিত (Man-made) ধাতু বা পাষাণে প্রস্তুত কোন মূর্তিতে আমি বিশ্বাসী নই। বেদে বারবার মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে নিষেধ বাক্য আছে। ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে বলেছেন — ন হি প্রতীকে হি সঃ। নারায়ণ শিলা বা নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ কোন মানুষ তৈরী করে না। এগুলি স্বতোৎপাদিত দৈব প্রভাবে সিদ্ধ যন্ত্র বিশেষ, তাই আমি নারায়ণ-শিলা, নর্মদেশ্বর বাণলিঙ্গে ভগবানের উপাসনা করি। আমি সাধন ভজনহীন অল্পজ্ঞ ব্যক্তি। আপনারা যদি আমার প্রগলভতা মার্জনা করেন, তাহলে আপনার মত মহাত্মা এবং এখানে উপস্থিত জ্ঞানবৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে জানতে চাই, প্রসিদ্ধ চারধামের মধ্যে পুরীধামের মত অন্য কোন ধামে এইরকম কাঠের ঠাকুর দেখেছেন কি ? জগন্নাথমূর্তি যদি সত্যই অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন জগতের নাথই হবেন তবে ভক্তের কল্পনায় তাঁর কপালে পঞ্চধাতু, অষ্টধাতুর মূর্তি জুটল না কেন? বাণলিঙ্গ, নর্মদেশ্বর কিংবা বহুবিচিত্র দিব্যচিহ্নযুক্ত স্বতোৎপাদিত নারায়ণ শিলার মত তিনিও ত কোন সিদ্ধ যন্ত্ররূপে প্রকট হতে পারতেন? কাঠের মূর্তি কেন? ভগবান কি একখণ্ড কাঠ মাত্র?

একলিঙ্গস্বামী আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন — লেও ভাই আপ্‌লোগ ইনকা সংশয়কা নিবৃত্তি কর দো, নেহি ত ইনকা যুক্তি খণ্ডন কর দিজিয়ে।

সন্ন্যাসীরা কেউ কোন উত্তর দিচ্ছেন না দেখে তিনি সচ্চিদানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললেন — রসিকরাজ, আপ্ কুছ বলিয়ে, কোঈ খণ্ডন মণ্ডন কা সওয়াল নেহি, মধুরেণ সমাপয়েৎ।

গুরুজীকে যুক্ত করে দণ্ডবৎ করে সচ্চিদানন্দজী আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললেন — লেকিন্ আরে ভেইয়া! আপ্ ত ব্রহ্মচারী হৈ, সাদি-উদি নেহি কিয়া, ইসি ওয়াস্তে ভগবানকা লকড়ীকা মূর্তি রহস্য আপনে সমঝ নেহি পায়া। দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখেছ কি, দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী। পলক পলক লোহু চুষণে-ওয়ালী এক বহু রহনেসেই আদমীকো হাড্ডি ঔর মাস কালি হো যাতা হৈ। ওহি কামিনী কভি ঝাঁটা হস্তে ধূমাবতীকা রূপ, কভি চণ্ডী প্রচণ্ডা উগ্রচণ্ডা রূপ ভি লেতে হৈ। উনকা প্রতাপসে মনুষ্য তো কোন ছার হৈ, দেব দৈত্য রাক্ষস ভি উৎসন্নমে যাতা হৈ। জগন্মাতা যব্ দশমহাবিদ্যাকা রূপ প্রকট কিয়া থা উন্‌কা ছিন্নমস্তা রূপ দেখ্ কর স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব ভি পাগল হোকর

উলঙ্গ হোকে শ্মশানচারী ভাঙড়ভোলা হো গয়া। জগন্নাথদেবকী তো দারুমূর্তি হবেই করেগা। উনকা হালৎ একদফে শোচিয়ে, উনকা এক বহু নেহি, দো বহু; এক ত বাগবাদিনী সরস্বতী যিনকা বাণী বচন ঔর কথাকা অনন্ত ভাণ্ডার হৈ, উনোনে নিরন্তর বকনেবালী হৈ। দুসরা বহু লক্ষ্মীজী, সদৈব চঞ্চলা, কিসিকা কোঠিমেঁ নিরন্তর নেহি ঠারতা হৈ, আজ যো গরীব হৈ, কাল উহ্ ধনী বন্ যাতা হৈ, আজ যো ধনী বিহানমেঁ (আগামীকাল) উহ্ গরীব হো যাতা হৈ। নারায়ণ কা এক লেড়কা যিন্‌কা নাম কামদেব হৈ, উনকা ঠোক্করসে দেবদৈত্য মনুষ্যকা কা কথা স্বয়ং ধূর্জটিভি নাকাল হো চুকে। দেবদৈত্য, ইহ্ মর্ত্যভূমিমেঁ রাজা মহারাজা ধনী শেঠলোগ্ ক্যাত্‌না সুখপ্রদ দুগ্ধফেননিভ শয্যামেঁ লেটতে হৈ; বেচারা নারায়ণকা শয্যা শেষ সাগরমেঁ লবণাক্ত পানিমেঁ! শোচিয়ে, উনকা উপাধান হৈ বাসুকীনাগ, এক ভয়ঙ্কর বীভৎস প্রাণীকা গোদ মেঁ, বাহন হৈ, উস বাসুকী নাগকা একনম্বর দুশমন্ গুরুড়জী!

আপনা সংসারকা এ্যায়সা হালৎ দেখ কর ভগবান জগন্নাথজী দারুভূত, একদম কাষ্ঠবৎ হো গয়ী —

> এক ভার্যা স্বভাব মুখরা, চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া,
> পুত্রমেকং ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
> শেষ শয্যা শয়নং জলধৌ বাহনং পন্নগারি,
> সারং সারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারীঃ।

সচ্চিদানন্দজীর স্বভাব-সিদ্ধ সরস ভঙ্গীতে বর্ণিত এই কথাগুলি শুনে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম।

একলিঙ্গস্বামী এইবার পাকশালার ভারপ্রাপ্ত হরিস্বামীকে ডেকে বললেন — আভি আপ্ ভোজনকা প্রবন্ধ করিয়ে। আপকা ভোজনকা বাদ প্রবল বারিবর্ষণ সুরু হো যাবেগা।

হরিস্বামী দ্রুত পাকশালায় গিয়ে আমাদের ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। সকল সন্ন্যাসীরা খেতে বসতেই তিনি 'শিবমস্তু' বলে নিজের গুহার দিকে দ্রুতপদে চলে গেলেন। ভোজনান্তে তাঁর আদেশমত যে যার গুহায় গিয়ে ঢুকলাম। প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে বজ্র বিদ্যুৎ সহ মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল, আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি! চারিদিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল। নর্মদার দিকে তাকিয়েও নর্মদাকে দেখা যাচ্ছে না। সামনের দিকে যতদূর দেখতে পেলাম, শুধু কুণ্ডলীকৃত বাষ্প গাছপালা এবং পাহাড়ের উপর যেন তাল তাল করে উঠছে, ভাসছে আর নাচছে। পাহাড়ের শিখরদেশ হতে দুড়দাড় শব্দে ছোট বড় পাথর গড়িয়ে পড়ছে তা শুনতে পেলাম। এক ঘেয়ে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিলাম জানি না, যখন ঘুম ভাঙল তখনও দেখি বৃষ্টির বিরাম নাই, তবে বজ্র বিদ্যুতের হানাহানি যেন অনেকটা কমেছে, বৃষ্টির বেগও কিছুটা স্তিমিত হয়েছে বলে মনে হল। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দও আর শুনতে পাচ্ছি না। কাছে ঘড়ি নাই, সন্ধ্যা হয়েছে, না সন্ধ্যা হতে এখনও দেরী আছে, কিছুতেই তা নির্ণয় করতে পারলাম না। আর আধঘন্টা পরে বৃষ্টি থেমে গেল। ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন বুঝতে পারলাম সন্ধ্যা হতে আর দেরী নাই। আকাশ মেঘমুক্ত কিন্তু গাছেপালায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

আমি বিছানার উপর উঠে বসে সকালের কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, একলিঙ্গস্বামীর কথা, তাঁর যোগশক্তির কথা। আমাদের শাস্ত্রে যোগীর দুজ্ঞেয় যোগবলের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে -

যদ দুষ্করং যদ্ দুরাপং যদ দুর্গং যচ্চ দুস্তরম্।
সর্বং তৎ তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥

অর্থাৎ যা কিছু দুঃসাধ্য, দুর্লভ, দুর্গম এবং দুস্তর — সে সকলই তপস্যার দ্বারা লাভ করা যায়। তপস্যার শক্তি অলঙ্ঘ্য, যোগীর যোগবল সাধারণ মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর। ভৃগু, দুর্বাশা, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিদের যোগবলের কাছে রাজচক্রবর্তী ও সম্রাট থেকে আরম্ভ করে দুর্ধর্ষ দেব দৈত্য রাক্ষসরা পর্যন্ত নতশির থাকতেন। তপোসিদ্ধ মহাযোগীরা প্রকৃতির অধীন নন, তাঁরা প্রকৃতির নিয়ামক বা অধীশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকার ফলে তাঁরা ইচ্ছা করলে প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রন করতে পারেন। আসন্ন বৃষ্টিপাতের ধারাকে একলিঙ্গস্বামী যে 'দু ঘন্টাকো লিয়ে রূখে' দিলেন, তাতো নিজের চোখেই আজ প্রত্যক্ষ করলাম।

সকাল প্রায় সাড়ে দশটায় আমাদের অধিবেশন বসেছিল, এগারটার সময় সারা আকাশ মেঘাবৃত হয়ে বৃষ্টিপাত সুরু হতেই তিনি প্রকৃতি শক্তিকে 'বিনতী' করলেন, দু ঘন্টার জন্য থেমে থাকতে। অধিবেশন শেষে ভোজন পর্ব সমাধা করে আমরা যে যার গুহায় প্রত্যাবর্তন করার পরেই আকাশ ভাঙ্গা প্রবল বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল! এগারটা হতে একটা, এই দু' ঘন্টার মধ্যে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হতে দেখিনি! পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগীর এই শক্তি বা বিভূতিকে বলা হয়েছে — প্রকৃতি-বশিত্ব।

যোগদর্শনের একটি সূত্রে মহর্ষি বলেছেন — স্থূল স্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্ব — সংযমাৎ ভূতজয়ঃ অর্থাৎ স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় এবং অর্থবত্ত্ব এই পাঁচটিতে সংযম করলে ভূতজয় হয়ে থাকে। এখানে স্থূল শব্দের অর্থ হল — নামরূপ, যথা ঘট, পট, জীবজন্তু ইত্যাদি। স্বরূপ শব্দে বুঝাচ্ছে — স্থূল উপাদান যথা মাটি বা পাথরের কাঠিন্য, জলের স্নেহপদার্থ, অগ্নির উষ্ণতা বায়ুর প্রণামিতা (নিয়ত সঞ্চরণশীলতা), আকাশের সর্বগামিতা ইত্যাদি। সূক্ষ্ম শব্দে এখানে সূচিত হয়েছে — পঞ্চমহাভূতের পঞ্চতন্মাত্রকে যথা রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি। অন্বয় শব্দের অর্থ — প্রকাশ প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ গুণত্রয়। সকল পদার্থেই এইগুলি অন্বিত আছে, তাই সত্ত্বঃ-রজঃ-তমঃ এই গুণত্রয়কেই অন্বয় বলা হয়। অর্থবত্ত্ব শব্দের অর্থ প্রয়োজনবত্ত্ব অর্থাৎ নির্লেপ আত্মার ভোগাপবর্গসাধন রূপ লীলা বিলাস। এ জগতে দৃশ্য বস্তু মাত্রেরই এই পাঁচরকম রূপ আছে। ক্রমে ক্রমে ঐ পাঁচটিতে পুনঃপুনঃ সংযম প্রয়োগ করলে যোগী ভূতজয় করতে পারেন। ভূতজয়ের গুহ্যতত্ত্বটি হল ভূতসমূহের যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত হওয়াই ভূতজয়। ভূতসকলে যে পরমার্থত নাই , বস্তুতঃ তাদের কোন সত্তাই নাই, এটি প্রত্যক্ষ হওয়াই ভূতজয় নামক বিভূতি।

প্রসঙ্গক্রমে আমার মনে পড়ল, পাঁচদিন আগে যাঁর সঙ্গ ছেড়ে এসেছি চব্বিশ অবতারের সেই বাঙালী পাগলা সাধুর কথা। সীতামায়ীর বনের প্রবেশ পথে পুনরায় যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হল, তখন দেখেছি তিনি বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য একটা হিংস্র বুনো মহিষের শিং ধরে বলেছিলেন — ভাগ্ ভাগ্, যমবেটা (বাঘ) তেড়ে আসছে। বাঁচবি যদি ঐ দিকে পালিয়ে যা। বুনোমহিষটা তাঁর কথা শুনে তাঁরই নির্দিষ্ট পথে ছুটে পালিয়েছিল। আবার সীতামায়ীর মন্দির হতে জঙ্গলপথে এই ধাবড়ী কুণ্ডের দিকে আসার সময় চড়াই পথে আমরা যখন উঠছিলাম, তখন দেখেছিলাম ঘন কৃষ্ণলোমে আবৃত এক বিরাট ভালুক ধতুপ ফলের মধু খেয়ে মাতালের মত টলতে টলতে উৎরাই পথে থপ্ থপ্ করে নামছিল। পাগলা

সাধু তার কান ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গাছে ঠেকিয়ে বলেছিলেন — সাতসকালে নেশা করেছিস্ একটু অসামাল হলে খাদে পড়ে অক্কা পাবি যে! এইখানে গাছে ঠেস্ দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, আমি যতক্ষণ না ফিরি! বলাবাহুল্য, আমি দেখেছিলাম সেই ভূতজয়ী মহাপুরুষের ধমক শুনে হিংস্র ভালুক পোষা কুকুরছানার মত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল! যাঁরা এইভাবে যোগবলে ভূতজয় করতে পারেন, সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণীজগৎ তাঁদের বশে থাকে, মহাপুরুষ ইচ্ছা করলেই তাঁদেরকে যদৃচ্ছা পরিচালনা করতে পারেন।

কিন্তু প্রকৃতি-বশিত্ব? প্রকৃতির উপর অসপত্ন অধিকার কারা বিস্তার করতে পারেন? একলিঙ্গস্বামী আজ সকালেই যেভাবে বৃষ্টি রোধ করলেন কিংবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কর্তৃক জয়দ্রথ বধকালে যেভাবে সূর্যের গতি অস্থায়ীভাবে রুদ্ধ করে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়ে এনেছিলেন পৃথিবীতে কিংবা জয়দ্রথ সূর্যাস্ত হয়েছে বুঝে চক্রব্যূহ হতে বেরিয়ে আসতেই শ্রীকৃষ্ণ সহসা সূর্যকে প্রকাশ করে দিয়ে অর্জুনকে জয়দ্রথ বধের জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেইরকম প্রকৃতি-বশিত্ব কোন শ্রেণীর যোগীর দ্বারা সম্ভব? নিজের মনে এসব কথা ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল, পাতঞ্জল যোগদর্শনে এইমাত্র আলোচিত সূত্রটির পরের সূত্রেই (বিভূতিপাদ, সূঃ ৪৫) বলা হয়েছে — ততোহণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ — তা হতে অর্থাৎ পূর্বোক্ত রূপ ভূতজয় হতে অণিমাদির প্রাদুর্ভাব হয় এবং কায়সম্পৎ লাভ হয়, কায়ধর্মের অনভিঘাতও সিদ্ধ হয়। অণিমাদি বলতে বুঝায় অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব এবং কামবসায়িত্ব এই আট রকম সিদ্ধি বা আত্মার বিভূতিকে। উচ্চকোটির যোগী তীব্র তপস্যার প্রভাবে ভূতজয় করতে পারেন। ভূতজয় করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে স্বতঃই অষ্টসিদ্ধির প্রকাশ ঘটে, তার জন্য তাঁকে আর পৃথক কোন সাধনা করতে হয় না। অণিমা শব্দের অর্থ অণু হওয়া, সূক্ষ্মত্বের পরাকাষ্ঠা লাভ। কাশীর প্রসিদ্ধ যোগীরাজ ভাস্করানন্দ স্বামীর কাছে রাশিয়ার জারও একবার ছদ্মবেশে নিজের পরিচয় না দিয়ে এসেছিলেন। সেইসময় যোগীরাজের শিষ্য কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন চীফ্-জাস্টিস্ মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রশ্ন করেছিলেন — স্বামীজী! যোগশাস্ত্রে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির কথা যে শোনা যায়, তা কি সত্য? তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মুখে কিছু না বলে ভাস্করানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছিলেন। জারসহ উপস্থিত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। এর নাম অণিমা সিদ্ধি।

দ্বিতীয় — লঘিমা। লঘু শব্দের অর্থ হল হাল্কা যেমন তুলা। ভূতজয়ী যোগী ইচ্ছামাত্র লঘু হতে পারেন। আমার মনে পড়ল, নৈমিষারণ্য পরিক্রমাকালে ধেনুমতী নদীর তীরে আমি চিদ্‌ঘনানন্দজী নামে এক বিশালদেহী যোগীর কুটীরে কয়েকদিনের জন্য ছিলাম। একদিন তিনি কুটীরের প্রাঙ্গনে শুয়েছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে যেতে আমি তাকে কুটীরের মধ্যে উঠে আসতে অনুরোধ করায় তিনি বললেন —'আমার হেঁটে যেতে ইচ্ছা করছে না, তুই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে যা।' তাঁর কথা শুনে আমি থামতে লাগলাম। কারণ সাড়ে চারমণ পাঁচমণ ওজনের সেই বিশাল কলেবরকে দুই হাতে তোলা আমার সাধ্যাতীত ছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেই বলেছিলেন — নে নে তুলে দেখ, ভাবিস না, আমি পাখীর পালকের চেয়ে হালকা। আমি সাহসে ভর করে আঁকড়ে ধরলাম, সত্যই তাঁর দেহ এত হাল্কা হয়েছিল যে আমি অবলীলাক্রমে তাঁকে কোলে তুলে কুটীরের মধ্যে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

আর একটি ঘটনাও মনে পড়ছে। আর্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রণেতা প্রসিদ্ধ বেদবিৎ পূজনীয় শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দজীর (শশীশেখর সান্যাল) জীবনীতে পড়েছিলাম যে তাঁর গুরু শিবরামস্বামীর গুরুভ্রাতা, তাঁরও নাম ছিল দণ্ডীস্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ, নিজের দেহান্তকালে ত্রিবেণী সংগমে গিয়ে 'ক্ষুদ্রাণ্ডং ত্যজামি, ব্রহ্মাণ্ডং ব্রজামি' এই কথা বলতে বলতে জলের উপর স্বচ্ছন্দে হেঁটে গিয়ে সংগমস্থলে মহাসমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন। এই দুই চিদ্‌ঘনানন্দজীদের জীবনের বিচিত্র ঘটনা লঘিমা সিদ্ধির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তৃতীয় — মহিমা। মহত্বের যা পরাকাষ্ঠা, যার চেয়ে আর কিছু মহৎ হতে পারে না, তাকেই মহিমা বলে। পরম মহত্ব একমাত্র আত্মাতেই নিত্য বিদ্যমান। যোগী যখন অনুমান করেন যে , আমিই সেই মহিমা, পরম মহত্ব আমাতেই নিত্য বিরাজিত, এইরকম যে প্রত্যক্ষ অনুভব তাকেই মহিমা নাম্নী বিভূতির আবির্ভাব বলা যেতে পারে।

চতুর্থ — প্রাপ্তি। আমি সত্তাস্বরূপ সদ্‌বস্তু। সুতরাং যেখানে যা কিছু আছে বলে প্রতীয়মান হয়, তৎসমুদয়ই আমা কর্তৃক সর্বথা প্রাপ্তব্য বা প্রাপ্ত, এইরকম প্রত্যক্ষ অনুভূতির নাম 'প্রাপ্তি'।

পঞ্চম — প্রাকাম্য। প্রাকাম্য শব্দের অর্থ ইচ্ছার অনভিঘাত। ভূতজয়ী যোগী দেখতে পান — ইচ্ছা একমাত্র পরমেশ্বরেরই, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বর, যিনি আত্মা, তিনিই আমি রূপে প্রকাশিত। এই অবস্থায় উপনীত হলেই যোগীর কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না। যোগীর চিত্তে অতি দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তির স্পন্দন জাগলেও তা সঙ্গে সঙ্গে সুলভ হয়। তখন বুঝতে হয়, যোগীর মধ্যে প্রাকাম্য বিভূতির আবির্ভাব ঘটেছে।

ষষ্ঠ — বশিত্ব। ভূতজগৎ বা প্রকৃতিজগতের উপর আধিপত্য বিস্তারই এই বিভূতির স্বরূপ। রৌদ্র, বৃষ্টি, মেঘ, ঝড়, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি ভূত ও ভৌতিক বস্তুরূপে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, সে সকলই আমার প্রকাশেই প্রকাশিত। আমি আশ্রয় বা আধার, ঐগুলি আশ্রিত বা আধেয়, এইরকম প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ হতেই প্রকৃতি-বশিত্ব নামক বিভূতির আবির্ভাব ঘটে। আজ একলিঙ্গস্বামী যেভাবে বৃষ্টিধারাকে দু ঘন্টার জন্য রুখে দিলেন, এটি প্রকৃতি-বশিত্বের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে আমার মনে হয়েছে।

সপ্তম — ঈশিত্ব। শ্রেষ্ঠ যোগী ইচ্ছা করলেই যে শক্তিবলে যথাভিলাষ ভূতভৌতিক দ্রব্যের উৎপত্তি লয় এবং স্থিতি ঘটাতে পরেন, তাকেই সাধারণতঃ ঈশিত্ব নামক বিভূতি বলা হয়ে থাকে। যেমন এই নর্মদা পরিক্রমা কালেই শুনেছি, নর্মদা পরিক্রমাকে যিনি কমলভারতীজীর পরে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন এবং যিনি জমায়েৎ সঙ্গে নিয়ে বারবার নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন, নর্মদামাতার কৃপাপ্রাপ্ত সেই গৌরীশংকরজী একবার নর্মদাতটে কোকসরে অবস্থানকালে এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁর জমায়েতের সহস্রাধিক পরিক্রমাবাসীর উপযোগী পুরী ভাজবার মত ঘি তাঁর ভাণ্ডারে ছিল না। তিনি নর্মদামাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কলসী কলসী নর্মদা থেকে জল তুলে এনে তাই দিয়ে পুরী ভাজতে আদেশ দেন। সহস্র সন্ন্যাসী দেখে অবাক হন যে তাঁর বিভূতিবলে সেই জল ঘি এ পরিণত হয়ে গেছে। এই বিভূতির নাম ঈশিত্ব। কিন্তু এহ বাহ্য। গ্রাহ্যবস্তু মাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই যে ত্রিবিধ অবস্থা, তাকে যথাযথ সুনিয়ন্ত্রিত করবার যে সামর্থ্য তাকেই প্রকৃত ঈশিত্ব বলা হয়। 'আমার ভয়ে সূর্য উদিত হয়, আমারই শাসনে বায়ু প্রবাহিত

হয়, আমার ভয়েই অগ্নিতাপ দেয়, আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থূল সূক্ষ্মাদি যাবতীয় বস্তুকে সুনিয়মিত করে থাকি। এইরকম প্রত্যক্ষ অনুভবের নাম ঈশিত্ব লাভ। পূর্বোক্ত বশিত্ব বিভূতি হতেই এই বিভূতির আবির্ভাব ঘটে। ভূতজয়ী যোগীর পক্ষে এটি স্বতঃসিদ্ধ বিভূতি।

অষ্টম বিভূতি — যত্রাকামাবসায়িত্ব। কামনা সমূহের সম্যক্ অবসান ঘটার নাম যত্রকামাবসায়িত্ব। এক কথায় একে পূর্ণকামত্ব বলা যায়। 'পূর্ণকামোহস্মি সুংবৃত্তঃ' আমি পূর্ণকাম হয়েছি , আর আমার চাইবার বা পাবার কিছুই বাকী নাই। আমি আমার স্বরূপের সন্ধান পেয়েছি। এর পর আর কোন জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্য থাকতে পারে না। কোন যোগীর মধ্যে এইরূপ অনুভূতির প্রকাশ ঘটলে বুঝতে হবে, যোগী যত্রকামাবসায়িত্ব নামক বিভূতি লাভে ধন্য হয়েছেন। একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভেই সর্ববিধ কামনা-বাসনার অবসান ঘটে থাকে ভূতজয়ী যোগী নির্বিশেষ সত্তামাত্রস্বরূপ আত্মার সন্ধান পেয়ে তবেই এইরকম অষ্টসিদ্ধি লাভ করে থাকেন।

অন্ধকারময় গুহার মধ্যে একা একা বসে সদ্যদৃষ্ট একলিঙ্গস্বামীর বিভূতির স্বরূপ আপন মনে বিচার করতে করতে আমি তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। সচ্চিদানন্দজীর ডাকে আমার চমক ভাঙল।

— লেকিন্, একেলা চুপচাপ বৈঠে ক্যা শোচতে হো? বাহারমেঁ দেখিয়ে আকাশ মেঘমুক্ত হো গিয়া। একদফে বাতি জ্বালাইয়ে।

তাঁর কথার গুহার এক কোণে পড়ে থাকা মোমবাতিটা জ্বালালাম। তিনি গুহার মধ্যে ঢুকেই একবার আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাতে লাগলেন, আর একবার গুহাময় পায়চারী করতে করতে লম্বা লম্বা শ্বাস টানলেন। তারপর মেঝের উপর বসে পড়েই হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন — লেকিন্, সমুচা সমঝ্ লিয়া। তোমার গুহার মধ্যে মহর্ষি দৃষ্ট কোন স্বতঃসিদ্ধ মন্ত্রের স্পন্দন এবং গন্ধ পাচ্ছি। তুম কোঈ মন্ত্রকা মনন করতে থে?

আমি বললাম — আজ আপনাদের গুরুজী যেভাবে অনিবার্য বৃষ্টিপাত রুখে দিলেন, দুপুরে ঘুম ভাঙার পর তারই স্বরূপ বিচার করতে করতে পাতঞ্জল যোগসূত্রের, একটি সূত্র মনে মনে ভাবছিলাম।

— লেকিন্, কোন সা সূত্র বাতাইয়ে না।

— ততোহণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তর্দ্ধমানভিঘাতশ্চ।

আমার মুখে মন্ত্রটি শুনেই তিনি আবার কয়েকবার লম্বা লম্বা শ্বাস টানলেন আর ফেললেন। তারপরেই হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন — মহর্ষি পতঞ্জলিজীনে উন্‌কা যোগসূত্রমেঁ অষ্ট বিভূতিকা বারে মেঁ জো কুছ বাতায়া হ্যায়, উহ্ কোঈ মামুলি চিজ্ নেহি হ্যায়। লেকিন্, যোগী আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হোনেসে তব্ উহ্ সিদ্ধি প্রকট হো যাতা হৈ।

কতকাংশে হিন্দীতে বলেই তাঁর স্বাভাবিক রীতিতে হিন্দী-বাংলা মিশিয়ে বলতে লাগলেন — লেকিন্ বিভূতি বললেই অনেকে নাসিকা কুঞ্চন করতে থাকে। যেন ঐগুলি কতই সস্তা এবং সহজলভ্য! দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় যে সব উচ্চকোটি যোগীর আত্মজ্ঞান সন্নিহিত হয়েছে, একমাত্র তাঁদের মধ্যেই ঐসব বিভূতির স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ ঘটে থাকে।

— কিন্তু আমার বাবাও বিভূতি-ওয়ালা সাধু দেখলে বিরক্ত হতেন। তিনি বলতেন — বিভূতি মানে বিভুর ইতি। বিভূতির ফাঁদে পড়ে যোগীরা যোগভ্রষ্ট হন।

— লেকিন্, তুমি তোমার বাবার কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পার নি। যে সব সাধুরা শিষ্য শিকারের জন্য বহোৎ সস্তা ভেল্কি দেখায়, সেইসব জাদুটোনা করনেওয়ালা সাধুকেই হয়ত তিনি ধিক্কার দিতেন। যারা উল্লুকা পাঁঠো (নীরেট মুর্খ) সেইসব সাধারণ লোক পতঞ্জলি প্রোক্ত বিভূতির সঙ্গে সাধারণ সিদ্ধাই এর পার্থক্য বুঝতে পারে না। তারা বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা দিতে পারে না, তাকেই 'উনকা অষ্টসিদ্ধি করায়ত্ত হৈ' বলে ঢাক পেটায়। পাতঞ্জল সূত্রোক্ত অণিমাদি অষ্ট বিভূতির তাৎপর্য তোমার বাবা নিশ্চয়ই বুঝতেন। লেকিন্, তোমাকে একটা কথা বলি, সূত্রের অর্থ ভাবতে বসে সূত্রের কতকাংশ অর্থাৎ 'ততোহণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ' এই অংশটির মধ্যেই ডুব দিলে, মনন করলে, সূত্রটির বাকী অংশটির বিষয় ভাবলে না কেন? না, হয়ত ভাবতে, আমি হঠাৎ এসে পড়লাম বলে তোমারে চিন্তাসূত্রে বাধা পড়েছে। তুমি বাকী অংশ ভাবতে থাক, আমি বরং এখন যাই।

আমি বললাম — না না আপনি বসুন। আপনি না এলেও সূত্রের বাকী অংশ আমি ভাবতাম না, তা নিয়ে বিচার করতেও বসতাম না?

— লেকিন্ কেঁও?

— কারণ, আমি কায়সম্পৎ এবং তদ্ধর্মানভিঘাত, এই দুটি পদের ব্যাখ্যা আপনার মুখে শুনব বলে রেখে দিয়েছি। এ দুটি পদের অর্থ কিভাবে মনন করব, আপনি বলুন, আমি শুনি। কিন্তু তার পূর্বে আপনি দয়া করে বলুন, গুহাতে ঢুকেই লম্বা লম্বা শ্বাস টেনে আপনি কিভাবে জানতে পারলেন যে, আমি মহর্ষি পতঞ্জলি দৃষ্ট কোন সিদ্ধমন্ত্র নিয়েই মনে মনে আলোচনা করছিলাম? বহুদিন দেশ ছেড়ে এসেছি, আমি ত আমার প্রিয় পরিজনের কথাও চিন্তা করতে পারতাম কিংবা একলা বসে বসে কোন কুচিন্তাও করতে পারতাম!

— নেহি জী ? কোন কুচিন্তা যথা কাম বা ভোগমূলক কোন চিন্তা, পরনিন্দা পরচর্চা, কোন দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে মন লিপ্ত থাকলে এই ঘরের অণু পরমাণুগুলি খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পূতিগন্ধময় হয়ে উঠত। কিন্তু আমি তোমার গুহাতে ঢুকেই নিঃশ্বাস টেনেই বুঝতে পারলাম, এই ঘরে সাত্ত্বিকভাবের হিল্লোল উঠছে; ঋষিদৃষ্ট কোন সিদ্ধমন্ত্রের জপ, মনন বা উচ্চারণেই সাধারণতঃ অণুপরমাণুর এইরকম বিবর্তন ঘটে থাকে। এইজন্য ধ্যান-ধারণা কিংবা পূজার্চনাকালে আমাদের দেশে বেদমন্ত্র পাঠ বা বৈদিক কোন স্তব পাঠের বিধান আছে। তাতে শুধু পরিবেশই শুদ্ধ হয় না, মনের যে সব বক্রগতি নিয়ত মনকে চঞ্চল ও অস্থির করে রাখে, সেগুলিও ধীরে ধীরে স্থির ও অনর্তমুখী হয় লেকিন, 'কায়সম্পৎ' সম্বন্ধে কিছু শোনার জন্য তোমার সাধ হয়েছে; এস, সেই বিষয়েই কিছু আলোচনা করি।

'কায়সম্পৎ পদটি তোমার আলোচ্য সূত্রে থাকলেও মহর্ষি পরবর্তী সূত্রে এই পদটির সবিশেষ চর্চা করেছেন; সূত্রটি হলো — রূপ-লাবণ্য-বল বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ — (সূত্র ৪৬, বিভূতিপাদ)॥ এর সরল অর্থ হল, সুন্দর রূপ বিশিষ্ট, কান্তিমান্, অতিশয় বলবান বজ্রের ন্যায় দৃঢ় অবয়বযুক্ত হওয়াই কায়সম্পৎ।

এখন ঋষির প্রত্যেকটি সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগের অন্তরালে যে উদ্দেশ্য এবং আশয় আছে, তা ভাল করে বুঝে নিই এস। প্রথম শব্দটি হল — রূপ। সাধারণতঃ আমরা যাকে 'রূপ' বলে বুঝে নেই, তা কিন্তু প্রকৃত রূপ নয়। আকৃত এবং রূপ এক বস্তু নয়।

যা সর্বত্র উদ্ভাসিত অথচ ভাষায় বা চিন্তায় যার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, মূকাস্বাদনচৎ অনির্বচনীয় সেই বস্তুর নাম রূপ। একজন গৌরবর্ণ সুগঠিত শরীরের অধিকারী হলেও তার

মুখে চোখে ক্রূরতা ও মিথ্যাচারের আভায় ফুটে উঠলে তার রূপ কাউকে আকর্ষণ করে না। কিন্তু কেউ কৃষ্ণবর্ণ কৃশকায় হলেও তার মুখে চোখে যদি নির্মলতার ও সরলতার ভাব থাকে, তাহলে তাকে সকলেরই ভাল লাগে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে নির্মল চৈতন্য বস্তুর আভাস বা শুদ্ধভাবের প্রকাশ ঘটলেই রূপ ফুটে উঠে। সহজ কথায় চৈতন্য বস্তুরই অপর নাম রূপ। জড়পদার্থ কা চৈতন্য যব্ কোঈ সুরতসে সম্বন্ধযুক্ত হো যাতা হৈ, তব বস্তুয়োঁকা আস্‌লি রূপ প্রকট হো যাতা হৈ।

দুসরা পদ 'লাবণ্য'। লেকিন্, তুম্ ইহ্ শ্লোক শোনা হোগা —

মুক্তাফলেষু চ্ছায়ায়াঃ তরলত্বমিবান্তরা
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তৎ লাবণ্যমিহোচ্যতে।

ইস্‌কা মতলব ইহ্ হৈ, সচরাচর শ্রী সৌন্দর্য চারুতা প্রভৃতি শব্দে আমরা যা বুঝে থাকি, লাবণ্য অনেকটা সেই ধরণের বস্তু। ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে আপাতদৃষ্টিতে আমরা যাকে কুৎসিৎ বলি, তার মধ্যেও একটি শ্রী আছে। সেই শ্রী যেখানে সমধিক উদ্ভাসিত সেইখানেই লাবণ্যের প্রকাশ। শিশুর মুখচন্দ্রিমা, পূর্ণচন্দ্র এবং প্রস্ফুটিত পদ্মে লাবণ্যের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

এই রূপ এবং লাবণ্য জগতের সর্বত্র পূর্ণভাবে অবস্থিত আছে, বুদ্ধির মলিনতার জন্য সব সময় সকলের চোখে তা পড়ে না। ভূতজয়ী যোগীর বুদ্ধি নির্মল, তাই তাঁর চোখে সর্বত্র সর্ববস্তুতে রূপ ও লাবণ্য ফুটে উঠে, তাই কেবল তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব হয় ভূতানি মধু, ভুবনানি মধু। মরি, মরি, কী মাধুরী! হম্ যব্ গঙ্গাসাগরমেঁ থা, উস্ বখৎ এক বাউলের কণ্ঠে শুনেছিলাম — 'জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' খাঁটি কথা, বহোৎ সাচ্চা বাত্। আত্মাই রূপ, আত্মাই লাবণ্য আত্মজ্ঞ যোগীর পক্ষে সর্বত্র এইরূপ লাবণ্য দেখা সম্ভব হয়। আত্মজ্ঞান বিরহিত সাধারণ লোকের বুঝার জন্য আরও সহজ করে বলা যায়, তুমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যাঁকে সবচেয়ে বেশী ভালবাস, যাঁর বিরহ তুমি মুহূর্তের জন্য সহ্য করতে পার না, তাঁরই নাম রূপ, তাঁরই নাম লাবণ্য।

এই রূপ ও লাবণ্য যেমন আমার দুটি কায়সম্পৎ, তেমনি সূত্রে উল্লিখিত বজ্রসংহননত্বও একটি কায়সম্পৎ। সংহনন্ শব্দের পারিভাষিক অর্থ শরীর অর্থাৎ স্বরূপ। সাধারণতঃ সকলে শরীর অর্থটিই গ্রহণ করে থাকে। তাই ঐ পদের অর্থ বুঝে রেখেছে যোগী এই বিভূতি লাভ করলে তাঁর শরীর বজ্রের মত দৃঢ় ও মজবুত হবে। কিন্তু 'বজ্র' শব্দটির তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগের কথা ভাবলে ঋষি প্রকৃত কথা কি বলতে চান তা ধরা পড়বে। বজ্র শব্দটি ভীতিসূচক। 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং'; ভয়াদস্য তপতি সূর্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে বজ্র শব্দে ভয়ের ভাব জড়িয়ে আছে। কারও মাথার উপরে নিয়ত যদি বজ্রপতনের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে, তবে সে সদাই ভীত ও সঙ্কুচিত থাকে, সদাই আজ্ঞানুবর্তী থাকে। ঠিক সেই রকম, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর মহদ্ভয় উদ্যত বজ্রস্বরূপ আত্মা বিরাজ করছেন। তাই সকলেই যথানিয়মে স্ব স্ব কর্মচক্রের অনুবর্তন করে চলেছে। কোনমতেই তার একতিলমাত্র অন্যথা হবার উপায় নাই। উদ্যত বজ্রস্বরূপ আমার 'আমি' বা আত্মার এই যে অনভিভাবত্ব এবং অভিভাবকত্ব — এই তত্ত্বটি লক্ষ্য করেই যোগদর্শনের ঋষি এই সূত্রে বজ্রসংহনন পদটির প্রয়োগ করেছেন।

এই পর্যন্ত বলে সচ্চিদানন্দজী হাই তুলতে তুলতে বললেন — লেকিন্ নিদ্ আতী হৈ। হম্ চল পড়ে, রাত সাড়ে নয় বাজ গিয়া হোঙ্গে, আপ্ভি লেট পড়ে। দুসরা কোঈ দিন মেঁ 'তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ' পদকী মনন করেঙ্গে।

সচ্চিদানন্দজী চলে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ বসে সপ্তাক্ষর শিবমন্ত্রের সঙ্গে নর্মদা মায়ের সপ্তাক্ষরী বীজমন্ত্র জপ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এইভাবে একই কার্যক্রম অনুসরণ করে ধাবড়ী কুণ্ডের দিনগুলো খুব আনন্দেই কেটে যেতে লাগল। প্রায় দু' একদিন ছাড়াই বৃষ্টি হয়, আবার কোন কোন দিন বৃষ্টির বিরতি ঘটে। প্রতিদিন সকালে ধাবড়ী কুণ্ডে স্নান ও শিবপূজা করতে গিয়ে এবং মধ্যাহ্ন ভোজন কালে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলেও অন্যসময় তাঁদের সঙ্গে বার্তালাপের সুযোগ ঘটে না। একলিঙ্গস্বামীকে ত সকলের সঙ্গে দূর থেকে কুর্ণিশ করা ছাড়া তাঁর দর্শনলাভ বা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা প্রায় ভগবদ্ দর্শনের মতই দুর্লভ। কিন্তু একা সচ্চিদানন্দজীই তাঁর সঙ্গদানে কোন কার্পন্য করেন না। প্রতিদিন সন্ধ্যাতে তিনি গুহাতে যথারীতি আসেন এবং নানারকম কথাবার্তায় আমার মনকে ভরিয়ে দিয়ে যান। তবুও যোগদর্শনের পূর্বোল্লিখিত অবশিষ্ট পদটির আলোচনার কথা তাঁর বা আমার কারও মনে পড়েনি। এর মধ্যে একদিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সেদিন ৩০শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার। সকালে দু' এক পশলা ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি হলেও সারাদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল। হঠাৎ বৈকাল প্রায় চারটা নাগাদ গুড়্গুড়্ শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। একদল ময়ুর ময়ূরী পেখম মেলে সামনের বনে নাচছে দেখতে পেলাম। গুহা থেকে মুখ বাড়িয়ে সেই দৃশ্যই দেখছিলাম, কিন্তু পাহাড়ের উপর দিকে একবার দৃষ্টি পড়তেই দেখি, তাল তাল সাদা মেঘ পাহাড়ের উপর গাছপালার ভিতরে যেন ঢুকে পড়েছে , মনে হচ্ছে সহস্র সহস্র বলাকা (বক) যেন যুথবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসছে, নর্মদাও ফুলে ফেঁপে বয়ে চলেছেন। বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। যুগপৎ এই দৃশ্য দেখে আমার মনে পড়ে গেল মহর্ষি বাল্মীকির বর্ষা বর্ণনা। রামচন্দ্র তখন কিষ্কিন্ধার সন্নিহিত প্রস্রবন-গিরিতে লক্ষ্মণকে নিয়ে বাস করছেন। বর্ষাকাল আরম্ভ হয়ে গেছে। বালিকে বধ করে কিষ্কিন্ধার রাজসিংহাসনে সুগ্রীবকে বসিয়েছেন। সুগ্রীব কাব্যসুখে মত্ত কিন্তু রামচন্দ্র সীতা বিরহে কাতর। তবুও বর্ষার সময় পর্বত ও গাছপালার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। বাল্মীকি তাঁর মুখ দিয়ে বর্ষাপ্রকৃতির একটি মনোরম চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলেছেন — 'দেখ, দেখ, লক্ষ্মণ! জলভারে নত সাদা মেঘের নর্তনলীলা দেখ, বনের গাছপালাও কেমন সুন্দর শোভা ধারণ করেছে!

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশম্ নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বত সন্নিরুদ্ধাম্ রূপং যথা শান্ত মহার্ণবস্য।।

১৭ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্, ২৮ সর্গ)

অর্থাৎ সূর্য কখনও কখনও আকাশের বুকে উঁকি মারছেন, প্রকাশিত হচ্ছেন, রৌদ্রের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে, আবার দেখতে দেখতে ঘন মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ছেন। বায়ুভারে সঞ্চরণশীল মেঘের সাদা সাদা বাষ্পকুণ্ডলী যখন পর্বতে নিরুদ্ধ হয়ে বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ার উপক্রম করছে, তখন আকাশকে দেখলে মনে হচ্ছে, আকাশ যেন শান্ত স্থির মহাসমুদ্রের রূপ ধারণ করেছে।

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ শৈলেন্দ্রকূটাকৃতি সন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ।।

১৭ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্, ২০ সর্গ)

যখন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে, তখন মনে হচ্ছে, পর্বতের শিখরদেশ বিদ্যুৎ পতাকায় সজ্জিত, সাদা মেঘের সঞ্চরণ দেখলে মনে হয়, সারি সারি বক পর্বতের গা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। মেঘ ঘন ঘন গর্জন করছে, মেঘনাদে সমগ্র বনাঞ্চল প্রকম্পিত, কৃষ্ণবর্ণ পর্বতগাত্রকে হস্তীযূথের মত দেখাচ্ছে।

অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে, রাত্রি হয়ে গেছে, ভাবলাম এই বৃষ্টির মধ্যে আজ বোধ হয় সচ্চিদানন্দজী আসতে পারবেন না! না আসুন, বাল্মীকির বর্ষা বন্দনার অনুপম শ্লোক মাধুর্য আমাকে আজ তন্ময় করে রেখেছে, আমি মনের আনন্দে শ্লোকগুলি সুর করে গাইতে লাগলাম। মহাকবির শ্লোকের এমনই যাদু যে তাল লয় মান সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও আমি চোখ বন্ধ করে নিজের হাঁটুতে হাত দিয়ে তাল ঠুকছি আর গমকে গমকে উচ্চারণ করছি!

এই সময় হঠাৎ গুহার মধ্যে ঢুকলেন সচ্চিদানন্দজী। তাঁর পায়ের শব্দে ভীষণ চমকে উঠলাম। আমৃতা আমৃতা করে বলতে লাগলাম — 'আমি ভেবেছিলাম এত বৃষ্টিতে আজ আর আপনি আসতে পারবেন না'। যাইহোক আমি সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতি জ্বাললাম।

— লেকিন্, হম্ ত আ গয়ি। কিন্তু তুমি থামলে কেন? মহাকবি বর্ণিত বর্ষা বর্ণনার আর কোন শ্লোক মুখস্ত থাকলে তাও গাইতে থাক, আমিও গাই।

এই বলেই তিনি চমৎকার সুরে মধুর কণ্ঠে মৃদু মৃদু হাতে তালি, এবং মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে তাল দিতে দিতে গাইতে লাগলেন —

বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনাঃ মত্তগজা বনান্তাঃ প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গাঃ।।

(ঐ, ২৭)

দিনরাত্রি অবিরাম বৃষ্টি ধারায় নদী স্ফীতকায়া হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে থাকে বারিপতনের টুপটুপ্ ঝমঝম্ শব্দ ; পাহাড় থেকে দুড়্দুড়্ শব্দে গড়িয়ে পড়ে ছোটবড় পাথর। নদীর জলে পড়ে স্রোতের টানে তারাও শব্দ করতে করতে যায়। নদীর স্বাভাবিক কলতান ত আছেই। মাঝে মাঝে কালো মেঘের হুঙ্কার যখন উঠে, তখন মনে হয় হাতীরা বনান্তরাল থেকে বৃংহন নাদ তুলছে। এইভাবে বর্ষায় বনপ্রকৃতি শব্দে শব্দে ধ্বনিতে ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলেও, বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে ময়ূর ময়ূরীরা কেকা শব্দ তুলতে তুলতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন গাছে উঠে পড়েছে, হরিণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে হরিণী থেকে, বানর হয়েছে বানরী থেকে, এমন কি ভেকগুলোও ভেকী হতে আলাদা হয়ে গেছে। প্রিয় প্রিয়ার জন্য, প্রিয়া প্রিয়ের জন্য বিরহে যেন কাতর হয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তাদের বুকের সেই ব্যথা, বিরহ যন্ত্রণা মহাকবি অন্তর দিয়ে অনুভব করছেন। প্রকৃতির বিচিত্র কলনাদের সঙ্গে তিনি যেন তাদের নীরব দীর্ঘশ্বাসের স্পন্দন ও ধ্বনিও শুনতে পেয়েছিলেন!

এক কথায়, বর্ষার বনপ্রকৃতি শব্দে শব্দে শব্দময়ী হয়ে উঠে। লক্ষ্য কর, মহাকবি এই শ্লোকে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন — প্লবঙ্গাঃ। প্লবঙ্গ শব্দের অর্থ ময়ূর, বানর বা ব্যাঙ।

বর্ষা নামলে এই তিনশ্রেণীরই সাময়িক বিরহ দশা ঘটলেও তাদের আনন্দের মাত্রাই যে তাদেরকে বেশী আনন্দবিহ্বল করে, তারও আভাষ দিয়েছেন পরবর্তী একটি শ্লোকে —

ষট্‌পাদতন্ত্রী মধুরাভি ধানম্ প্লবঙ্গমোদীরিত কণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈ - র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্॥

১৭ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্, ৩৭ সর্গ)

বৃষ্টি আসছে বুঝতে পারলেই ময়ূর-ময়ূরীরা পেখম তুলে আনন্দে নাচতে থাকে, কেকা-রব করে ; এক পশলা বর্ষণের পর যখন বৃষ্টি ঝরে যায়, তখন সন্ধ্যার পরেই এই পর্বতাঞ্চলে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে ভ্রমর-ভ্রমরীর গুঞ্জরণে সমগ্র বনাঞ্চল মুখর হয়ে উঠেছে, যেন সমগ্র অরণ্যে সঙ্গীতের মূর্ছনা জেগেছে। ভেকের অবিশ্রান্ত কলরব শুনে মনে হয় তারা সূত্রধারের মত বাজনার সঙ্গে তাল দিচ্ছে, মেঘের গুরুগুরু ডাককে তখন মৃদঙ্গ-বাদ্য বলে মনে হয় অর্থাৎ প্রকৃতিরাণী যেন গান বাজনায় মেতে উঠেন।

মহাত্মা উচ্ছ্বাস ভরে রামায়ণের শ্লোক আবৃত্তি করে তার ভাবানুবাদ করে যাচ্ছেন, কিন্তু তার কথায় আমার মন ছিল না। আমি কেবল বিস্ময়ের সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ নখাগ্র হতে কেশাগ্র পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করছিলাম। মহাত্মা যখন আমার গুহায় এসে ঢোকেন, তখন অবিরলধারে বৃষ্টি ঝরছিল, তাঁর গুহা হতে আমার গুহায় আসতে অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, তাঁর সঙ্গে 'টোগা'ও ছিল না, অথচ আমি দেখলাম তাঁর গায়ে মাথায় এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি! তাঁর পরণের গেরুয়া কাপড়টাও শুক্‌নো! এই দেখে আমি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। একাগ্র দৃষ্টিতে আমি তাঁর দিকে মুহুর্মুহু তাকাচ্ছি দেখে, আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তিনি কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। তিনি মেঝের উপর তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে আমাকে বললেন — লেকিন্, আপ্‌কো এক বার্তা শুনানেকে লিয়ে আয়া হুঁ। কাল ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার, গুরুপূর্ণিমা হৈ। গুরুজী উন্‌কা গুম্ফা সে উৎরেঙ্গে, হম্‌লোক্ উনকা পূজা করেঙ্গে, থোড়া বহোৎ শাস্ত্রার্থ ভি হোনেকা সম্ভাবনা হৈ। বিহানমেঁ সুবা সুবা ধাবড়ী কুণ্ডমেঁ যানে পড়েগা।

তখনও আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। তিনি আমার কাছেই বসে থাকার ফলে মোমবাতির আলোতে তাঁর সর্বাঙ্গ আরও ভালভাবে দেখবার সুবিধা হয়েছে — নাঃ ! তাঁর শরীর বা গেরুয়া কাপড়ের কোথাও ভিজা দেখছি না।

আমি কোন কথা বলছি না দেখে তিনি আমাকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার জন্য বললেন — দেখিয়ে, যোগসূত্রের অবশিষ্ট 'তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ' পদকো চর্চা আভি তক্ নাহি হুয়া। উস্‌কা মতলব হ্যায় ....

এই বলে তিনি ব্যাখ্যা সুরু করতেই আমি হাতজোড় করে হাসতে হাসতে বললাম — ঐ পদের অর্থ আমি ভাল করে বুঝতে পেরেছি। আপনি আসার পরেই ঐ মন্ত্রার্থটি আমার সামনে মূর্তি পরিগ্রহ করে প্রকট হয়েছে! শুধু মন্ত্রার্থ নয়, মন্ত্রের প্রয়োগও!

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই উঠে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে দ্রুত গুহার বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে, তার বেগ অনেক কম। আমি তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করতে করতে আপন মনে বলতে লাগলাম — হে ভূতজয়ী মহাপুরুষ!

শরীর ধর্মের অনভিঘাত আজ আপনি যে ভাবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সহকারে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন এমনভাবে আর কে বুঝাবেন? আপনাকে প্রণাম। প্রণাম মাতা নর্মদাকে যাঁর কৃপায় তাঁর তটে এসে আজ বুঝতে পারলাম যে, মহর্ষি পতঞ্জলির সূত্রগুলি কেবল কথার কথা নয়, এগুলি যে বাস্তব সত্য, চিরন্তন সত্য, যে কোন যোগী সঠিকভাবে যোগ সাধনা করলে যে আজও নিজের জীবনে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। ভূতজয়ী মহাপুরুষ যোগবলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিই শুধু লাভ করে না, তিনি রূপ লাবণ্য বল ও বজ্রের মত দৃঢ় শরীর প্রভৃতি কায়সম্পদও লাভ করেন। কায়সম্পদ্ লাভ করলে যোগীর শরীরে রূপান্তর ঘটে তার (তদ্ধর্মের) অনভিঘাত হয় অর্থাৎ সেগুলির আর কোনকালেই বিনাশ ঘটে না। তখন সেই যোগীর শারীরিক ক্রিয়াদিকে পৃথিবী তার কাঠিন্য দিয়ে নিরুদ্ধ করতে পারে না। যোগী ইচ্ছা করলে তাঁর শরীর শিলার ভিতরেও অনুপ্রবেশ করতে পারে, স্নেহগুণযুক্ত জলও সেই শরীরকে ক্লিন্ন করতে পারে না অর্থাৎ ভিজাতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, প্রণামী (সঞ্চরণশীল) বায়ুও বহন করতে পারে না, অনাবরণাত্মক আকাশেও তিনি আবৃত্তকায় হতে পারেন অর্থাৎ তিনি সিদ্ধদের কাছেও অদৃশ্য থাকতে পারেন।

সদানন্দময় সচ্চিদানন্দজী বাহ্যতঃ সকলের কাছে হাস্যপরিহাসের মধ্যে সময় কাটালেও তিনি নিজেও যে একজন ভূতজয়ী মহাযোগী সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ রইল না। কেননা, আজ নিজের চোখেই ত দেখলাম, প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তিনি হেঁটে এলেও স্নেহগুণযুক্ত জল তাঁর শরীরকে ক্লিন্ন করতে পারে নি।

এইসব চিন্তা করতে করতে আমার মন আনন্দে ভরে গেল। আমি মোমবাতিটা নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন শুনতে পেলাম শিঙা ও ডম্বরু বাজছে। রাত্রেই বৃষ্টি থেমে গেছল, এখন আকাশ পরিষ্কার। মনে পড়ল, আজ গুরুপূর্ণিমা। সন্ন্যাসীরা ধাবড়ী কুণ্ডে নর্মদেশ্বরকে পূজা করতে যাবেন, তারজন্যই শিঙা ডম্বরু বাজিয়ে সবকে ডাক দিচ্ছেন। আমিও তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে, তাঁদের সঙ্গ ধরলাম। হর নর্মদে, হর নর্মদে ধ্বনি তুলে শিঙা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে অভয়ানন্দজী নর্মদা স্তোত্রের ধুয়া ধরলেন, আমরা সকলেই তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে স্তব পাঠ করতে করতে ধাবড়ী কুণ্ডের কাছে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। বিশাল জলপ্রপাতের কাছাকাছি হতেই আমাদের ধারা স্নান হয়ে গেল। উঁকি মেরে দেখলাম, প্রথম দিন অভয়ানন্দজী আমাকে হাত ধরে যে ঘাটে স্নান করিয়েছিলেন, তাঁর পাঁচটা ধাপ জলে ডুবে গেছে। এখন আর কুণ্ডের মধ্যে বোধহয় সব ডুবে গেছে। তবুও সেখানে থাকতে থাকতেই দুতিনটি লিঙ্গকে স্রোতের ধাক্কায় উপরে ছিটকে উঠতে দেখলাম। অভয়ানন্দজী প্রথমেই সবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি নর্মদাস্তোত্রের এক একটি স্তোত্র পাঠ করে নর্মদেশ্বরের উদ্দেশ্যে কুণ্ডের মধ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন, আমরাও যেন সেই মন্ত্র পাঠ করে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করি। তিনি বলতে লাগলেন —

ওঁ তপোনিধি তপস্বিনী স্বযোগযুক্তমাচরী,
তপঃকলা তপোবলা তপস্বিনী শুভামলা।
সুরাসনী সুখাসনী কুতাপপাপমোচিনী
তরঙ্গরঙ্গ সর্বদা নমামি দেবি নর্মদা॥ ১

কলৌ মলাপহারিণী নমামি ব্রহ্মচারিণী
আদিরূপা শ্রীকন্যাকা অনাদি সিদ্ধিধারিণী।
শাঙ্করী ব্রহ্মশক্তি ত্বং কিলোল লোল চাপলা
তরঙ্গরঙ্গ সর্বদা নমামি দেবি নর্মদা॥ ২
মুনীন্দ্রবৃন্দসেবিতং স্বরূপ বহ্নিসন্নিভং
ন তেজদাহকারকম্ সমস্ত পাপহারকং।
অনন্তপুণ্যপাবনী সদৈব শম্ভুভাবিনী
তরঙ্গরঙ্গ সর্বদা নমামি দেবি নর্মদা॥ ৩

আমরা সমবেত কণ্ঠে এক একটি মন্ত্র পাঠ করে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করলাম। পূজা হয়ে গেল। হর নর্মদে উচ্চারণ করতে করতে আমরা ফিরে এলাম। আমি গুহাতে ফিরেই কমণ্ডলু রেখে কিছু বনফুল তুলে নিয়ে এলাম। গুরুপূর্ণিমার পুণ্যক্ষণ স্মরণ করে বাবার ফটোটি ফুলে সাজিয়ে তাঁর অপার স্নেহ ও দয়ার কথা স্মরণ মনন করতে লাগলাম। আমার দুচোখ বেয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে, এমন সময় সম্বিদানন্দজী দৌড়ে এসে বলে গেলেন, গুরুজী আ রহে হ্যায়। আমি বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে পাকশালার কাছে যেখানে একলিঙ্গস্বামীর আসন পাতা হয়, সেইদিকে যেতে যেতে দেখতে পেলাম, তিনি তাঁর গুহা থেকে এসে বসেছেন। সন্ন্যাসী শিষ্যরা তাঁর কমণ্ডলুর উপর ওঁ নমো ভগবতে বেদব্যাসায় গৌড়পাদায়, শুকদেবায়, শংকরাচার্যায়, হর নর্মদায়ৈ, নমঃ শিবায় ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন, একে একে তাঁকে প্রণাম করছেন। আমিও ধীরে ধীরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। অভয়ানন্দজী আমাকে ইঙ্গিত করলেন কমণ্ডলুর উপর ফুল চাপাতে। কিন্তু আমি উঠবার উপক্রম করতেই স্বয়ং একলিঙ্গস্বামী আমাকে বসে থাকতে বলে বললেন — উননে উনকা গুরুজীকা পূজা করকে তব ইধর আয়া। আমি চুপ করে বসে থাকলাম। তিনি নিজেই আবার বললেন — দেবাদিদেব মহাদেবজী আদি গুরু হৈ। সবকা গুরু একই হৈ। শিউজীকা পূজা করনেসেই গুরুপূজা হো যাতা হৈ। তব্ ভি গুরুপূর্ণিমাকী কে বিশেষ তাৎপর্য হৈ। ইস্‌লেজি আপনা দীক্ষাদাতা গুরুজীকো পূজা অবশ্য করনা চাহিয়ে। এইবলে কিছুক্ষণ পরে নিজেই ভাবস্থ হয়ে বসে রইলেন। তারপর নর্মদার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আপন মনে বলতে লাগলেন —

গঙ্গাপি পুণ্যা যুমনাপি পুণ্যা, পুণ্যাশ্চ ধন্যাঃ সরিতোহপি অগন্যাঃ।
তৎতৎ প্রদেশে নিখিলাস্তু পুণ্যা, সর্বত্র পুণ্যা খলু নর্মদেয়ম্॥

অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা এবং আরও অনেক নদীর জল পবিত্র হলেও বিশেষ বিশেষ স্থানে সেইসকল নদীর জল বেশী পুণ্যশালিনী বলে বিবেচিত হয়, তৎ তৎ স্থানে সেগুলির স্থানে সেগুলির মহিমাও বেশী কিন্তু নর্মদার জল বিশেষ কোন স্থানের অপেক্ষা রাখে না, নর্মদার মাহাত্ম্য সকল স্থানেই সমভাবে বর্তমান।

শ্রুতপ্রভাবা শ্রুতিশাস্ত্রসম্মতং, তপো বিধাতুং তব তীরমাগতাঃ।
নিপীয় পীযূষনিভং পয়শ্চ তে, বিধূয়তাপং নিজরূপমাপ্লুবন্॥

হে নর্মদে! কত মুনি ঋষি তপস্বী তোমার মহিমা শুনে বেদশাস্ত্রানুমোদিত দুশ্চর তপস্যায় সিদ্ধিলাভের জন্য তোমার তটে ছুটে এসেছেন এবং নিয়ত তোমার অমৃততুল্য জল পান করে এবং তপস্যা করে তোমার কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করে কৃতকৃত্য হয়ে গেছেন।

আচার্যবর্যা অপি শংকরার্যা, অব্যক্তচর্যা মুনয়স্তথান্যে।
শ্রী সদ্‌গুরুং প্রাপ্য বিমুক্তকার্যা মুক্তা অভুবন্ ননু সন্নিধৌ তে॥

মাগো ! যাঁদের কথা লোকে জানেনা এমন অনেক মুনি ঋষি ত বটেই, এমনকি আচার্যপ্রবর স্বয়ং শংকরাচার্যও তোমার তটে এসে গুরুলাভ করে তোমার কৃপাতেই কৃতকৃত্য হয়েছিলেন, এ কথা কে না জানে বল ?

তিনি যখন এইভাবে ভাবের ঘোরে কথা বলছেন, তখন দূরে কোথাও মাদল বাজছে শোনা গেল। আমরা সবাই একদৃষ্টেই তাকিয়ে আছি মহাত্মার দিকে। তবুও বুঝতে পারছি, মাদলের শব্দ যেন ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। মাদল বাজাতে বাজাতে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে বোধহয় দুশ আড়াইশ এখানকার আদিবাসী দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইতে গাইতে নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। ত্রিশূল হস্তে অভয়ানন্দজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন — ভগবান ! বাইগা লোগোঁকো নিকাল দুঁ ? তিনি হাত তুলে বললেন — আনে দেও। অভয়ানন্দজী কুর্ণিশ করতে করতে বসে পড়লেন।

আদিবাসীরা ধীরে ধীরে এসে একলিঙ্গস্বামীকে মণ্ডলাকারে ঘিরে ধরল। আমরা সবাই একধারে সরে এসে তাদেরকে স্থান করে দিলাম। স্ত্রীলোকদের হাতে নানাজাতীয় ফুলের স্তবক। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পুষ্পাভরণে সুসজ্জিত। পুরুষরা মাদল বাজাতে বাজাতে বারবার মাথা নুইয়ে নুইয়ে নাচতে লাগল। মেয়েরাও নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে গিয়ে মহাত্মার বেদীর নীচে ফুলের তোড়াগুলি একে একে নিবেদন করল। গান গাইতে গাইতে তারা ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল সেই কঙ্কর ও প্রস্তরময় প্রাঙ্গণে। তাদের ভাষা কিছুই বুঝতে পারছি না, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ভাবাবেগে তাদের প্রত্যেকেরই চোখ দিয়ে অবিরলধারে জল ঝরছে। একলিঙ্গস্বামী বসে আছেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির মত; উভয় চক্ষু মুদ্রিত। একটু পরেই তিনি বরাভয়ের ভঙ্গীতে তাদেরকে আশীর্বাদ করে বললেন — 'লেও, পরসাদী'।

এইবলে তিনি একে একে সবাইকে কাছে ডাকলেন। সন্ন্যাসীরা তাঁর হস্তধৃত যে কমণ্ডলুতে গুরুপূজা করেছিলেন, তার মাথা থেকে সমস্ত ফুল ফেলে দিয়ে বাঁ হাতে কমণ্ডলুটি ধরে ডানদিকে রাখলেন তারপর কমণ্ডলুর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সকলের হাতে একটি একটি করে 'অম্রুত' (পেয়ারা) দিতে লাগলেন। অপূর্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে তারা একজন একজন করে তাঁর কাছে নতজানু হয়ে অম্রুত নিয়ে আসতে লাগল।

মুণ্ডমহারণ্য পরিক্রমা কালে একজন আলেখিয়া সম্প্রদায়ের মহাত্মাকে দেখেছিলাম তিনি তাঁর একটি ঝুলি থেকে দশজন সাধুর ভোজনোপযোগী আটা, ডাল, ঘি, প্রভৃতি বের করে পরম পরিতোষ সহকারে তাঁর সাধু অতিথিদেরকে ভোজন করিয়েছিলেন, কিন্তু এ যে দেখছি তার চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার!

মহাত্মার কমণ্ডলুর যে আকার তাতে দু'তিনটির বেশী পেয়ারা কিছুতেই ধরতে পারে না, কিন্তু আমি গুণে দেখলাম আদিবাসী বাইগাদের স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে ২৫১ জন। ২৫১টি পেয়ারাই বেরুল তাঁর আজব কমণ্ডলু থেকে। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেলেও সেই আদিবাসীদের চোখে মুখে কোন বিস্ময়ের অভিব্যক্তি দেখলাম না। তাদের ভাবখানা যেন এই যে, নর্মদাতটবাসী কোন মহাত্মার এটুকু ক্ষমতা ত থাকতেই পারে।

আদিবাসীরা আনন্দে কলরব করতে করতে পিছু হটে হটে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করে চলে যাবার পর মহাত্মা তাঁর সেই কমণ্ডলু হতে জল ঢেলে দুইহাত ধুয়ে ফেললেন। এমন সময় সচ্চিদানন্দজী বলে উঠলেন — ভগবন! হমালোগকো ভি কৃপাপুর্বক পরসাদি দিজিয়ে। মৃদু হেসে মহাত্মা আবার বারজন সন্ন্যাসী সহ আমার হাতেও কমণ্ডলুতে হাত ঢুকিয়ে এক একটি করে তেরটি পেয়ারা প্রসাদ হিসাবে দিলেন। আবার হাত ধুলেন। কমণ্ডলুতে একবার পেয়ারা একবার জল — এই রকম বিচিত্র ম্যাজিক দেখে আমার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। পতঞ্জল যোগদর্শনের বিভূতিপাদে ৪৫ ও ৪৬ নম্বর সূত্রে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত থাকলেও তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা সহজ নয়। মহর্ষি পতঞ্জলি আকারে ইঙ্গিতে আভাষ দিয়েছেন বটে যে, অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত 'ঈশিত্ব' যে যোগীর আয়ত্ব থাকে, তিনি সংকল্প করলে ভূত ভৌতিক দ্রব্যের উৎপত্তি, লয় ও স্থিতি যথাভিলাষিত ভাবে ঘটাতে পারেন। কিন্তু যোগসিদ্ধ মহাপুরুষদের এইরকম ক্ষমতা থাকলেও, ঈশিত্বের পরেই স্বাভাবিকভাবে তাঁদের মধ্যে 'যত্রকামাবসায়িত্ব' নামক বিভূতিরও আবির্ভাব ঘটে। 'যত্রকামাবসায়িত্ব' শব্দের অর্থ ভূত ও ভূত প্রকৃতিকে যথা সংকল্পিত স্থানে স্থির রাখা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে ঋতম্ বা ছন্দ তা যথা নিয়মে বজায় রাখা। ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকলেও তাঁরা কোনমতেই পদার্থের বিপর্যয় ঘটান না। কারণ, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর পূর্বসিদ্ধ হিরণ্য-গর্ভ ঈশ্বরেরও ত এই রকমই ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি বিষয়ে, তার স্বাভাবিক নিয়ম ছন্দ ও ঋতমের সুস্থিতি বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় 'যত্রকামাবসায়িত্ব' রয়েছে!

আমার মনের মধ্যে এইরকম ভাবনা চলছে, এমন সময় মহাত্মা চট্‌পট যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে আমাকেই লক্ষ্য করে বললেন — আপ্ কুছ্ পুছেঙ্গে?

আমি মনের তৎকালীন চিন্তাসূত্র বদলে ফেলে বললাম — ভগবন! নর্মদাকী কঙ্কর সবহি ক্যায়সে শংকর বন্ যাতী ঔর কেবল নর্মদাকী জল মেঁ কেঁও বিচিত্র শিবচিহ্নযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন কিসিমকা শিবলিঙ্গকা উৎপত্তি হোতি হৈ, ইস্ রহস্য কা উপর কৃপা পূর্বক থোড়া রোশনী ডালিয়ে।

— কেঁও আপ্ মার্কণ্ডেয় পুরাণ নাহি পড়া? উসমে ইস্‌কী জিকর্ আয়া হৈ। মার্কণ্ডেয় মহামুনিনে কহা, নর্মদামাতা আর্বির্ভূত হোকর শংকর ভগবানকা পাশ এহি বর মাংগা। ভগবান উন্‌কো বর দিয়া থা —

> গর্ভে তব বসিস্যামি পুত্রো ভূত্বা শিবাত্মজা!
> মম ত্বম্ অপরামূর্তি খ্যাতো জলময়ী শিবা॥
> অপরং বরং দাস্যামি পশ্য দেবি মহৎতেজা।
> লিঙ্গরূপেন সুচিরং প্লবয়ামি তব ক্রোড়ে॥

অর্থাৎ শিব তাঁর পুত্রী নর্মদাকে বর দিয়েছিলেন, — আমি তোমার পুত্র হয়ে তোমার গর্ভে (জলেই) বাস করব। তুমি আমার অপরা-মূর্তি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। তোমাকে আমি আরও একটি বরদান করছি — আমি লিঙ্গরূপে চিরকাল তোমার কোলে ভেসে বেড়াব। শিবের বরে কি না সম্ভব?

আমাকে এই কথা বলে নর্মদার দিকে মুখ করে তিনি স্বগতভাবে বলে উঠলেন —

> স্পৃষ্টং করৈশ্চন্দ্রমাসৌর কেশ্চ তাদেব দদ্যাৎ পরমং পদং তু।
> যত্রোপলাপ্লুতাস্তে শিবত্বমায়ান্তি কিমত্র চিত্রম্? (স্কন্দপুরাণ)

মা ! যব তুমনে সূর্য ঔর চন্দ্রমাকো কেবল কিরণোঁ কে কারণ পরমপদ প্রদান কর দিয়া তো যো পথর তুম্হারে জল মেঁ সদা হি স্নান করতে রহতে হৈ, উন্হে যদি শিবত্ব কী প্রাপ্তি হো যাতী হৈ তো ইস্‌মেঁ আশ্চর্য কী কৌনসী বাত হৈ?

তাঁর এই কথার সরলার্থ হল, তিনি মা নর্মদাকে সম্বোধন করে বলে গেলেন, মা নর্মদে! সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তোমার জল স্পর্শ করায় তারা যদি পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে যেসব প্রস্তরখণ্ড তোমায় জলে নিয়ত ডুবে আছে , তারা শিবত্ব লাভ করবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

মহাত্মা এই কথা বলেই চড়াই এর পথ বেয়ে তাঁর গুহাতে ফিরে গেলেন, সন্ন্যাসীরা সকলেই তাঁর চলার পথ অনুসরণ করে নতমস্তকে কুর্নিশ করতে লাগলেন।

তিনি চলে যাবার পরেই ভোজন-পর্ব সমাধা করে নিজের গুহায় ফিরে এলাম। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে আজকের ঘটনাগুলি মনে মনে স্মরণ ও বিচার করতে লাগলাম। সাধুর শেষের কথাগুলিতে আজ মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূর হতে সূর্য ও চন্দ্র তাদের কিরণ মারফৎ নর্মদা-স্পর্শ করেন বলেই তাঁরা পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছেন, একথা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। জড় সূর্য ও জড় চন্দ্রেরই কিরণ নর্মদার জলে পড়ে থাকে। শুধু নর্মদা জলই বা কেন জাগতিক সব বস্তুতেই তাঁদের রশ্মি পড়ে। বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে সূর্য বা চন্দ্র কোন জড় বস্তু নন। তাঁরা সূর্যকে বলতেন — সূর্যনারায়ণ, চন্দ্রকে চন্দ্রমা নারায়ণ, তাঁরা ব্রহ্ম হতে কোন পৃথক বস্তু নন, তাঁরা ব্রহ্মই। ঋগ্বেদে ঋষি এই ব্রহ্ম দৃষ্টিতেই সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেছেন—

ওঁ হিরণ্যপতিমূর্ত্তয়ে সবিতারং উপাহ্বয়ে
স চেত্তা দেবতাপদং ॥

অর্থাৎ হে হিরণ্যপতি সূর্য! তুমিই সবিতাস্বরূপ। তুমিই জগতের প্রসবিতা, স্রষ্টা। তোমার চিতিশক্তির স্পর্শলাভ করে আমরা যেন দেবতা পদ লাভ করতে পারি। গায়ত্রীর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিশ্বামিত্র বলেছেন — জগৎ প্রসবিতা সেই সূর্যের বরণীয় ভর্গ-জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। সমস্ত ঋষিকুল এবং ব্রাহ্মণকুলের সারসর্বস্ব এই গায়ত্রী মন্ত্র।

সূর্যোপনিষৎ এর একটি মন্ত্রও এই প্রসঙ্গে আমার স্মরণে এল —

নমো মিত্রায় ভানবেব মত্যোর্মা পাহি।
ভ্রাজিষ্ণবে বিশ্বহেতবে নমঃ॥
সূর্যাদ্ভবতি ভূতানি সূর্যেণ পালিতানি তু।
সূর্যে লয়ং প্রাপ্নুবন্তি যঃ সূর্য সোহহমেব চ॥

মিত্রকে নমস্কার, ভানুকে নমস্কার, আমাকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর; প্রকাশশীল (ভ্রাজিষ্ণবে) , বিশ্বের কারণকে নমস্কার। জীবগণ সূর্য হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে, সূর্যের দ্বারা পালিত হয়, সূর্যেই লয় প্রাপ্ত হয়। যিনি সূর্য তিনিই আমি।

বৈদিক ঋষিরা এই জড়সূর্যের আরাধনা করতেন না। এই জড়সূর্যের মধ্যেও যাঁর মহাবিভূতি ক্রিয়াশীল, সেই চৈতন্য-সূর্যের মহিমা উপলব্ধি করে তাঁরা বলতে পেরেছিলেন —

সূর্যঃ আত্মা জগতস্তস্থুসশ্চ॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যে যুগেই শিবপুত্রী নর্মদার আবির্ভাব ঘটুক না কেন, মহেশ্বরের

স্বেলোৎপন্না নর্মদার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল বিন্ধ্যপর্বতের মেকল চূড়ায়। সেই বিন্ধ্য, মেকল ছাড়াও ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থের স্রষ্টা সূর্য-নারায়ণ। তিনি ত জগতের আত্মা। একলিঙ্গস্বামী বললেই মানতে হবে নাকি, সূর্য ও চন্দ্ররশ্মি নর্মদাজল স্পর্শ করে থাকে বলে সূর্যের সূর্যত্ব ? চন্দ্রের চন্দ্রত্ব? আমি যদি বলি, সূর্য চন্দ্রের কিরণ পড়ে বলেই সূর্যের সূর্যত্ব? চন্দ্রের চন্দ্রত্ব? আমি যদি বলি, সূর্য চন্দ্রের কিরণ পড়ে বলেই নর্মদা ত্রিভুবনতারিণী হতে পেরেছেন?

গুহার মধ্যে শুয়ে শুয়েই নিজের মনে গর্জাতে থাকলাম। গুহার বাহিরে দৃষ্টি দিয়ে বুঝলাম বেলা বোধহয় পাঁচটা বাজতে যায়। আমি বাইরে বেরিয়ে এসে একটা পাথরের উপরে বসে নর্মদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। আজ ভাগ্য ভাল যে বৃষ্টি হয়নি, আকাশ বেশ পরিষ্কার। ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে দূরে সাতপুরা পর্বতাঞ্চল এবং ভেটাখেড়া জঙ্গলের পিছনে। পশ্চিম দিগন্তের রক্তাভ আকাশপটে এই নীল অরণ্যানীর দৃশ্য ছবির মত আঁকা বলে মনে হচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছি আর ভাবছি, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা নন্দলাল বসু যদি এ দৃশ্য দেখতেন, তাহলে তাঁদের অত্যাশ্চর্য তুলির টানে একটি অনুপম চিরকালীন বাস্তব ছবি নিশ্চয়ই জন্ম নিত!

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে বাঁ দিকে দৃষ্টি ফেলতেই দেখতে পেলাম, কিছু দূরে অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলো বাঁকাভাবে এসে পড়েছে পাহাড়ের গায়ে; একদল হরিণ এসে প্রত্যেকে দুপায়ে ভর দিয়ে ঘাড় লম্বা করে সেই পাথরের গা চাটছে আর লাফিয়ে আনন্দ করছে। বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি এই সুন্দর সুন্দর প্রাণীদের সেই আনন্দ-লীলা মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম।

এমন সময় ডান দিক দিয়ে সচ্চিদানন্দজী এসে কিঞ্চিত গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন — লেকিন্ তুম জরুর মৃগযুথকা পাথর চাটনেকা কারণ ঢুঁড়রহা হৈ। ঐ পাথরে খনিজ লবণের স্তর আছে। বন্য জানোয়াররা চেটে চেটে ঐ নুন খেতে ভালবাসে। অন্য কেউ ঐ নুন ব্যবহার করে না। চলিয়ে চলিয়ে গুহাকা অন্দরমেঁ চলিয়ে। সাঁঝ হো গিয়া।

তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে মোমবাতিটা জ্বালালাম।

বসে বসে তাঁর সঙ্গে নানা রকমের কথাবার্তা বলছি, এমন সময় অদ্ভুত একধরনের ডাক শুনতে পেলাম — ব্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-বুম্। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন — উহ্ কোঙরা হ্যায়।

— কোঙরা কি ?

— লেকিন, এহি ধাবড়ী কুণ্ডকা জঙ্গলমেঁ কেবল কৃষ্ণসার মৃগ নেহি, এখানে খাসি ছাগলের মত দেখতে আর এক রকমের (হিরণ) ভি হ্যায়, তাঁরা মাঝে মাঝে রাত্রিতে ঐ রকম চেঁচিয়ে উঠে, ইস্‌লিয়ে ইস্‌কো 'বার্কিং ডিয়ার' ভি কহা যাতা হৈ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন — আজ গুরুপূর্ণিমাকা অধিবেশন ক্যায়সী হুয়া? দেখা ত, ভোলেভালে পাহাড়ী লোগোনে ক্যায়সা সুন্দর ঢং সে গুরুজীকো শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কিয়া। এ শিখনেকা চীজ্ হৈ।

আমি বললাম — কিন্তু আপনার গুরুজী নর্মদা সম্বন্ধে যেসব স্বগতোক্তি করলেন, তাতে আমি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আপনিই বলুন, লক্ষ যোজন দূর হতে সূর্য ও

চন্দ্রের কিরণ এসে নর্মদার জলে পড়েছে বলে সেই পুণ্যেই সূর্য চন্দ্র আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছেন? একি কোন যুক্তিসিদ্ধ কথা, না, অনুভব-সিদ্ধ কথা?

আমার কথা শুনেই দুহাতে কান ও নাকমলা দিয়ে বললেন — হর নর্মদে! হর নর্মদে! তুমি কি চাইছ, আজ গুরুপূর্ণিমার দিনে আমি গুরুবাক্যকে সমালোচনা করব? উন্‌নে যো কুছ বোলা হম্ উস্‌কো সচ্ মানেগা! তুমি অন্য কোন দুস্‌রা বাতকী প্রসঙ্গ লে চর্চা করিয়ে।

আমি কিঞ্চিৎ রাগত স্বরে বললাম, তবে আর আপনার সঙ্গে মন খুলে কোন আলোচনা করে লাভ কি? আমার মনে ঐ বিষয়টাই দুপুর থেকে গজ্‌গজ্ করছে।

— আরে ভেইয়া, নারাজ কেঁও হোতা হ্যায়? দুনিয়ামেঁ আলোচনাযোগ্য বহোৎ বহোৎ চীজ্ হৈ।

দুনিয়াতে অন্য কোন আলোচ্য বস্তু নাই, একথা বলছি না। তবে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না, ভাল লাগছে না।

তিনি আমার চিবুক ধরে নাড়াতে নাড়াতে বললেন — লেকিন্ , তুমি কিছু না বললে ভাবব; আমার উপর তোমার বহোৎ গোস্যা হয়েছে।

আমি বললাম — কি যন্ত্রণা! আমার এখন কোন তত্ত্বকথা আলোচনা করতে ভাল লাগছে না। অথচ আপনি জোর করে আমাকে তত্ত্বের ধাঁধায় ফেলবেন-ই। ভাল, আপনি দয়া করে বলুন ত শিব শ্মশানবাসী কেন? জগতের অতি দীনদরিদ্রেরও মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, অথচ বিশ্বেশ্বরের শ্মশান ছাড়া আর কোথাও ঠাঁই হল না।

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। আমার মনে অনুশোচনা এল, এই মহাপুরুষ যে একজন ভূতজয়ী মহাযোগী তা আমি বুঝেছি। এই বিদেশ বিরাজ্যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় যখন দিন কাটাচ্ছি, তখন এই মহাপুরুষ কেবল দয়া করে আমাকে সঙ্গ দিয়ে আনন্দে রাখার চেষ্টা করছেন। এঁকে ঝাঁজের সঙ্গে কথা বলা উচিত হয় নি। তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব কিনা ভাবছি, এমন সময়, তিনি মুখ তুলে হাসতে হাসতে আমাকে বললেন-লেকিন্, তুমহারা প্রশ্নকা জবাব শুনিয়ে। গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা উমার সঙ্গে যখন শিবজীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়, তখন হিমালয়ের যিনি কুলগুরু ছিলেন, তিনি প্রচলিত কুলাচার ও সামাজিক প্রথা হিসাবে শিবজীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন —

> কিং গোত্রং কিমু জীবনং কিমু ধনং কা জন্মভূঃ কিং বয়ঃ,
> কা বিদ্যা কিমু সদ্ম কে সহচরাঃ কে বংশজাঃ প্রাক্তনাঃ।
> কা মাতা চ পিতা ভবেতি গুরুণা পৃষ্টো বিবাহে শিবঃ,
> মালিন্যেন হৃদঃ স্বকীয় ভবনং ত্যক্ত্বা শ্মশানস্থিতঃ॥
>
> কিবা তব গোত্র, কিসে জীবিকা অর্জন?
> কোথা তব জন্মস্থান, কিবা তব ধন?
> কিবা তব বয়ঃক্রম, কি বিদ্যা তোমার?
> কেমন গৃহটি তব, কেবা আছে সহচর আর?
> তোমার বংশীয় পূর্বলোক কে কে বল রয়?
> পিতা মাতা কেবা তব, দাও পরিচয়।

শিবের বিবাহকালে বসিয়া সভায়
কুলগুরু জিজ্ঞাসে এ সব তাঁহায়।
প্রশ্নের উত্তরদানে অক্ষম হইয়া,
লাজে অধোমুখ হয়ে রহেন বসিয়া।
মনের দুঃখেতে তাই দেব ত্রিলোচন,
অদ্যাপি শ্মশানে নিত্য করেন ভ্রমণ।।

উত্তর দিয়ে মহাত্মা হো হো করে হাসতে হাসতে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমিও হাসতে হাসতে তাঁর সঙ্গে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তিনি ত চলে গেলেন কিন্তু আমি বাইরের রূপ দেখে এমন মুগ্ধ হলাম যে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাথার উপরে ঝকঝকে তারা ছিটানো আকাশ, চারধারে শৈলশ্রেণী, তাদের ছোটবড় চূড়া যেন আকাশের গায়ে ঠেকেছে, পূর্ণচন্দ্রের বিমল জোৎস্নাধারার এই নিবিড় নির্জন অরণ্যানীর শোভা কী অদ্ভুত ও গম্ভীর, নাম- না-জানা কোন বুনো ফুলের সুবাসও ভেসে আসছে। সত্যই বড় সুগন্ধ ফুলটার! গভীর বনের মধ্যে, চক্ষুর আড়ালে, জ্যোৎস্নারাত এই নির্জন আকাশতলে তার এই প্রাণঢালা আত্মনিবেদন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হচ্ছে না। আমার মনে হল, প্রকৃতির এই পূজা গুরুপূর্ণিমার এই শুভদিনে আদিগুরু শিবসুন্দর নিশ্চয়ই গ্রহণ করছেন। আজ সারাদিনই বৃষ্টি হয় নি, তার ফলে পূর্ণজ্যোৎস্নার এই অপরূপ সৌন্দর্য দুচোখ ভরে দেখার সুযোগ পেলাম।

সহসা গভীর বনের মধ্য থেকে দু'একটা রাত-জাগা পাখীর ডাক শুনতে পেলাম। যে দিকটায় ধাবড়ী কুণ্ডে একত্র বহু নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গের সমাবেশ, সেদিকটায় দৃষ্টি পড়তেই মনে হল হাজার বাতির ঝাড়লণ্ঠন যেন কেউ বা কারা সেখানে জ্বেলে রেখেছে। হয়ত একলিঙ্গস্বামীই তাঁর দলবল নিয়ে গুরুপূর্ণিমা বলে সেখানে পূজা করতে গেছেন! যতই হোক্, আমি বাইরের লোক ত! তাঁদের অন্তরঙ্গ সাধনার অংশীদার করেন নি। মনের মধ্যে এই চিন্তার হিল্লোল উঠা মাত্রই দেখলাম, সেই আলো অন্তর্নিহিত হয়েছে। আলোর আভা ত আর দেখতে পাচ্ছি না। একটা গহন গভীর রহস্য যেন আজ এই রাত্রিতে এই বনস্থলীর অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। আমার সারা শরীর ছমছম্ করছে। শিউরে উঠলাম। সত্যশিবসুন্দরের সর্বত্র যেন বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে আজ। আমি মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

একটু পরেই গুহার পর্দাটা ফেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলাম সেই একই দৃশ্য। সেই নর্মদা তটের অমলধবল জ্যোৎস্না, বন-পাহাড়ে যেন জ্যোৎস্নার ঢেউ নেমেছে, সেই অজানা ফুলের গন্ধ আমার গুহার মধ্যেও ঢুকেছে। একবার আমার ভ্রম হল, আমি গুহার মধ্যেই শুয়ে আছি ত? না, গুহার বাইরে নির্জন আকাশ তলেই শুয়ে আছি? একটু পরেই দেখলাম এইমাত্র যেন নর্মদায় স্নান করে জলপূর্ণ কমণ্ডলু হাতে বাবা গুহার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। আমার মাথায় নর্মদার জল কয়েক বিন্দু ছিটিয়ে দিয়ে বললেন --- নর্মদামাতা সম্বন্ধে কি সব উল্টা পাল্টা ভাবিস্ বস ত? যিনিই সূর্যনারায়ণ, তিনি সোম, তিনিই শিবসুন্দর, তিনি চন্দ্রচূড় শিবের সোমকলা হতে উদ্ভূতা শিবপুত্রী নর্মদা। না, না, কোন পার্থক্য নাই। মা নর্মদা হলেন নিরাকার ব্রহ্মের সাকার রূপ! পূর্ণব্রহ্মের দ্রবীভূত করুণার ধারা নর্মদা রূপে বয়ে চলেছেন! শুভমস্তু।

বাবা অন্তর্হিত হলেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রণাম করবার জন্য উঠবার চেষ্টা করতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। গলা যেন বন্ধ হয়ে আসছে। আমি কাঁদতে কাঁদতে বাবার উদ্দেশ্যে মাথা ঠুকে প্রণাম জানালাম। হাতড়ে হাতড়ে কমণ্ডলুটা নিয়ে জল খেলাম কতকটা। মন অপরিসীম আনন্দে ভরে উঠেছে। আজ গুরুপূর্ণিমার দিনে আমার ইহজীবনের ইষ্ট উপাস্য এবং মহাগুরুর দর্শন পেলাম। নর্মদাকে প্রণাম করার জন্য গুহার পর্দা সরাতেই দেখি সকাল হয়ে গেছে।

গুহার বাইরে এসে বসে রইলাম পূর্বদিকের শৈলচূড়ার দিকে তাকিয়ে। মনের ইচ্ছা প্রভাত-সূর্যের উদয়রশ্মিকে অভ্যর্থনা জানাব। কতক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম, শৈলচূড়ার অন্তরাল থেকে বাল-সূর্য নিজের মহিমায় আত্মপ্রকাশ করছেন। কে যেন আগে ভাগেই সমস্ত বড় বড় শিখরগুলোতে সিন্দুর আর সোনার রেণু ছড়িয়ে দিল। যে দিকেই তাকাই সে দিকেই দেখছি অজানা আকাশ-পরীর অদৃশ্য হস্তের ইন্দ্রজাল যেন। ধীরে ধীরে রোদ ফুটে বেরুল। কী সুন্দর সুস্নিগ্ধ প্রভাত! মন ভরে গেল।

গাছপালার আড়ালে সন্ন্যাসীদের গুহার দিকে তাকালাম। কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমি আবার গুহার মধ্যে ঢুকে ঘন্টাধ্বনির অপেক্ষায় বসে রইলাম। ঘন্টা আর পড়ছে না। কতক্ষণ আর এভাবে বসা যায়। আমি নিজেই সচ্চিদানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য তার গুহার দিকে রওনা হলাম। এবার মনে সন্দেহ হল, যথাসময়েই হয়ত ঘন্টাধ্বনি হয়েছিল, আমি শুনতে পাই নি। গাছের আড়াল অতিক্রম করতেই দেখতে পেলাম, সকল সন্ন্যাসীই শিঙা, ডম্বরু, পুষ্পপাত্র এবং কমণ্ডলু নিয়ে স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়ে একলিঙ্গস্বামীর গুহার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছাকাছি হতেই সচ্চিদানন্দজী বললেন — লেকিন্, অভয়ানন্দজীকে গুরুজী বুলায়া হৈ। উন্‌নে লৌটেঙ্গে, তব হম্ কুণ্ডকা তরফ যাত্রা করেঙ্গে। বেলা প্রায় আটটার সময় অভয়ানন্দজী ফিরবার পর আমরা সকলে রওনা হলাম। তাঁর সঙ্গে গুরুজীর কি কথা হল, তা জানার জন্য সন্ন্যাসীরা উন্মুখ হয়েছিলেন, তিনি কিন্তু সে বিষয়ে কোন আভাষ দিলেন না, কেবল বললেন গুরুবার মেঁ গুরুজী ফিন্ ইধর্ পধারেঙ্গে। আজ একটা মাত্র পার্থক্য দেখলাম, তাঁর নির্দেশে নূতন মন্ত্র পাঠ করতে করতে কুণ্ডের দিকে এগোতে লাগলাম। শিঙ্গা ডম্বরু যথারীতি বাজাতে থাকল। প্রথমে অভয়ানন্দজী মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকলেন, তা শুনে সমবেত কণ্ঠে আমরা গাইতে থাকলাম —

ওঁ রুদ্র দেহায়ৈ বিদ্মহে মেকলকন্যকায়ৈ ধীমহি তন্নো রেবা প্রচোদয়াৎ ॥

নর্মদার এই গায়ত্রী মন্ত্রটি পাঁচবার উচ্চারণ করা হল।

জলপ্রপাতের ধারা স্নান করতে করতে কুণ্ডের ধারে গিয়ে নিম্নলিখিত দুটি মন্ত্রও সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হল —

১। ওঁ পুণ্যাহৃতিরম্যা ত্রিদশৈঃ সুপূজিতা, ধন্যা চ মান্যা নিখিলৈর্মহর্ষিভিঃ।
ভূতেশ কন্যা জয়তাদনারতং, নান্যা বরেণ্যা মম দেবি নর্মদে ॥

সমস্ত মুনি ও মহর্ষিদের বরণীয়া, দেবতাগণ কর্তৃক সুপূজিতা, পুণ্যশীলা, অত্যন্ত রমণীয়া ভূতনাথ মহেশ্বরের কন্যা মা নর্মদা, আমরা তোমার সতত জয়ধ্বনি করছি। আমাদের ত মনে হয়, শুধু মনে হয় কেন, আমরা ভাল করেই জানি, এ জগতে একমাত্র তুমিই পূজনীয়া দেবী।

২। নমো নর্মদায়ৈ নিজানন্দদায়ৈ, নমঃ শর্মদায়ৈ শমাদ্যর্পিকায়ৈ।
নমো বর্মদায়ৈ বরাভীতিদায়ৈ, নমঃ হর্ষদায়ৈ হরং দর্শিকায়ৈ ॥

নিজানন্দ দাত্রী, আত্মজ্ঞানপ্রদায়িনী মা নর্মদা, তোমাকে আমরা প্রণাম করি। তোমার দয়াতেই আমরা শম দমাদি ষটসম্পত্তি লাভ করে থাকি। তোমাকে প্রণাম। নিয়ত বরাভয়দায়িনী মাগো, তুমি কেবল শর্মদা নও, তুমি সাধন-সমরে রক্ষাকবচদাত্রী। আত্যন্তিক শুভকারিনী মঙ্গলময়ী মাগো! মহেশ্বরের দর্শন লাভ করাবার সামর্থ্য তোমারই আছে। তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

মন্ত্র পাঠের পর সবাই 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' বলতে বলতে কুণ্ডে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পন করে ফিরে এলাম।

আজ ১লা শ্রাবণ শনিবার (১৩৬১ সাল), অথচ সারাদিনই বৃষ্টি হল না দেখে আশ্চর্য হলাম। ভাবলাম এইভাবে যদি দু চারদিন বৃষ্টি বন্ধ থাকে, তাহলে কি হবে এক জায়গায় আবদ্ধ থেকে, একলিঙ্গস্বামীর অনুমতি নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়ব। নাগফনী সম্প্রদায়ের মহেশ গিরির জমায়েতের সঙ্গে ভেটাখেড়ার জঙ্গল পেরিয়ে আমি ত চব্বিশ অবতারে পৌঁছেছিলাম। পথ ত একরকম আমার চেনা। যদি দেখি বৃষ্টির প্রকোপ কমে গেছে, তাহলে রওনা হয়ে যাবো। গতানুগতিক এক নিয়মে একই ধারায় এখানে দীর্ঘকাল বসে থাকা কোন কাজের কথা নয়। বৈকাল চারটার সময় গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে করতে এসব কথা ভাবছি, আমাকে দেখতে পেয়ে সম্বিদানন্দজী আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে আমার সিদ্ধান্তের কিছুটা আভাষ দিতেই বললেন — লেকিন্, তুমি কি করে জানলে যে আষাঢ় মাসেই বর্ষা শেষ হয়ে গেল? আজ ত সবে শ্রাবণ মাসের পয়লা, পাহাড়ী অঞ্চলের চরিত্র তোমার জানা নাই, এখানকার বর্ষার প্রকৃতিও যে কি রকম রহস্যময় সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নাই। এ বৎসর চন্দ্র রাজা গুরু মন্ত্রী। চন্দ্র রাজা হলে কি ফল হয় জান কি? জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে যে বৎসর চন্দ্র রাজা হন তার ফল হল —

সর্বশস্যাময়ী পৃথ্বী মোদন্তে সর্বতঃ প্রজাঃ।
সুভিক্ষঞ্চ সুবৃষ্টিশ্চ যত্রাব্দে চন্দ্রমা নৃপঃ॥

এর অর্থ ত বুঝতেই পারছ। সুবৃষ্টি হবে, সুবৃষ্টি না হলে পৃথ্বী সর্বশস্যাময়ী হবে কি করে? তোমাদের বাংলাদেশে যে খনার বচন বহুল প্রচলিত, সে খনার বচন অনুসারেও এ বৎসর বৃষ্টি হবে, অতিবৃষ্টি! খনার বচন কখনও ভুল হয় না। সেই খনার বচনে আছে, রবিবার দোষে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয়। এ বৎসরের পঞ্জিকা আমি দেখেছি, এই শ্রাবণ মাসে পাঁচটা রবিবার পড়েছে। এ সম্বন্ধে খনার বচন — পাঁচ রবি মাসে পায়, ঝরা কিংবা খরায় যায়। কিন্তু খরা যে হবে না, ঝরা অর্থাৎ অতিবৃষ্টি হবে তার কারণ, গতকাল পূর্ণিমার রাতে আমি তোমার কাছ হতে ফিরে যাবার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছি, পূর্ণচন্দ্রের কাছাকাছি একটি তারা জ্বলজ্বল করছিল, সে সম্বন্ধে খনার বচন —

চাঁদের সভার মধ্যে তারা।
বর্ষে পানি মুষলধারা॥

আষাঢ় মাসেই বৃষ্টির যে নমুনা দেখেছ, এই শ্রাবণ মাসে দেখবে তার পাঁচগুণ বৃষ্টি হবে। অতএব বৎস! রহু ধৈর্যং। কেন, আমার সঙ্গ কি তোমার ভাল লাগছে না? আমি বললাম

সে কি কথা? এখানে এসে আপনাকে না পেলে, আমার মনে হয় বর্ষার ভয়ে আমি কিছুতেই এই জায়গায় টিকতে পারতাম না। পরিক্রমায় অঙ্গ হিসাবে ধাবড়ী কুণ্ড দর্শন করতে হয়, তা দর্শন করেই তদ্দণ্ডেই আমি ফিরে যেতাম। যত কষ্টই হোক, আমার চেনা জায়গা, চব্বিশ অবতারে ফিরে গিয়ে বর্ষাকালটা সেখানেই কাটাতাম।

আমার কথা শুনেই তিনি মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন — চব্বিশ অবতারের প্রতি তোমার টানের কথা হম্ অচ্ছিতরেসে জানতা হুঁ। এখানকার স্থানের প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র টান নাই , তোমার টান চব্বিশ অবতারের সেই বাঙ্গালী ভৈরবের প্রতি। এইবলে তিনি হাতজোড় করে সেই ভৈরবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। আমি অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — আপনি সেই পাগলা সাধুকে চেনেন?

— থোড়াসা। লেকিন্ উন্‌কো 'সাধু' কহনা ঠিক নেহি। উনোনো সাধুয়োঁকা সাধু, পূজনীয়, বরণীয় সাধু হ্যায়। উনোনে শ্মশানের ভৈরব হ্যায়।

— ঐ নিত্য ভাবোন্মাদ মহাত্মার সম্বন্ধে আরও কি জানেন দয়া করে বলুন।

বারবার পীড়াপীড়ি করায় তিনি বললেন — উনি জন্ম থেকেই মুক্ত পুরুষ। বাল্যকাল হতেই উনি ভাবোন্মাদ অবস্থা লাভ করেছিলেন। ওঁর জন্ম তোমাদের বাংলাদেশে চব্বিশ পরগণার কোন গ্রাম, বোধহয় নৈহাটিতে। সেখানকার লোকেরা ওঁকে 'জটে পাগলা', কেননা ওঁর মা বাবা নাম রেখেছিলেন — জটাধারী। জটাধারী হতে 'জটে '। ব্রাহ্মণ শরীর। এক রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধুর সঙ্গে উনি গৃহত্যাগ করেন। সেই সাধুর মৃত্যুর পর উনি অযোধ্যা ত্যাগ করে কাশীতে এসে পৌঁছান। বিশ্বনাথের দয়ায় মণিকর্ণিকার ঘাটে তিনি শৈবাগম দর্শনের মহাশৈব স্বামী মগ্নানন্দ সরস্বতীর দর্শন লাভ করেন। তাঁর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে মনিকর্ণিকার ঘাটের এক গুহায় উনি দিনের পর দিন সমাধিস্থ হয়ে পড়ে থাকতেন। ওঁর সন্ন্যাস নাম ছিল সোমানন্দ সরস্বতী। ওঁর গুরু ওঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন — আলানান্মুক্তো গজঃ অর্থাৎ আলান বা গজবন্ধনস্তম্ভ হতে মুক্ত গজ। গজ বন্ধনস্তম্ভের ভাবার্থ সংসার-চক্র। চারধাম পরিক্রমার সময় আমি যখন বদরীনারায়ণে ছিলাম, সেই সময় আমার সঙ্গে মগ্নানন্দজীর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম যে অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীর রক্ষক স্বয়ং নন্দীকেশ্বর ভৈরব তোমার ঐ পাগলা সাধুকে দর্শন দিয়ে এই ওঁকারেশ্বর ক্ষেত্রে আসতে বলেন। সেই থেকে উনি চব্বিশ অবতার হতে সীতামায়ীর জঙ্গল পর্যন্ত যদৃচ্ছাক্রমে সানন্দে বিহার করে বেড়াচ্ছেন। বিলকুল মুক্তজীব, সর্বজ্ঞ, প্রকৃত তত্ত্ববিদ্। সাংখ্যপ্রবচনের ৩। ৮০ নম্বর সূত্রে আছে — চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ অর্থাৎ যেমন কুম্ভকারের কর্মনিবৃত্তি হলেও পূর্বকৃত কর্মের বেগবশতঃ কিয়ৎকাল পর্যন্ত স্বয়ংই চক্রভ্রমণ করে, সেইরকম তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও মহামুক্ত মহাজ্ঞানীকেও প্রারব্ধ কর্মনাশের জন্য কিছুকাল পর্যন্ত শরীর ধারণ করতে হয়। পাগল সেজে ঐ মহাপুরুষ সেই কর্মটুকু ভোগেরই অভিনয় করে চলেছেন। আমাদের গুরুজীও তাঁকে খুব মান্য করেন। আমাদের গুরুজীর কাছে নর্মদাতটের অনেক ঋষি মুনি সূক্ষ্ম শরীরে এসে থাকেন। এ আমার নিজস্ব অনুভব। তুমি যদি এর কোন ব্যাখ্যা চাও বা প্রমাণ করতে বল তা পারব না। পহেলেই হম্ বোল দিয়া জো ইহ হমারা নিজস্ব অনুভব। অনুভবের কোন ব্যাখ্যা নাই।

একবার গুরুজীর হুকুমে আমরা ঐ মহামুক্ত মহাপুরুষকে স্থূলে দর্শন করবার জন্য দল বেঁধে গিয়েছিলাম। চব্বিশ-অবতারে তাঁর তালপাতার ঝোপড়াতে দর্শনও পেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে দেখতে পেয়ে নানারকম দুর্বোধ্য ভাষায় বকতে বকতে কুটীর থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেছলেন। পলায়মান তাঁর পৃষ্ঠদেশ দেখতে দেখতে আমরা সকলেই যে যার ইষ্টমূর্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। বেলা দশটার সময় এ ঘটনা ঘটেছিল। বেলা একটার আমাদের ধ্যান ভেঙেছিল। ধ্যান ভাঙতে দেখি কুটীর শূন্য, তিনি ফেরেন নি, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের সামনেই একটা করে কন্দমূল এবং এক ভাঁড় করে দুধ আমাদের ভিক্ষার জন্য প্রস্তুত আছে। আমরা তাঁর প্রদত্ত ভিক্ষা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করে ধাবড়ী কুণ্ডে ফিরে এসেছিলাম সন্ধ্যাবেলা। কেবল অভয়ানন্দজী আমাদের সঙ্গে যান নি। তিনি এখনে গুরুসেবা ছেড়ে কোথাও যান না। আমরা ফিরে এসে দেখি, আমাদের মুখে তাঁর সমাচার শোনার জন্য গুহা থেকে নেমে এসে পাকশালার কাছে একটি পাথরের বেদীতে স্বয়ং গুরুজী বসে আছেন। এই ঘটনা থেকেই, লেকিন্ সমঝ লিজিয়ে ইন্ দোনোকো ক্যাতনা ভাব ঔর মহব্বত্ হৈ।

গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেই কখন যে অন্ধকার হয়ে গেছে বুঝতেই পারি নি। এবার তাঁর হাত ধরে গুহাতে ঢুকলাম। তাঁকে আসনে বসিয়ে মোমবাতি জ্বাললাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে প্রথমে গুণ্ গুণ্ করে, পরে স্বরকে উচ্চ, উচ্চতর গ্রামে তুলে উদাত্ত কণ্ঠ গাহিতে লাগলেন —

ওঁ অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বম্। উত্তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ।
অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান বয়মুত্তরেমাভি বাজান্।।

এই একই ঋক্‌মন্ত্র বিশুদ্ধ স্বর ও ছন্দে উচ্চারণ করতে লাগলেন বারবার। যেমনই বিশুদ্ধ উচ্চারণ তেমনই কণ্ঠমাধুর্য! যে কোন বেদমন্ত্র তার স্বর ও ছন্দানুযায়ী উচ্চারণ করতে পারলে, নিজের গুণেই তা স্বাভাবিকভাবেই সংগীতের রূপ নেয়। আমি মোহিত হয়ে গেলাম তাঁর বেদগান শুনে। সহসা গান থামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন — লেকিন্ কহিয়ে ত ইহ কোন সা বেদমন্ত্র হৈ? কাঁহা হৈ?

— আমার যতদূর মনে পড়ছে এটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত পঞ্চাশ নম্বর সূক্তের কোন মন্ত্র। ঋকের নম্বর বলতে পারব না।

— লেকিন্ থোড়াসা ভুল হো গিয়া। মন্ত্রটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত সন্দেহ নাই , তবে এটি ৫৩ নম্বর সূক্তের ৮ নম্বর ঋক্। এটির ছন্দ জগতী। বলত, এই ঋক্‌মন্ত্রের ভাবার্থ কি ? ঋষি এখানে কি বলতে চাচ্ছেন?

তাঁর গান শুনতে শুনতেই আমি মন্ত্রার্থ মনন করেছিলাম, তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম — এখানে ঋষি বলছেন — উপলবন্ধুর জীবনের নদী বয়ে চলেছে — চল বন্ধুগণ! উৎসাহের সঙ্গে গাত্রোত্থান কর, সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। ঊর্ধ্বপথের সহযাত্রী ভাইসব, চলা বন্ধ করো না; এগিয়ে চল, এগিয়ে চল — যা অমঙ্গল, যা অকল্যাণ তাকে এখানে ফেলে রেখে আমরা শিবময় মঙ্গলময় সাফল্য এবং বিজয়ের পথে যাত্রা করব।

— বহোৎ আচ্ছা। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা দেবতাবৃন্দ, তাঁরাই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা। এই মন্ত্রে গভীরভাবে ডুব দিলে তাঁদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং আশয় আমাদের কাছে স্পষ্টতই অভিব্যক্ত হয়। দেবতারা মানুষের কাছে চান — অতন্দ্র সাধনা, অতন্দ্র কর্ম। মানুষের অন্ত

শতোত্তর হোক বা তারা শতায়ুই হোক, তাকে কাজ করেই জীবনযাপন করতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষ পূজনীয় বৈদিক ঋষিরা প্রমাদ এবং আলস্যকে ঘৃণা করতেন। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৩৩ নম্বর সূক্তের একাদশ মন্ত্রে ঋষি বামদেব সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন — ন ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ অর্থাৎ কর্মে যে ক্লান্ত নয়, দেবতারা তারই বন্ধু হন। ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন কর্মই যজ্ঞ, অনলস অধ্যাবসায়ই তপস্যা। প্রগাথ কান্ব ঋষির প্রার্থনা শোন —

ত্রাতারো দেবা অধিবোচতা নো মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ।
বয়ং সোমস্য বিশ্বহপ্রিয়াসঃ সুবীরো সো বিধতমা বদেম॥

(৮ম।৪৮সূ।১৪)

হে পরিভ্রমণকারী দেবগণ! তোমাদের আশীর্বাদে আমাদের জীবন ধন্য হোক, পুণ্য হোক। নিদ্রা এবং জল্পনা যেন আমাদেরকে গ্রাস না করে ; অক্লান্তকর্মা কর্মী হয়ে তোমাদের যেন প্রিয় হতে পারি, বাক্-বৈদগ্ধ্যে পটু হয়ে যেন প্রশংসা লাভ করতে পারি।

এক কথায়, কাজ, কেবল কাজ, চলা, কেবল চলা — এই ছিল বৈদিক ঋষিদের লক্ষ্য এবং আদর্শ। ধনলাভ ও জয়লাভ, সিদ্ধি এবং ঋদ্ধিলাভ দুই-ই করব নিরন্তর ঋতের পথে, সত্যের পথে। বুধ্যেম শরদঃ শতম্। রোহেম শরদঃ শতম্। জীবন আরোহণ — ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে উর্ধ্বে আরোহণ নব নব বোধ — নব নব তেজে দীপ্তিমন্ত প্রকাশই সৎজীবনের সত্যজীবনের কাম্য। কর্মহীন বিশ্রাম মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স্ নয়। তাঁরা বলে গেছেন — 'শুধু চলা শুধু চলা দিক্ হতে দিগন্তরে নব নব বাণীর সন্ধানে।'

সম্বিদানন্দজী এইবার নিজের গুহায় যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখি, সমস্ত পর্বত প্রান্তর অন্ধকারে ঢেকে আছে। ভাবলাম, আজ ত কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া, একটু পরেই চাঁদ উঠবে। সম্বিদানন্দজী ইচ্ছা করলে আরও দু'দণ্ড আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন, অন্যদিন ত তিনি কমপক্ষে রাত্রি নটা দশটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে গল্প করে থাকেন। নিজেই আবার ভাবছি এতটা আশা করা আমার পক্ষে অন্যায়, কারণ আমি সাধনভজনহীন লোক, স্বাভাবিক ভাবে আমি আড্ডাপ্রিয় বাঙালীদেরই একজন, যতক্ষণ আড্ডা পাই, ততক্ষণই মজা; বিশেষ এই বিদেশে একা আছি বলে এই রসিক, হাস্যপরিহাসপ্রিয় সাধুর সঙ্গ যতক্ষণ পাই, ততক্ষণই আনন্দে সময় কেটে যায়। কিন্তু এই মহাত্মাও একজন উচ্চকোটির যোগী। অন্তরঙ্গ সাধন ছেড়ে বৃথা বাক্যালাপে তিনি সময় কাটাবেন কেন?

যখন বুঝলাম যে এতক্ষণে তিনি তাঁর গুহায় ঢুকে গেছেন, আমি আর বাইরে না দাঁড়িয়ে গুহায় ঢুকে চুপ করে বসে রইলাম। এত তাড়াতাড়ি শুয়ে কি করব। একটু পরেই মনে হল, বাইরে বাতাসের শব্দ বেড়েছে। বাতাসের বেগে আমার দক্ষিণমুখী গুহার পর্দাটা বেশ জোরে দু একবার নড়ে উঠল। দূরে যেন মনে হল, মেঘ ডাকছে গুড়্গুড়্ শব্দে।

ধীরে ধীরে উঠে গুহার পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি মারলাম। দেখলাম সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘ ধীরে ধীরে ঘণীভূত হয়ে আসছে। বাতাসের বেগও ক্রমশঃ বাড়ছে। হঠাৎ দূরে কোথাও বাজ পড়ল কড়্-কড়্-কড়্-কড়াৎ। বাজের শব্দে চমকে গিয়ে আমি মুখটা সরিয়ে নিলাম।

— লেকিন্ ডরো মৎ, ডারো মৎ। বাইরে বেরিয়ে এস হে। ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির এই ধাবড়ী কুণ্ডে বর্ষার আকাশ দিনেই হোক রাত্রেই হোক, কি রকম বিচিত্র রূপ ধারণ করে তাও

একটা দেখার মত জিনিষ! আমি তোমাকে সেই দৃশ্য দেখানোর লোভ সংবরণ করতে পারলাম না, তাই আবার তোমার কাছে ফিরে এলাম।

সচ্চিদানন্দজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই আমি ততক্ষণে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। তিনি আমার হাত ধরে আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দুবার তিনবার ধরে বলতে লাগলেন — কহং অবিরল বিলোল ঘুন্নন্ত বিজ্জুলতা বিলাস মংডিদেহিং মত্ত মোরকণ্ট সামলেহিং ওখরী অদি নমোঙ্গণং জলহরেহিং।

— কুছ্ সমঝমেঁ আতী হৈ?

আমি বললাম, না আপনার এই বিদ্ঘুটে ভাষার বর্ণ-বিসর্গও বুঝতে পারছি না, এটা কি সংস্কৃত?

—'নেহি জী এ ভাষা সংস্কৃত নয়। এটা সংস্কৃতের প্রাকৃত রূপ। যখন আমাদের দেশে সংস্কৃতই প্রধান ভাষা ছিল, তখন শিক্ষিত লোকেরা আর্যভাষা সংস্কৃতেরই কিঞ্চিৎ বিকৃত রূপ — প্রাকৃত ভাষাকেই কথ্যভাষা হিসাবে ব্যবহার করতেন। এখনও যেমন বাংলা বা হিন্দী ভাষার বিশুদ্ধ রূপ বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক রূপ নিয়েছে, তখনও সেইরকম ছিল; সে যুগে সংস্কৃতের যে আঞ্চলিক রূপ কথ্যভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তারই আমরা নাম দিয়েছি প্রাকৃত।

এইমাত্র যে আমি প্রাকৃত ভাষায় কথা বললাম, তার বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ হল — কথম অবিরল-বিলোল-ঘূর্ণমান্ বিদ্যুল্লতা বিলাসমণ্ডিতৈঃ মত্ত ময়ূরকণ্ঠশ্যামলৈঃ অবস্তীর্যতে নভোঙ্গনং জলধরৈঃ।

হাঁ করে আমার কথা গিলছ শুধু, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, তবেই ত দেখতে পাবে ঐ সংস্কৃত বা প্রাকৃতে যে কথা বলা হয়েছে, তার প্রকৃষ্ট জীবন্ত রূপ আকাশ-পটে আঁকা হয়ে গেছে। ঐ উক্তির শব্দার্থ হচ্ছে — মেত্তময়ূরের স্কন্ধের মত কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণমেঘে সমস্ত আকাশ ব্যপ্ত হয়ে গেছে — বিদ্যুতের রেখায় সেই মেঘমালা সজ্জিত, তার থেকে অবিরাম ক্ষণিকের দীপ্তি ঝলসে উঠছে।'

আমি দেখলাম, সত্যিই আকাশ ঘন জমাট কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, মেঘের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ ঘনঘন ঝলসে উঠছে বলে সেই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের রঙ দেখাচ্ছে কামোন্মত্ত ময়ূরের বহু বিচিত্র কাঁধের মত! গুড়গুড় শব্দে আবার বাজ পড়ল — কড়্-কড়্-কড়াৎ!

সচ্চিদানন্দজী বললেন — এখন পালাও, নিজের গুহাতে গিয়ে ঢুকে পড়, আমিও নিজের গুহাতে পালাচ্ছি, এখনই প্রবল বৃষ্টি সুরু হয়ে যাবে। কাল তোমাকে ঐ প্রাকৃত উক্তির বক্তা কে সে সম্বন্ধে সব বুঝিয়ে বলব।

তিনি দৌড়ে চলে গেলেন, আমি তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকলাম। প্রবল বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। গুহাতে বসেই বৃষ্টির তোড় অনুভব করতে পারছি। আরও প্রায় ঘণ্টাখানিক জেগে ছিলাম কিন্তু একই বেগে ঝম্ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে শুনতে পেলাম। গুহার পেছনে যে জঙ্গল সেখান থেকে বিচিত্র সব শব্দ ভেসে আসতে লাগল। দুড়্দাড় শব্দে সমানে পাথর গড়িয়ে পড়ছে, তারও শব্দ শুনতে পাচ্ছি। শেষরাত্রে যখন ঘুম ভাঙল, তখনও দেখছি, বাইরে বৃষ্টির বিরাম নাই, সমানে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে একদল বন্য মোরগ ডেকে উঠল। বুঝলাম রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। কম্বলের উপর বসে থেকে সকালের প্রতীক্ষা করতে থাকলাম।

বুঝতে পারছি, আজ সূর্যের মুখ দেখতে পাব না। তবুও সকাল হয়ে গেলে চারিদিকে একটা স্বচ্ছতা ফুটে উঠবে। বাইরের প্রকৃতিকে নিজের চোখে দেখতে পেলেও কতকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। পর্দাটা উঠিয়ে দিয়ে এসে চুপ করে বসে রইলাম। ধীরে ধীরে বৃষ্টির প্রকোপ কমে এল। বেলা বোধহয় আটটার সময় বৃষ্টি থামল। গুহার প্রবেশদ্বারে কান খাড়া করে রইলাম, স্নানের ঘন্টি শোনার জন্য। ঘন্টা যখন পড়ল তখন্য ঝিম্‌ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। যাইহোক আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কুণ্ডে যাবার জন্য কমণ্ডলু ও গামছা নিয়ে পাকশালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। অপরাপর সন্ন্যাসীরাও উপস্থিত হয়েছেন, শিঙা ডম্বরু বাজছে। চারদিকে ছোট বড় পাথর গড়িয়ে এসে পড়ছে, যে সব বড় বড় পাথরের চাঙড় ঢালের দিকে গড়িয়ে গেছে, সেগুলোর চাপে অনেক গাছের শাখা-প্রশাখা ভেঙে ভেঙে পড়েছে। চারদিকে একটা যেন লণ্ডভণ্ড অবস্থা। বুঝলাম কাল রাত্রে শুধু প্রবল বর্ষণই হয় নি, ঝড়ের তাণ্ডবও বয়ে গেছে। যাইহোক, ধাবড়ী কুণ্ডের পথেও দেখছি, পথের উপর পড়ে আছে অনেক ছিন্ন ভগ্ন ডালপালা। সন্ন্যাসীরা লাঠি দিয়ে সেগুলো হটিয়ে হটিয়ে এগোতে লাগলেন। আজ অভয়ানন্দজী চারটি সংস্কৃত মন্ত্রের ধুয়া ধরলেন, আমরা তাঁর উচ্চারিত নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করতে করতে এগোতে লাগলাম —

১। পথ্যুত্তরে বিষ্ণুপদী বিরাজিতে, কুরুস্থলে ব্রহ্মবধূ সরস্বতী।
মধ্যপ্রদেশেহঘহরী চ শাঙ্করী, তনোতি মোদং কিল নর্মদা সদা॥

উত্তরপ্রদেশে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতো গঙ্গা এবং কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী দেবী নদীরূপে প্রবাহিতা হয়েছেন। আর এই মধ্যপ্রদেশে স্বয়ং শংকর কন্যা (শাংকরী) নর্মদারূপে প্রকট হয়ে সকলের আনন্দ বর্ধন করে চলেছেন।

২। যুগং কলিং ঘোরমিমং য ইচ্ছেৎ দ্রষ্টুং কদাচিৎ ন পুনঃ দ্বিজেন্দ্রঃ।
স নর্মদাতীরং উপেত্য সর্বং সম্পূজয়েৎ সর্ববিমুক্তসঙ্গঃ॥

যে ব্রাহ্মণ এই ঘোর কলিযুগে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে চান না, তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে এই ভগবতী নর্মদাতটে এসে একান্তমনে মহাদেবের অর্চনা করা উচিত।

৩। ভৃগুঃ কপিলঃ অত্রি চ বশিষ্ঠঃ, শতৈ সমেতৈঃ নিয়তাস্তু অসংখ্যৈঃ।
সিদ্ধিং পরাং তে হি জলাপ্লুতাঙ্গা, প্রাপ্তাস্তু লোকাৎ মরুতাং ন চান্যে॥

মহর্ষি ভৃগু কপিল অত্রি এবং বশিষ্ঠাদি অসংখ্য ঋষি এই নর্মদাতটে এসে তপস্যা করে পরমাসিদ্ধি লাভ করেছিলেন; অন্তঃকালে নর্মদার পুণ্যজলে সলিল সমাধিলাভ করে দিব্যধামে প্রয়াণ করেছেন।

৪। জ্ঞানং মহৎপুনাং পবিত্রং আয়ান্তি যো নিত্যবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
গতিং পরাং যান্তি মহানুভাবা, রুদ্রস্য বাক্যং হি যথা প্রমাণম্॥

যে যে বিশুদ্ধাত্মা পুণ্যশালী ব্যক্তি এই নর্মদাতটে এসে তপস্যা করতে পারেন, তিনিই পরমপদ লাভ করতে পারেন — স্বয়ং মহেশ্বর একথা ঘোষণা করেছেন। অপৌরুষেয় বেদবাণীর মত এই শিববাক্যও প্রামাণিক।

মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতেই আমরা প্রপাতের জলসিঞ্চনে স্নান করতে করতে কুণ্ডে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করে এলাম।

ফেরার পথে দেখলাম, একদল হরিণ ডালপালা ভেদ করে দ্রুত দৌড়চ্ছে এবং তাদেরকে তাড়া করে আসছে দুটো বাঘ। এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে অভয়ানন্দজী হুঙ্কার তুললেন — হর নর্মদে। আমরাও সমস্বরে রব তুললাম — হর নর্মদে। সেই শব্দে বাঘ দুটো গতিপথ পরিবর্তন করে ঘনজঙ্গলের দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। সূর্য আত্মপ্রকাশ করেছেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় সচ্চিদানন্দজীর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন — লেকিন্ দেখ্যা ক্যায়সা বর্ষণ হুয়া। আপ্ শোচতে থে, আষাঢ় মাস খতম্ হো গয়া, বর্ষণ মেঁ ছেদ ঘটেগা!

খাওয়ার পর গুহাতে যখন পৌঁছলাম, তখন আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাসলেও আকাশ বেশ পরিষ্কার, পর্বত-প্রান্তর-অরণ্য সবই রোদে ঝলমল করছে। তবে পর্বতের উপর দিয়ে চারদিক থেকে জল ঝর্ণার আকারে গড়িয়ে পড়ছে। গতরাত্রে জলের ঝাপটায় পর্দার কিছুটা অংশ জলে ভিজে গেছল, পর্দাটা বাইরে নিয়ে রোদে দিলাম। গুহার মধ্যেও বসে এখানকার কিছু কিছু ঘটনা ডায়েরীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করলাম। বেলা তিনটা নাগাদ বাইরে একটা পাথরের উপর এসে বসলাম। চারদিক স্যাঁতস্যাতে ভিজে আবহাওয়ার মধ্যে রোদটা বেশ মিষ্টি লাগছে। আমাদের বাংলাদেশে বৃষ্টির পর মাটি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাই কিন্তু এখানে প্রবল বর্ষণের পর রোদ উঠতেই পাথর এবং বনের নাম না জানা ফুলের একটা ভিজা ভিজা সুগন্ধ ভেসে আসছে। একগুচ্ছ রজনীগন্ধা বা গোলাপকে একসঙ্গে জলে ফেলে রাখলে সেই বাসি ফুলের গন্ধ যেমন হয়, এই গন্ধও কতকটা সেইরকম ; বা আরও ঠিক করে বুঝাতে গেলে বলতে হয় কোন প্রস্তর নির্মিত দেবমন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকলে ফুলে ফুলে সুসজ্জিত দেবমূর্তি থেকে যেমন গন্ধ ভেসে আসে, এখানকার পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেইরকমই গন্ধ ভেসে আসছে।

সচ্চিদানন্দজী বোধহয় আমাকে দূর থেকে একা একা রোদে বসে থাকতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কিছুক্ষণ পরেই আমার কাছে এসে বললেন — লেকিন্ হমারা সাথ মেঁ আইয়ে ত । তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে একটা উঁচু পাথরের ঢিপির উপর দাঁড় করালেন। তারপর উত্তর পশ্চিম কোণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আঙুল বাড়িয়ে আমাকে বলতে লাগলেন — ওহি দূর মেঁ গাঁও দেখাই দেতা হৈ, উসকা নাম পুনাশা হৈ। পুনাশা গাঁও সে সাত মীল (মাইল) দূরী পর ঔর এক গাঁও হৈ, উস্কা নাম আয়ফল হৈ। উঁহাসে ছয় মীল আগে সাতমাত্রা তীর্থ হৈ। সাতমাত্রামেঁ বারাহী, চামুণ্ডা, ব্রাহ্মাণী, বৈষ্ণবী, ইন্দ্রানী, কৌমারী ঔর মাহেশ্বরী ইন্ সপ্তামাতৃকা মন্দির হৈ। সাতমাত্রা কী পাশ মেঁ জো মহল্লা হৈ উসকা নাম কোটখেড়া। কোটখেড়াকে সমীপ পুরাণে কিল্লা খণ্ডহরকা ধ্বংশাবশেষ হৈ ....

আমি তাঁকে আর কথা বলতে দিলাম না। আমি তাঁর কথার উপর কথা চাপিয়ে বলতে লাগলাম — ঐ সব কথা এখন শুনে আমার কি লাভ ? আপনি ঝটপট আঙুল নেড়ে নেড়ে যে সব স্থানের নাম একের পর এক অনর্গল বলে চলেছেন, আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি, ঐগুলো সবই নর্মদার দক্ষিণতটে। তা, আমি যখন উত্তরতটের পরিক্রমা শেষ করে পুনরায় দক্ষিণতট দিয়ে পরিক্রমা করে অমরকন্টকের দিকে যাবো, তখন ত ঐসব স্থান, মন্দির ও তীর্থ নিজের চোখেই দেখতে পাবো।

—'লেকিন্, লেকিন্ তব ভি শুনিয়ে। সাতমাত্রা হতে আড়াই মাইল আগে কাবেরী-সংগম। এখানে কাবেরী নদী এসে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হলেও ওঁকারমান্ধাতা পাহাড়ের কিনারে কিনারে দেড় মাইল পর্যন্ত গিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র বজার রেখে বেঁকে গেছে উত্তরদিকে। তারফলেই ওঁকারেশ্বর একটা শৈল-দ্বীপে পরিণত হয়েছে। বলতে ভুলে গেছি, কাবেরী যেখানে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে তার নাম কুবের ভাণ্ডারী তীর্থ। এখানে কুবের তপস্যা করে যক্ষপতি হয়েছিলেন। কাবেরী-সংগম, চণ্ডবেগা সংগম, এরণ্ডী সংগম এবং পিতৃতীর্থ বা ব্রহ্মতীর্থ। এইসব কারণে কুবের ভাণ্ডারী তীর্থ মহাতীর্থ হিসাবে সাধুসন্তদের কাছে একটা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।'

আমি পুনরায় বাধা দিয়ে বললাম — আমি ওঁকারমান্ধাতা পরিক্রমা করেই এখানে এসেছি। আমি ওঁকারেশ্বরের রামদাস নামক জনৈক মহাত্মার সঙ্গে ঐ সব তীর্থ পরিক্রমা করে এসেছি, কাজেই নূতন করে ঐ সব তীর্থ সম্বন্ধে আর কিছু শোনার আগ্রহ নাই।

— লেকিন্ তব ভি হমারা পাশ উনকা কহানী শুনিয়ে।

কি জ্বালাতন! আমি শুনতে চাচ্ছি না, তবুও তাঁর বাক্যস্রোত থামল না! তিনি বলে চললেন — 'লেকিন্ বারাহী-সংগমের উৎপত্তি রহস্য হচ্ছে, ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির তপস্যাজনিত ক্লান্তিতে যে স্বেদক্ষরণ হয়েছিল, সেই তেজ বা স্বেদ থেকে যেমন নর্মদার উৎপত্তি তেমনই ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহ রূপ ধারণ করে প্রলয়জলে নিমগ্ন পৃথিবী হতে বেদ উদ্ধার করেছিলেন, তাঁর সেই শ্রমজনিত স্বেদ হতেই বারাহী নদীর উৎপত্তি। এই তীর্থে স্নান দান খুবই পুণ্যজনক।

চণ্ডবেগা সংগমের কহানী এই যে স্বারোচিষ মন্বন্তরে চণ্ডসেন নামক অয্যোধ্যাতে সূর্যবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কামুক ছিলেন। শিকার করার উদ্দেশ্যে বনে প্রবেশ করে তিনি ঘুরতে ঘুরতে নর্মদা-তটস্থ মহর্ষি শাণ্ডিল্যের আশ্রমে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি ঋষি-পত্নীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। কামান্ধ রাজা সরাসরি মহর্ষির কাছে গিয়ে বলেন — 'মহর্ষি ইহ্ ললনা বিশ্বকী ললামভূতা সৌন্দর্য কী আকর হৈ, ইহ্ ত রাজমহল শোভিত করনে কি যোগ্য হৈ। আপ্ ত বুঢ্ঢা হো গয়ী। তপস্যা মেঁ নিমগ্ন রহ্না আপকা উচিত কার্য হৈ। ইহ্ ললনাকো মুঝে দিজিয়ে। ইস্কে বদলে মে মৈঁ আপকো বহুত ধনরত্ন দুংগা।'

চণ্ডসেনের এই ধৃষ্ট উক্তি শুনে মহর্ষি চণ্ডসেনকে অভিসম্পাত করেন — তু চণ্ডাল জৈসা বর্তাব কর রহা হৈ, জা, চণ্ডাল হো জা। মহর্ষির শাপে রাজা তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাঁর চণ্ডালের আকার দেখে তাঁর রাণীরা এবং প্রজাবৃন্দ তাঁকে ত্যাগ করেন। তখন রাজার চৈতন্যোদয় হয়। অয্যোধ্যা হতে ফিরে এসে হৃতসর্বস্ব বিকৃতাঙ্গ রাজা নর্মদা-তটে মহর্ষি শাণ্ডিল্য এবং তৎপত্নী মহাসতী সৌদামিনীর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তাঁরা করুণার্দ্র হয়ে নির্দেশ দেন, চণ্ডবেগা সংগমে চণ্ডকেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করে শিবের তপস্যা করতে এবং তাঁদের নির্দেশানুসারে রাজা পুনরায় নিজের রূপ এবং রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন। সেই থেকে চণ্ডবেগা সংগম পাপনাশিনী তীর্থ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আমি এবার বিরক্তিতে ফেটে পড়লাম। বললাম — আপনি দয়া করে থামবেন কি? পুরাণের এইসব গালগল্পে বিশ্বাস করি না। পর্দাটা শুকিয়ে গেছে, আমি এটা যথাস্থানে রাখতে যাচ্ছি। আপনি পাহাড়ের সঙ্গে কথা বলতে থাকুন।

এই বলে আমি পর্দাটা নিয়ে গুহার ভিতরে চলে এলাম। আসতে আসতে শুনতে পেলাম, তিনি সশব্দে হাসতে হাসতে বলছেন — তুমহারা দিমাগ্ আভিতক টেরাবাঁকা হৈ। নর্মদামায়ী আপ্‌কো সিধা করেগা।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আজ আর বৃষ্টি হবে না। মোমবাতিটা জ্বেলে বসে আছি। ভাবছি, আজ হয়ত মহাত্মা আর আসবেন না। মনে অনুশোচনা জাগছে, আমার টেরাবাঁকা কথাবার্তায় হয়ত তিনি বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। সন্ধ্যার পরেই প্রসন্ন মূর্তিতে ঘরে ঢুকলেন মহাত্মা। আমি আসন পেতে দিলাম। তিনি বসতে বসতেই বললেন — তোমার মনে হয়ত কোন প্রশ্ন আছে, আমি তা বলবার সুযোগ না দিয়েই নিজের আবেগেই বক্‌বক্ করে গেছি। তাই তোমার গোস্যা হয়েছে। মনের প্রবৃত্তিবেগ বড় কঠিন আপদ্। আমাদের মধ্যে যে অহং চেতনা আছে , সে চায়, আমার নিজের কথাটাই আগে বলি।

— এ আপদের হাত থেকে কিভাবে মানুষ রক্ষা পেতে পারে?

— লেকিন্, মনকে উলটিয়ে দাও। মনকে উলটিয়ে দিলে হবে নম অর্থাৎ ন মম। এই মমত্বকে বিসর্জন দিয়ে বলতে হবে নর্মদায়ৈ নমো নমঃ কিংবা গোবিন্দায় নমো নমঃ। মনকে নিয়ত এভাবে অভ্যাস করালে, অহরহ ইষ্টমুখী করতে পারলে তবেই এই আপদ অর্থাৎ মনের সহস্রমুখীন্ বৃত্তি ধীরে ধীরে লয় পাবে। এখন বল, তুমি আমার কাছে কি জানতে চাও।

— গতকাল আপনি আকাশে মেঘের ঘনঘটা এবং মুহুর্মুহু বজ্রবিদ্যুতের হানাহানি দেখে দুর্বোধ্য প্রাকৃত ভাষায় যে উদ্ধৃতিটি আমাকে শুনিয়েছিলেন সেই উক্তির বক্তা কে? কোন বই-এ বর্ষার এইরকম বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে? কে সেই মহান্ কবি, যা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীও তুলির আঁচড়ে এত সহজে হয়ত ফোটাতে পারবেন না, শুধুমাত্র কতকগুলি সুনির্বাচিত শব্দের প্রয়োগেই কথার ফুলঝুরিতে সেই অপরূপ চিত্র অবলীলাক্রমে ফুটিয়ে তুলেছেন?

— সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের পরেই যাঁর স্থান, ভারতের সেই বরেণ্য কবি ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নামক সংস্কৃত নাটক হতেই আমি ঐ উদ্ধৃতিটি তোমাকে শুনিয়েছিলাম। নাট্যকারের সৃষ্ট জনৈকা বিদ্যাধরীর উক্তি এটি। নাটকের গল্পাংশ তোমাকে একটু শোনাই। তাহলেই তোমার পক্ষে বোঝা সহজ হবে। ভবভূতি বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ নাটকটি রচনা করেছিলেন। গল্পাংশ হল, অযোধ্যার প্রজারা সীতা-চরিত্রে সন্দিহান, দুর্মুখের মুখে এই সংবাদ জানতে পেরে রামচন্দ্র সীতাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই বাল্মীকির তপোবনে বিসর্জন দেন। সেখানেই কুশ ও লব জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি বাল্মীকির অস্ত্র শিক্ষায় উভয় পুত্রই বালক বয়সেই শৌর্যে বীর্যে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেন। এইসময় রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবার ব্যবস্থা করেন। রীতি অনুযায়ী অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছুটে চলেছে, কেউ তার গতিরোধ করলেই যুদ্ধ অনিবার্য। অশ্বের রক্ষক হিসাবে লক্ষ্মণের বীরপুত্র চন্দ্রকেতু এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে অশ্বকে অনুসরণ করছেন। বিপদ ঘটল, বাল্মীকির তপোবনের সন্নিকটস্থ হতেই। লব অশ্বকে আটকালেন। সৈন্যরা অশ্বকে উদ্ধার করতে এসে অসামান্য ধনুর্ধর লবের শর নিক্ষেপে সবাই ছত্রভঙ্গ হল। চন্দ্রকেতু এগিয়ে এলেন। পরস্পর সম্পর্কে ভাই, উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্তের সম্বন্ধ। কিন্তু কেউ কাউকে চেনেন না। একই সূর্যবংশের দুই রাজকুমার সহসা ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের ক্ষত্রিয়

শক্তির পরাক্রম অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠেছে, তাঁদের বীরকর্ম দেখে দেবাসুরগণ সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত। এইসময় অন্তরীক্ষে বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী যুগলও আবির্ভূত হয়েছেন যুদ্ধ দেখতে।

ভবভূতি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, চন্দ্রকেতু আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করছেন কুমার লবকে লক্ষ্য করে। সেই অস্ত্র থেকে অগ্নিশিখা ঝলকে ঝলকে নির্গত হচ্ছে, বিদ্যাধরের মনে হচ্ছে যেন শিবের ললাটস্থিত তৃতীয় নয়ন হতে সহসা অগ্ন্যদগীরণ হচ্ছে। সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে নিরস্ত করতে লব নিক্ষেপ করলেন বারুণাস্ত্র। বারুণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ়তর মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আকাশ, অন্ধকারে ঢেকে গেল সব, প্রলয়কালীন বায়ু-সংঘাতে সেই মেঘ যেন ভীষণ গর্জন করতে থাকল।

তাই দেখে ভীতা সন্ত্রস্তা বিদ্যাধরী বলে উঠলেন — অহং অবিরল-বিলোল ঘুন্নত বিজ্জুলতা .... ইত্যাদি অর্থাৎ এ আবার কি! মত্তময়ূরের স্কন্ধের মত কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণমেঘে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত হয়ে গেছে — বিদ্যুতের রেখায় সেই মেঘমালা সজ্জিত, তার থেকে অবিরাম ক্ষণিকের দীপ্তি অর্থাৎ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে!

'আমি গতকাল মেঘের রূপ দেখে বিদ্যাধরীর ঐ উক্তি আওড়ে ছিলাম। অবশ্য বিদ্যাধরীর মুখ দিয়ে ভবভূতি তাঁর নাটকে বারুণাস্ত্রের ভীষণ রূপ বর্ণনা করেছিলেন। গতকাল মেঘের অবিকল সেই রকম প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখে বিদ্যাধরীর সেই প্রাকৃত ভাষার বর্ণনাটি মনে পড়ে গেছল। পর্বত অরণ্য নদী ও বর্ষার মহিমা, তার গম্ভীর নিসর্গ চিত্র ভবভূবতির ভাষা ছাড়া আর কিসে এমনভাবে ফুটবে বল? এই প্রসঙ্গে তোমাকে আর একটা কথা মনে রাখতে বলি। কালিদাস এবং ভবভূতির কাব্য ভাল করে পড়লেই বুঝতে পারবে — দুজনেই নিসর্গের কবি। কালিদাস তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সুকুমার ও স্নিগ্ধ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন ; লেকিন্ ভবভূতির রচনায় ফুটে উঠেছে প্রকৃতির গম্ভীর ও মহিমাব্যঞ্জক রূপ। কাজেই প্রকৃতির সেইরকম ভয়াল রূপ দেখলে, তার যথাযথ বর্ণনা দিবার জন্য আমাদেরকে বারবার ভবভূতির দ্বারস্থ হতেই হবে।

কথা শেষ করেই তিনি নিজের গুহায় ফিরবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বললেন — তোমার মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, তার ত উত্তর পেলে। এবার তোমার মন থেকে 'গোস্যা' চলে গেছে ত? বাইরে গিয়ে দেখি চল, আজ রাত্রির আকাশ কি বলছে! আমি তার সঙ্গে গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কোথাও খণ্ড খণ্ড মেঘ দলা পাকিয়ে ভেসে বেড়ালেও অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখে মনে হল, আজ রাত্রে আর বৃষ্টিপতনের সম্ভাবনা নাই। তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন। হঠাৎ আমার হাতটা ধরে তিনি আদরের সঙ্গে বলতে লাগলেন —মাঝে মাঝে অঝোরে বৃষ্টি, মাঝে মাঝে বিরতি এই হল বর্ষার চরিত্র। তবে পাহাড়ের বর্ষাকে বিশ্বাস করতে নাই, কখন যে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি নামবে, তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না । আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের এই কয়দিনে যে বৃষ্টি পড়ল, তাতেই পার্বত্য অঞ্চল দুর্গম হয়ে উঠেছে, কত জায়গায় যে ধ্বস নেমেছে তার ইয়ত্তা নাই । এখানে যখন এসেছিলে তখন ত দেখেছ, এখানে আমাদের গুহাগুলির কাছে জলের লেশমাত্র ছিল না। এখন দেখছ পর্বতের শিখর থেকে কত নালা নেমে এসেছে ছোট্ট ছোট্ট নদীর রূপ নিয়ে, বিদ্যানন্দজীর গুহার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে একটা 'ঝোরি'। তাই আমি

বলছিলাম কি, জানি আমাদের সঙ্গ হয়ত তোমার ভাল লাগছে না, তবুও মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে না দেখে তুমি এস্থান ছেড়ে যাবার সংকল্প করো না। ভাদ্রমাসের শেষপর্যন্ত এখানে থেকে যাও।

— আপনাদের সঙ্গ ভাল লাগছে না, একথা কেন বলছেন? আপনি কি আমাকে এতই বোকা ভাবেন যে, আমি কি এই সারসত্যটুকুও জানি না — সৎসঙ্গজানি নিধনান্যপি তারয়ন্তি? অর্থাৎ সজ্জনের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে যদি মৃত্যুও ঘটে তাতেও মুক্তিলাভ হয়।

— সাধু ! সাধু ! তুমি ভবভূতির ভাষাতেই আমাকে সুন্দর জবাব দিয়েছ! তোমার উদ্ধৃত অংশটি উত্তররামচরিতেরই দ্বিতীয় অঙ্কের এগার নম্বর শ্লোকে রয়েছে। আমি খুবই খুশী হয়েছি। এখন মা নর্মদাকে প্রণাম জানিয়ে গুহামেঁ লৌট যাইয়ে।

তিনি চলে যেতেই আমি মা নর্মদাকে প্রণাম করে, যেদিকে তিনি বয়ে চলেছেন সেদিকে তাকিয়ে বলতে লাগলাম — মাগো! মহামুনি মার্কণ্ডেয় থেকে আরম্ভ করে নর্মদাবাসী অপরাপর মুনি ঋষিরাও একবাক্যে বলে গেছেন যে তুমি দিব্যরূপা, তপস্যায় সিদ্ধিদায়িনী শক্তি। গুরুপূর্ণিমার দিন স্বপ্নে বাবা বলে গেলেন, যে তুমি নাকি নিরাকার ব্রহ্মের নীরাকার রূপ। সকলের সব কথাই যে সত্য, তা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করে নিয়েও আমি দুর্ভাগা তোমার সেই দিব্যরূপ কোনদিন দেখতে পেলাম না; কোনসময় বুঝতে পারলাম না যে তুমি শুধু আর পাঁচটা নদীর জলধারাই নও, ঐ বাহ্যরূপের অন্তরালে তোমার একটা তেজোময়ী জ্যোতির্ময়ী রূপও আছে! অমরকন্টক হতে ঘনঘোর মুণ্ডমহারণ্য এবং ওঁকারেশ্বর ঝাড়ি অতিক্রম করতে করতে আমি এতদূর যখন আসতে পেরেছি, তখন শূলপানির ঝাড়ি পেরিয়ে তোমার সংগমস্থল পর্যন্ত নিশ্চয়ই একদিন পৌঁছাবো, এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। লাখড়াকোটের জঙ্গলে আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে তোমাদের পিতাপুত্রী উভয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম, বন্য আদিবাসীর ছদ্মাবরণে তোমাদের রূপাভাস আমার চোখে ভেসেছিল, মহা মহাসঙ্কটকালে তোমার প্রত্যক্ষ দয়ার পরিচয়ও পেয়েছি, একথা স্বীকার না করলে আমার অপরাধ হবে। কিন্তু মাগো! একটিবার দয়া করে দেখাও না সেই রূপ, যে দেখে আমি কৃতকৃতার্থ হয়ে যাবো, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে সদম্ভে ঘোষণা করতে পারব যে, নর্মদা সত্য, তাঁর দিব্যরূপ সত্য, সত্যই তিনি রুদ্রতেজাৎ সমুদ্ভূতা, মর্ত্যজনের ক্লেশহারিণী, পাপতাপমোচনী দয়াময়ী মা!

উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এই কথাগুলি বলতে বলতেই আমার দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল। সেই নির্জন মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলাম। কান্নায় যে এত তৃপ্তি হয়, বুকখানা এত হাল্‌কা হয়, তা জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। গায়ের উড়না দিয়ে চোখ মুছে নর্মদার দিকে আবার তাকাতেই দেখতে পেলাম একটা বিমল জ্যোতির প্রবাহ বয়ে চলেছে পর্বত ভেদ করে। সেই জ্যোতির আভায় উভয়তটের অরণ্যেরও মধ্যেও আলোর আভায় দেখা যাচ্ছে! সহসা আমার মাথা ঘুরে গেল, আমি টলে পড়ে গেলাম।

ধীরে ধীরে আমার চেতনা যখন ফিরে এল, তখন ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখলাম, একটা বিরাট বাঘ আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, স্বয়ং একলিঙ্গস্বামী বলছেন — বটুকনাথ! আপ্ খাড়া রহিয়ে, হম্ অভয়ানন্দকো বুলাতে হৈ। আমি মাথা তুলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মাথা

ভীষণ ভার, সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রনা। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই একলিঙ্গস্বামী ফিরে এলেন, অভয়ানন্দজী এবং সম্বিদানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে। 'গুহাকী অন্দর মেঁ লে যাও', একলিঙ্গস্বামীর কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে আবার আমি চেতনা হারালাম।

পরদিন সকালে যখন জেগে উঠলাম, তখন চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম কতকগুলো লতা পাতা নিয়ে সম্বিদানন্দজী বসে আছেন। তাঁর হাতের কাছেই রয়েছে একটা বড় নুড়ি। তিনি আমাকে বললেন — লেকিন্, উঠিয়ে মৎ। লেট রহো। এইবলে সেই লতা-পাতাগুলোকে থেঁতো করে, আমাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে আমার ঘাড়ে মাথায় এবং হাতের কনুই-এ, যেখানে ক্ষত হয়েছিল, সেগুলিতে প্রলেপ দিলেন। আমাকে হাঁ করতে বলে একরকম লতা নিগড়ে তার রস মুখে ঢেলে দিলেন। আমি শুয়ে থাকলাম। তিনি চলে গেলেন। শুয়ে শুয়েই আমি শুনতে পেলাম, শিঙা ডম্বরু বাজছে। বুঝলাম সন্ন্যাসীরা কুণ্ডে শিবপূজা করতে যাচ্ছেন; আজ আমার আর যাওয়া হল না, নর্মদা-স্নানও ভাগ্যে ঘটল না। কমণ্ডলুতে নর্মদার জল আছে, তা দর্শন করে যে নর্মদার জল মাথায় নিব, তারও উপায় নেই। কমণ্ডলুটা আমার হাতের নাগালের বাইরে আছে, আজ আমি চলৎশক্তিহীন। সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জরিত কিন্তু হৃদয়ে একটা অপার আনন্দের অনুভূতি। গতরাত্রির ঘটনা ভাবতে ভাবতে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

এবার যখন ঘুম ভাঙলো, তখন শরীর বেশ হাল্‌কা মনে হল। হাত পা তুলে দেখলাম, সেগুলোও স্বাভাবিক, শরীরে আর ব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। এমন সময় একটা বড় কমণ্ডলু হাতে সম্বিদানন্দজী ঢুকলেন, সঙ্গে হরিস্বামী। তাঁর হাতে একটা বড় পাথরবাটি ভর্তি গরম দুধ।

— লেকিন, উঠে বস, উঠে বস। তুমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। গুরুজী হম্‌কো কভি রসিকরাজ , কভি কভি বৈদ্যরাজভি বলতে হেঁ। দেখ্যা বৈদ্যরাজকা দাওয়াই ক্যায়সা!

তাঁর কথায় আমি উঠে বসলাম। কোথাও কোন ব্যথা অনুভব করলাম না। আমি উভয় সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ করলাম। সম্বিদানন্দজী বললেন — লেও বিন্দুমেঁ সিন্ধুদর্শনবৎ হমারা কমণ্ডলুমে নর্মদামাতাজীকো দর্শন করিয়ে। এইবলে আমার মাথায় কিঞ্চিত জল ছিটিয়ে দিয়েই বললেন — হমলোগ মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপ্ত কিয়া। আপ্ দুধ পি লিজিয়ে। দুধ খাওয়ার পর হরিস্বামী চলে গেলেন। আমি বসে বসে বনজ লতাপাতার অত্যাশ্চর্য গুণের কথা ভাবতে লাগলাম। আমার ঘা এর মুখগুলো শুকিয়ে এসেছে , আঙুল দিয়ে টিপে দেখলাম ব্যথাও খুব কম। চরক সুশ্রুতের যুগে যখন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের স্বর্ণযুগ ছিল, তখন এই সব ভেষজের প্রয়োগপদ্ধতি অনেকের জানা থাকলেও বর্তমান ভারতবর্ষে এইসব লতাপাতার কদর নাই। চর্চা কম বলেই অনেকে এর ব্যবহার জানেন না।

বৈকাল চারটা নাগাদ ঝিম্‌ঝিম্ করে কিছুক্ষণ বৃষ্টি হল। সন্ধ্যার মুখে তা থেমে গেল। আমি উঠে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে গুহার মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারী করছি, এমন সময় আবার সম্বিদানন্দজী এলেন। আমার মনে সংকোচ এবং শঙ্কা জেগেছে, গতরাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে উনি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কি বলব?

কিন্তু না, তিনি সেসব প্রসঙ্গ মোটেই তুললেন না। কেবল একবার বললেন — লেকিন্, আপ্ সাংঘাতিক আদমী হৈ। ভগবানকো ভী আসন আপনে টলা দিয়া। ভগবান

একলিঙ্গস্বামীকো ভি উপরসে, আপনা আসন ছোড়কে উৎরানে পড়া!

আমি কোন উত্তর দিলাম না। তিনি মোমবাতিটা এনে আমার পিঠ ও মাথার ঘা মুখগুলো টিপে টিপে পরখ করলেন, মন্তব্য করলেন — বিহ্বাণমেঁ বিলকুল আরাম হো জাবেগা। আপ্ কুণ্ডমে জানে সেকেগা। ঔর এক বার্তা শুনিয়ে, আগামীকাল গুরুবার, ৬ই শ্রাবণ, গুরুজীর কাল বৈঠকে আসার কথা ছিল, কিন্তু এইমাত্র অভয়ানন্দজীর কাছে শুনলাম, তিনি আসতে পারবেন না, কাল নাকি প্রবল দুর্যোগের আশংকা আছে। উনি গুহা থেকে নেমে আসবেন দু সপ্তাহ বাদে ২০ শে শ্রাবণ।

— কেন দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকলেও তিনি ত সেদিনকার মত দুঘন্টার জন্য বৃষ্টি রূখে দিতে পারতেন!

— নেহি জী। প্রকৃতি-বশিত্ব যাঁদের করায়ত্ত থাকে, তাঁরা সহসা প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করেন না, প্রাকৃতিক নিয়মের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই বিধি।

— কিন্তু সেদিন ত তিনি তাই করেছিলেন?

— লেকিন্, উহ্ উনকো মৌজ।

মৌজ বা মর্জি বললে তার আর জবাব কি? তর্ক করে লাভ নাই, আমি চুপ করে গেলাম।

দুজনেই নীরবে বসে আছি, কোন প্রসঙ্গে তাঁকে ব্যস্ত না রাখলে, তখন জিজ্ঞাসা করেন নি বলে এখন যে গতরাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না এমন কোন কথা নাই, গতরাত্রির ঘটনা যেন আমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ, আমার অনুভূতি একান্তভাবে আমারই অন্তরে চিরন্তন হয়ে থাক, তা আর কেউ জানতে পারে, তা আমি চাই না। তাই তিনি কোন প্রসঙ্গ ফেলবার আগে আমিই প্রশ্ন করে বসলাম — সেদিন আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম শিব শ্মশানবাসী কেন? আপনি তার উত্তরে যা বলেছিলেন তা আপনার অসাধারণ রসবোধ এবং শ্লোক রচনার অপূর্ব ক্ষমতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তবে তা শুনে আমি সম্পূর্ণতঃ তৃপ্ত হতে পারি নি। শিব শ্মশানবাসী — এই কথার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আমি আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। আপনি দয়া করে তা বলবেন কি?

— লেকিন্, তুমি আগে বল শ্মশান কাকে বলে?

আমি উত্তর দিলাম — শ্মশান বলতে আমি বুঝি যেখানে শবের অবসান ঘটে, যেখানে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়।

— ভাল করে বুঝে দেখ মানুষের দেহ কখন শব হয়? যখন দেহ থেকে আত্মার উৎক্রমন ঘটে, প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করে, তখনই জীবদেহ শব পদবাচ্য হয়। এখন, এই আত্মার উৎক্রমন কখন ঘটে? কিভাবে ঘটে? যোগের পরিভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, উত্তরা সুষুম্নার পথে প্রাণবায়ুকে উর্ধ্বমুখী করে সজ্ঞানে বিদৃতিদ্বারে ★ নিয়ে যেতে পারলে আত্মার উৎক্রমন ঘটে। তখন দেহের মধ্যে মনের সহস্র বৃত্তি, বুদ্ধির ক্রিয়া, চিত্তবৃত্তি, অহংচেতনার সম্পূর্ণ নাশ হয়। দেহ তখন কার্যতঃ শব। জীবচেতনা তখন শিবচেতনায় পরিণত হয়। জীবচেতনার লয় হওয়া মানেই শবের অবসান ঘটল। সে হেন শ্মশানে তখনই শিবসুন্দরের

★ লেখক প্রণীত 'পিতরৌ' গ্রন্থে যোগচিত্রে বিদৃতিদ্বারের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

আবির্ভাব ঘটে। তাই সাধারণভাবে বলা হয়, শিব শ্মশানবাসী।

আমি বললাম — আপনার কথার সারমর্ম বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু বুঝা সম্ভব তা বুঝতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। ঐ তত্ত্ব অনুভব করতে হলে যথেষ্ট সাধন-সম্পদ থাকা দরকার। বিনা সাধনায় মহেশ্বরতত্ত্ব বুঝা সম্ভব নয়, তা আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করি। উত্তরা সুষুম্না, তার স্থান, সেই পথে আত্মার উৎক্রমন এবং বিদৃতিদ্বার প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করে এক বিশিষ্ট বৈদিক যোগপদ্ধতির ইঙ্গিত আপনি দিয়েছেন। আপনি দয়া করে আর একটি কথার উত্তর দিন। শৈবাগমের গ্রন্থে আমি পড়েছি যে শিব-শক্তি নিত্যযুক্ত অবস্থায় থাকেন। যেখানে শিব নিত্য বিরাজমান, উভয়ে উভয়েরই মধ্যে নিত্য অনুস্যূত থাকেন, এইজন্যই মহাদেবকে কি অর্ধনারীশ্বর বলা হয়? শিব অর্ধনারীশ্বর কেন হয়েছেন, সে সম্বন্ধে দয়া করে কিছু বলবেন কি ?

— লেকিন্, তুমহারা প্রশ্নকা শৈলী এ্যায়সা হ্যায় যিসকা অন্দরমে প্রশ্নকা জবাব ভী হ্যায়। আজ তুমহারা তবিয়ৎ ভী দুবলা হ্যায়। রাত্ ভী হো গয়া। হমারা ভী নিদ্ আতী হৈ। একঠো মামুলী জবাব শুন লিজিয়ে—

ভিক্ষয়াহসম্ভবং নিত্যমুদরদ্বয় পূরণম্।
অতো বিচক্ষণো ভিক্ষুরর্ধনারীশ্বরো হরঃ॥
প্রতিদিন ভিক্ষা করে দীনহীন জন,
ভরাতে না পারে দুটি উদর কখন;
পরম ভিক্ষুক তাই বুদ্ধিমান্ হর,
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে অর্ধনারীশ্বর!

আমি তাঁর কাছে শুনতে চাইলাম তত্ত্ব। কিন্তু তিনি রসালো চুটকি শুনিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। এতে আমি ক্ষেপে গেলাম। আমি যে একজন মহাযোগীর সঙ্গে কথা বলছি তা ভুলে গিয়ে তাঁর হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম, আপনি গুরুত্বপূর্ণ গভীর তত্ত্বের কত রসালো উত্তর দিতে পারেন, তা আজ আমি পরখ করে দেখতে চাই। আপনার গুরুর দোহাই আপনি বলুন ত — শিবের মাথায় গঙ্গা কেন? ভগীরথের তপস্যায় স্বর্গের সুরধুনী মর্ত্যে যখন অবতরণ করলেন, তখন তাঁর বেগ আর কেউ ধারণ করতে পারবেন না বলে ভাঙড়ভোলা মহাদেব তাঁর মাথার বিশাল জটাভার পেতে দিয়েছিলেন। এসব পুরাণ-কথা আমার জানা। আমার প্রশ্ন হল, ভগীরথের প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে ভোলানাথ নিজের মাথায় গঙ্গাকে ধারণ করেছিলেন, ভাল কথা, কিন্তু তারপর গঙ্গা যখন নিম্নতর ভূমিতে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে কপিলের কোপাগ্নিতে দগ্ধ ভগীরথের পূর্ব-পুরুষদেরকে উদ্ধার করে দিলেন, তখন ত আর গঙ্গাকে মাথায় ধারণ করার প্রয়োজন ছিল না। গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গকে চিরকাল মাথায় ধারণ করতে কি তাঁর অস্বস্তি হয় না? নিশ্চয়ই হয়, তবে তিনি গঙ্গাকে নামাতে চান না কেন?

আমার প্রগলভতা দেখে বিন্দুমাত্র তিনি বিরক্ত হলেন না। প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি হাসতে হাসতে বললেন —

কণ্ঠে গরলম্ অত্যুগ্রম্ অঙ্গেঽহির্ভালিকে শিখী।
ইতি গঙ্গাধরো গঙ্গাম্ উত্তমাঙ্গাৎ ন মুঞ্চতি॥

আমার ধৃষ্ট প্রশ্নকে যেন পরিহাস করার জন্যই শ্লোকের প্রতিটি শব্দের সমাস ভেঙে ভেঙে কাটাকাটা জবাব দিলেন —

ঢল্ ঢল্ করে কণ্ঠে দুর্জয় গরল,
শন্ শন্ ভ্রমে সর্প দেহে অবিরল।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট উপর,
এসব উত্তাপে দগ্ধ সদা গঙ্গাধর।
পাছে আরো জ্বালা বাড়ে ছাড়িলে গঙ্গায়,
তাই শিব মাথা হতে নামাতে না চায়!

এই শ্লোক শোনবার পরে তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে আমাকে বললেন — ঔর কুছ্?

তাঁর এই কথাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলাম — মহাভারতে দেবাসুরের সাগর-মন্থনের গল্প পড়েছি, তার সমূহ বৃত্তান্ত আমার জানা। বিষ্ণু গ্রহণ করলেন লক্ষ্মীকে , দেবতারা বিলোন অমৃত। মন্ত্রমূর্তি মৃত্যুঞ্জয় মন্থনজাত গরলকে কেন পান করলেন, তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও বাবার কাছে শুনেছি। আপনার কাছে তা নূতন করে শুনতে চাই না, আপনি জানলেও তা বলবেন না, এই কয়দিনে তা বুঝে নিয়েছি। আসল কথায় না গিয়ে রসের ভিয়ান দিয়ে কোন শ্লেষাত্মক শ্লোক শুনিয়েই আপনি এড়িয়ে যেতে চান। এখন বলুন ত, সমুদ্র হতে উত্থিত অমূল্য নিধি অন্যেরা নিলেন, শিবই কেবল বেকুবের মত বিষপান করলেন কেন?

— লেকিন্ এক মিনট্ আপ্ রুখ যাইয়ে। হাঁ.......হাঁ.........ব্যস্ হো গয়া। আভি শুনিয়ে।

বৃদ্ধোক্ষঃ প্রপলায়তে প্রতিদিনং সিংহাবলোদ্ভিয়া,
পশ্যন মত্তময়ূরমস্তিকচরং ভুযাভুজাঙ্গব্রজঃ।
কৃত্তিং কৃন্ততি মূষিকোঽপি রজনৌ ভিক্ষান্নমাক্ষয়ন্,
দুঃখেনেতি দিগম্বরঃ স্মরহরঃ হলাহলং পীতবান্॥

তুমহারা বাংলা বুলিমেঁ এহি শ্লোককা মতলব হোগা —

সিংহ দিখি বৃদ্ধ বৃষ নিত্যই পলায়,
ময়ূর দেখিয়া সর্প পলাইয়া যায়।
ইন্দুর ভিক্ষান্ন খায় হলে রাত্রিকাল,
ব্যাঘ্রচর্ম কাটি পুনঃ বাড়ায় জঞ্জাল
লোকে বলে দিগম্বর না দেখি বসন,
স্মরহর হল নাম বধিয়া মদন।
এ সব দুঃখের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
বিষ গিলেছেন শিব মরিবার তরে!

সম্বিদানন্দজীর মুখে এই রকম অদ্ভুত জবাব শুনে আমি হেসে গড়িয়ে পড়লাম। আমি তাঁকে পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ করতে করতে বললাম — হে বিদ্বান তপস্বিন্, আপনার বিচিত্র রসবোধকে নমস্কার! হে স্বভাব-কবি, মুখে মুখে শ্লোকরচনার আপনার যে অলৌকিক প্রতিভা, সেই প্রতিভাকেও নমস্কার জানাচ্ছি।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন — এ লেও ব্রাহ্মীবুটি, ইহ্ হ্যায় নর্মদামায়ী কী খাস্ পরসাদী। অমরকন্টককী মাঈকী-বাগিয়ামেঁ ইহ্ উৎপন্ন হোতা হৈ। মুহ্‌মেঁ ডাল কর্ থোড়া পানি পি লেও।

তিনি চলে যেতেই আমি বুটিটি গিলে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন নিজেকে যথেষ্ট তাজা মনে হল। পরশু রাতে হঠাৎ পাথরের উপর পড়ে গিয়ে শরীরের যে যে অংশ থেঁতলে গেছল, তার কোথাও চিহ্নমাত্র নাই।

স্নানের ঘন্টা পড়তেই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গিয়ে স্নান ও শিবপূজা করে এলাম।

এইভাবে একই কার্যক্রম অনুসরণ করে ধাবড়ী কুণ্ডের দিনগুলি আনন্দেই কেটে যেতে লাগল। প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের সময় পর্বতের এক রূপ। প্রকৃতির নিত্য নূতন সাজ দেখে একঘেঁয়ে বৃষ্টিপাতের মধ্যেও দুচোখ জুড়িয়ে যায়। যেদিন প্রথম ধাবড়ী কুণ্ডে আসি সেদিন অরণ্যের যে রূপসজ্জা দেখেছিলাম, দেখতে দেখতে সেই রূপসজ্জা চোখের সামনেই বদলে যাচ্ছে, তা দেখতে পাচ্ছি। গাছপালা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের ঘন নীল ও সবুজ রং দেখে মনে হচ্ছে, প্রকৃতিরাণী দ্রুত সাজপোযাক বদলে অপরূপ সাজে সেজেছেন। নর্মদার বুক ফুলে ফেঁপে উঠেছে, প্রবল বেগে কুল ছাপিয়ে ছুটে চলেছেন সাগর সঙ্গমে। গভীর রাত্রে নর্মদার কলধ্বনি যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। ১২ই শ্রাবণ থেকে ১৫ই শ্রাবণ পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হল। এ কয়দিন সূর্যের মুখ একবারও দেখতে পাইনি। ১৬ই শ্রাবণ বৃষ্টি ধরল। বেলা ১০টা নাগাদ আকাশে সূর্যের প্রকাশ দেখলাম। শুধু আমি নয়, এ অঞ্চলের মানুষ পশুপক্ষী সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সূর্য আত্মা জগতঃ তস্থুশ্চ — এ শ্রুতিবাক্য নিত্য সত্য। সূর্যই জগতের আলো, সূর্যই জগতের প্রাণ। ঝক্‌ঝকে রোদে সর্বত্র যেন আনন্দের সাড়া জেগেছে। একদল ময়ূরকে দেখলাম ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদল হরিণকে দেখলাম আমাদের গুহাগুলির ধার দিয়েই দ্রুত দৌড়ে পালাচ্ছে।

বেলা প্রায় তিনটা নাগাদ গুহার বাইরে বেরিয়ে দেখি, সন্ন্যাসীরা তাঁদের গেরুয়া কাপড়, উত্তরীয়, কৌপীন এবং গুহামুখের পর্দাগুলো গাছের ডালে ডালে শুকোতে দিয়েছেন। আমিও আমার ভিজা স্যাঁতস্যাতে আলখাল্লা, গামছা, কম্বল ইত্যাদি রোদে এনে মিলে দিলাম। অন্যদিন গুহার বাইরে বৈকালের দিকে কাউকে দেখা যায় না। আজ দেখছি, প্রায় সকল সন্ন্যাসী যে যার গুহার বাইরে রোদের মধ্যে বসে আছেন। চারদিন একটানা বৃষ্টির পর রোদের মুখ দেখতে পেয়ে সবাইকেই খুশী বলে মনে হল। একলিঙ্গস্বামীর গুহার দিকে তাকিয়ে দেখি, অভয়ানন্দজী সেখান থেকে তরতর করে নেমে আসছেন।

আমাকে দেখতে পেয়ে সচ্চিদানন্দজী আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমাদের কাছ হতে প্রায় ১০০ গজ দূরে গাছের ডালে একটা বড় পাখী দেখিয়ে বললেন — লেকিন্, দেখ দেখ, পাখীর পা দুটো কত ঘন নীল, ঠোঁটটাও নীল। এই পাখীর নাম — মল্লিছাখ্, শুদ্ধ সংস্কৃতে বলা হয় মল্লিকাক্ষ। এপাখী এখানে, সীতামায়ীর বনে এবং দণ্ডকারণ্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

— কিন্তু এগুলি আমাদের বাংলাদেশের নীলকণ্ঠ পাখীর মত দেখতে।

— নেহি জী, নীলকণ্ঠ নয়, নীলকণ্ঠ পাখী এত বড় হয় না। নীলকণ্ঠ পাখীর কণ্ঠদেশ নীল হয়, কিন্তু মল্লিকাক্ষ পাখীর কণ্ঠটা লক্ষ্য করে দেখ, ঘন সবুজ।

হঠাৎ পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, অভয়ানন্দজী আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে সম্বিদানন্দজী কুর্নিশের ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে বলতে লাগলেন — আইয়ে কুমার সাহাব! স্বাগতম্, সুস্বাগতম্, সুস্বাগতম্! অভয়ানন্দজী তাঁর হাত ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বললেন — আপ্ য্যাত্না বুড্ঢা হোতে হেঁ, আপ্কা রস ভি বাঢ় যাতা হৈ অর্থাৎ তুমি দিন দিন যতই বুড়ো হচ্ছ, তোমার রসও তত উথলে উঠছে!

সম্বিদানন্দজী তাঁর হাত ধরে বনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলতে লাগলেন — ভবান্ পশ্য রাজপুত্র! অথৈতানি মদকলময়ূরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভিরবকীর্ণানি পর্বতৈঃ অবিরলনিবিষ্টনীলবহলচ্ছায়তরুশতরু ষণ্ডমণ্ডিতানি অসংভ্রান্তবিবিধমৃগযূথানি্ পশ্যতু মহাভাগঃ প্রশান্তগম্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি।

অভয়ানন্দজী — ইহ্ কি আপ্নে অভি রচনা কিয়া? ন ইহ্ কোঈ কেতাবসে উদ্ধৃতি দেতে হৈ?

সম্বিদানন্দজী — লেকিন্, একলিঙ্গ-পুরাণ পাঠ করতে করতে তুমি সব ভুলে গেছ! আচ্ছা, ঔর ভি একঠো উদ্ধৃতি দেতে হৈ —

ইহ্ সমদশকুন্তাক্রান্তবাণীরবিরুৎ প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি
ফলভারপরিনামশ্যামজম্বুনিকুঞ্জ স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ॥

অভয়ানন্দজী — নাঃ! আমার কিছু স্মরণে আসছে না, শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি কবি কোন নিবিড় অরণ্যের মনোহারী দৃশ্য বর্ণনা করছেন।

সম্বিদানন্দজী — বড়ই আশ্চর্যের কথা, কাব্য ও দর্শনের সুপণ্ডিত স্বামী অভয়ানন্দ যোগসাধনা এবং গুরুসেবায় এমনই মস্ত্ আছেন যে, তিনি ভবভূতির মত কবিকেও একেবারে ভুলে বসে আছেন।

সলজ্জ হাসি হেসে অভয়ানন্দজী বললেন — ভবভূতির কথায় এখন আমার মনে পড়ছে, উত্তররামচরিত নাটকে তোমার উদ্ধৃত ঐ বাক্যগুলি আছে। কিন্তু সে ত শম্বুকের দিব্যদেহ ভগবান রামচন্দ্রকে বলেছিলেন দণ্ডকারণ্যের শোভা বর্ণনা করতে করতে। কিন্তু এ ত নর্মদাতটের অরণ্য। গোদাবরী তটের দণ্ডকারণ্যের কথা এখানে আসছে কি করে?

সম্বিদানন্দজী — কেন, দণ্ডকারণ্যের মতই কি এখানে প্রাকৃতিক শোভার সাদৃশ্য তোমার চোখে পড়ছে না? হে মহাভাগ! তাহলে আপনি চেয়ে দেখুন শান্ত ও গম্ভীর ঐ মধ্যভাগে স্থিত অরণ্যের দিকে — পশ্যতু মহাভাগঃ প্রশান্তগম্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি। এই অরণ্য পর্বতপূর্ণ; এইসকল পর্বতের শোভা কেকামুখর ময়ূরের কণ্ঠের মত কোমল সৌন্দর্যে মণ্ডিত, ঘননিবদ্ধ এবং ঘনান্ধকার সমন্বিত তরুণ বৃক্ষসমূহে সজ্জিত, এখানে বিচিত্র মৃগদল (যথা চিতল হরিণ ও কৃষ্ণসার মৃগ) নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখানে বয়ে যাচ্ছে কত স্রোতস্বিনী, জামবনের কুঞ্জপথে যখন ওরা অতি কষ্টে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন জলধারা কলরবে মুখর হয়ে ওঠে — সেই জামবন পরিপক্ক ফলসম্পদে শ্যামবর্ণ (ফলভারপরিণামশ্যামজম্বু নিকুঞ্জ)। মদমত্ত পাখীদের আশ্রয় বাণীর লতা, সেই লতার ফুল ঝরে পড়ছে স্রোতস্বিনীর জলে, ফলে সেই জল হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ, শীতল ও সুগন্ধি!

অভয়ানন্দজী — কিন্তু এখানে নর্মদাতীরে ফলভারে নত জামবন কোথায় দেখতে পাচ্ছ?

সম্বিদানন্দজী — লেকিন্, আছে দোস্ত্ আছে। তুমি গুরুসেবা ছেড়ে কোথাও বেরুতে চাও

না। এখান হতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে জঙ্গল পেরিয়ে একমাইল গেলেই জামবন দেখতে পাবে। সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দাক্ষিণাত্যে জন্মেছিলেন ভবভূতি, হয়ত জীবনে তিনি দণ্ডকারণ্যেও যান নি, কিন্তু তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্য প্রতিভার যাদুস্পর্শে এমনই বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছিল যে, তিনি রামচন্দ্রের যুগের দণ্ডকারণ্যের এমন বর্ণনা দিয়ে গেছেন যে, তা এই ভয়ঙ্কর ওঁকারেশ্বর ঝাড়িসহ যেখানে যত গম্ভীর অরণ্য আছে, তার প্রাকৃতিক চিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এইজন্য প্রথম শ্রেণীর কবিকে বলা হয় ক্রান্তদর্শী।

'বহোৎ আচ্ছা, বহোৎ সুক্রিয়া' বলতে বলতে অভয়ানন্দজী সম্বিদানন্দজীর দাড়ি ধরে নেড়ে দিয়ে আমারও চিবুকটা স্পর্শ করে চলে গেলেন হাসতে হাসতে।

তিনি চলে যেতেই সম্বিদানন্দজী আমাকে বললেন — 'অভয়ানন্দজীর মত গুরুগতপ্রাণ শিষ্য আর একজনকেও দেখি নি। আমি চারধাম পরিক্রমা করেছি, কত যে মঠ ও সন্ন্যাসী দেখেছি তার ইয়ত্তা নাই। সকলেরই হাজার হাজার ভক্ত আছে। কেউ চায় তার গুরুর কাছে ঐহিক কামনা বাসনার পূর্তি, কেউ চায় পরমার্থিক কল্যাণ। গুরুর কাছে সাধনপ্রাপ্ত হয়ে কত জনকে দেখেছি পাহাড়ে গুহায় তীব্র শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে উগ্র তপস্যায় রত আছেন। কেউ উর্ধ্বপদে নতমুণ্ডে, কেউ বা অগ্নি-প্রাকারের মধ্যে বসে তপস্যা করছেন। তুমিও হয়ত পরিক্রমা করতে করতে অনেক উৎকট তপস্বীকে দেখে থাকবে। আমিও তাঁদেরকে দেখেছি এবং ভগবান আমাকে যেটুকু যোগদৃষ্টি দিয়েছেন তারই সাহায্যে আমি বলতে পারি, অভয়ানন্দজী তাঁদের অনেক উপরের অবস্থা লাভ করেছেন অথচ তার জন্য তাঁকে কোন উগ্র তপস্যা করতে হয় নি। শুধুমাত্র গুরুসেবা এবং গুরুগত প্রাণতার জোরে তিনি উচ্চকোটি হতে উচ্চতর কোটিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। ত্যাগ বৈরাগ্য ত তাঁর আছেই, গুরুর প্রতি ভালবাসার টানে তিনি রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে এসেছেন, সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। একলিঙ্গস্বামীই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। গুরুর স্থূলদেহের সেবা ত তিনি করছেনই, তাঁর সমস্ত খুঁটিনাটি প্রয়োজনেও অভয়ানন্দজী সব সময়েই হাজির থাকে। আমরা যখন সময় ধরে নিয়ম করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকি, গুরু উপরের গুহায় কখন কিভাবে কি অবস্থায় আছেন, প্রতিকূল জলহাওয়া তাঁর স্থূলদেহের কোন অসুবিধা ঘটাচ্ছে কিনা, তার কোন খোঁজ নিই না, তখনও অভয়ানন্দজী গুরুসেবায় রত থাকেন।

একবার মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে এখানে বরফ পড়ছিল, আমরা যে যার গুহার মধ্যে ধূনি জেলে নিজেদের অন্তরঙ্গ সাধনে মত্ত ছিলাম; সকালে উঠে দেখলাম, এখানকার পাহাড় ও গাছপালাগুলোও বরফে ঢেকে গেছে। গুহার বাইরে হঠাৎ-সমাধিস্থ গুরুজীর উপর একটা ত্রিপল টাঙ্গিয়ে ত্রিপলের তিনদিক গাছের ডালে বেঁধে গুহার গায়ে যেদিকটায় কোন গাছ নাই, সেদিকের খুঁটটা নিজের হাতে ধরে গোটা রাত দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বেলা আটটা নাগাদ ঐ দৃশ্য আমার চোখে পড়ে। আমি সবকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গুরু-শিষ্য উভয়ের চারদিকে আগুন জ্বালি। 'বটুকনাথ' গুহার মধ্যে ঢুকে গিয়ে বরফের হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছিল। প্রায় দু'ঘন্টা বাদে গুরুজীর ধ্যান ভাঙে, তিনি অভয়ানন্দজীর দুর্দশা দেখে অধীর হয়ে পড়েন। সারারাত্রি বরফ পড়ে অভয়ানন্দজীর দেহ বরফের কুচিতে ঢেকে গেছল। 'হম্ ত নর্মদামায়ীকা গোদমে থা লেকিন হমারা অভয়ানন্দকা হালৎ কায়সে বুরা হো গয়া' — এই বলে মহাযোগী কেঁদে ফেললেন। নিজে দুহাতে জড়িয়ে ধরে অভয়ানন্দের দেহ আগলে তিনি

বসেছিলেন। অভয়ানন্দের সারা গায়ে বড় বড় ঘা হয়ে গিয়েছিল তুষারপাতের ফলে। গুরুজী নিজ হাতে তার পরিচর্যা করেছিলেন। সেবা বলতে বুঝায় স ইব = সেব্ ধাতুর উত্তর আপ্। স ইব মানে তাঁর অর্থাৎ ঈশ্বরের মত। গুরুকে জীবন্ত ঈশ্বরবোধে সেবা; তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন এই অভয়ানন্দজী। নানাবিধ যোগযাগ, ধ্যানধারণায় যা লাভ করা যায় না, কেবলমাত্র গুরুসেবা দ্বারা তা প্রাপ্তব্য। উপনিষদে পড়েছ ত উদ্দালক ও আরুণির কথা। তাঁরা কেবল গুরুসেবা করেই পরমপদ লাভ করেছিলেন। শ্রুতিবাক্য মিথ্যা নয়। যে কোন তপস্যার চেয়ে গুরুসেবা পরমপদ-প্রাপ্তির অব্যর্থ ফলপ্রদ পন্থা।

আমরা একই গুরুর শিষ্য হয়েও যতই সাধনা করি না কেন, নিজেদের পূর্বজন্মার্জিত সাধনা ও সুকৃতি, তার সঙ্গে এ জন্মের তপস্যার বল যুক্ত হয়ে যত উচ্চপদই পাই না কেন, আমরা কিছুতেই শিবকল্প মহাযোগী একলিঙ্গস্বামীর সমান হতে পারব না, কিন্তু অভয়ানন্দজী তাঁর গুরুসেবার জোরেই দ্বিতীয় একলিঙ্গস্বামী হয়ে যাবেন। একলিঙ্গস্বামীর সমূহ সাধন-সম্পদ এবং সাধন-শক্তি অবলীলাক্রমে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাবে নর্মদাতটে দাঁড়িয়ে আমি মিথ্যা বলছি না, এ কথাকে আমার ধ্রুবসত্য বলেই জানবে।

এতক্ষণ ধরে আমি তাঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে বুঝতে পারি নি। তিনি নিজেই বললেন — লেকিন্ সাম হো গয়া। আভি গুহামে যাইয়ে থোড়া দের বাদ হম আপ্‌কা পাশ আয়েঙ্গে। এই বলে তিনি চলে গেলেন। আমি গুহার মধ্যে ঢুকে মোমবাতি জ্বেলে তাঁর প্রতীক্ষায় বসে থাকলাম। ঘন্টাখানিক পরে তিনি এসে বসতেই তাঁকে প্রশ্ন করলাম — আপনি তখন যেসব অন্ধ গুরুভক্তির কথা বললেন, তাতে ত আপনাকে গুরুবাদের কট্টর প্রবক্তা বলে মনে হচ্ছে। যাই হোক আপনার কথায় বুঝা যাচ্ছে, সাধনভজন, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অষ্টাঙ্গযোগ ধারণা বা সমাধি অভ্যাস প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে গুরুসেবা করলেই পরমাসিদ্ধি লাভ হয়ে যাবে! তাহলে ত সাধন-ভজন তপ তপস্যার আর কোন প্রয়োজনই নাই। আপনি এ কথাই কি বলতে চান?

— লেকিন্, না আমি সেকথা বলছি না। লেকিন্, যা ঘটনা , যা বাস্তব সত্য এবং পারমার্থিক সত্য সে সে কথাই কেবল তোমাকে বলেছি। কেউ ইচ্ছা করলেই অভয়ানন্দজী হতে পারবে না কি ? চেষ্টা করে কেউ গুরুগত প্রাণ হতে পারে না । বহুজন্মে তপস্যা করে এলে সেই সুকৃতির জোরেই একজনের মধ্যে গুরুর প্রতি অনন্যনিষ্ঠা জন্মায়। গুরুভক্তি, গুরুসেবা এসব, কথার কথা নয়। যার এইজন্মেই সিদ্ধি ফলদায়ী হতে যাচ্ছে, তারই পক্ষে অভয়ানন্দজী হওয়া সম্ভব। গুরু শত হেনস্থা এবং লাঞ্ছনা করলেও এই প্রকৃতির ভক্ত গুরুপাদপদ্ম ছাড়ে না। সবকিছু দুঃখকষ্টকে সে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে, তার অন্তরাত্মা বলে, গুরু যা কিছু করছেন বা বলছেন, তাতে তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আপাতঃ রূঢ় পথে তিনি তোমার মঙ্গল করছেন, তোমার কর্মজঞ্জাল দূর করছেন।

— আপনার কথা শুনে আমার মনে অনেক বিচার-বিতর্কের উদয় হচ্ছে, নানা সংশয়ের দোলায় আমার মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথমেই ধরুন, অভয়ানন্দজী ভাগ্যক্রমে একলিঙ্গস্বামীর মত একজন পূর্ণগুরুর কাছে এসে পৌঁচেছেন; কাজেই কোন সাধন ভজন না করলেও শুধু গুরুসেবার জোরেই গুরুর সমূহশক্তি সঞ্চারিত হয়ে যেতে পারে, তিনি একদিন দ্বিতীয় একলিঙ্গস্বামী হয়ে যেতে পারেন, আপনার একথা মেনে নিয়েও বলছি, তিনি

যদি কোন ভণ্ডগুরুর সমীপে থেকে এইভাবে গুরুসেবা করে যেতেন, তাহলে তিনি কি রকম ফল লাভ করতেন? জগতে এমন ত অনেক দেখা যায়, অনেক সজ্জন ব্যক্তিও সংস্কারবশে কোন ভণ্ডগুরুরই সারাজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে যায়। তার সেই সেবার ফলে সে কি পরম বস্তু লাভ করতে পারবে? আমার ত মনে হয়, অন্ধেন নীয়মনোঃ যথান্ধাঃ, কানাকে কানা পথ দেখালে উভয়ে যেমন খানায় পড়ে, তেমনি গুরু শিষ্য উভয়েই সেই দশা প্রাপ্ত হবে।

— লেকিন, তোমার এ কথার মধ্যে অনেক ফাঁক ঔর গলতী আছে। আমি গুরুগত প্রাণতা ও যথার্থ গুরুভক্তির কথা বলছিলাম। যে বিশুদ্ধ সংস্কার এবং সুকৃতি মানুষকে এজন্মে গুরুগতপ্রাণ এবং যথার্থ সেবক করে তোলে, কাল ও মায়ার ছলনা যতই বিভ্রান্তিকর হোক তাদের সাধ্য নাই, যথার্থ নিষ্কাম প্রেমিকভক্তকে ভণ্ডগুরুর কবলে নিয়ে গিয়ে ফেলে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া তাকে ভণ্ডগুরুর জালে আবদ্ধ করে এবং সে গুরুগতপ্রাণ হয়ে সেই গুরুরই সেবা করে যায়, তাহলেও সেই ভক্ত কিন্তু বঞ্চিত হবে না। কারণ যে বিশ্বগুরুর সত্তা চিরকাল ধরে বিরাজিত, সেই বিশ্বগুরু আদিগুরু শিবই ঐ ভক্তকে তার সেবার ফল দান করবেন। গুরুগতপ্রাণতা বা যথার্থ গুরুসেবা কখনও নিস্ফল বা ব্যর্থ হয় না, এই আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। সম্বিদানন্দজী চলে যাওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ নিজের কাজ করে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে অভয়ানন্দজীর গুরুভক্তির কথা ভাবছিলাম। এইরকম গুরুভক্তি ও গুরুসেবার গল্প ভারতের অধ্যাত্ম ইতিহাসে অনেক পড়েছি, অনেক শুনেছি। শিখগুরুদের জীবনীতে পেয়েছি, তাঁরা এমনই গুরুগতপ্রাণ ছিলেন যে, গুরুর কথায় তাঁরা হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করতে পারতেন।

একবার আমি আগ্রাতে গিয়ে স্বামীবাগ নামক রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের মূল গদীতে শুনে এসেছিলাম, তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রথম সন্ত শিবদয়াল সিংজীর (রাধাস্বামী সাহেব) একজন শিষ্য ছিলেন তাঁর নাম রায়বাহাদুর শালগ্রাম সিং। তিনি তাঁর সময়ে ভারতের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ছিলেন। তিনি প্রতি মাসে বেতন হিসাবে তখনকার দিনে সাড়ে তিন হাজার বা চারহাজার টাকা পেতেন, বেতনপ্রাপ্তি মাত্র তা গুরুর চরণে এসে 'ভেট' দিতেন। গুরু সেই টাকা থেকে একহাতে মুঠো করে যা তুলে দিতেন, তাই দিয়ে তিনি সংসার নির্বাহ করতেন। অফিস যাবার আগে এবং অফিস থেকে ফিরে এসে গুরুকে দর্শন করা ছিল তার নিত্য কাজ। যদি কোন সময় এসে দেখতেন, গুরু ভজনগৃহে আছেন, তাহলে যত রাত্রিই হোক তিনি অফিসের সেই ধড়াচূড়া পরেই ভজনগৃহের রুদ্ধ দরজার কাছেই বসে থাকতেন। একবার রাধাস্বামী সাহেব সমাধিমগ্ন ছিলেন, রাত্রি অতিবাহিত হল, সকাল আটটা হল, তবুও তাঁর দরজা খুলল না। রায় শালগ্রাম সাহেবের বাড়ীর পরিজনরা বারবার এসেও তাঁকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না। বেলা ৯টার সময় রাধাস্বামী সাহেবের ধর্মপত্নী রাধাবাঈ এসে দেখেন, একটা সিঁড়ি লাগিয়ে ভজনগৃহের দেওয়ালের উপর দিকে যে সংকীর্ণ ভেন্টিলেটর আছে তার মধ্যে তিনি নিজের মাথা ও মুখ ঢুকিয়ে নিজের ইষ্টমূর্তি গুরুকে দর্শন করছেন। শ্রীমতী রাধাবাঈ তাঁকে সস্নেহে মৃদু ভর্ৎসনা সুরু করলে তিনি অতিকষ্টে মুখ বের করে নিয়ে মাতাজীকে বলেন — মাতাজী গুরুজীকা শ্রীমূর্তি দর্শন কে লিয়ে মেরে দিল তড়পাতে হৈ

তিনি সিঁড়ি বেয়ে যখন নামলেন, তখন দেখা গেল, তাঁর গালের চামড়া ঘর্ষণের চাপে উঠে গেছে, কপাল ও দুটো কানও রক্তাক্ত! যাইহোক এই সময় সমাধি হতে রাধাস্বামী সাহেবের ব্যুত্থান ঘটে। তিনি টলতে টলতে দরজা খুলে শালগ্রামজীকে তদবস্থায় দেখে নিজেই তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর্ করে কাঁদতে থাকেন। শালগ্রামজীর গুরুভক্তির আরও কাহিনী শুনেছিলাম। তাঁর গুরুর নিবাসস্থল থেকে প্রায় চারমাইল দূরে যমুনা। তিনি অতদূর হেঁটে গিয়ে প্রতিদিন গুরুর স্নানের জন্য জল বয়ে আনছেন, এজন্যে সাধারণের মধ্যে গুঞ্জন উঠে। সকলেই বলতে থাকেন — গুরুর পাল্লায় পড়ে এতবড় একটা লোক পাগল হয়ে গেছে। শালগ্রামজী এই লোকাপবাদের কথা শুনতে পেয়ে দুপায়ে ঘুঙুর বেঁধে দু বাহু ও মাথায় টুকরো টুকরো নেকড়া বেঁধে নাচতে নাচতে জল বয়ে আনতে লাগলেন। গুরুসেবার জন্য তিনি লোকপবাদকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি। তাঁর এই রকম বেপরোয়া ভাব ও গুরুভক্তি দেখে লোকের গুঞ্জন আপনা হতেই স্তব্ধ হয়ে গেছল। পরবর্তীকালে দেখা যায় রাধাস্বামী সাহেব তাঁর এই গুরুগত প্রাণ ভক্তকেই তাঁর গদীতে দ্বিতীয় সন্তসদ্‌গুরু হিসাবে মনোনীত করে গেছলেন। সন্তমতালম্বী লক্ষ লক্ষ ভক্তদের কাছে আজও তিনি হুজুর মহারাজ নামে পূজা পাচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে গুরুনানকের জীবনে একটি ঘটনাও আমার মনে পড়ল। একবার গুরুনানক তাঁর কয়েকজন শিষ্যসহ ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত লাহিনাও সেই দলে ছিলেন। হঠাৎ বনের মধ্যে একটি মৃতদেহ তাঁর চোখে পড়ল; পচা মৃতদেহ একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। গুরুনানক সেই দুর্গন্ধময় শবটি দেখিয়ে শিষ্যদেরকে বললেন — তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে আমার কথায় পচা গলিত শবদেহ ভক্ষণ করতে পারে? গুরুর এইকথা শুনে সবাই অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ কেউ ভাবতে লাগলেন, গুরুজী কি আজ অপ্রকৃতিস্থ নতুবা এমন ন্যক্কারজনক প্রস্তাব কি করে করতে পারলেন? আমরা শিখ, অঘোর পন্থী ত নই!

নানক অধিকাংশ শিষ্যদের এইরকম মনোভাব বুঝে পুনরায় ঘোষণা করলেন —'নির্দ্বিধায় যে বিনা বিচারে গুরুবাক্য পালন করতে পারে, সেই প্রকৃত শিখ। প্রকৃত গুরুগতপ্রাণ শিখই পরমপদ অর্থাৎ অলখ্ নিরঞ্জনতত্ত্ব উপলব্ধির যোগ্য আধার। যারা তা পারে না. তারা গুরুর চারধারে থেকে কেবলই ভীড় বাড়ায়'। নতমস্তকে সব শিষ্য নীরবে গুরুর এই ধিক্কার শুনলেন, কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করতে এগিয়ে এলেন না। অবশেষে লাহিনাকে দেখা গেল, তিনি ধীরে ধীরে মৃতদেহের কাছে করজোড়ে বললেন — গুরুজী আপনি দয়া করে বলে দিন, এই মৃতদেহের কোন অংশ থেকে আমি সর্বপ্রথম খেতে আরম্ভ করব?

লাহিনার কথা শুনে তাঁর গুরুভ্রাতারা স্তম্ভিত। কিন্তু নানক শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন. 'কোমরের দিক থেকেই আরম্ভ কর।' গুরুর বাক্য শেষ হতে না হতেই নির্বিকার চিত্তে লাহিনা শবদেহে কামড় দিবার জন্য হাঁ করে ঝুঁকে পড়লেন। কিন্তু শবদেহ হতে কাপড়ের আচ্ছাদন তুলতেই দেখা গেল, সেখানে থরে থরে সুমিষ্ট ফল ও মিষ্টান্ন দ্রব্য সাজানো রয়েছে! বিস্ময়ে হতবাক শিষ্যরা। ভাবলেন, ও হল সর্বশক্তিমান গুরুজীর এক অত্যাশ্চর্য বিভূতির খেলা। গুরুনানক চেলাদের ভাব-ভাবনার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে লাহিনার মাথায় হাত দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন —'এ আমার কোন বিভূতি নয়, তোমার গুরুভক্তির গুণেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। মনে রাখবে, অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ, শব্দযোগ, সিদ্ধযোগ,

বিহঙ্গীযোগ, সুরতশব্দযোগ, প্রভৃতির নিরন্তর অভ্যাসেও যে পরমপদ লাভ করা যায় না, প্রকৃত একজন শিষ্য তার গুরুভক্তির গুণে তা অবলীলাক্রমে লাভ করতে পারে। লাহিনা! তোমার অসাধারণ গুরু সত্তাকে গুরুর অঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছ, সর্বতোভাবে তুমি আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছ। তাই তোমার নাম দিলাম অঙ্গদ। আমার পরেই তুমিই হবে সমগ্র শিখপন্থের গুরু।'

আজ সন্ধ্যাবেলা সচ্চিদানন্দজী এসে অভয়ানন্দজীর গুরুগতপ্রাণতার যে গল্প বলে গুরুভক্তি ও গুরুসেবার মহিমা বর্ণনা করে গেলেন, শুয়ে শুয়ে সেই প্রসঙ্গে নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমের দফা শেষ হল। এদিকে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আমি গুহার বাইরে প্রস্রাব করতে গিয়ে দেখি, আকাশে শুকতারা জ্বল জ্বল করছে। ফিরে এসে জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ঘুমে অচেতন। কখন যে স্নানের ঘন্টি পড়েছে তা শুনতে পাইনি। বেলা আটটার সময় অভয়ানন্দজী এসে হর নর্মদে, হর নর্মদে শব্দ করে আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে তাদের সঙ্গে গিয়ে স্নান ও পূজা করে এলাম। দুপুরবেলা আমরা যখন খেতে বসেছি, তখন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। সেই থামলো বেলা ৫টায়। গুহা থেকে আর বেরুতে পারলাম না।

সন্ধ্যার সময় সচ্চিদানন্দজী আমার কাছে এলেন। কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর বললেন — লেকিন্ রাতমেঁ আপ্‌কো নিদ্ নেহি হুয়া। ক্ষুদ্র অভয়ানন্দজী আপ্‌কো জাগানেকো লিয়ে আয়ে থে। হম্ দুসরি কামমেঁ ফাঁস গয়ে থে ।

— আপনি যেভাবে গুরুবাদের ঢাক পিটিয়ে গেলেন, গুরুগতপ্রাণতা ও গুরুসেবার মাহাত্ম্য যেমনভাবে একতরফা বলে গেলেন, তাতেই গতরাত্রে চোখে আমার ঘুম এল না। তারজন্য আপনিই দায়ী!

— তা হোক, শুয়ে শুয়ে তুমি সৎপ্রসঙ্গই মনন করেছ। লেকিন্ তোমার এত গুরুভক্তের কথা মনে এল অথচ আচার্য শংকরের প্রধান শিষ্য পদ্মপাদাচার্যের কথা তোমার মনে এল না? পঞ্চপাদিকা, বিজ্ঞানদীপিকা, প্রপঞ্চসার এবং পঞ্চাক্ষরী ভাষ্য (শিবের পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ব্যাখ্যা) প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে পদ্মপাদ গুরুর মতবাদের পুষ্টি সাধন করেছিলেন। তাঁর গুরুভক্তির স্বীকৃতি স্বরূপ আচার্য শংকর তাঁর প্রধান চারটি মঠের অন্যতম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থিত গোবর্ধনপীঠের আচার্য পদে তাঁকে অভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি কিরকম গুরুগতপ্রাণ ছিলেন, তাঁর গল্প বলি শোন। পদ্মপাদাচার্যের অন্য নাম সনন্দন। আচার্যের সব শিষ্যরা অসাধারণ গুরুভক্ত ছিলেন এবং সকলেই প্রাণপণে তাঁর সেবা করতেন। তবুও আচার্য কেবল সনন্দনের গুরুগতপ্রাণতার পুনঃপুনঃ প্রশংসা করতেন। এজন্য অন্যান্য শিষ্যদের মনে সনন্দনের প্রতি একটা অসূয়ার ভাব ছিল । আচার্য তা জানতেন। তাই সর্বসমক্ষে সনন্দনের একক বৈশিষ্ট্য প্রকট করার জন্য একদিন সনন্দন যখন অলকানন্দার অপর পারে গিয়েছিলেন, তখন সকলের সামনেই আচার্য অন্য পার থেকে ডাক দিলেন —'সনন্দন! সনন্দন! শীঘ্র এস।' গুরুদেবের ত্রস্ত আহ্বানে সনন্দন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন দুর্গম হিমালয়ের বিপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে হয়ত কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে। সেতুর উপর দিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে গেলে দেরী হয়ে যাবে, এই চিন্তা করে তিনি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা অলকানন্দায় ব্যস্ত হয়ে নেমে পড়লেন।

বরফাচ্ছন্ন খরস্রোতা নদী। স্রোতের বেগ এমনই প্রচণ্ড এবং উদ্দাম যে, তাতে মত্ত মাতঙ্গও পড়ে গেলে ভেসে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। এই দৃশ্য দেখে আচার্যের অন্যান্য শিষ্যরা সনন্দনের মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে হাহাকার করে উঠলেন। কিন্তু গুরুগতপ্রাণ শিষ্যের দেহকে সর্বদাই গুরু রক্ষা করেন। গুরুশক্তিতে বলীয়াণ সনন্দনের প্রতি পদক্ষেপেই এক একটি করে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে লাগল। সেই সকল পদ্মের উপরেই এক একটি পা রেখে উর্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে গুরুর চরণে এসে বন্দনা করলেন। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে তাঁর গুরুভ্রাতাদের আর বাক্যস্ফূর্তি হয় না। সনন্দনকে আলিঙ্গন করে অপরাপর শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ হতে সনন্দনের নাম হল পদ্মপাদ। তোমরা মনে রাখবে — ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ অর্থাৎ গুরুর চেয়ে বড় তত্ত্ব নাই আর গুরু সেবার মত আর কোন শ্রেষ্ঠ তপস্যা নাই। 'অদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য, মায়াবাদের প্রবক্তা, জ্ঞান-বিচারের নব ভগীরথ সেদিনই ঘোষণা করেছিলেন —

শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং,
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যং।
গুরোরঙ্ঘ্রি-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং।। ইত্যাদি

এই শ্লোকের ভাবার্থ হল, কারও শরীর কন্দর্পকান্তিই হোক, কিংবা সে নীরোগ শরীরের অধিকারীই হোক, সে যত বড় যশস্বী হোক, কিংবা তার মেরুপর্বত তুল্য ধনরত্নের পাহাড়ই থাক, গুরুপাদপদ্মে যদি চিত্ত লগ্ন না থাকে, তবে তার কি লাভ হল? অর্থাৎ গুরুভক্তি বিনা সবই নিরর্থক।

খুব ভাবাবেগের সঙ্গে শ্লোকটি উচ্চারণ করে সচ্চিদানন্দজী ভাবের ঘোরে কিছুক্ষণ দুলতে থাকলেন। প্রায় মিনিট দশেক পরে আবার তিনি বলতে থাকলেন — দেখ, এখন আমি একলিঙ্গস্বামীর সন্তান, নর্মদা মাতাকে আশ্রয় করে পড়ে আছি, পূর্বাশ্রমের শরীরটা জন্মেছিল মহারাষ্ট্র দেশে। মহারাষ্ট্রের জাতীয় গুরু, সমর্থ রামদাসস্বামী, যিনি ছত্রপতি শিবাজীর দীক্ষাগুরু, তিনি দাসবোধ নামক মহাগ্রন্থ লিখে গেছেন। দাসবোধ মারাঠীদের কাছে রামায়ণ মহাভারতের সমতুল্য। ঐ মহাগ্রন্থে ৭৭৫২ টি অভঙ্গ বা দোঁহা আছে। তাতে রামদাসস্বামী সদ্‌গুরু ও গুরুগতপ্রাণতার মহিমা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন —

১। পারস্ আপনা ঐসেঁ করীনা। সুবর্ণে লোহো পালটে না।
উপদেশ করী বহুত জনা। অংকিত সদ্‌গুরুচা।।

স্পর্শমিনির স্পর্শে লোহা সোনা হয়। স্পর্শমণি লোহা বা সোনাকে স্পর্শমণি করতে পারে না। কিন্তু গুরুগতপ্রাণতা থাকলে সদ্‌গুরু শিষ্যকে সদ্‌গুরুই করে তুলতে পারেন।

২। শিষ্যাস্ গুরুত্ব প্রাপ্ত হোয়ে । সুবর্ণে সুবর্ণ করি তাঁ।
স্মণৌনি উপমা ন সাহে । সদ্‌গুরুসী পরিসাচী।

সদ্‌গুরুর সেবায় শিষ্য গুরুপদে উন্নীত হন। গুরুর যোগবল তপোবল সবই গুরুগতপ্রাণ শিষ্যের মধ্যে বর্তে যায়। স্পর্শমনির দ্বারা কৃত সোনা, অন্য বস্তুকে সোনায় পরিণত করতে পারে না। কিন্তু গুরু পারেন তাঁর সেবককে গুরুর গুরুত্ব দিতে। অতএব সদ্‌গুরুর সঙ্গে স্পর্শমণিকে তুলনা করা চলে না। গুরু এবং তাঁর সেবকের মহিমা অনেক বেশী।

৩। আতাঁ উপমাবা গভস্তী। তরী গভস্তীচা প্রকাশ কিতী।
শাস্ত্রে মর্যাদা বোলতী। সদগুরু সেবক অমর্যাদ।।

সূর্যের সঙ্গে সদ্‌গুরু বা তাঁর সেবকের তুলনা করা যায় না। সূর্য ভূমণ্ডলের যতখানিই প্রকাশ করুন না কেন, তাঁর দীপ্তি যতই প্রচণ্ড হোক, সূর্য ত আর একটা সমান ভাস্কর ও জ্যোতির্ময় সূর্য নির্মাণ করতে পারেন না। কিন্তু সদ্‌গুরু তাঁর সেবককে নিজের স্বরূপ রূপে গড়ে তুলতে পারেন। শাস্ত্রমুখে সূর্যের মহিমা প্রকাশ করা গেছে। কিন্তু গুরুগতপ্রাণ সেবকের মর্যাদা বর্ণনা করা যায় না।

কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৯টা বেজে গেছে। উঠবার মুখে মহাত্মা মন্তব্য করে গেলেন, সমর্থ রামদাসস্বামীর মত বহু অনুভবী মহাত্মা এইভাবে গুরুগতপ্রাণ সেবকের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে গেছেন। তাঁরা সবাই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ সত্যবাক্। তাঁদের জীবনোপলব্ধি আমরা কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারি না। তাই তোমাকে সেদিন বলেছিলাম যে অভয়ানন্দজীকে যেভাবে কায়মনোবাক্যে গুরুসেবা করতে দেখি, তাতে আমার মনে হয় তিনি একদিন দ্বিতীয় একলিঙ্গস্বামীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন, তিনি নিয়ত আর পাঁচজনের মত ধ্যানধারণার নিরত না থাকলেও গুরুজীর অমিত তপঃশক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই সঞ্চারিত হয়ে যাবে। আমি চলি, শিবমস্তু।

অবশেষে ২০শে শ্রাবণ এসে গেল। ধাবড়ী কুণ্ডে স্নান পূজা করে আসার পরেই দেখি একলিঙ্গস্বামী এসে গেছেন। হরিস্বামী বেদীর উপর মৃগচর্ম পেতে দিয়েছেন। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। আমরা সবাই তাঁকে প্রণাম করে যে যার গুহায় গেলাম কাপড় বদলাতে। গুহার মুখে ঢুকবার আগে একবার পেছন ফিরে দেখতে গিয়ে দেখলাম, সকল সন্ন্যাসীই যে যার গুহায় ঢুকে গেছেন। কিন্তু অভয়ানন্দজী যান নি। তিনি ভিজা গায়ে ভিজা কাপড়েই গুরুসন্নিধানে বসে আছেন। প্রকৃত গুরুগতপ্রাণ ভক্ত গুরুকে লঙ্ঘন করে যাওয়াকে গুরুর মর্যাদাহানি, অপরাধ বলে মনে করেন। অভয়ানন্দজীর কাছে একলিঙ্গস্বামীই একমাত্র অভীষ্টদেব, তাঁর দুই চোখের মণিস্বরূপ। স্বয়ং বিধি বিষ্ণু মহাদেবকে চোখের সামনে দেখতে পেলে তাঁদেরকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেমন কোন ভক্ত যেতে পারে না, আজ অভয়ানন্দজীর সেই দশা দেখতে পেলাম। অন্যান্য সন্ন্যাসী-শিষ্যরা নিজেদের বেশবাশ বদলের জন্য চলে যেতে পারলেও অভয়ানন্দজী পারেন নি। অন্যান্যদের সঙ্গে অভয়ানন্দজীর তফাৎ কোথায়, এই দণ্ডেই আমার চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল।

আমি ত একলিঙ্গস্বামীর ভক্ত বা শিষ্য নই, কাজেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তাঁর দিকে পেছন ফিরে গুহায় চলে আসতে। কিন্তু অন্যান্য সন্ন্যাসী-শিষ্যদের আচরণ দেখে এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল আমার গ্রামের ভট্টাচার্য বাড়ীর এক বিধবা মাসীর কথা। সেই মাসীর উগ্র শুচিবাই সম্বন্ধে অনেক কথা এখনও গ্রামবাসীর মুখে মুখে ঘোরে। বেশ মনে পড়ছে, একবার আমি তাঁর বাড়ীতে বসেছিলাম, বৃন্দাবন থেকে তাঁর বৃদ্ধ বৈষ্ণব গুরু এক সেবকসহ 'মাসীর' বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। মাসী তখন নদীতে স্নান করতে গেছলেন, স্নান করে এসে গুরুকে দেখতে পেয়েই বললেন — হতভাগীর কি ভাগ্য গুরুদেব বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলেন, বসুন আমি এখনই শুদ্ধবস্ত্রে তিলক সেবা করে আসছি। মাসী গেলেন ত গেলেন, প্রায় একঘন্টা কেটে গেল, গুরুদেব বসে বসে ঘামছেন। তিনি কপালে গাইমূত্রে

তথা সর্বাঙ্গে পরিপাটি তিলকসেবা করে পট্টবস্ত্র পরে এসে গলায় আঁচল দিয়ে তারপর গুরুর পদতলে প্রণাম করলেন। এখানকার সন্ন্যাসীরা আমার সবাই নমস্য, তাঁদের দু'একজনকে ত আমি ভূতজয়ী সিদ্ধ মহাপুরুষ বলেই বিশ্বাস করি, তবুও অভয়ানন্দজীর তুলনায় তাঁদেরকে অনেক ছোট বলেই আমার মনে হল। ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ কিংবা গুরুঃ ব্রহ্মা, গুরুঃ বিষ্ণু, গুরুদেবঃ মহেশ্বরঃ, এসব কথা ত মুখে বললেই হবে না, আচরণেও তা ফুটিয়ে তোলা চাই!

যেতে যেতেই দেখলাম, সন্ন্যাসীরা গৈরিক বস্ত্রাদি পরে, দণ্ড কমণ্ডলু হাতে নিয়ে একে একে গুরুর কাছে বসছেন। আমিও গিয়ে বসলাম। অভয়ানন্দজীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম, তাঁর গায়ের জল তখনও শুকায়নি, তাঁর জটা ও চুল-দাড়ি থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে! তিনি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমিও গিয়ে সকলের পেছনে বসলাম। একলিঙ্গস্বামী গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন,

ওঁ হিমেনাকুলিতং বিশ্বং স্মরাত্যগ্নিং যথা তথা।
স্মরন্তি সততং বিষ্ণুং পিতৃ-দেবর্ষি মানবাঃ।

শীতে কাতর হলে বিশ্ববাসী যেমন অগ্নির শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ পিতৃগণ, দেবর্ষিগণ এবং মানবগণ ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করেন।

দূরস্থোহপি যথা গেহং চাতকো জলদশ্ যথা।
ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মবিদস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্॥

যেরূপ দূরস্থ ব্যক্তি গৃহকে, চাতক যেরূপ মেঘকে এবং ব্রহ্মবিদ্যাকে স্মরণ করেন, তদ্রূপ আমি ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করি।

হংসা মানসমিচ্ছন্তি ঋষয়ঃ স্মরণং হরেঃ।
ভক্তাশ্চ ভক্তিমিচ্ছন্তি তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্॥

যেরূপ হংসসকল মানস-সরোবর, ঋষিকুল শ্রীহরির স্মরণ, ভক্তসকল ভক্তি ইচ্ছা করেন, আমিও তদ্রূপ ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করছি। হর নর্মদে! হর নর্মদে।

বিষ্ণুস্মরণ ও নর্মদাস্মরণের পরেই তিনি সন্ন্যাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন — তোমরা এখন কোন শাস্ত্র মনন ও স্বাধ্যায় করছ?

অভয়ানন্দজী — ভগবন! আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সবাই এখন সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র মনন করছি। আমাদের তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। কোন কোন মন্ত্র মনন করতে গিয়ে স্বামী বিদ্যানন্দ ও স্বামী দিব্যানন্দের মনে উদয় হয়েছে যে ঐ অধ্যাত্মশাস্ত্রে ভগবান সনৎকুমার মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে কৌশলে বৌদ্ধমতবাদ ও মাধ্যমিক শূন্যবাদীদের মত এর উপর কটাক্ষ করেছেন এবং সুকৌশলে ঐসব মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। তাই ওঁদের মনে হয়েছে বুদ্ধের আবির্ভাবের পর হয় ঐ শ্লোকগুলি রচিত হয়েছে নতুবা পরবর্তীকালে ঐগুলি সংযোজিত হয়েছে।

একলিঙ্গস্বামী — ঐ দুই দণ্ডীস্বামীর মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে, তাকে এককথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তবে কারও বাক্যে বা রচনায় সমজাতীয় চিন্তাধারা থাকলেই একথা ভাবা ঠিক নয় যে একটির পর তার একটির উদ্ভব হয়েছে। যাইহোক যে কোন একটি শ্লোক আস্বাদনকালে তা আমি বিচার করে দেখাব। এখন শৈলেন্দ্রনারায়ণ, তুমি আমাকে বল, তুমি

কি মহাভারতের সনৎসুজাতীয় পর্বাধ্যায় মনন করার সুযোগ পেয়েছ?

আমি — না, ভগবন্! মহাভারত আমি পড়েছি , তবে তা যথোচিতভাবে গভীরভাবে চিন্তা বা মনন করে দেখি নি।

একলিঙ্গস্বামী — অবশ্য এখন তা করবার তোমার বয়স হয় নি। তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমেই সাধারণতঃ ঐ শাস্ত্র গভীরভাবে বিচার করার উপযুক্ত কাল। মহাভারতের সনৎসুজাতীয় পর্বাধ্যায়ে শোকদুঃখে কাতর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আচার্য শিরোমণি ভগবান সনৎকুমার বেদবেদান্তের যে সকল নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন, সেই সকল উপদেশই সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আচার্যের জ্ঞানামৃতবর্ষিণী কথাগুলি এত সুমধুর যে, মহাভরতের এ অংশকে গীতা বললেও অত্যুক্তি হয় না। গীতার সঙ্গে এর সাদৃশ্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে তথা সমগ্র জগৎবাসীকে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির উপদেশ দিয়েছিলেন, যোগেশ্বর ভগবান সনৎকুমারও তেমনি ধৃতরাষ্ট্রকে উপলক্ষ্য করে অধিকারীবিশেষের নিমিত্ত প্রধানভাবে কেবল জ্ঞান ও যোগকে ভিত্তি করে অমৃতস্যন্দিনী ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবদ্গীতার সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, কর্মনিষ্ঠা, ভক্তিনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা তুল্যরূপে সংকীর্তিত বলে গীতা সকল আশ্রমেই আদৃত হয়েছে আর চিত্তনাশের উপায়স্বরূপ জ্ঞান ও যোগকে অবলম্বন করে, মুখ্যভাবে ব্রহ্মবিদ্যাই উদাহৃত উপদিষ্ট হয়েছে বলে এই সনৎসুজাতীয় গ্রন্থ কেবলমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমেই সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

বিবিদিষু সন্ন্যাসীর এবং যুঞ্জানযোগীর বিশেষ হিতকর বলে দক্ষিণাপথের কন্যাকুমারিকা হতে উত্তরাপথের শক্রকুমারিকা (গঙ্গোত্রী) পর্যন্ত সমস্ত উপাসক সম্প্রদায়ের নিকটেই এই গ্রন্থখানি সুপরিচিত এবং সমাদৃত। ধর্মাদিচর্তুবর্গের মধ্যেও মোক্ষই যে পরমপুরুষার্থ তা সর্ববাদীসম্মত। মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও বেদান্তপ্রতিপাদিত মোক্ষকেই তাত্ত্বিক মোক্ষ বলে স্বীকার করতে হবে কারণ শ্রুতির তাৎপর্যানুসারে মোক্ষের স্বরূপ নির্ণয় এই শাস্ত্রে বিশেষভাবে অভ্রান্তভাবে করা হয়েছে।

আমার দিকে তাকিয়ে এই কথাগুলি মহাত্মা বললেন। এইবার তাঁর দণ্ডী শিষ্যদের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললেন — তোমরা তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত মনন করেছ বললে, এবার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি নিয়ে বিচার করি এস, সেই শ্লোক আস্বাদন করতে করতেই আমরা দিব্যানন্দ ও বিদ্যানন্দের সংশয়ের জবাব খুঁজে পাব আশা করি। অভয়ানন্দ শ্লোকটি আবৃত্তি কর।

অভয়ানন্দজী — সনৎসুজাত উবাচ —

> যত্তচ্ছুক্রং মহজ্জ্যোতিঃ দীপ্যমানং মহদ্যশঃ।
> তদ্বৈ দেবা উপাসতে তস্মাৎ সূর্যো বিরাজতে।
> যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্॥ (১, ৪র্থ অধ্যায়)

অর্থাৎ আত্মবিৎ জ্ঞানযোগী যাঁকে দর্শন করেন তিনি শুদ্ধ, মহৎ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, সদাই দেদীপ্যমান এবং মহদ্যশঃ। দেবগন তাঁর উপাসনা করেন। তা হতেই সূর্য ভাস্বর হয়ে বিরাজ করছেন। যোগিগণ সেই ভগবান সনাতনকে দর্শন করে থাকে ।

একলিঙ্গস্বামী — এইবার এই শ্লোকটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিচারমুখে উদ্ধার করবার চেষ্টা করি এস। এ কথা তোমরা সকলেই জান যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের দুটি উপায়। একটি

বিচারপূর্বক এবং অন্যটি যোগপূর্বক। সাক্ষীর কল্পিত সাক্ষ্য মিথ্যা বলে সাক্ষীস্বরূপ আত্মাই কেবল পরমার্থ সত্য — এইরূপ বিচার করে যাঁরা উপনিষদ্ জ্ঞানকে ভিত্তি করে জগৎ প্রপঞ্চের পরমার্থতা স্বীকার করে না, তাঁরা প্রথম উপায়টি গ্রহণ করেন ; আর যাঁরা জগৎপ্রপঞ্চের পরমার্থতা স্বীকার করে সাক্ষি-দর্শনে উপায়ান্তরের অভাব মনে করেন, তাঁর হিরণ্যগর্ভের মতানুসারে দ্বিতীয় উপায়টি গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মবাদি-ঋষিগণ ও তৎপরবর্তী গৌড়পাদ শংকরাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ বলেন যে, সমস্ত প্রকার প্রপঞ্চের ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্তা থাকলেও পরমার্থিক দৃষ্টিতে তা মিথ্যা। সুতরাং প্রপঞ্চের এই প্রকার স্বভাব বুঝে একমাত্র সত্যাত্মক ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করা জীবনের পরম পুরুষার্থতা। আর প্রাচীন শাস্ত্র ব্রহ্মবাদী যোগিগণ এবং তৎপরবর্ত্তী দক্ষাদি ঋষিগণ বলেন যে, প্রপঞ্চ যখন অনুভূত হয় তখন তার সত্তা আছে, কিন্তু ঐ সত্তার লোপ সাধন করতে হবে। অতএব চিত্তবৃত্তিনিরোধের দ্বারা প্রপঞ্চ জ্ঞানকে লুপ্ত একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করাই জীবনের পরম পুরুষার্থতা।

পরমতত্ত্ব উপলব্ধির উপায় নিয়ে এইভাবে উভয়মতের বাহ্যতঃ পার্থক্য থাকলেও মূলে কোনরূপ অনৈক্য নাই। এই দুটি মতবাদ বুঝবার জন্য একটা স্থূল উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন — কাঁচকুপী বায়ুপূর্ণ হলেও তার ভেতর বাহির দু'দিকই ব্যোম বা আকাশতত্ত্ব দিয়ে পরিব্যাপ্ত থাকে। ঐ কাঁচকুপী হতে বায়ু বের করে নিলেও ব্যোমপূর্ণই থাকবে। আমার এই কথার প্রথম পক্ষের মত কেউ কেউ হয় বলবেন যে বায়ু উপাধি মাত্র, তার সঙ্গে ব্যোমের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং ব্যোম ভাবতে হলে বায়ুর সত্তাকে বিচারে আনবার কোন প্রয়োজন নাই। আবার দ্বিতীয় পক্ষের মত হয়ত কেউ কেউ বলে বসবেন যে কাঁচকুপীর অন্তর-বাহির ব্যোমব্যাপ্ত এ ধারণা করতে হলে কাঁচকুপীর অভ্যন্তর হতে বায়ুর নিঃসরণ হওয়া চাই। একথার উত্তরে প্রথম পক্ষ বলবেন যে, প্রপঞ্চ বিষয়ে জ্ঞানে আরূঢ় থাকলেও তাকে মিথ্যা ও মায়াময় বলে ভেবে নিয়ে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জ্ঞানের উপলব্ধি করে তুলতে হবে আর দ্বিতীয় পক্ষ বলে যে, জ্ঞান হতে প্রপঞ্চ বিষয়ের নিঃসরণ করে সত্যাত্মক ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞানোপলব্ধির বিষয় করে তুলতে হবে।

এইরকম দুটি বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করবার অভিপ্রায়ে আচার্য শিরোমণি সনৎকুমার প্রথমে জ্ঞানপ্রধান যোগোপসর্জন ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলে এখন এই শ্লোকে যোগপ্রধান জ্ঞানোপসর্জন ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় দিচ্ছেন। উপসর্জন শব্দের অর্থ গৌণ বা অপ্রধান।

আমরা এইমাত্র যে দুটি বিরুদ্ধ মতের কথা বললাম সে সম্বন্ধে আমাদের আচার্যের অভিপ্রায় এই যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ বিচারবাদী বৈদান্তিক পক্ষ বিচারণার পক্ষ নিয়েছেন বটে, তবে দ্বিতীয় পক্ষ যোগবাদীদের সমাহিত অবস্থাই বিচারণার পূর্ববৃত্ত। চিত্তের সমাহিত অবস্থা ছাড়া 'বিচার' কখনও সিদ্ধ হতে পারে না। এ কথায় শংকরমতাবলম্বী বেদান্তী প্রতিবাদ করতে পারেন না। কারণ, 'শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষাপরায়ণ এবং সমাহিত হয়ে নিজের অভ্যন্তরে আত্মাকে উপলব্ধি করবে' এই জাতীয় শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রীশংকরাচার্য স্বয়ং যখন শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তিকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাধন বিশেষ বলেছেন তখন ধরে নিতে হবে যে যিনি যোগের দ্বারা সমাহিত অবস্থাকে ব্রহ্মবিচারণার পূর্ববৃত্ত হিসাবে ধরেছেন। দ্বিতীয় পক্ষ যোগিগণের সম্বন্ধেও আমাদের আচার্য সনৎকুমারজীর অভিমত এই বলে ধারণা করতে

পারি যে, যোগের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় সত্য কিন্তু প্রথম পক্ষের বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিচারণাই যোগের পূর্ববৃত্ত। আমাদের এই সিদ্ধান্তে যোগিগণও প্রতিবাদ করতে পারেন না কারণ বেদান্তে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিষয়ে কতকটা মানসিক সংস্কার না থাকলে যোগী অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করতে পারলেও চরমসিদ্ধি মোক্ষলাভ করতে পারবেন না।

এইভাবে উভয়ক্রমের ফল এক হলেও পাছে কেউ মাধ্যমিক শূন্যবাদীদের মত মনে করেন, নিদিধ্যাসনের অপরোক্ষজ্ঞানে শূন্যমাত্রই সার হয়ে থকে সেইজন্য আমাদের আচার্য ব্রহ্মের সত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য পুনঃপুনঃ যোগ প্রত্যক্ষকে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করে বলেছেন — 'যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি সনাতনম্' অর্থাৎ সেই সনাতন ভগবৎসত্তাকে যোগিগণ উপলব্ধি করে থাকেন। এই কথার অনুষঙ্গ এই যে, চিত্তের বৃত্তি রোধ করলে শূন্যতা মাত্র সার হবার সম্ভাবনা নাই।

প্রাচীনকালে কিছু লোক উপনিষদ্‌গত ব্রহ্মের ধারণা করতে না পেরে তাঁকে মহাশূন্য বলে মনে করতেন। তাদেরকে লক্ষ্য করেই আচার্যবাক্যের অনুষঙ্গ ★ দেখালাম। ঐ সম্প্রদায় হতে পরবর্তীকালে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের উদয় হয়েছে। বৌদ্ধদের এই সর্বোচ্চদর্শন শূন্যবাদকে কোন হিন্দুদর্শন সমর্থন করেন না। বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুদর্শন উভয়ই বেদমূলক কিন্তু একটি গণ্ডযোগে জন্মহেতু নিজের জননীকেই গ্রাস করার চেষ্টা আর অন্যটি শেষ পর্যন্ত স্থবিরা মাতৃদেবীকে কুপুত্রের নির্যাতন হতে রক্ষা করে। এই দুই প্রস্ত দর্শন অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করলে বুঝা যায়, ওদের একটি গুটিপোকা অন্যটি দাড়িম ফল। গুটিপোকা যে কোষে জন্মগ্রহণ করে, সেই কোষ ছিন্নভিন্ন করে নিজের সৌন্দর্য দেখাতে শূন্যপথে উড়ে যায় এবং জন্মস্থানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। বৌদ্ধদর্শনের অবস্থাও সেই রকম। কারণ তা বেদ হতে উদ্ভূত হয়ে বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে জগৎকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করেছে। আর দাড়িম ফল যে ফুল হতে উদ্ভূত হয়, শুষ্ক ও জীর্ণশরীর হয়ে গেলে তাকে ধারণ করে রাখে। হিন্দুদর্শন ঠিক সেই রকম। বেদ হতে উদ্ভূত হয়ে শেষপর্যন্ত বেদের প্রকৃত গভীর তাৎপর্যের পুষ্টি সাধন করেছে এবং বৌদ্ধদর্শনগত মোহের অসারতা ভালভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছে।

আলোচ্য শ্লোক বিচার ও মনন করতে গিয়ে মূল তাৎপর্যের অনুষঙ্গ হিসাবে দিব্যানন্দ ও বিদ্যানন্দের মনে যে ভগবান্ সনৎকুমারের উপলব্ধিকে বৌদ্ধদর্শন ও মাধ্যমিক শূন্যবাদের অকাট্য জবাব বলে মনে হয়েছে, তাদের ঐ সূক্ষ্মমননশীলতায় কোন ভুল নাই। ভাল করে বৌদ্ধদর্শন ও মাধ্যমিক শূন্যবাদের গ্রন্থ পড়া থাকলে আচার্যের প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ শ্লোকে তাদের অসারতা ধরা পড়ে বটে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, নাগার্জুনের পর শূন্যবাদ প্রায় প্রতীকোপসনায় পরিণত হয়েছে। 'অনাকাররূপং শূন্যং শূন্যং মধ্যে নিরঞ্জনঃ। নিরাকারমনঙ্গজ্যোতিঃ সংজ্যোতির্ভগবানয়ম্।' অথবা, শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্নবিনাশনম্। সর্বপরঃ পরোদেবস্তস্মাত্ত্বং বরদো ভব।' — শূন্যবাদের এইসব শ্লোকই আমাদের বক্তব্যের অনুকূলে সাক্ষ্য বহন করেছে। বিশেষতঃ মহাশূন্যের ধর্মদেবত্বপ্রাপ্তি বা শৈলেন্দ্রনারায়ণজীর গৌড়দেশে প্রচলিত রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজাপদ্ধতি পরীক্ষা করলেই ঐ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। সুতরাং এই সমস্ত ধর্মোবিরুদ্ধ বিষয়ের সমালোচনা ছেড়ে দিয়ে যার থেকে

★ অনুষঙ্গ — প্রসঙ্গের গভীরে নিহিত যে গূঢ় অর্থ।

মাধ্যমিক সম্প্রদায় নির্গত হয়েছিল, সেই প্রাচীন 'ত্রৈবিদ্যাসূত্রোক্ত অনাত্মবাদ'কে কিঞ্চিত পর্যালোচনা করে দেখি এস। সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে , যাঁরা আত্মার উপলব্ধি করতে না পেরে সর্বশূন্য তত্ত্ব নিয়ে গদগদ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের সেই সর্বশূন্যতার সাক্ষী কে? নিশ্চয়ই তার অনুভব-কর্তা! অনুভব-কর্তা বা অনুমন্তা যদি সর্বশূন্যের সাক্ষী হন, তাহলে সর্বশূন্যতা টিকে কি ? যদি বলা হয় যে সর্বশূন্যতার কোন সাক্ষী থাকতে পারে না তাহলে ত প্রমাণের অভাবে শূন্যবাদ স্বতঃই ব্যাহত হয়ে পড়ে ! এই সমস্ত বিরোধ দেখে মাধ্যমিকদের কোন কোন পণ্ডিত সরাসরি ব্রহ্মের নাম না করে তাঁর কতকগুলি (attributes) মহাশূন্যে আরোপ করে বসে আছেন। ব্রহ্মের ধর্মই যদি মহাশূন্যে আরোপ করা হয়, তাহলে আর বিরোধ থাকে কি করে? ঘুরে ফিরে তাদের মহাশূন্যকে ত ব্রহ্মবাদই গ্রাস করে ফেলল।

আচার্য সনৎকুমারের কথায় শূন্যবাদ খণ্ডনের অনুষঙ্গ দেখানো হয়েছে বলে মহাভারতের এই অংশটিকে মাধ্যমিকদের পরবর্তী সংযোজন বলে কোনমতেই বলা যায় না। কারণ মাধ্যমিকদের বহু পূর্বেও শূন্যবাদের প্রচলন ছিল। 'অসদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ', 'সর্বশূন্য নিরালম্বং স্বরূপং যত্র চিন্ত্যতে। অভাবযোগঃ স প্রোক্তো যেনাত্মানং প্রপশ্যতি।' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতির অনুসরণ করতে না পেরে যারা ব্রহ্মকে শূন্য ভাবতেন তাদেরকে আমাদের প্রাচীনেরা চার্বাক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নাস্তিক বলে মনে করতেন। বৈদিকযুগে এই সম্প্রদায় শূন্যবাদী হিসাবে অভিহিত না হলেও অনাত্মবাদী বলে পরিচিত ছিলেন।

এইজন্য আদিবিদ্বান্ কপিল সাংখ্যপ্রবচনে 'শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি ....' ইত্যাদি সূত্রের সমাবেশ করেছেন। গৌড়পাদাদি আচার্যগণ কর্তৃক সাংখ্যপ্রবচনকে যেমন তাঁদের পরবর্তী বলা যায় না, তেমনি মাধ্যমিকদের শূন্যবাদ দেখে সাংখ্যপ্রবচনে শূন্যতত্ত্বের সমালোচনা করা হয়েছে এ কথাও বলা উচিত হবে না।

ভাস্করাচার্য গোলাধ্যায়ে 'আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহীতয়া যদ্ ....স্বাভিমুখং সশক্ত্যা' ইত্যাদি বচনের দ্বারা বহু পূর্বে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির উল্লেখ করে গেছেন। কেবল মাধ্যাকর্ষণী শক্তি কেন, শ্লোকের 'মহীতয়া যৎ' শব্দের দ্বারা পরমাণু প্রভৃতি জড়পদার্থের আপীড়নকেও লক্ষ্য করেছেন। এই ত কিছুকাল পূর্বে পশ্চিমজগৎ মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বিদ্যমানতা স্বীকার করে প্রচার করেছেন কিন্তু ভাস্করাচার্যের আকৃষ্টিশক্তির কোন উল্লেখ করেন নি। সেইজন্য কি বলতে হবে যে পশ্চিমজগতে মাধ্যাকর্ষণী শক্তির কথা আবিষ্কৃত হওয়ার পর ভাস্করাচার্যের গোলাধ্যায় প্রণীত হয়েছে। পশ্চিম জগতের বিদ্বানরাও একথা ভালবালেই জানেন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিক নিউটনের বহুপূর্বে 'আকৃষ্টি শক্তিশ্চ' এই তত্ত্বের প্রবক্তা ভাস্করাচার্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদে বা ছান্দোগ্য উপনিষদে পিতৃযান ও দেবযান শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধগণ ঐ ভাবে হীনযান ও মহাযান নাম গ্রহণ করেছেন। সেইজন্য কি বলতে হবে যে শাক্যবুদ্ধের পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের হীনযান ও মহাযান নাম দেখে ঋগ্বেদাদির পিতৃযান ও দেবযান শব্দ আম্নাত হয়েছে? অতএব সাংখ্য প্রবচনকে কিংবা মহাভারতের অংশ এই সনৎসুজাত পর্বকে বৌদ্ধযুগের পরবর্তী বলে কারও ধর্মদ্রোহী হওয়া উচিত নয়।

আমাদের আচার্য সনৎকুমার এই অধ্যায়ে পুনঃপুনঃ যোগানুভবকে প্রমাণ রূপে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যোগ কি ? অঙ্গাঙ্গীভাবে বদ্ধ চিত্তের বহির্মুখ বৃত্তিগুলিকে বিলোমপরিণামের

দ্বারা সেগুলিকে আপন আপন কারণে লয় করার নাম যোগ। এই যোগই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায়। ককারাদি বর্ণের অভ্যাস যেমন ক্রমে শাস্ত্রবোধ উৎপন্ন করে, যোগও তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ঘটায়। যোগ চিরবর্তমান, হিরণ্যগর্ভও যোগের অনুসারক ও বক্তা। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন — হিরণ্যগর্ভঃ যোগস্য বক্তা নান্য পুরাতনঃ। দর্শনশাস্ত্রগুলির ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে, কিন্তু যোগ অজাতশত্রু, যোগের সঙ্গে কারও বিরোধ নাই। যোগাই সমস্ত বিদ্যার প্রাগ্‌ভাগ বলে গণ্য। স্মৃতিকার দক্ষও বলেছেন —

স্বসংবেদ্যং হি তদ্‌ব্রহ্ম কুমারী স্ত্রীসুখং যথা।
অযোগী নৈব জানাতি জাত্যন্ধো হি যথা ঘটম্‌॥

অর্থাৎ জন্মান্ধ যেমন ঘটপটাদিপদার্থের চাক্ষুষ জ্ঞান পায় না, কুমারী যেমন স্ত্রীসুখ বুঝতে পারে না, অযোগীও সেইরকম স্বসংবেদ্য ব্রহ্মের বিষয় কিছুই জানতে পারে না। যম নিয়মাদি না পালন করলে যেমন সংযম হয় না এবং সংযম না হলে যখন কেবল উপনিবদ আত্মসাক্ষাৎকার কেন, কোন বিদ্যাই অধিগত হয় না, তখন ব্রহ্মবাদিগণ যোগের আবশ্যকতা কিভাবে অস্বীকার করবেন? বেদান্ত দর্শনে 'আসীনঃ সম্ভবাৎ' এই সূত্রে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান যোগসাপেক্ষ এবং বেদে যোগবিষয়ক বহু সূক্ষ্ম সংকেত লিপিবদ্ধ আছে এজন্য আমাদের আচার্য সনৎসুজাত কর্তৃক যোগ অভ্যুপগত ★ হয়েছে।

এইবার আমরা মূলের অনুসরণ করব। আচার্য এই শ্লোকে বলতে চাইছেন যে, আত্মবিৎ সংসারের অতীত যে পরম পদার্থ অনুভব করেন তা পরম বিশুদ্ধতত্ত্ব। কারণ শ্রুতিই তাঁকে অমৃতাত্মক শুদ্ধ ব্রহ্ম বলে অভিহিত করেছেন — তদেব শুক্রং তদ্‌ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ। দেবগণ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ তাঁকে বিষয়ীভূত করার জন্য লালায়িত কিন্তু তারা কখনই কৃতার্থ হয় না। ভাবার্থ এই যে, সকলেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের বাসনা করে কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ কখনও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হয় না। শ্রুতি বলেন — 'পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়গণকে অভিশাপ দিয়েছেন সেইজন্য তারা অন্তর্মুখ না হয়ে সর্বদা বহির্মুখ হয়ে থাকে। 'তস্মাৎ সূর্যো বিরাজতে,' শ্লোকের এই পংক্তিটির অর্থ হল, ব্রহ্ম হতেই সূর্য বিরাজ করছেন অর্থাৎ সূর্য পরমেশ্বরের নিকট হতেই আলোক পাচ্ছেন বলেই জগৎকে আলোক দিতে পারছেন। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্য হল — তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

শ্লোকের শেষ চরণে, 'ভগবান্‌' ও 'সনাতন' এই দুটি শব্দের প্রয়োগ আছে। অভিপ্রায় এই যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগিগণ সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মলাভ করেন এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে তাঁরা নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মলাভ করে থাকেন। পদযোজনা হতে এইরকম অর্থ না হলেও অনুসঙ্গ হতে ঋষির এই রকম আশয় অনুমান করা যায়।

এই পর্যন্ত বলে মহাত্মা চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তাঁর দয়ায় শাস্ত্র বাক্য মনন করার বিধি কি তার একটা দিগ্‌দর্শন পেলাম। তিনি ধ্যান নিমীলিত লোচনে বসে আছেন আর তাঁর সন্ন্যাসী-শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁদের প্রত্যেকেই সমকায়শিরোগ্রীব হয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। বেলা তখন বোধহয় এগারটা, নর্মদাতটের মুক্ত আকাশতলে গুরু ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর এইরকম ধ্যাননিবিষ্ট দৃশ্য দেখে প্রাচীন বৈদিক ভারতবর্ষে ঋষিদের

★ অভ্যুপগত — অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত।

তপোবন-দৃশ্য যেন আমার চোখে ভেসে উঠল। সবুজ গাছপালা ও পর্বতের অপরূপ শোভা এই পরিবেশকে আরও মহিমামণ্ডিত করে তুলেছে।

আমি মনে মনে ভাবছি, এইভাবে তাহলে এঁরা সমবেতভাবে প্রতিদিন মিলিত হয়ে মনন ও নিদিধ্যাসনেই মধ্যাহ্ন-কাল অতিবাহিত করেন। প্রায় দু'মাস হতে চলল, এতদিন এখানে থেকেও তাঁদের এই গোপন ইষ্টগোষ্ঠীর সন্ধানই আমি পাই নি। সচ্চিদানন্দজীও ঘূণাক্ষরে আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। আজ বুঝতে পারলাম, ধাবড়ী কুণ্ডে পূজা ও মধ্যাহ্ন-ভোজনের কাল ছাড়া কেন কোনদিন আমি গুহার বাইরে এদেরকে দেখতে পাই নি! আরও একটা জিনিষ শিখলাম, গুরুবাক্য শুনতে শুনতে কায়মনোবাক্যে একাগ্র হয়ে কিরকম ধ্যানাসনে বসে থাকতে হয়!

হঠাৎ 'হর নর্মদে' ধ্বনিতে আমি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, একলিঙ্গস্বামী চোখ খুলে আমার উপরেই দৃষ্টি স্থাপন করেছেন। দীপ্ত চক্ষুর রশ্মি ফেলে তিনি যেন আমার ভিতরটা পরখ করছেন!

-- শৈলেন্দ্রনারায়ণজী ! হমারা প্রবচন সে আপকা মনমেঁ কোঈ জিজ্ঞাসাকী উদয় হুয়া ত মুঝে বাতাইয়ে।

আমি মহাত্মার আশ্বাস পেয়ে তাঁকে যুক্তকরে নিবেদন করলাম — আপনার কথা শুনে আমার বুক গর্বে ও আনন্দে ভরে উঠেছে। দেশ বিদেশের সাধারণ লোকের ধারণা, যতকিছু বিজ্ঞানের বিস্ময়কর গবেষণা ও আবিষ্কার কার্য হয়েছে পাশ্চাত্যদেশে। ভারতের পণ্ডিতবর্গ কেবল ন্যায়ের কচকচি বেদান্তের গুরুগম্ভীর তত্ত্বালোচনা এবং ব্যাকরণের 'গুস্তনাদের মগর নদী, ধগুনিনাদের আঁ, গপে পক্কশ্চ ভজ দীর্ঘশ্চ' এইসব সূত্র মুখস্থ করে কিংবা কাব্যের রস আলোচনা করেই কাল কাটিয়েছেন। যাঁরা ন্যায় বেদান্ত ব্যাকরণ বা কাব্যের কোন উপাধি নিতে পারেননি, তাঁরা পুরাণাদি, পুরোহিত দর্পণ বা কিছু তন্ত্রশাস্ত্র মুখস্থ করে পূজাপাঠ করেই কাল কাটিয়েছেন বা এখনও কাটাচ্ছেন। আর সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে ধারণা তাঁরা কেবল পরলোকের কথা চিন্তা করেন, নিজের আত্মারই উন্নতি কিসে হয় সেই ভাবনায় মত্ত থাকেন। তাঁরা ইহলোকের বিষয় কোন চিন্তাই করেন না, বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলন ত নয়ই। আজই আপনার কাছে জানতে পারলাম যে নিউটনের মত প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিকও তাহলে কেউ কেউ আমাদের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও বর্তমান ছিলেন? আমি ভাস্করাচার্যের বিজ্ঞান গবেষণা সম্বন্ধেই আরও কিছু জানতে চাই। আপনি দয়া করে বলবেন কি ?

একলিঙ্গস্বামী — ভাস্করাচার্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সহ্যাদ্রি নামক পশ্চিমঘাট পর্বতের নিকট বিজড়বিড় গ্রামে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মহেশ্বর আচার্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ভোজরাজের সভাপতি ভাস্কর ভট্ট এঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ এবং গ্রহযাগবিশারদ লক্ষ্মীধর এঁর পুত্র ছিলেন। ভাস্করাচার্য প্রণীত সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রমাণ করে যে তিনি জগতের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গাণিতিক। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ গাণিতিক নিউটন পৃথিবীর চর্তুদিকে চন্দ্রের আবর্তন নিয়ে যখন গবেষণা করছিলেন, তখন গাছ হতে আপেলের ভূপৃষ্ঠে পতন দেখে তিনি আপেলের ঊর্ধ্বগমন না হয়ে অধোগমন হল কেন এ-বিষয়ে চিন্তা করতে করতে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের বহুপূর্বে ভারতের ভাস্করাচার্য

ধনুর্নিঃসৃত বাণ ঊর্ধ্বমুখে নিক্ষিপ্ত হলেও অধোমুখে ভূপতিত হয় কেন তার বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এবং সমগ্র জড় পদার্থের আপীড়ন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ভাস্করাচার্য তাঁর প্রণীত সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক গ্রন্থের শেষখণ্ড গোলাধ্যায়ে লিখেছেন —

আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ স্বস্থং গুরুং স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যার্থ হল, আকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন পৃথিবী যখন আকাশস্থ গুরুবস্তু নিজের দিকে আকর্ষণ করে তখন মনে হয় যেন ঐ সকল বস্তু পড়ছে, বাস্তবিক পক্ষে তারা স্বেচ্ছায় পড়ছে না, পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির জোরেই পৃথিবীতে আসছে। সকল দিকে সমান আকর্ষণে আবদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এমন অবস্থায় পৃথিবী আকাশে কোথায় গিয়ে পড়বে? তার মানে এই যে পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে এবং সেই আকর্ষণ-শক্তির বলে কেউ কক্ষচ্যুত হয় না।

সামান্য অনুধ্যান করলেই বুঝা যায় ভাস্করাচার্যের ঐ শ্লোকটিতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং গ্রহনক্ষত্রাদির আপীড়ন শক্তি অবধারিত হয়েছে। কারণ 'মহী' শব্দ ঘনতার পরিচায়ক। যদিও বাসনাভাষ্যে তিনি বলেছেন — 'আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহীত্যনেন ভূমেরধঃ পতনং তৎতির্যগধঃ স্থিতানাং চাধঃপতনশঙ্কা নিরস্তা'। তথাপি ঐ কথা সাধারণকে বোধগম্য করাবার জন্যই বলেছেন বলে ধরতে হবে। ব্রহ্মবিৎ নন, কেবল শাস্ত্রবিৎ হয়েই ভাস্করাচার্য যে বিজ্ঞান-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা কোন অংশেই পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাচার্য নিউটনের চেয়ে কম নয়।

মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব ছাড়াও ভাস্করাচার্য গোলাধ্যায়ের 'প্রোক্তো যোজন সংখ্যায়া' (৩।৫২) ইত্যাদি শ্লোকে পৃথিবীর ৪৯৬৭ যোজন পরিধি এবং $১৫৮১^{২}/_{২৫}$ যোজন ব্যাস নির্দেশ করেছেন। ৫.১ মাইলে মাগধীয় যোজন হয়। এই রকম হলে, আধুনিকভূগোলবিৎ পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভাস্করাচার্যের গবেষণার অত্যাশ্চর্য মিল দেখা যায়। এ ছাড়াও উক্ত পরিধি-ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধ $৪৯৬৭ \div ১৫৮১^{১}/_{২৪}$ বা ১১৯২০৮/৩৭৯৪৫ অর্থাৎ ৩.১৪১৫৯ বলে ভাস্করাচার্যই সর্বপ্রথম নির্ধারণ করে গেছেন। আধুনিক গণিতজ্ঞগণ এই সংখ্যাটিকে 'পাই' (π) বলে নির্দেশ করে থাকেন। সুতরাং এ সম্বন্ধেও অর্বাচীন মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন ভাস্করাচার্যের মতবাদের কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

ভারতের অন্যতম বিজ্ঞানী লল্লাচার্য পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করে গেছলেন। তদনুসারে ভাস্করাচার্য পৃথিবীর সমতলতা প্রতিষেধ করে বলে গেছেন —'যদি সমা মুকুরোদর সন্নিভা ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ। উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমন্ কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে' : । অর্থাৎ পৃথিবী যদি দর্পণাদির মত সমতলক্ষেত্র হয় তবে দেবতাদের মত ক্ষিতিতলগত দূরবর্তী নৌকাদি মানুষের দৃষ্টিপথে পড়ে না কেন? গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে মনুষ্যগণ কর্তৃক দূরস্থিত কিন্তু দৃষ্টিসীমা মধ্যবর্তী বস্তু উপলব্ধি হয় না বলে পৃথিবী যে গোল তা নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদন করা যায়। যেজন্য পৃথিবীকে আপাতদৃষ্টিতে সমতল বলে মনে হয়, তার কারণ নির্দেশপূর্বক ভাস্করাচার্য বলেছেন —'সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশ পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্। নরশ্চ তৎ পৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা।' অর্থাৎ

মানুষ পৃথিবীর আয়তনের চেয়ে নিতান্ত ক্ষুদ্র বলে পৃথিবী গোল হলেও চক্রাকার সমতলক্ষেত্রের মত দেখায়।

লল্লাচার্যের সিদ্ধান্তের সমর্থনে পৃথিবীর গোলত্ব ভাস্করাচার্য স্বীকার করে নিলেও তাঁর শেষ জীবনে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন — কপিথ ফলবৎ বিশ্বং অর্থাৎ নিখুঁতভাবে বলতে গেলে বলতে হয় পৃথিবী দেখতে একটা কঁতবেলের মত । পৃথিবীর দুই মেরু ঈষৎ চ্যাপ্টা । আধুনিক বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন কিন্তু তাঁদের বহুপূর্বেই ভাস্করাচার্য গোলাধ্যায়ে পৃথিবীর সঠিক আকার ঘোষণা করে গেছেন।

গোলাধ্যায়ের 'লঙ্কাপুরেহকস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ' ইত্যাদি শ্লোকে দেখলেও বুঝা যায়, তিনি পৃথিবীর পরিধির ৩৬০° অংশ চারটি ৯০° অংশে ভাগ করে কোন্ কোন অংশের প্রতিলোমে কি কি দেশ অবস্থিত তারও পরিচয় দিয়ে গেছেন। তুমি যদি কোনদিন ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি পড়, কতকগুলি শ্লোক বিশেষভাবে সমীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে পাটীগণিত, বীজগণিত, স্থিতিগণিত (Statics) গতিগণিত (Dynamics) বলগণিত (Caynatics) জলগণিত (Hydrostatics), ভূমিতি, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি , জ্যা-তত্ত্ব, কোটিজ্যাতত্ত্ব, স্পর্শরেখাতত্ত্ব, কোটিস্পর্শরেখাতত্ত্ব, প্রঘাতসারণী, চক্রতত্ত্ব, ভগণতত্ত্ব, ভূগোলতত্ত্ব, খগোলতত্ত্ব, বর্গাঙ্ক , যুগপদাঙ্ক, দ্বিপদাঙ্ক (Binomial Theorem), ঘাতাঙ্ক (Exponential Theorem) ব্যাসকলন বা চলগণিত (Differential Calculus), সমাসকলন (Intigral Calculus) এবং শঙ্কুচ্ছেদাদি (Conic Section) প্রভৃতি শাস্ত্ররহস্য ভাস্করাচার্যের নিকট কখনই অপরিচিত ছিল না।

আমাদের দেশে 'ক্যালকুলাস্' বা সূক্ষ্মরাশিগণিত অর্থাৎ চলগণিত সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ নাই, একথা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা সগর্বে ঘোষণা করে থাকেন। তাঁদের মনে নিউটনই সূক্ষ্ম রাশিগণিতের স্রষ্টা। নিউটনের অলৌকিক বিজ্ঞান-প্রতিভাকে যথোচিত শ্রদ্ধা জানিয়েও আমি বলছি কেউ যদি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে ক্যালকুলাস্ বা সূক্ষ্মরাশিগণিতের তত্ত্ব ভাস্করাচার্যের অবিদিত ছিল না। তিনি গোলাকার বস্তুর গোলপৃষ্ঠফল ও গোলঘনফল এবং ডিম্বাকার বস্তুর ডিম্বপৃষ্ঠফল ও ডিম্বঘনফল অঙ্ক কষে বের করতে পারতেন। ক্যালকুলাসের নিয়ম জানা না থাকলে ঐসব ফল বের করা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব হত না।

কেবল ভাস্করাচার্য কেন, তাঁর পূর্বে 'লঘুমানস' প্রণেতা মুঞ্জাল এবং 'মহাসিদ্ধান্ত' প্রণেতা আর্যভট্টও ক্যালকুলাসের নিয়মগুলি আয়ত্ব করেছিলেন। যেমন দ্বিপাদাঙ্ক (Binomial Theorem) এবং ঘাতাঙ্কাদি (Exponential Theorem) না জানলে ক্যালকুলাস জানা যায় না, সেইরকম ক্যালকুলাস না জানলে গোল পদার্থাদির পৃষ্ঠফল বা ঘনফল কখনই বের করা যায় না।

আমার শিষ্য মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সভাজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রমাণ করেছেন যে ভাস্করাচার্য, নিউটন এবং লাইব্নিট্জের অনধিক ৫০০ বৎসর পূর্বে ব্যাসকলনের বহু সূত্র আবিষ্কার করে গেছেন। বাপুদেব শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত-শিরোমণির টিপ্পনীতে লিখেছেন — 'চলিত (Differential Calculus) প্রকারেণৈতৎ সম্যগ্ উপপদ্যতে। কিংচাচার্য্যেণাপি চলিত গণিতমবিদুরিত্যত্র সাধনমেয প্রকার ইত্যপি বক্তুং সুশকম্'।

বেদমন্ত্রের কেবল তত্ত্বমূলক ও যজ্ঞপরক ব্যাখ্যাতে মত্ত না থেকে কেউ যদি বিজ্ঞানতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাহলে শত শত মন্ত্রের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক তথ্য ও সূত্রের সন্ধান পাবেন। ঋষি গৌতম, কনাদ ও আচার্য প্রশস্তপাদের গ্রন্থের মধ্যে পদার্থবিদ্যার অনেক উচ্চকোটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। ঋষিরাই ছিলেন প্রাচীন ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখার দ্রষ্টা এবং গবেষক। কাজেই ঋষিরা ইহজগতকে অসার ও মিথ্যা ভেবে, কেবল পরমার্থ-তত্ত্বে ডুবে থাকতেন, সাধারণের এ ধারণা ভুল। অলমিতি বিস্তরেণ।

নর্মদাতটের এই ঋষি নীরব হলেন।

আমি — আপনার কাছে অনেক নূতন ও অমূল্য তথ্যের সংবাদ পেলাম। আমার প্রগলভ প্রশ্নে আপনি দয়া করে কোন অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

একলিঙ্গস্বামী — নেহি জী, নেহি জী! (সচ্চিদানন্দজীর দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা, আভি কহিয়ে ত, সচ্চিদানন্দ আপ্‌কো আচ্ছিতরেসে দেখভাল করতে হেঁ কি নেহি?

আমি — হাঁ ভগবন্, উনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তবে ওঁর বিরুদ্ধে আমার কিছু সিকায়ৎ (অভিযোগ) আছে।

আমার কথার মধ্যে যেন নূতন কোন রগড়ের সন্ধান পেয়েছেন, এইভাবে তিনি নড়েচড়ে বসলেন। হাসতে হাসতে বললেন — বাতাইয়ে, বাতাইয়ে সমুচা খোল্‌সা করকে বাতাইয়ে ত!

সচ্চিদানন্দজীর দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি হেনে আমি বলতে লাগলাম — আমি যখনই কোন গুহ্যতত্ত্ব জানবার জন্য ওঁকে প্রশ্ন করি, তখনই সে বিষয়ে কোন রসালো চুটকী শুনিয়ে, উনি কেটে পড়েন, তখনই উনি অজুহাত দেখান নিদ্ আতী হ্যায়! আমি ওঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শিব অর্ধনারীশ্বর কেন? অর্ধনারীশ্বরের অর্থ কি ? উনি একটা টপ্পা শুনিয়ে বললেন, শিব ত ভিখারী, কোন মতে কায়ক্লেশে ভিক্ষান্নে নিজের পেটটা চালাতে পারেন। তার উপর ঘরণীকে ভাগ দিতে হলে তাঁর নিজের পেট ভরবে না, ঘরণীকেও আধপেটা খেয়ে থাকতে হবে, তাই অনেক ভেবেচিন্তে শিব ঘরণীকে নিজের অর্ধাঙ্গে লেপটে নিলেন অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বরের রূপ ধারণ করলেন, ফলে দুজনের দুটো পেট একটা পেটে পরিণত হল! এই নাকি অর্ধনারীশ্বরত্বের গুহ্য কারণ!

আর একদিন সন্ধ্যাবেলা ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গঙ্গা যখন মর্ত্যে অবতরণ করেন, তখন তাঁর প্রচণ্ড বেগ আর কেউ ধারণ করতে পারবেন না বলে ভগীরথের কাতর প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে আশুতোষ নিজের মাথা পেতে দিয়েছিলেন, ভাল কথা, কিন্তু সেই গঙ্গার স্পর্শে কপিলের কোপাগ্নিতে ভস্মীভূত সগর-সন্তানরা যখন উদ্ধার হয়ে গেলেন, তখন গঙ্গাধর গঙ্গাকে মাথা থেকে নামিয়ে দিলেন না কেন? চিরকাল ধরে গঙ্গাকে মাথায় রাখার এ বিড়ম্বনা প্রভু সহ্য করছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সচ্চিদানন্দজী একটি রসস্নিগ্ধ সংস্কৃত কবিতা শুনিয়ে বললেন — সমুদ্রমন্থনের সময় মৃত্যুঞ্জয় গরল পান করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে সেই বিষ ত আছেই, তারপর তাঁর সারা অঙ্গে সাপ জড়িয়ে আছে, কপালে রয়েছে অগ্নি। গঙ্গাকে মাথা থেকে নামিয়ে দিলে পাছে ঐ বিষ ও আগুনের জ্বালায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েন, এই ভয়ে নাকি তিনি গঙ্গাকে নামাতে সাহস পাচ্ছেন না!

আমার অভিযোগের ফিরিস্তি শুনে স্বয়ং মহাত্মা এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন। সচ্চিদানন্দজী সলজ্জবদনে মাথা হেঁট করে বসে আছেন। আর একজনকেও দেখলাম বিরক্ত মুখে বসে আছেন তাঁর কপাল ও ভ্রূদ্বয়ে বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট। তিনি হলেন বিদ্যানন্দ।

একটু পরে হাসি থামিয়ে একলিঙ্গস্বামী আমাকে বললেন, রসিক কবি তোমার কাছে যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সুকৌশলে চেপে গেছে আমি তোমাকে তা অল্প কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। অর্ধনারীশ্বর শব্দটি রূপকে বলা হয়। কুছ মায়ীকী কুছ্ অংশ দয়াল-ঈ। দোনোকী রচন্ ইহ খামখেয়ালী। পরমেশ্বর মহাদেব এবং পরমেশ্বরী আদ্যাশক্তির খেলা এই বিশ্বজগৎ। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্য স্মরণ কর — একোহহং বহুস্যাম্। এক আছি বহু হব — এই ভাগবতী ইচ্ছা থেকেই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগতের সৃষ্টি। তদ্‌সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশ্যৎ। দয়ালের ইচ্ছা এবং মায়ের শক্তিতেই , অর্থাৎ তাঁদের ক্ষণেকের খামেখেয়ালেই এই ত্রিজগৎ স্তরে স্তরে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে প্রকটিভূতা হলেও তাঁরা তাঁদের এই সৃষ্টজগৎ বা সৃষ্টি হতে দূরে নাই। সৃষ্টবস্তুর মধ্যে তাঁরা অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন। এটি তাঁর দয়ার লক্ষণ। এটি একটি খেলা, লীলা বা খামখেয়াল বলে ধরা যায়। এ কথা ঋষিদের উপলব্ধি সত্য যে যেখানে শিব সেখানেই শক্তি বিরাজিত, যেখানে শক্তি সেখানেই শিব, এ দুটি তত্ত্ব সর্বদা অঙ্গাঙ্গীভাবে ওতপ্রোত হয়ে বর্তমান। যেখানেই Static Energy সেইখানে Kenetic Energy নিহিত থাকে। স্থিতির মধ্যে গতি এবং গতির মধ্যে স্থিতির সঞ্চরণ সর্বদাই চলছে। আলো থেকে যেমন তার আভাকে আলাদা করা যায় না, চৈতন্য থেকে তার জ্যোতিকে নয়, তেমনই শিব থেকে শিবের শক্তি পৃথক হবেন কি করে? এই জগৎকে উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন চিৎ-জড়ের গ্রন্থি। স্থুল চক্ষে যাকে জড় বলে দেখা যায় তাও আসলে পরাবর দৃষ্টিতে চৈতন্য ছাড়া কিছু নয়। আলোর অভাবকে সাধারণতঃ অন্ধকার বলা হয়। আমাদের চোখের রেটিনা ১০০, ২০০, ৫০০ বা জোর হাজার ওয়াটের আলো সইতে পারে কিন্তু চোখের সামনে হাজার বা দুহাজার ওয়াটের আলো জ্বাললে তখন চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, চোখের সামনে তখন সব অন্ধকার। এই অন্ধকার কিন্তু আলোর অভাব নয়, আলোর প্রাচুর্য। এ জগৎ চৈতন্যময়, চৈতন্যময় শিব এবং চৈতন্যময়ী শিবানী একত্রে ওতপ্রোতভাবে থাকায় চিদ্‌সত্ত্বার প্রাচুর্যে জড় বলে প্রতিভাসিত হচ্ছে। জড় কিন্তু সাধারণ অর্থে জড় নয়, ত্রিভুবনের অর্ন্তসত্ত্বায় রয়েছে চৈতন্যের ঘনীভূত রূপ। চৈতন্যের মধ্যে নিত্যস্থিতি আছে, আছে গতিও। এই শাশ্বত স্থির সত্তা ও শাশ্বতী গতির চিরভাস্বতী রূপকেই রূপকভাবে বলা হয়েছে অর্ধনারীশ্বর।

এইবার গঙ্গাধরের মাথায় গঙ্গাধারণ তত্ত্বটি বুঝবার চেষ্টা করি এস। গঙ্গা শব্দে জ্ঞানকে বুঝায়। (আমার দিকে তাকিয়ে আমাকেই লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন) আমি জানি, তুমি তোমার বাবার মুখে এই শ্লোকটি বহুবার শুনেছ — 'কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞান-গঙ্গা।' পঞ্চক্রোশী কাশীতে যেমন গঙ্গা আছেন, তেমনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চকোষাত্মক শরীরে, আমাদের মস্তিষ্ককোষে জ্ঞান-গঙ্গা নিত্য বিরাজিতা। গম ধাতু + অন কর্তৃবাচ্যে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ প্রত্যয় করে গঙ্গা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। গম্ ধাতু গতিসূচক। চরৈবেতি, নিত্য এগিয়ে চলার মহামন্ত্রে উর্দ্ধের দিকে যে প্রেতি, গম্ ধাতুতে তারই ব্যঞ্জনা আছে। ন+ন = অন। ন মানে অনন্য। সর্বত্র

স্থিতিশীল, সর্বগত ও সর্বব্যাপী। জ্ঞান প্রজ্ঞা বোধি সম্বোধি যাই বল, সকলেরই মূর্ত বিগ্রহ হলেন শংকর। মানুষের মস্তিষ্ককোষে যেমন আছে বুদ্ধি ও জ্ঞান তেমনি সমষ্টি চৈতন্যের আধারভূত সত্তা শংকরের মাথায় আছেন গঙ্গা। তোমরা আমরা কি আমাদের মস্তিষ্ক হতে বুদ্ধি বা জ্ঞানকে নিষ্কাসিত করে দূরে রাখতে পারি? পারি না, কখনই পারি না। তাহলে গঙ্গাধর শংকর কিভাবে গঙ্গাকে দূরে সরিয়ে রাখবেন?

গঙ্গা বিষয়ে আমার উত্তর দিয়েই তিনি বিদ্যানন্দকে বললেন — বিদ্যানন্দ তোমার মুখে চোখে একটা অপ্রসন্নতার ভাব ফুটে উঠেছে কেন? শৈলেন্দ্র নারায়ণের 'সিকায়েতে' শ্রদ্ধা প্রেম ও রঙ্গরস মিশে ছিল। কিন্তু তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সচ্চিদানন্দের বিরুদ্ধে তোমার মনে সত্যকার কোন ক্ষোভ জমা হয়ে আছে। কি হয়েছে আমাকে অকপটে বল।

বিদ্যানন্দ — ভগবন! আমি সচ্চিদানন্দজীকে আন্তরিকভাবেই ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। তবে ওকে অন্তরঙ্গভাবে কোন প্রশ্ন করলে উনি বরাবরই হাসি ও টিপ্পনী কেটে উত্তর দেন। ওঁর রসিক স্বভাবের সঙ্গে আমি বহুদিন হতেই পরিচিত, তবুও কখন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করলেও উনি লঘু ও চপল ভাবেই যখন উত্তর দেন, তখন মনে সাময়িকভাবে ক্ষোভ জন্মে। গতকাল কথাপ্রসঙ্গে আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নর্মদাতে বাণলিঙ্গের অভাব নাই। এত বাণলিঙ্গ থাকতে সদা শিবপরায়ণা মহীয়সী অহল্যাবাঈ ওঁকারেশ্বরে মামলেশ্বর মন্দিরে ২২জন পণ্ডিত দিয়ে প্রতিদিন ৩৩০০০ পার্থিব শিবলিঙ্গ তৈরী করে তা পূজা ও বিসর্জনের ব্যবস্থা করে গেছেন কেন? পার্থিব শিবলিঙ্গ এবং বাণলিঙ্গ পূজায় পার্থক্য কোথায়? এর উত্তরে সচ্চিদানন্দজী এক রসাল কবিতা শুনিয়ে আমার সব কথাই চাপা দিলেন। আমার কৌতূহল নিবৃত্তি হল না।

একলিঙ্গস্বামী — আচ্ছা, আমি কৌতূহল নিবৃত্তি করে দিচ্ছি। নর্মদা তটে এতকাল তপস্যা করলে, বুড়ো হয়ে মরতে যাচ্ছো, এখনও তোমার মনে এইরকম অবান্তর প্রশ্ন জাগে কেন?

তুমি কি জান না মহারাজ বাণ এই ধাবড়ী কুণ্ডে নিজহাতে মৃন্ময় শিবলিঙ্গ গড়ে পূজা করতেন এবং নিত্য নর্মদাতে বিসর্জন দিতেন। মহাদেব দর্শন দিলে তাঁর কাছে বাণ নিবেদন করেন — ক্লিষ্টোহহং তব দেবেশ লিঙ্গং কৃত্বা দিনে দিনে অর্থাৎ তোমার লিঙ্গরূপ গড়তে গড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তুমি কৃপা করে আমাকে সুলক্ষণ লিঙ্গ দান কর। বাণের প্রার্থনায় মহাদেব লক্ষ লক্ষ বাণলিঙ্গ রূপ প্রকট করে এখনও নর্মদার কোলে বিরাজমান আছেন।

পরম শৈব বাণের এই কাহিনী হতেই বুঝা যাচ্ছে, পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা করতে করতেই তাঁর শিবদর্শন ঘটেছিল। বাণলিঙ্গ পূজা করলেও শিব প্রসন্ন হন, আশুতোষ ভক্তকে দর্শন দান করেন। বাণলিঙ্গস্তোত্রে আছে —বাণলিঙ্গপ্রসাদেন নরঃ যোগিত্বমাপ্নুয়াৎ। অর্চয়িত্বা বাণলিঙ্গং মোক্ষমাপ্নোতি সত্বরম্।। আবার পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজার ফল বর্ণনা করতে গিয়ে ঋষি বলেছেন — ঐহিকং কিং ফলম্ তস্য মুক্তিরেব করে স্থিতা।। পার্থিব শিবলিঙ্গও মহাদেব, বাণলিঙ্গও মহাদেব। নিষ্ঠাভরে পূজা করলে একই ফল লাভ হয়।

মহারাণী অহল্যাবাঈ ওঁকারেশ্বরের বিষ্ণুপুরীতে পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা করে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যে যাঁরা বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করতে পারবেন না, তাঁরা মৃন্ময় শিবলিঙ্গ পূজা করেও একই ফল পাবেন। কি বিদ্যানন্দ! তোমার কথঞ্চিৎ কৌতূহল নিবৃত্তি হয়েছে ত?

বিদানন্দ — হাঁ ভগবন্‌ ! কথঞ্চিৎ নেহি হমারা পুরা সন্তোষ হো গয়া।

একলিঙ্গস্বামী — স্বভাব কবি সম্বিদানন্দ যদি রসসিক্ত ছড়ায় কোন উত্তর দিয়ে থাকে, তাতে তুমি নারাজ হবে কেন? তোমার কি ধারণা যোগী হলেই রসকসহীন গোমড়ামুখো হতে হবে। যাঁরা 'রসো বৈ সঃ' সেই আনন্দময় পরমপুরুষের সাধনা করবেন, তাঁদেরকে কি জীবন থেকে সবরকম রস হাসিঠাট্টা বিসর্জন দিতে হবে? সম্বিদানন্দ যে গুরুগম্ভীর তত্ত্বকেও রসালো করে প্রকাশ করতে পারে, এ তার একটি দুর্লভ দৈবসম্পত্তি বলে জানবে? এ গুণ ক'জনের থাকে? যাইহোক, এখন সম্বিদানন্দ বল, বিদ্যানন্দকে তুমি কি উত্তর দিয়েছিলে? তোমার উত্তরটি শুনে আমি তৃপ্ত মনে উঠে যাবো। তোমাদের মধ্যাহ্নভোজনের কাল অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে।

সম্বিদানন্দ — লেকিন্‌, ভগবন্‌! এ দাস আপনার মত দৈবী প্রতিভা এবং শাস্ত্রজ্ঞান কোথায় পাবে? তাই বিদ্যানন্দজীকে সবকথা গুছিয়ে বলতে পারি নি। আমি কেবল বলেছিলাম দরিদ্রের একমাত্র ভগবান্‌ শিবসুন্দর। মাটির লিঙ্গ পূজা করেই নিঃস্ব দরিদ্রের মনস্কামনা সিদ্ধ হতে পারে,

মূর্ত্তি মৃদা বিল্বদলেন পূজা, অযত্ন সাধ্যং বদনেন বাদ্যং
ফলঞ্চ সাযুজ্য-পদ-প্রদানং নিঃস্বস্য বিশ্বেশ্বর এব দেবঃ॥

মূর্তিটি গড়িতে চাই মৃত্তিকা কেবল,
পূজা করিবারে চাই শুধু বিল্বদল!
ঢাক ঢোল বাদ্যযন্ত্রে কিবা প্রয়োজন?
গালবাদ্যে সেই কার্য হইবে সাধন।
তথাপি শাযুজ্য-ফল দেন নিরন্তর,
দরিদ্রের একমাত্র দেব দিগম্বর॥

সম্বিদানন্দজীর এই জবাব শুনে একলিঙ্গস্বামী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন এবং সম্বিদানন্দজীর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন — সাবাস্‌! সাবাস্‌! জিতা রহো বেটা! সর্বেষাং শিবং ভূয়াৎ, শিবং ভূয়াৎ।

তিনি চলে যাবার পর আমরা মধ্যাহ্নভোজন সেরে যে যার গুহাতে ঢুকলাম। বেলা প্রায় তিনটার সময় ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। গত দুদিন বৃষ্টি হয় নি। একটানা বৃষ্টি হল সন্ধা ছটা, সাড়ে ছটা পর্যন্ত। সন্ধ্যা সাতটার সময় সম্বিদানন্দজী আমার কাছে এসেই বললেন — গুরুজীকে বহুদিন পরে খুব খোশমেজাজে দেখলাম। তুমি যেমন অবলীলাক্রমে তাঁর সঙ্গে কথা বল, আমরা তা পারি না। আমরা ত তিনি যতক্ষণ থাকেন, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকি। তিনি তোমাকে বিজ্ঞান বিষয়ে যেসব কথা বললেন, তা তাঁর মুখে নূতন শুনলাম। বিদানন্দের ত দৃঢ় ধারণা, তিনি উপরের ঐ গুহার নিরালায় বসে বসে অবসর সময়ে প্রাচীন বিজ্ঞানী ঋষিদের মত কোন বৈজ্ঞানিক অবিষ্কারে রত আছেন। অভয়ানন্দও একবার কথায় কথায় আমাকে জানিয়েছিল যে গুরুদেব একজন রসায়নবিৎ। জ্যোতিষ্মতী লতার সাহায্যে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যৌগিক পদ্ধতিতে কায়কল্প না করেই তিনি জরাব্যাধি জয় করেছেন। আজ তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা শুনে মনে হল, বিদ্যানন্দ এবং অভয়ানন্দের ধারণা হয়ত ঠিক।

আমি — আপনি ত দীর্ঘকাল ধরে তাঁর সঙ্গে আছেন, মনুষ্যদেহধারী হিসাব তাঁর কোন ত্রুটি আপনার চোখে পড়ে নি?

সম্বিদানন্দজী — লেকিন্, পাথরভাব থাকলে যেমন শিবভাব থাকে না, আবার শিবভাব হলে পাথরভাব থাকে না, সেইরকম যখন কাউকে গুরু বলব, তখন আর তাঁকে মানুষ ভাবব কি করে? কাজেই তোমার এই প্রশ্ন অবান্তর।

আমি — আচ্ছা ও কথা থাক। মানুষের মন এত চঞ্চল কেন বলুন ত? অবশ্য অর্জুনের মত লোকও শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন — চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়ুরেব সদুষ্করম্। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মনে চঞ্চল স্বভাবের কথা স্বীকার করে নিয়ে 'অভ্যাস' ও 'বৈরাগ্যের' দ্বারা মনকে স্থির করার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন? আপনি এই গীতাবাক্যের সঙ্গে একমত ত?

সম্বিদানন্দজী — সম্পূর্ণতঃ একমত হতে পারি নি, এজন্য দুঃখিত। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে। আমার মতে মন চঞ্চল কারণ সে অখণ্ড আনন্দের প্রয়াসী। সে অখণ্ড আনন্দের স্বাদ জানে — পাচ্ছে না। তাই সে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছুটছে। চঞ্চলতা মনের স্বভাব নয়, স্থৈর্যই তার স্বভাব। চাঞ্চল্যটা তার সাময়িক ব্যারাম মাত্র। এই ব্যারাম সারাবার একমাত্র ঔষধ গুরুকৃপা।

আমি — নিত্য নাম জপ ও ধ্যানাভ্যাস করলে প্রত্যেকেই কি চঞ্চল মনকে স্থির এবং একাগ্র করতে পারবে?

সম্বিদানন্দজী — যদি গুরু বলে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই হবে। এখানেও কিন্তু নামজপ এবং ধ্যানাভ্যাসটা উপলক্ষ্য মাত্র। গুরুবাক্যই মূল কথা। আর তাছাড়া, সারকথা জেনে রাখ, ধ্যান জপ করা যায় না, ধ্যান জপ আপনা হতে গুরুর বাক্য প্রভাবে হয়ে থাকে। তবে যেমন সন্ন্যাসের বৃত্তি নিলে সন্ন্যাস আসে, তেমনি নিম্নাধিকারীর পক্ষে ধ্যানজপের বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়।

আমি — আপনি অসুখ বিসুখে কোনদিন ভুগেছেন? অবশ্য আপনি নিজেও বৈদ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সেদিন রাত্রে আচমকা পড়ে গিয়ে আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছল, আপনার চিকিৎসা গুণেই ত আমি দ্রুত সেরে উঠলাম। তাই জিজ্ঞাসা করছি, আপনার শরীরে কোন রোগাক্রমণ ঘটলে সেই রোগ তাড়ানোর জন্য আপনি কি নিজেই ঔষধ খান?

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বলতে লাগলেন — বাবা! আমি সন্ন্যাসী। শাস্ত্রমতে সন্ন্যাসীকে সমবৃত্তি ও সমদৃষ্টিতে থাকতে হয়, কারও উপর দ্বেষ রাখতে নাই। শীতের কামড়, গ্রীষ্মের উত্তাপ, ঝড়বৃষ্টির উৎপাত সবই ত শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কৈ তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছি না, তবে রোগ এলে তাকে তাড়িয়ে দিবার জন্য ঔষধ খাবো কেন? দুর্নিবার শৈত্য, প্রচণ্ড উত্তাপ, অসহ্য জল ঝড় বা রোগের যন্ত্রনা যার যা কাজ সে তা করে যাবে। তাই রোগ যদি এই শরীরটাকে নিয়ে যায় — নিয়ে যাক্ ক্ষতি কি? সবাই ত আনন্দের মূর্তি, কাউকে ডেকেও আনব না, কাউকে তাড়িয়েও দেব না। দণ্ড কমণ্ডলু ও গেরুয়া ধারণ করে সাজসজ্জা করলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, সন্ন্যাসের মূল তত্ত্বও তা নয়। সমবৃত্তি, সমদৃষ্টিতে স্থিতি, গুরুচরণে শরণাগতি — এই ত এই জীবনের উদ্দেশ্য তবে আর রোগকে দ্বেষ করব কেন?

আজ অনেক টুকরো টুকরো প্রশ্ন করেছ। আর না, এবার আমি আসি। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

এইভাবে ধাবড়ী কুণ্ডের দিনগুলি কেটে যেতে লাগল, গতানুগতিক ভাবে। সেই একই রুটিন বাঁধা নিয়মে কুণ্ডে গিয়ে স্নান, মধ্যাহ্নভোজন আর সন্ধ্যা নামলেই গুহার আশ্রয়। কোনদিন বৃষ্টি অঝোরে ঝরছে সারাদিন ধরে আবার কোনদিন বা এক আধ পশলা বৃষ্টি হয়েই বৃষ্টি ধরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে চোখের সামনে নদী, পর্বত কান্তার সকলেরই প্রকৃতি ও রূপ বদলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। একমাত্র সচ্চিদানন্দজীর সঙ্গ আমার মনেকে ভরিয়ে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু আর একজায়গায় আবদ্ধ থাকতে আর ভাল লাগছে না। মুণ্ডমহারণ্য অতিক্রম করে এই ওঁকারেশ্বর ঝাড়ি পাড়ি দিতে পথে অনেক কষ্টভোগ করতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে সব কষ্টকে আমার কষ্ট বলেই মনে হয় নি। ওঁকারমান্ধাতার রামদাসস্বামীর আশ্রমে বাধা হয়ে আটকে থাকা আর এখানে এই ধাবড়ী কুণ্ডে বর্ষার জন্য আটকে থাকাকেই আমি নর্মদা-পরিক্রমার সবচেয়ে দুঃখজনক অধ্যায় বলে মনে করছি। আমি শুয়ে শুয়ে মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালাম —

মাগো! আমি নিঃস্ব-যাযাবর
তাই মোর গতিছন্দ অবিরাম চলে,
যাত্রার আহ্বান শুনি প্রতি পলে পলে।
বিশ্বের কল্যাণকর
যা কিছু পেয়েছি খুঁজি তোমার ভাণ্ডারে
রেখেছি যতন করি।
সেই হবে জীবন-স্বাধ্যায়,
পড়ি দুটি পায়,
এবে যেতে দাও মোরে॥

আমি কবি নই, মোমবাতির আলোয় ডায়েরীতে লিখে ফেললাম কথাগুলো। এটা কবিতা বা গবিতা যাই হোক, এর মধ্যে কোন পূর্ব কবির ভাবভাষার ছায়াপাত ঘটল কি না তা বিচার না করেও আমি বলতে পারি, আমার মনের যন্ত্রনা এভাবে প্রকাশ করে, আমি যেন শান্তি পেলাম। ৩১শে শ্রাবণ সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টি হল না। মনে আশা জেগেছে, এভাবে যদি আকাশ ধরে যায় তাহলে ভাদ্রমাসে মাঝে মাঝে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও আমি এখান থেকে চলে যাবোই। গ্রীষ্মকালে ওঁকারমান্ধাতায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও সকাল এগারটা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত যদৃচ্ছা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতাম, কিন্তু এখানে ঘোরার উপায় নাই, এখানে যে যখন তখনই দেখছি,

'ছুটিছে উল্কা প্রলয়দীপ্ত,
বহিছে ঝটিকা প্রমাদক্ষিপ্ত,
গরজে জলদ কাঁপায়ে সৃষ্টি,
করিছে অশনি করকা বৃষ্টি!'

সেদিন ২রা ভাদ্র বুধবার। সন্ধ্যাকালে সচ্চিদানন্দজী প্রতিদিনের মত সেদিন এসেছেন

এসে জানালেন লেকিন্ মনে আছে ত ? কাল গুরুজী এসে বৈঠক করবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

— আমি জানি তোমার মন চলে যাবার জন্য অস্থির হয়েছে। তবে কাল যেন গুরুজীর কাছে তোমার মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বস না। কারণ জানতে চেয়ো না, লক্ষ্মীটি ! তুমি গুরুজীর আদেশের জন্য প্রতীক্ষা কর। আমি যেমন ভাবে তোমার মনের অস্থিরতা জানতে পেরেছি, তিনিও তেমনি ভাবে অবশ্যই তোমার মনের কথা অবগত আছেন। তিনি নিজের থেকে যেদিন স্বেচ্ছায় যেতে বলবেন সেদিন তুমি এস্থান ত্যাগ করে গেলে তোমার সব দিক দিয়েই শুভ হবে। মনে রাখবে তোমার পথ দুস্তর। ওঁকারেশ্বর পেরিয়ে শূলপাণির ঝাড়িতে প্রবেশ করলেই বুঝতে পারবে, মুণ্ডমহারণ্য বা ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ির তুলনায় সে পথ কত দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল! অবশ্য নর্মদামাতাই তোমাকে সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করবেন তবুও মহাপুরুষের বাক্য শুনে এগোলে পথ তোমার পক্ষে কোনমতেই বিপজ্জনক হতে পারবে না।

আমি বললাম — তাই হবে, আপনার কথা শিরোধার্য, আমি নিজের থেকে অনুমতি চাইব না। আপনি কাব্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, বহু গ্রন্থ মহাকবি কালিদাসের রচিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। ঐ সব গ্রন্থই কি কালিদাস লিখে গেছেন বলে মনে করেন? তাঁর জন্মস্থান স্থিতিকাল মৃত্যু নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক বিসম্বাদ আছে বলে শুনেছি। এ সম্বন্ধে আপনি আমাকে কিছু বলুন।

— লেকিন্, তুমি ঠিকই শুনেছ। কালিদাসের জন্মস্থান, মৃত্যুস্থান এবং গ্রন্থের সংখ্যা নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। তবে আপাততঃ সিদ্ধান্ত এই যে তিনি মালব ও বুন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্তী প্রাচীন দশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মেঘদূতের ২৯ হতে ৪৩ শ্লোক পড়লে উজ্জয়িনীকে তাঁর বসতিস্থান বলেও অনুমান করা যায়।

কালিদাসের স্থিতিকাল নিয়েও অনেক বিবাদ আছে। জ্যোতির্বিদ্যাভরণের মতে তিনি প্রথম খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর লোক। আবার বল্লাল প্রণীত ভোজপ্রবন্ধের প্রমাণানুসারে তাঁকে একাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলে গ্রহণ করতে হয়। ভোজপ্রবন্ধের কথা হিতোপদেশের ন্যায় কপোলকল্পিত, সুতরাং তা প্রামাণিক নয়। কারণ কুমারিল ভট্ট ভোজের বহুপূর্বে তাঁর তন্ত্রবার্তিকে শকুন্তলা হতে — সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃ করণ প্রবৃত্তয়ঃ — এই বাক্যাংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কুমারিল ভট্ট সপ্তম খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ পুলকেশী প্রদত্ত তাম্রশাসনে ভারবি ও কালিদাসের নামও প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া মন্দাসোর বা দশপুরস্থি সূর্যমন্দিরে ৪৭২ খৃষ্টাব্দে বৎসভট্টি রচিত প্রশস্তিতে মেঘদূতাদির অনুকৃতিও দেখা যায়। অতএব কালিদাসের আবির্ভাব কাল নিয়ে ভোজপ্রবন্ধ বা জ্যোতির্বিদ্যাভরণের কথাকে বিশ্বাস করা যায় না। মহাকবি কালিদাস রচিত মেঘদূতে দেখা যায়, মেঘদূতের মেঘ অভিশপ্ত যক্ষের সংবাদ নিয়ে রামগিরি হতে হিমালয়ে যাত্রা করবে। তদুপলক্ষে কালিদাস লিখেছেন (মেঘদূত ১৪) —

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং দিঙ্নাগানাং
পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, হে মেঘ তুমি যখন এই রামগিরি আশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে, তখন তোমাকে আর দিঙ্নাগাদির স্থূল শুণ্ডবিক্ষেপ (অর্থাৎ ধর্মবিষয়ক অভিঘাত সহ্য করতে হবে না।) ইত্যাদি। বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ বলেছেন কালিদাস আচার্য দিঙ্নাগকে লক্ষ্য করেই শ্লোকটি রচনা করেন। মল্লিনাথের কথায় প্রতিপাদিত হচ্ছে যে, কালিদাস দিঙ্নাগের কিঞ্চিৎ পরবর্তী। এদিকে বৌদ্ধ গ্রন্থ হতে জানা যায়, আচার্য বসুবন্ধু ও দিঙ্নাগ বৌদ্ধ পণ্ডিত অসঙ্গের শিষ্য। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বসুবন্ধুকে চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলে স্থির করেছেন। কালিদাস ও দিঙ্নাগ সমসাময়িক লোক হলে কালিদাসের স্থিতিকাল চতুর্থ শতাব্দী বলে স্বীকার করে নিতে হয়। এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ, কালিদাস ছিলেন, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই যে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা সকলেই একমত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত চতুর্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র কুমারগুপ্তের জন্মোপলক্ষে কালিদাস 'কুমারসম্ভব' লিখে রাজাকে উপহার দিয়েছিলেন।

মহাকবির গ্রন্থসংখ্যা সম্বন্ধে এই কথা বলতে পারি যে, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ, ঋতুসংহার এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ যে তাঁরই অনুপম কাব্যকৃতি এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কালিদাস প্রথমে কুমারসম্ভব, পরে মেঘদূত এবং তারেপর রঘুবংশ ও ঋতুসংহার রচনা করেছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, কালিদাস প্রথম জীবনে মূর্খ ছিলেন। তিনি তখন উষ্ট্র শব্দটিও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারতেন না। এজন্য তিনি পত্নী কর্তৃকঅপমানিত হন। লাঞ্ছিত কালিদাস মনের দুঃখে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে গিয়ে পড়েছিলেন। মহাদেবের কৃপায় তাঁর মধ্যে সহসা অলৌকিক কবিত্ব শক্তির স্ফূরণ হয়। মনের আনন্দে তিনি পত্নী কমলাদেবীর নিকট ফিরে আসলে তিনি প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কালিদাস উত্তর দেন — 'অস্তি কশ্চিদ্ বাগবিশেষঃ।' এই কয়টি পদ নিয়েই মহাকবি তাঁর মহাকাব্যগুলি রচনা করেছিলেন। যেমন, কুমারসম্ভবের প্রথম চরণটি হল —'অস্তি উত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।' মেঘদূতের প্রথম পংক্তি আরম্ভ করেছেন —'কশ্চিৎ কান্তো বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ।' রঘুবংশের প্রথমে লিখেছেন —'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।' আর ঋতুসংহার আরম্ভ করেছেন এই বলে — 'বিশেষসূর্যঃ স্পৃহানীয়চন্দ্রমা' ইত্যাদি। 'প্রচণ্ড' শব্দের যোগ্যতা অধিকতর হলেও কালিদাস 'বিশেষ' শব্দের প্রয়োগ করে ছিলেন বলে অনেকেই অনুমান করেন। বিক্রামার্বাসী এবং মালবিকাগ্নিমিত্রম্ও কালিদাসের লেখা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাদি গ্রন্থ কালিদাসের নামে প্রচলিত থাকলেও ঐটি কালিদাসের রচিত বলে আমরা মনে করি না। নলোদয় নামক কাব্যটি কালিদাসের নামে চললেও বস্তুতঃ গ্রন্থটি নারায়ণ পণ্ডিতের পুত্র রবিদেব কর্তৃক রচিত।

মহাকবির মৃত্যু নিয়েও অনেক কুহেলী সৃষ্টি হয়েছে। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে সিংহলে সপ্তবোধিবট নামক স্থানে একজন বারবণিতা বাস করত। সিংহলের রাজা কুমারদাস ঐ বারবণিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন। কুমারদাস সংস্কৃতজ্ঞ কবি ছিলেন। তিনি মহাকবি কালিদাসের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি একবার ঐ বারবণিতাকে রহস্যাচ্ছলে একটি শ্লোকার্ধের একটি লাইন দিয়ে বলেন সে যদি ঐ শ্লোকার্ধের পাদপূরণ করাতে পারে তাহলে রাজা তাকে অনেক ধনদৌলত দান করবেন। শ্লোকার্ধটি হল — কমলে কমলোৎপত্তিঃ শ্রুয়তে ন তু দৃশ্যতে। এর উপযুক্ত পাদপূরণের ক্ষমতা ঐ সামান্যা বারবণিতার ছিল না। কিন্তু ঐ সময় কালিদাস

দৈবক্রমে সিংহলে যান। বারবণিতা বিনম্রভাবে কালিদাসের নিকট ঐ শ্লোকার্ধ উচ্চারণ করে পাদপূরণ করে দিতে বললে কালিদাস সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা পূরণ করেন এই বলে যে :— বালে তব মুখাম্ভোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ম্? কালিদাস স্বয়ং সশরীরে বর্তমান থাকলে পাছে এই সমস্যা পূরণের গৌরব তাঁরই একথা জানাজানি হয়ে যায়, এজন্য প্রবাদ এই যে, ঐ বারবণিতা একটি গোপন কক্ষে নিয়ে গিয়ে কালিদাসকে হত্যা করেন। পরে ঐ শ্লোক শুনিয়ে রাজা কুমারদাসের কাছে ঐ বারবণিতা পুরস্কার আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজার সন্দেহ হওয়ায় ভয় দেখিয়ে বারবণিনতার কাছে প্রকৃত সত্য জানতে পারেন। কালিদাসের গুণমুগ্ধ রাজা শোকার্ত হয়ে কালিদাসের চিতাতেই আত্মবিসর্জন করেন। এইরকম শোচনীয়ভাবে কালিদাসের সিংহলে মৃত্যু হয়েছে বলে কোন কোন তথাকথিত গবেষকদের ধারণা। কিন্তু এ ধারণা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ত বটেই ,'বিলকুল ঝুটা।' কারণ, কুমারদাস কালিদাসের গুণমুগ্ধ সুকবি হলেও তিনি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন না। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান্ এবং সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-এন-চোয়াঙ্গ ও ইট-সিং নামক পর্যটকগণ চীন হতে ভারতবর্ষে পর্যটন করতে এসেছিলেন। ঐ সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে বা সিংহলে বৌদ্ধ ব্যাপার সংক্রান্ত যা যা তাঁরা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন তা তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণনা করে গেছেন। ফা-হিয়ানের 'ফো-কু-কি', হিউ-এন্-চোয়াঙ্গের 'সি-যু-কি', এবং ইট্-সিং এর 'ভারত কি শিখাইতে পারে?' নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলি ভারতবর্ষের তিনখানি বৌদ্ধ ইতিহাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ কুমারদাস রাজা ত ছিলেনই তাছাড়া তিনি সুকবিও ছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের ভারত ভ্রমণকালে অর্থাৎ পঞ্চম হতে সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান থাকলে অবশ্যই তাঁরা সিংহলরাজ কুমারদাসের নামোল্লেখ করতেন। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থে তাঁর নাম নাই। কর্পূরমঞ্জরী প্রণেতা কবি রাজশেখর ৮ম-৯ম শতাব্দীরই লোক হয়েও কুমারদাস প্রণীত জানকীহরণ কাব্যের নাম করেছেন। তাতেই অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কুমারদাস অবশ্যই ৮ম-৯ম শতাব্দীরই লোক ছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর মহাকবি কালিদাসকে তাঁর বহু পরবর্তীকালের রাজা কুমারদাস বা তাঁর বারবণিতা চোখেই দেখেন নি। কাজেই সিংহলে মহাকবির অপমৃত্যু বিষয়ক রটনা সম্পূর্ণ অপসিদ্ধান্ত। প্রকৃত সত্য এই যে কালিদাসের পরিণত বয়সে উজ্জয়িনীতেই আমাদের এই ভারতের মাটিতেই দেহাবসান ঘটেছিল।

আমি মহাত্মাকে বললাম, আপনার কাছে আমি অনেক নূতন কথা জানতে পারলাম। কাব্য বিষয়েরই হোক আর তত্ত্ববিষয়েই হোক আপনি যখনই কথা বলেন, তার মধ্যে বৈদগ্ধ্য, রস এবং যুক্তি থাকে। সেইজন্য আপনি প্রতিদিন যে সব কথা আলোচনা করেন, আমি তা ডায়েরীতে টুকে রাখি। এসব কথা সাধারণ সাধু সন্ন্যাসীর কাছে শুনতে পাবো বলে আশা করি না; তবে এই কথা ভেবে আশ্চর্য হই, আপনার কাছেই শুনেছিলাম যে আপনি অল্পবয়সেই এক রামায়েৎ বৈষ্ণব সাধুর প্রভাবে গৃহত্যাগ করেছিলেন। অতএব শাস্ত্র আপনি অধ্যয়ন করলেন কি ভাবে? দীর্ঘকাল ধরে সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে জীবন কাটালে অনেক মিঠা মিঠা বুলি এবং রোচক বাক্য ও গল্পাদি শুনে শুনেই শিখে ফেলা যায়, কিন্তু সে সব কথার কোনগুলি শাস্ত্রসিদ্ধ বা নিজের উপলব্ধি, তা একটু বিচারেই ধরে ফেলা যায়। চুলচেরা বিচার বা বিশ্লেষণেই ধরা পড়ে যায় সে সব কথার পরস্পর বিরোধ এবং অন্তঃসার শূন্যতা। কিন্তু আপনি যখন কথা বলেন, তা শুনে অভিভূত হয়ে পড়ি।

— লেকিন্, বহোৎ সুক্রিয়া, বহোৎ সুক্রিয়া। আপ্‌নে মুঝে বড়া সার্টিফিকেট দে দিয়া। আমি দীর্ঘকাল গঙ্গাসাগর সঙ্গমে বাস করে যখন গিরনারে গিয়ে গুরুজীর দর্শন পাই, তখন গুরুজীর এক সন্ন্যাসী-শিষ্য ছিলেন। তিনি অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি গুরুজীর সঙ্গে অনর্গল সংস্কৃতে কথা বলতেন। একদিন তার কাছে সংস্কৃত শিখবার আগ্রহ প্রকাশ করলে গুরুজীর আদেশে তিনি আমাকে বলেন—'তোমাকে ৬ মাসেই সংস্কৃত শিখিয়ে দেব, চিন্তা নাই।'এই বলে তিনি আমাকে 'কলাপ' ব্যাকরণ পড়াতে আরম্ভ করেন। ব্যাকরণের পাঠ শেষ করেই আমি কাব্য পড়তে আরম্ভ করি।।

যুক্তকরে সেই বিদেহী সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সচ্চিদানন্দজী বলতে লাগলেন — একমাত্র তাঁর দয়াতেই সংস্কৃতের মধ্যে আমি রসের সন্ধান পেয়েছি।

— মাত্র ৬ মাস 'কলাপ' ব্যাকরণ পড়েই আপনি সংস্কৃত শিখতে পেরেছিলেন, একথা অবিশ্বাস্য হলেও আপনার কথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করছি।

— লেকিন্, তোমার বাবা তোমাকে পাণিণি ধরিয়েছিলেন বেদ বুঝার জন্য। বেদের ভাষা বুঝতে হলে অবশ্যই পাণিণি ব্যকরণ অপরিহার্য। তবে তখন আমার মনের অবস্থা যা ছিল, তাতে বেদ বুঝি আর না বুঝি, যে কোন ভাবে দ্রুত সংস্কৃত শিখবার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। তুমি 'কলাপ' ব্যাকরণ সম্বন্ধে জাননা বলেই তোমার কাছে 'অবিশ্বাস্য' ঠেকছে। 'কলাপ' ব্যাকরণের প্রণেতা ছিলেন শর্ববর্মাচার্য। তাঁর আবির্ভাব কাল ১-২ খৃষ্ট শতাব্দী। 'কলাপ' ব্যাকরণের রচনা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ কাহিনী আছে। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজগণ মধ্যভারত হতে উত্তরভারতের কতকাংশ অধিকার করে মালব দেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনীকে রাজধানী করেন। তাঁদের মধ্যে অরিষ্টকুমার পুত্র হালসাতবাহন খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর রাজা ছিলেন। তাঁরই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন 'বৃহৎকথা' প্রণেতা গুণাঢ্য এবং প্রধান সভাপণ্ডিত ছিলেন শর্ববর্মাচার্য। একদিন জলক্রীড়াকালে রাজাকে তাঁর বিদূষী রাণী বলেছিলেন — 'মোদকং দেহি রাজন্' অর্থাৎ মা উদকং দেহি রাজন্, আমার গায়ে আর জল ছিটাবেন না। মা উদকং = মোদকং না বুঝে রাজা মোদক শব্দের অর্থ বুঝলেন লাড্ডু। মনে করলেন জলকেলী করতে করতে রাণীর মিষ্টান্ন ভোজনের সাধ হয়েছে। তদনুযায়ী তিনি পরিচারিকাকে লাড্ডু আনার আদেশ দিলেন। তাতে কৌতুকময়ী রাণী তাঁকে উপহাস করলে রাজা অপমান বোধ করে সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় ফিরে এসে বললেন — 'যিনি আমাকে অবিলম্বে সংস্কৃতে ভাষা শিখিয়ে দিতে পারবেন, তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।' প্রধানমন্ত্রী গুণাঢ্য তাঁকে ৬ বৎসরে সংস্কৃত শিখাবার প্রস্তাব করলে শর্ববর্মাচার্য বলেন — 'রাজা আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি ৬ মাসের মধ্যেই সংস্কৃত শিখিয়ে দিতে পারব।' শর্ববর্মাচার্যের এই দম্ভোক্তিতে বিরক্ত হয়ে গুণাঢ্য প্রতিজ্ঞা করেন — 'আপনি যদি ৬ মাসে রাজাকে সংস্কৃত শিখাতে পারেন, তাহলে আমি সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন ত্যাগ করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করব।'

প্রকাশ্য রাজসভায় এই তর্কবিতর্কের পর, শর্ববর্মাচার্য তাঁর উপাস্য দেবতা কুমার কার্ত্তিকেয়ের সাধনায় মগ্ন হন। কুমারের প্রসাদে তিনি অচিরাৎ 'কলাপ' ব্যাকরণ প্রণয়ন করতে সমর্থ হন। কলাপ ব্যাকরণ এইজন্য কুমার ব্যাকরণ বা কাতন্ত্র নামেও অভিহিত হয়। যতগুলি লৌকিক ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তার মধ্যে কলাপই সবচেয়ে প্রাচীন। দুর্গাসিংহ

কলাপের বৃত্তি প্রণয়ন করেছেন। যাইহোক, শর্ববর্মাচার্য এই 'কলাপ' পড়িয়েই রাজা হালসাতবাহনকে সংস্কৃতে কৃতবিদ্য করে তুলেন। গুণাঢ্য তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে শুক্তিমান্ পর্বতে গিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

কলাপ ব্যাকরণ প্রণয়নের এই ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে সচ্চিদানন্দজী মন্তব্য করলেন — আমার যা কিছু সংস্কৃত বিদ্যা এই কলাপ অধ্যয়ন করেই। তিনি আর একবার তাঁর ব্যাকরণ শিক্ষক দণ্ডী সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

আমি তাঁকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে এসে শুয়ে পড়লাম কারণ সকাল সকাল উঠতে হবে, রাত্রি প্রভাত হলেই ৩রা ভাদ্র, আগামীকাল একলিঙ্গস্বামী বৈঠকে আসবেন।

পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে উঠেই আমরা সবাই নর্মদাস্নান ও কুণ্ডস্থিত বাণলিঙ্গে অন্যদিনের মত পূজা করে এসে বেদীর সামনে যে যার নির্দিষ্ট স্থানে বসে পড়লাম। বেদীর উপর কৃষ্ণজিন মৃগচর্ম বিছিয়ে সন্ন্যাসীরা গুরুবন্দনা গাইতে লাগলেন। প্রায় দশমিনিট পরেই নেমে এলেন একলিঙ্গস্বামী। এসেই তিনি অন্যদিনের মত বসে পড়লেন না। পূর্বদিকে তাকিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তিনি আরম্ভ করলেন সূর্য বন্দনা —

ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ ভগবান এষঃ ছন্দসি পঠ্যতে।
আদিত্যঃ আদিভূতত্বাৎ প্রসূত্যা সূর্য উচ্যতে॥

মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রার্থ্যও-ব্যাখ্যা করতে লাগলেন — 'সূর্য সিদ্ধান্ত পাঠে আমরা দেখতে পাই, আদিত্যদেব বেদে হিরণ্যগর্ভ ভগবান রূপে পূজিত এবং আদিভূত বলে আদিত্য নামে, জগতের প্রসবকর্তা বলে সবিতৃ বা সূর্য নামে বিখ্যাত। বৈদিক ঋষিদের কাছে জড়সূর্যই যে পূজ্য ছিলেন তা নয়। জড়সূর্যের মধ্যে যে অন্তর্যামী পুরুষ, তিনিই হিন্দুদের উপাস্য। শালগ্রামাদি শিলায় যেমন বিষ্ণুর উপাসনা, সেইরকম সূর্যমণ্ডলে হিরন্ময় অন্তর্যামী পুরুষের উপাসনা। গায়ত্রী মনন করলে সকলে বুঝতে পারে যে, সূর্যান্তর্গত এই পুরুষের উপাসনাই তার লক্ষ্য। বিশ্বব্যাপী অন্তর্যামী পুরুষের চিন্তা সূর্যমণ্ডলে ব্যবস্থিত হওয়ার কারণ, সকলদিক বিবেচনা করলে এরূপ প্রতিনিধি দুর্লভ।

ওঁ ত্রয়ীময়ঃ অয়ং ভগবান্ কালাত্মা কালকৃৎ বিভূঃ।
সর্বাত্মা সর্বগঃ সূক্ষ্মঃ সর্বং অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্॥ (সূর্যসিদ্ধান্ত ১২।১৮)

এই সূর্যদেবই ত্রিবেদময় ভগবান্, কালেরও আত্মা এবং স্রষ্টা, সর্বাত্মা, সর্বতোগামী এবং সূক্ষ্ম, এই সূর্যদেবেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত।

এই সূর্যদেব বেদোক্ত অষ্টবসুর শ্রেষ্ঠ বলে বাসুদেব নামে খ্যাত। তিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতীত অব্যয় তত্ত্ব।

বাসুদেবঃ পরংব্রহ্ম তৎমূর্তিঃ পুরুষপরঃ।
অব্যক্তঃ নির্গুণঃ শান্তঃ পঞ্চবিংশাৎ পরঃ অব্যয়ঃ॥

(সূর্যসিদ্ধান্ত ১২।১২)

বেদে এই সূর্যদেব পাপরূপ বিষধ্বংসকারী এবং পাপরূপ বিষহরণকারী —

ওঁ উৎ অপপ্তৎ অসৌ সূর্যঃ পুরা বিশ্বানি জুর্বন্॥ (ঋ ১।১৯১।৯)
অস্য যোজনং হরিষ্ঠা। (ঋ ১।১১৯।১০)

এবং এই সূর্যদেব পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে এবং স্বর্গে ত্রিপাদ বিক্ষেপকারী বলে পূজিত হন —

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ॥ (ঋ ১।২২।১৮)

বেদে ইহাও বর্ণিত আছে, সূর্য সপ্তরশ্মি, সূর্যের সপ্তাশ্ব এবং এই অশ্বের নাম তার্ক্ষ এবং রশ্মির নাম সুপর্ণ —

ওঁ সপ্তত্বা হরিতঃ রথে বহন্তি দেব সূর্য॥ (ঋ ১।৫।৮)

বি সুপর্ণঃ অন্তরিক্ষাণি অখ্যৎ গভীর বেপাঃ অসুরঃ সুনীথ॥

(ঋ ১।৩৫।৭)

সূর্যনারায়ণকে করজোড়ে প্রণাম করেই তিনি ডানদিকে ঘুরে নর্মদামাতাকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন —

রেবে ! কৃপা কিন্ন বিধীয়তে ত্বয়া দীনো ভবন্নেষ জনঃ প্রতীক্ষতে।

দৃষ্টবা রুদন্তং শিশুমাত্মজং ন কিং কারুণ্যপূর্ণা জননী ত্বরায়তে?

মা নর্মদাগো! তুমি আমাদের উপর দয়া কেন করছ না? রোরুদ্যমান্ শিশুকে দেখে প্রত্যেক মা-ই ত দ্রুত এসে কোলে তুলে নেয়। তবে তুমি কেন মা আমাদের মত অসহায় শিশুদেরকে কোলে তুলে নিচ্ছ না?

পুণ্যাহতিরম্যা ত্রিদশৈঃ সুপূজিতাঃ ধন্যা চ মান্যা নিখিলৈর্মহর্ষিভিঃ।

ভূতেশকন্যা জয়তাদনারতং, নান্যা বরেণ্যা মম দেবি নর্মদে॥

সমস্ত দেবতাবৃন্দ এবং মহর্ষি কর্তৃক সুপূজিতা, পরমমান্যা, পরম দ্যুতিদীপ্তা, স্বয়ং মহেশ্বরের কন্যা, পরম পুণ্যময়ী মা নর্মদে, তুমিই এই ত্রিভুবনে ধন্যা। সর্বদাই তোমার জয় হোক। আমার দৃষ্টিতে এই ত্রিজগতে তুমিই একমাত্র আরাধ্যা দেবী। হর নর্মদে।

নর্মদামায়ীকে প্রণাম করে এইবার মহাত্মা বেদীর উপর উপবেশন করলেন। উপস্থিত সকলেই ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি বসতেই হরিস্বামী হাতজোড় করে নিবেদন করলেন — ভগবন্! আপনার আদেশানুযায়ী আমি অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে বসে সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রম্ মনন করার চেষ্টা করি বটে, আপনি নিজেও সেদিন দয়া করে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, তবুও আমার পক্ষে সব মন্ত্র ঠিক ঠিক ভাবে সুবোধ্য নয়। আপনি যথার্থ মননের যে ধারা দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই ধারা সর্বত্র অনুসরণ করতে পারছি বলে মনে হচ্ছে না। আমার কাছে অনেক শ্লোকই অননুভূত রয়ে গেছে। এঁদের সঙ্গে একই তালে শ্লোকগুলি পড়ে মনন করার চেষ্টা করি বটে কিন্তু আমি সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেই আটকে আছি।

একলিঙ্গস্বামী — প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি তাহলে আস্বাদন করা যাক্। শ্লোকটি হল,

দ্বারাণি সম্যক প্রবদন্তি সন্তো বহুপ্রকারাণি দুরাচারাণি।

সত্যার্জবে হ্রীর্দমশৌচবিদ্যাঃ যণ্মানমোহপ্রতিবন্ধকানি॥ ৪৩

এর বাচ্যার্থ হল — সত্য, আর্জব, হ্রী, দম, শৌচ ও বিদ্যা এই ছয়টি মান ও মোহের প্রতিবন্ধক। ঋষিগণ এই ছয়টিকে কষ্টসাধ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার বলে বর্ণনা করেছেন।

অল্প অনুধ্যান করলেই বুঝা যায়, এই শ্লোকে আচার্য সনৎসুজাত ব্রহ্মানন্দ লাভের উপায় নির্দেশ করেছেন। সত্যাদি আচরণ না করলে ব্রহ্মলাভ হয় না বলে সত্য প্রভৃতিকে ব্রহ্মের দ্বার বলা হয়েছে। সত্যনিষ্ঠা থাকলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় সুতরাং তখন আর মনে পার্থিব মান বা

অনিত্যবস্তুগত মোহের অধিকার থাকে না বলে ঐগুলি মানাদির প্রতিবন্ধক।

বাক্য ও মনের ঐক্য ব্যতীত সত্য আচরিত হয় না। অতএব ছলের আশ্রয় না নিয়ে অপরের মনে আপন বোধের ন্যায় বোধ উদয় করানোই সত্যতা। যদি পরের মনে বোধান্তর উৎপাদন করাই বক্তার অভিপ্রায় হয় তাহলে তাকে সত্য বলা যায় না। এ কারণ যুধিষ্ঠির হস্তীকে অভিসন্ধান করে করে অশ্বত্থামা হত (কিঞ্চিৎ থেমে) ইতি গজঃ বললেও বাক্যমনের অনৈক্য প্রযুক্ত তাঁকে পাপভোগী হতে হয়েছিল। ভ্রমবশতঃ যা বলা যায় তাও সত্য নয়, তাকেও অজ্ঞানকৃত পাপ বলেই অভিহিত করা হয়। রাজনীতির চেয়ে ধর্মনীতি বলীয়সী বলে রাজধর্মেও এই নীতি প্রবর্তিত। সেইজন্য শাসনধর্মের বিধি বা ব্যবহার না জেনে কেউ অপরাধ করলে সে দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায় না। আবার লোকের অহিতকর হলে শাস্ত্রানুসারী আক্ষরিক সত্যও সত্য নয়, তার নাম সত্যাভাস। সত্যাভাসও পাপজনক। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হচ্ছে, এক ধনী বণিকের যথাযথ সংবাদ দেওয়ায় তা আক্ষরিক অর্থে সত্য হলেও সত্যতপা ঋষিকে পাপভোগী হতে হয়েছিল। আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। একবার এক ধনীর সালঙ্কারা কন্যা একদিন রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে পাল্কীতে চড়ে স্বামীগৃহে যাচ্ছিলেন। পথে ঐ কন্যা দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হন। দস্যুদের সঙ্গে রক্ষীদের যখন লাঠালাঠি হচ্ছিল, সেই কোলাহলের মধ্যে এক ফাঁকে কন্যা পালকী হতে নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকেন। কতকদূর গিয়ে একটি ধূনি জ্বালিয়ে একজন সাধুকে ধ্যানাবিষ্ট দেখে ঐ কন্যা তাঁর বিপদের কথা জানালে তিনি তাঁর কুটীর সংলগ্ন একটি কাঠের স্তূপ দেখিয়ে তার পিছনে লুকিয়ে থাকার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পরে রক্ষীদেরকে পরাজিত করে ঐ দস্যুদল কন্যার অনুসন্ধান করতে করতে ঐ সাধুর কাছে উপস্থিত হন। তারা সাধুর কাছে ঐ কন্যার খবর জানতে চাইলে সাধু মনে মনে ভাবলেন, যদি সত্য কথা বলি তাহলে অসহায় অবলার ধন মান প্রাণ সবই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা; যদি নীরব থাকি তাহলে কন্যার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে এই ভেবে দস্যুদল আমার কুটীরের চারদিক অনুসন্ধান করে বলপূর্বক কন্যার যথাসর্বস্ব অপহরণ করে নিয়ে যাবে। তাহলে শরণাগতকে রক্ষা করা যে পরম ধর্ম, তা আমার দ্বারা পালিত হবে না। আর যদি কন্যাকে আদৌ দেখিনি, এইরকম মিথ্যা বলি তাহলে আমাকে তপোভ্রষ্ট হতে হয়, তবুও এস্থলে সত্যের অপলাপ করাই কর্তব্য। এই বিবেচনা করে সাধু দস্যুদেরকে বললেন — আমি তোমাদের বিপরীত দিকে কন্যাটিকে দৌড়ে যেতে দেখেছি। সাধুর কথা শুনে দস্যুরা সেইদিকে ছুটে গেল, কন্যা বিপদ্‌মুক্তা হলেন। এখানে বাহ্যতঃ সত্যের অপলাপ করলেও সাধু কোন পাপভাগী হলেন না। এইজন্য শাস্ত্র সত্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন — যথার্থকথনং যচ্চ সর্বলোকসুখপ্রদম্। তৎসত্যমিতি বিজ্ঞেয়ম্ অসত্যম্ তদ্ বিপর্যয়ম্ অর্থাৎ যা লোকহিতকর যথার্থ ভাষণ তাকেই সত্য বলে এবং যেখানে এর বিপর্যয় ঘটে, তা সত্য পদবাচ্য নয়।

আর্জব শব্দের অর্থ সরলতা। হ্রী শব্দের অর্থ লজ্জা। কুৎসিৎ কর্ম করার জন্য যে মানসিক প্রবৃত্তি হয় তা দমন করার নাম দম। অন্তরেন্দ্রিয়ে প্রবৃত্তি শান্ত করা সম্বন্ধে যেমন শম শব্দের প্রয়োগ হয় তেমনি বাহ্যেন্দ্রিয় সম্বন্ধে দম শব্দ ব্যবহৃত হয়। শৌচ বা শুদ্ধি বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে দুই প্রকার। জল মাটির সাহায্যে, গোমূত্রাদি পানের দ্বারা বা উপবাসের দ্বারা যে শৌচ অনুষ্ঠিত হয়, তা বাহ্য আর মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাদির দ্বারা চিত্তমল শোধন করার নাম আভ্যন্তরিক শৌচ।

শ্লোকোক্ত বিদ্যা শব্দটি লক্ষ্য কর। পরা ও অপরা ভেদে বিদ্যাও দু'প্রকার। গ্রন্থপাঠাদি-জনিত জ্ঞানের নাম অপরা। এটি পরোক্ষজ্ঞান। ব্রহ্মবিচারণার দ্বারা সিদ্ধ বা যোগানুভব-জনিত জ্ঞানকে পরাবিদ্যা বলে। শাস্ত্রাভ্যাস করে যে জ্ঞান হয় তা অনুমানসিদ্ধ, কাজেই পরোক্ষ। কিন্তু যোগের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তা অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। শাস্ত্র পাঠের দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হলেও তাকে পরোক্ষই বলা হবে। যারা নাস্তিক তারা নিজেদেরকে প্রত্যক্ষবাদী বলে দাবী করে কিন্তু একটু পরেই আমি বিচার করে দেখাব যে তাদের জ্ঞানও পরোক্ষ। এমন কি যাঁরা বলেন আধুনিক বিজ্ঞান অনেক জিনিস প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দেয়, কাজেই বিজ্ঞানের জ্ঞান পরোক্ষ নয়, তাদেরকেও ঋষি প্রণীত শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি, পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নশাস্ত্রের প্রত্যক্ষতা ব্যবহারিক ভাব সিদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের মূলে কোন তাত্ত্বিকতা নাই। কারণ, আমরা যে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিজ্ঞান শাখার প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রহণ করি তারা কখন বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে না। যে ঘটনা ঘটে থাকে, কেমন করে কোন্ নিয়মে তা ঘটে থাকে, তা বিজ্ঞান দেখাতে পারে, কার্যকারণও ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু কেন ঘটে থাকে তার জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। বিজ্ঞান অপরা বিদ্যা অর্থাৎ পরোক্ষ-জ্ঞান নির্ভর বলেই বিজ্ঞানে এর জবাব নাই।

আমার জীবনের একটি ঘটনা থেকেই তোমাদেরকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর পরিব্রাজক অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে আমি একবার রাজস্থানের গোবি মরুভূমি অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। আমি মরুভূমির একদেশ হতে কিছুদূরে দেখতে পেলাম কোথাও কোন গাছ নাই কিন্তু জল এবং সেই জলে একটি গাছের ছায়া পড়েছে। জলের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে দেখছি গাছের ছায়াটি ছোট, ক্রমশঃ আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে। তারপর আরও কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে দেখি জল নাই, গাছ নাই, গাছের ছায়া নাই কিছুই নাই কেবল বালুরাশি ধূ ধূ করছে। আরও কতকটা গিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম জল বা জলে গাছের ছায়া নাই বটে কিন্তু বালুকা পরীণাহে (বিশাল বালুরাশির বিস্তারের মধ্যে) সত্য সত্যই একটি ছোট গাছ আছে এবং তার আরও নিকটবর্তী হয়ে দেখতে পেলাম যেটি ছায়া ছিল এবং পরে যাকে ছোট গাছ বলে মনে করেছিলাম আসলে সেটি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ। প্রথম স্থান থেকে এই বৃক্ষের পদমূলে আসতে কতটুকুই বা সময় লেগেছে কিন্তু তার মধ্যেই আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় কতই না অভিনয় করেছে! মাথা নাই তবুও মাথাব্যথার মত প্রথমাবস্থায় জল না থাকলেও এবং কোন গাছ না দেখা গেলেও তরঙ্গিত জলে গাছের ছায়া দেখিয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় গাছের ছায়াটিকে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর করে জল ও ছায়ার লোপ অনুভব করিয়েছে। তারপর জলের পরিবর্তে এবং ক্ষুদ্র গাছ সৃষ্টি করে দেখিয়েছে এবং শেষে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়েছে। এই সামান্যকালের মধ্যেই এতগুলি অভিনয় দৃশ্যের অবতারণা আমি দেখলাম। মজা দেখ, যখন যা দেখেছি সেই সেই সময়ে তদ্‌গত জ্ঞানকে সত্য বলেই জানতাম কিন্তু শেষে বালুরাশি এবং গাছ দেখে পূর্বের সকল জ্ঞানই ব্যাহত হয়ে গেল। সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়, এই বালুরাশি, সেই গাছ সকলই বর্তমান কিন্তু এই তিনরকম বোধের কারণ কি? এইরকম ভিন্ন ভিন্ন বোধের অনুভব কেন হল? আমার ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতাই কি ঐরূপ বিবিধ জ্ঞানের কারণ অথবা সূর্যরশ্মি এবং বালুরাশির বস্তুধর্মই এইসব ঘটনার কারণ!

পদার্থ বিজ্ঞান নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সঙ্গে বলবে বস্তুধর্মই ঐ সব বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর কারণ। উত্তপ্ত বালুকা সন্নিহিত বায়ুস্তর সমূহে বৃক্ষপ্রতিহত সূর্যরশ্মি আনতভাবে অর্থাৎ বক্রীভাবে দর্শকের চক্ষুগোলকে এসে পড়ে সুতরাং প্রতিবিম্বের নিয়মানুসারে বা দর্পণ-ন্যায়ে চক্ষুসংলগ্ন রশ্মি সমসূত্রপাতে হঠাৎ যেন বেড়ে গিয়ে একটি কল্পিত স্থানে ঐ বৃক্ষের ছায়া নির্মাণ করেছে। আর বালুকা সন্নিহিত বায়ুস্তরগুলির ঘনত্ব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন করে বলে এবং দর্শকের মনে জলসংস্কার বিদ্যমান রয়েছে বলে একটি কল্পিত তরঙ্গযুক্ত জলময় আস্তরণ অনুভূত হয়েছে। সুতরাং এইসকল দৃশ্য বস্তুধর্মানুসারেই ঘটেছে এবং যা যা ঘটেছে, চক্ষুরিন্দ্রিয় তাই গ্রহণ করেছে বলে ইন্দ্রিয়শক্তির কোনরকমের অক্ষমতা কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। এই হবে পদার্থবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

আমরা বলব — বস্তুধর্ম যাই হোক না কেন, ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতাবশতঃ কল্পিত জল ও ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঐ বৃক্ষপ্রতিহত সূর্যরশ্মি বালুরাশি সন্নিহিত বায়ুস্তর সমূহের মধ্যে প্রবেশপূর্বক বক্রীভাব ধারণ করে চক্ষুঃগোলকে পৌঁচেছে সত্য কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় বক্রীভাবে সূর্যরশ্মির অনুসরণ করতে না পেরে নিজের অক্ষমতা পূরণের জন্য দর্পণের মত বালুকাগর্ভে মায়াবৃক্ষ নির্মাণ করেছে। আর দর্শকের মন ইন্দ্রিয়ে জলসংস্কার বর্তমান রয়েছে বলে বালুকা সন্নিহিত উত্তপ্ত বায়ুস্তরের ঘনত্ব পরিবর্তনই জল ও তরঙ্গ জ্ঞানের উদয় করেছে। যদি সাক্ষাৎ সূর্যকিরণ অনুসরণ করে চক্ষুরিন্দ্রিয় বৃক্ষদর্শন করতে সমর্থ হত এবং যদি তরঙ্গিত জলসংস্কার মন নিবারণ করতে পারত, তাহলে দর্শক কখনই কল্পিত জলাদি অনুভব করতেন না। এই সমস্ত কারণে বলতেই হবে যে ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতাই দর্শকের মনে কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত অনুভবের সৃষ্টি করেছে। অতএব এইরকম অবস্থায় দৃষ্ট বিষয়ে দর্শকের কোন প্রত্যক্ষতা নাই বলে তাঁর জ্ঞান যে পরোক্ষ এতে কোন সন্দেহ নাই। মৃগতৃষ্ণিকায় এইরকম ঘটনা ঘটলেও অপরাপর বিষয়ে দর্শকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভবপর বলে পাছে কেউ সিদ্ধান্ত করেন, সেইজন্য অন্যান্য বিষয়ে কিছু উদাহরণ তোমাদেরকে দিচ্ছি।

আমরা সকলে প্রত্যহ সূর্যকে দেখছি কিন্তু সূর্যকে যেখানে দেখি সে কেবল একটি কল্পিত স্থান। যদিও মাধ্যন্দিনে নিতান্ত অল্পসময়ের জন্য তাঁকে স্বস্থানে অবস্থান করতে দেখি কিন্তু সেটাও যে বিপর্যয়জ্ঞান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পদার্থবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জানেন যে অন্তরীক্ষমণ্ডল হতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে বক্রীভাবে গমন করে। মণ্ডল হতে মণ্ডলান্তরে গমন করে এই রশ্মি পথান্তর প্রাপ্ত হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে বায়ুমণ্ডল হতে সূর্যরশ্মি যখন জলমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন পথচ্যুত হয়। এইজন্য জলের মধ্যে একখণ্ড রজত খণ্ড ফেললে দিলে সেটি উদ্‌গত হয়েছে বলে মনে হয়। রশ্মি সূর্য হতে আগমন করে বায়ুমণ্ডলে যখন প্রবেশ করে তখন তা বক্রীভাবে চক্ষুঃসংলগ্ন হয় এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় তদনুসারে অনুভব করতে অশক্ত বলে তার এই অক্ষমতা পূরণের জন্য চক্ষুঃসন্নিহিত রশ্মির সমসূত্রপাতে একটি মায়াকল্পিত স্থানে সূর্যের সন্নিবেশ ঘটায়।

এইজন্য ঊষাকালে যখন সূর্য চক্রবালের উপর আগমন করেন নি তখন তাঁকে আমরা আকাশপটে উদিত হতে দেখি এবং সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে যখন তিনি চক্রবালের নিম্নে অস্ত গিয়েছেন তখনও আমরা আকাশপটে তাঁর বিদ্যমানতা অনুভব করি। এ বিষয়ে পদার্থবিদরা

জানেন যে সূর্যকিরণ মণ্ডল হতে মণ্ডলান্তরে আনত হয়েছে বলে ঐ রকম ভ্রান্তিদর্শন হয় এবং দার্শনিকরাও জানেন যে দর্শকের ঐরকম সূর্যদর্শন বিপর্যয়জ্ঞানের উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। একস্থানের সূর্যকে অন্য একটি কল্পিতস্থানে সন্নিবেশ করায় চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সত্যদর্শনে অক্ষমতা এবং সেই অক্ষমতা পূরণের জন্য মায়াশক্তির বিদ্যমানতা স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই এইরকমভাবে সূর্যদর্শন করে কেউ-ই প্রত্যক্ষতার ভাণ করতে পারে না। দর্পণে নিজের মুখ দেখে কারও যেমন প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মায় না কিংবা অদৃষ্টপূর্ব ব্যক্তির আলোকচিত্র অথবা উক্ত উৎকীর্ণ প্রস্তর মূর্তি দেখে যেমন প্রত্যক্ষজ্ঞানে অধিকার হয় না, সেইরকম কল্পিতস্থানে সূর্য দেখে সূর্যদর্শনে কারও প্রত্যক্ষজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। অতএব যে সূর্যকে আমরা প্রতিদিন দেখছি, সে দর্শনও যথার্থ ও প্রত্যক্ষ নয় বলে এইভাবে সূর্যদর্শনের জ্ঞানকে পরোক্ষ বা অনুমানসিদ্ধজ্ঞান বলেই অভিহিত করতে হবে।

ধর, দর্পণে আমার মুখ দেখলাম। মনে হল মুখের অবিকল প্রতিকৃতি আমি দেখছি। কিন্তু বিচার করে বুঝতে পারলাম আমার মুখের সঙ্গে প্রতিকৃতির কোন সৌসাদৃশ্য নাই। আমার দক্ষিণচক্ষুঃ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিকৃতির বামে, আমার বামচক্ষুঃ প্রতিকৃতির দক্ষিণে এবং এইরকমভাবেই আমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই স্থানবিপর্যয় ঘটে গেছে। তথাপি সকল বস্তুর সমান বিপর্যয় ঘটেছে বলে আমি মুখের প্রতিকৃতি অনুমানে বোধ করতে পারছি। দর্পণ আমার মুখের যে প্রতিকৃতি দেখিয়েছে তাতে মুখের যথার্থ স্বরূপতা নাই বলে এটি প্রত্যক্ষজ্ঞান নয় এবং আমি স্বয়ং আমার মুখ দেখতে পাই না এইজন্য প্রতিকৃতি দর্শনে মুখের অনুমান করি বলে একে পরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত বলেই বলতে হয়। অতএব নিজের চোখে দেখলেও প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত যে বিচারমূলক এবং যুক্তিসিদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

কেবল দর্পণগত প্রতিবিম্ব কেন, স্বস্থান-প্রতিষ্ঠিত মধ্যাহ্নের সূর্যই হোক অথবা বিশ্বের যে কোন বস্তুই হোক, সে সম্বন্ধে আমাদের চাক্ষুষ-জ্ঞান থাকলেও তা এইভাবে অনুমান-সিদ্ধ বলে পরোক্ষ। চাক্ষুষ-জ্ঞানকে কেন পরোক্ষ বলছি তা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে যে চক্ষু যন্ত্রের গঠনপ্রণালী ও ক্রিয়াফল জানা আবশ্যক। কারণ তাহলে কেবল যে ইন্দ্রিয়ের স্বভাব উপলব্ধি হবে তাই নয় কিন্তু যোগিগণ যে কি জন্য বৃত্তিনিরোধের পক্ষপাতী হয়েছেন কিংবা শংকরাচার্য যে কি জন্য নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে অনিত্য বলে ঘোষণা করেছেন, তারও আভাষ পাওয়া যাবে।

আমরা যে অবয়বটিকে চক্ষু বলি, তার পরিমাণ যে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠোদরের সমান হয়ে থাকে। চক্ষুর আকার প্রায় বর্তুল এবং ঋষি সুশ্রুতের ★ মতে পঞ্চমহাভূতের সকল অংশ হতে উৎপত্তি। চক্ষু প্রধানতঃ এগারো ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে সপক্ষ্ম (লোমযুক্ত) অক্ষিপত্রই প্রথম ভাগ। এটি সামনে থেকে ধূলিকণা প্রভৃতি বাহ্যপদার্থ

★ সুশ্রুত -- আয়ুর্বেদাচার্য সুশ্রুত চরকের সমসাময়িক। উভয়ের আবির্ভাব কাল ১৫-১৪ খৃষ্টপূর্ব শতাব্দী। অস্ত্রোপচারে সুশ্রুতের পারদর্শিতা সুপ্রসিদ্ধ। চরক এবং সুশ্রুতই প্রাচীন বৈদ্যশাস্ত্রের জীর্ণোদ্ধার করে বৈদ্যশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। এঁর প্রণীত গ্রন্থের আদি নাম সুশ্রুত তন্ত্র। কনিষ্কের রাজত্বকালে এই গ্রন্থ সুসংস্কৃত হবার পর সুশ্রুত সংহিতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অনেক পণ্ডিতের মতে বিশ্বামিত্র পুত্র বৃদ্ধ সুশ্রুত ও সুশ্রুত একই ব্যক্তি। সুশ্রুত ধন্বন্তরীর নিকট বৈদ্যশাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন।

থেকে চোখকে রক্ষা করে। তার পেছনে আছে যোজক-ত্বক্। সহোম অক্ষিপত্রের বাধা সত্ত্বেও ধূলা-বালি প্রভৃতি অক্ষিগোলকে গিয়ে পড়ে তাহলে যোজক-ত্বক্ তা অপসারণ করে থাকে। এইভাবের দু' চোখের দুই যোজক-ত্বক্ যেন দৌবারিকের কাজ করে চলেছে। এর পরে আছে কতকগুলি ব্যূহতন্তু নির্মিত শাঙ্গত্বক বা স্বচ্ছাবরণী। সম্মুখস্থিত এই স্বচ্ছাবরণীকে সুশ্রুত শ্বেতমণ্ডল বলে অভিহিত করেছেন। শ্বেতমণ্ডলের পেছনেই রয়েছে তারকামণ্ডল। প্রাচীনেরা এই তারকামণ্ডলকেই বলতেন কৃষ্ণমণ্ডল। শ্বেতমণ্ডলের স্বচ্ছতার জন্য কৃষ্ণমণ্ডলকে তারই অংশ বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটির পেছনে অন্যটি অবস্থিত। এই কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যভাগে একটি সছিদ্র কনীনিকা আছে। এই কনীনিকা, মণি বা দীপ্তোৎপলের অভাবে সূচীবিদ্ধ আলোকলেখ্য যন্ত্রের মত কাজ করে থাকে। এরই কেন্দ্রস্থল দিয়ে রশ্মিগুচ্ছ অক্ষিমুকুরকে কেউ কেউ মণি বা দীপ্তোৎপল বলে থাকেন। এটি স্বচ্ছ উভয়দিকে ন্যুজ এবং আকুঞ্চনে প্রসারণে সামান্যতঃ উপযোগী। এর গর্ভে এবং বাইরে একরকমের জলীয় রস আছে। এইসকল পদার্থের ভিতর দিয়ে রশ্মিগুচ্ছ মণির পশ্চাৎস্থিত এক রকমের স্বচ্ছ রসে প্রবেশ করে তৎপশ্চাৎবর্তী একটি কোমল অর্ধস্বচ্ছ চিত্রপত্রের উপরে গিয়ে পড়ে এবং এই প্রপতনের ফলেই দ্রষ্টব্য বস্তুর একটি প্রতিবিম্ব আঁকা হয়ে যায়। এই চিত্রপত্রের পেছনে একটি কালো আবরণ আছে এবং তার পশ্চাৎভাগ স্থিত ঘনত্বক সমগ্র অক্ষিমণ্ডলকে গ্রথিত রেখেছে।

কৃষ্ণবর্ণ সকল বর্ণের অভাব বলে উক্ত চিত্রপত্র নানারকমের বর্ণজ্ঞান উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। এই চিত্রপত্র একটি কোমল অর্ধস্বচ্ছ ঝৈল্লিক পদার্থ এবং একে দর্শনস্নায়ুর বিস্তৃতি বলে ধরা হয়। মস্তিষ্কের সঙ্গে দর্শনস্নায়ুর সংযোগ থাকার ফলে ঐ চিত্রপত্রস্থিত প্রতিবিম্বের বা বর্ণগত বিভিন্ন বিভিন্ন কম্পনের সন্নিকর্ষরূপ (ইন্দ্রিয়গোচর রূপ) স্পর্শচৈতন্য আমাদের বুদ্ধিস্থ হয়ে থাকে। চক্ষুঃযন্ত্রের গঠনপ্রণালী এবং তার ভিন্ন অংশের কার্যকারিতা এত বিশদভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্য এটি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে তবেই আমরা চাক্ষুষজ্ঞানের স্বভাবটি ভাল করে বুঝতে পারব।

অক্ষিমণ্ডলস্থিত চিত্রপত্রে বস্তুর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে থাকে তা স্পর্শচৈতন্যের কারণ। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র প্রতিবিম্বটি চিত্রপত্রে বিপরীতভাবে পতিত হয় বলে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির জ্ঞানও বস্তু সম্বন্ধে বিপরীত হয়ে থাকে। বটবীজ হতে যেমন বটগাছই হয়, অন্য গাছ হয় না, সেইরকম বিপর্যস্ত প্রতিবিম্ব হতে অবিপর্যস্ত জ্ঞান না হয়ে বিপর্যস্ত জ্ঞান হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ কথা পদার্থবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করে থাকেন। এইভাবে বস্তু হতে জ্ঞানের বৈলক্ষন্য হলেও জ্ঞান ও বস্তুর অন্তরালে কোন আপেক্ষিকতা নাই বলে সংস্কারবশতঃ আমরা উভয়ের পার্থক্য বুঝতে পারি না। সাপেক্ষজ্ঞানের অভাব থাকলে কোন পরিণাম অনুভূত হয় না তা অন্য একটি উদাহরণ নিলেও বুঝা যায়। যেমন পৃথিবীর আহ্নিকগতির জন্য আমরা প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৫০০ ক্রোশ হিসাবে ১৫০ অংশ অর্থাৎ সার্ধ দ্রেক্কাণ ঘূর্ণিত হচ্ছি, আর পৃথিবীর বার্ষিকগতির জন্য ঐ সময়ে প্রায় ৩২৪০০ক্রোশ হিসাবে ভূকক্ষের একস্থান হতে প্রক্ষিপ্ত হচ্ছি এবং অভিজিৎ নক্ষত্রাভিমুখে সমস্ত সৌরজগতের অভিধানের জন্য ঐ সময়ে আমরা ১৮০০০ ক্রোশ হিসাবে সৌরকক্ষের একস্থান হতে অন্যস্থানে নীত হচ্ছি কিন্তু সাপেক্ষজ্ঞানের অভাবের জন্য এই গতিত্রয়ের কোন পরিণাম অনুভব না করে

আমরা মনে করছি যে আমরা স্থিরভাবেই বিরাজ করছি!

বস্তুর স্বরূপ স্থগিত করে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করাই ইন্দ্রিয়ের এই রকম স্বভাব। আমরা ভূপৃষ্ঠে থেকে নিয়ত শূন্যে ভ্রমণ করছি কিন্তু দেখ কী দুর্দৈব, ইন্দ্রিয় আমাদের মধ্যে বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন করে পৃথিবীর স্থির এবং সূর্যকে গতিশীল হিসাবে দেখিয়ে ছাড়ছে! কেবল তাই নয়, ইন্দ্রিয়ের আরও অদ্ভুত কেরামতি আছে। বস্তুতঃ আমরা পশ্চিমদিক হতে পূর্বদিকে ভ্রমিত হচ্ছি বলে সূর্যকে তার বিপরীতভাবে অর্থাৎ পূর্ব হতে পশ্চিমে যেতে দেখছি। সুতরাং বাইরে যেমন ঘটনা ঘটছে মন-ইন্দ্রিয় যে তার বিপরীত কাণ্ড অবলম্বন করছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

এটিই যে ইন্দ্রিয়ের কেবল মাত্র দোষ তা নয়। ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতাও জ্ঞানান্তর উদ্ভাবন করে থাকে। মৃগতৃষ্ণিকার উদাহরণে তার ঐ বিলক্ষন স্বভাবটি ইতিপূর্বে দেখিয়েছি। মহর্ষি গৌতমও ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়ে ইন্দ্রিয়ের ঐ রকম ব্যভিচারিতা লক্ষ্য করে বলেছেন —'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্' অর্থাৎ বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হেতু যে জ্ঞান হয় তা অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক হলে তাকে প্রত্যক্ষ বলা যায়। ভগবান বাৎস্যায়ন এই মন্ত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে বলেছেন — 'গ্রীষ্মে মরীচয়ো ভৌমেন উষ্মণা সংসৃষ্টা স্পন্দমানা দূরস্থস্য চক্ষুষা সন্নিকৃষ্যন্তে তত্রেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ উদকমিতি জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তচ্চ প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ — অব্যভিচারীতি।' অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের স্বাভাবিক গরমের জন্য পার্থিব বস্তু সকল উত্তপ্ত হয়ে থাকে। সেই উত্তাপের জন্য সূর্যকিরণ সংসৃষ্ট ও স্পন্দমান হয়ে দূরগত দ্রষ্টার চক্ষুতে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ গোচরীভূত হয়ে জলজ্ঞান উৎপন্ন করে। প্রত্যক্ষতায় সেইরকম ভ্রান্ত জ্ঞান নিবারণ করার জন্য আচার্য 'অব্যভিচারিণ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র যাকে অব্যপদেশ্য , অব্যভিচারী এবং ব্যবসায়াত্মক-প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে গ্রহণ করেন তা ব্যবহারতঃ সত্য হলেও তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক নয়। এইজন্য যোগশাস্ত্র সর্বাগ্রে বৃত্তি নিরোধের পক্ষপাতী। যে সকল ইন্দ্রিয় যে কোন বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উৎপাদক, তারা যে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণে বা নির্ণয়ে ভ্রান্ত, বিপর্যস্ত ও অসমর্থ, তা বোঝানোর জন্যই আমি এতক্ষণ ধরে এত কথা বললাম। মৃগতৃষ্ণিকার উদাহরণে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি দেখানো হয়েছে। সূর্যাদির গতি বিষয়ে যা কিছু আলোচনা করেছি তাতে তার বিপর্যয় কিভাবে হয় তা দেখানো হয়েছে। এখন বস্তুর যথার্থ জ্ঞান উৎপাদনে ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা কতখানি তা বুঝিয়ে বলছি, তোমরা সবাই মন দিয়ে শোন।

সূর্যের শুভ্ররশ্মি আমরা প্রত্যহই দেখে থাকি। রশ্মির শুভ্রত্বে বা শ্বেতত্বে কারও সন্দেহ নাই , কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় তার শুভ্রত্ব দেখায় এবং মনও সেই শুভ্রত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুভ্র বলে কোন মৌলিক বর্ণই নাই। সকল বর্ণের অভাব হলে যেমন কৃষ্ণত্ব হয়, সেইরকম অনুপাত বিশেষে সকল মৌলিক বর্ণের মিশ্রণেই শুভ্রত্ব হয়ে থাকে। যদি একটি স্বচ্ছ ত্রিপৃষ্ঠ বা তিনশিরাযুক্ত কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের কতকগুলি রশ্মি গমন করে, তাহলে ধূমল, শ্যাম, নীল, হরিৎ , পীত, নারঙ্গ, ও লোহিত এই সাতটি বর্ণের আবির্ভাব হয়। ঐ কাঁচে শ্বেত বলে কোন বর্ণই নাই কারণ শ্বেত কোন মৌলিক বর্ণই নয়। এটি কেবল মিশ্রনের ফল মাত্র। কার্যে কারণ নিহিত থাকে এত স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। শুভ্রবর্ণ রশ্মিতে ধূমলাদি সাতটি বর্ণ

না থাকলে তা হতে কখন ধূমলাদি বর্ণ বিশ্লিষ্ট হত না। সুতরাং এখানে ঐ ধূমলাদি সাতটি বর্ণ কারণ এবং শুভ্রত্ব বা শ্বেতত্ব কার্য বলে পরিগণিত।

ইন্দ্রিয় যদি বস্তুর স্বরূপ গ্রহণে পর্যাপ্ত হত, তাহলে চক্ষু সূর্যরশ্মিতে সূক্ষ্মকারণ দেখতে পেত এবং ঐ কারণের সন্ধান পেয়ে স্থূল কার্যে আর মুগ্ধ হত না। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় সূক্ষ্ম গ্রহণে অশক্ত বলে নিজের অক্ষমতা মায়ার দ্বারা পূরণ করতে গিয়ে সাতটি মৌলিক বর্ণ হতে একটি কাল্পনিক বর্ণের সৃষ্টি করে থাকে। সূর্যরশ্মির মত চন্দ্রকিরণ বা অগ্নিশিখা সম্বন্ধে একই কথা।

সূর্যরশ্মিতে সপ্তবর্ণের সদ্ভাব আছে, এ কথা যে এ যুগের পদার্থবিজ্ঞানীদেরই অভিনব উদ্ভাবন তা নয়। প্রাচীন বৈদিক ঋষিরাও এ তত্ত্ব জানতেন। যোগিগণ সূর্যে সংযম করে প্রজ্ঞালোকে সূর্যরশ্মির তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্য তাঁরা সূর্যকে সপ্তাশ্ব বলতেন। অশ্ব শব্দের অর্থ ঘোটক হলেও এখানে রশ্মির নিরতিশয় সংবেগ হেতু রশ্মি-অর্থে অশ্ব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এইজন্য নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক ঘোটক অর্থে অশ্ব-শব্দ উল্লেখ করার পর বলেছেন — 'অশ্নুবতেঽধ্বানং মহাশনা ভবন্তীতি চ।'

সূর্যকে সপ্তাশ্ব বলার কারণ সপ্ ধাতুর অর্থ একত্র হওয়া। সূর্যকিরণে সাতটি মৌলিক বর্ণ একত্র হয়ে নিরতিশয় বেগে গমন করে বলে বৈদিক যুগে সূর্যকে বলা হত সপ্তি। আরও দেখা যায় যে সূর্যরশ্মি জগৎকে ধারণ অর্থাৎ পোষণ করে বলে রশ্মি অর্থক অশ্ব-শব্দ দধিক্রা শব্দেও অভিহিত হয়েছে।

যাইহোক, আমি ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে, চক্ষু গঠনানুসারে প্রতিবিম্বের বিপর্যয়ে জ্ঞানেরও বিপর্যয় ঘটে এবং মানুষের দর্শনশক্তি প্রতীপগত রশ্মির অনুসরণে অসমর্থ বলে চক্ষু দ্রষ্টব্য বস্তুর একটি ছায়ামূর্তি দেখায় বলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রতারণামূলক কার্যকারিতা সহজেই প্রতিপাদিত হয়। অতএব পরমার্থদৃষ্টিতে চক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ দর্শন হয় না বলে যোগশাস্ত্রে চক্ষুদৃষ্ট ও বুদ্ধি নামক অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে পরোক্ষ অর্থাৎ অনুমানসিদ্ধ জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। স্থালীপুলাক ন্যায়ানুসারে এখানে কেবল চাক্ষুষ জ্ঞানের উদাহরণ দেখানো হলেও অন্যান্য সমূহ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান উপলব্ধ হয়, তা ব্যবহারতঃ সত্য হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। এই সমস্ত কারণে যোগিগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ করে এবং বৈদান্তিকরা ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে অনিত্য বলে কেবল মাত্র জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্ব নিরূপনের চেষ্টা করে থাকেন।

এখানে আচার্যপাদ সনৎসুজাতও তত্ত্বদৃষ্টি অবলম্বন করে বুদ্ধিজনিত সমস্ত জ্ঞানকে আধ্যাসিক (অধ্যাসের অর্থ মায়া, মিথ্যা) বলেছেন। বুদ্ধিজনিত আধ্যাসিক জ্ঞান মাত্রই পরোক্ষ সুতরাং তা অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। আর মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা ছাড়া বস্তুর যে প্রকৃত স্বরূপ দর্শন যে উপায়ে হয়ে থাকে তাকে পরাবিদ্যা বলে। বলাবাহুল্য, এই পরাবিদ্যাই অপরোক্ষজ্ঞানের প্রসূতি।

এইভাবে সনৎসুজাতীয়ম অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোক অর্থাৎ শেষ, মন্ত্রটির সবিশেষ ব্যাখ্যা করে একলিঙ্গস্বামী হরিস্বামীকে বললেন —'এইভাবে প্রত্যেকটি মন্ত্র পূর্বাপর প্রসঙ্গ ও সঙ্কেত ধরে ধীরভাবে পর্যালোচনা করে মনন করতে পারলে তবেই মন্ত্রার্থ অধিগত হয়। তুমি এই ভাবেই মনন করবে, তাতে যদি সকালের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যেতে না

পার তাতে কোন ক্ষতি হবে না।'

হরিস্বামী বিনম্রভাবে তাঁর কথায় সায় দিতে তিনি এইবার আমার দিকে তাকিয়ে আমার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তা জিজ্ঞাসা করতে ইঙ্গিত করলেন। আমি তাঁকে কোন প্রশ্ন করব একথা ভেবে দেখি নি। তাই সহসা তাঁর সম্মতি পেয়ে ৩/৪মিনিট চুপ করে বসে থেকে ভেবে চিন্তে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই একটি বেদমন্ত্র সম্বন্ধে আমার একটা শঙ্কা নিবেদন করে বসলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের বশিষ্ঠ ঋষি দৃষ্ট ১৩ নম্বর মন্ত্রে আছে,

সত্রে হ জাতাবিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানম্।
ততো হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ততো জাতমৃষিমাহুর্বশিষ্ঠম্॥

আমি এই মন্ত্রের সরল অর্থ যা বুঝেছি তা হল —'যজ্ঞে উৎপন্ন মিত্র ও বরুণ স্তুতি দ্বারা প্রার্থিত হয়ে, কুম্ভের মধ্যে নিজ তেজ স্থাপন করেছিলেন। অতঃপর সেই কুম্ভের মধ্য হতে মান আবির্ভূত হলেন। বশিষ্ঠ ঋষিও তা হতেই জন্মেছিলেন।' পূর্ববর্তী দুটি ঋক্‌মন্ত্রেও আছে বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের পুত্র; উর্বশীর মন হতে জাত। এই আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ কি ? আমার প্রধান প্রশ্ন হল, মন্ত্রোক্ত এই মান কে ? ইনিও কি বশিষ্ঠের মত কোন ঋষি ছিলেন ?

একলিঙ্গস্বামী — মন্ত্রে আম্নাত মান, ঋষি ত বটেই; মহর্ষি অগস্ত্যেরই পূর্বনাম মান। বশিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বসুতম অর্থাৎ উজ্জ্বলতম অর্থাৎ সূর্য। মিত্র ও বরুণ অর্থে দিন ও রাত্রি। উর্বশীর আদি অর্থ উষা, অতএব বশিষ্ঠ অর্থাৎ সূর্যকে মিত্রাবরুণের (দিন ও রাত্রির) পুত্র বলা হয়েছে। উষাকালের পরই সূর্য উদিত হন, মনে হয় যেন উষা অর্থাৎ উর্বশীর কোল হতেই সূর্য (উদ্ভূত) হলেন !

এখন মান মুনির কথা শোন। এই মান মুনি বিন্ধ্যাচলের দর্প চূর্ণ করে অগস্ত্য নাম পেয়েছিলেন। অগস্ত্য শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি হল — অগং বিন্ধ্যাচলং স্ত্যায়তীতি অগস্ত্য। লোপামুদ্রা অগস্ত্যের পত্নী এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল ইধ্মবাহ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিন্দু পণ্ডিতদের মতে সপ্তগণ্ডকীর নিকটবর্তী শালগ্রামী নদীর তীরে মান মুনি জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে পুলহ মুনির আশ্রম ছিল এবং এখনও ঐ স্থানে মুক্তিনাথের মন্দির বিরাজ করছে। এই মান মুনিই সপ্তসিন্ধু হতে বহুতর আর্য সন্তানকে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে গিয়ে তাঁদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তদুপলক্ষে মান মুনি রাজপুতনাস্থিত সমুদ্রকে শোষণ করে, বিন্ধ্যাচলকে খর্ব করে দেবগিরির অর্থাৎ বর্তমান হায়দরবাদের অন্তর্গত দৌলতাবাদের নিকটে আতাপি, বাতাপি এবং ইল্বল নামক দুর্ধর্ষ অনার্য নেতাদেরকে দমন করেন। যেখানে ইল্বল পরাজিত হয়, তার নাম ইলোলা, পরে ইলোরা, এখন এলোরা হয়েছে। এলোরায় বিশ্বকর্মার চৈত্য অর্থাৎ পর্বতগুহাস্থিত মন্দির পরিবেষ্টিত একটি যজ্ঞস্থান এখনও বর্তমান আছে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধরা ঐখানে বিহার নির্মাণ করেছিলেন। দেবগিরির কিছুদূরে নাসিকের নিকটে অগস্ত্য মুনির আশ্রম ছিল। এখনও এই স্থান আগস্তীপুর নাম প্রসিদ্ধ। এইখানেই লোপামুদ্রার গর্ভে ইধ্মবাহের জন্ম।

মান বা অগস্ত্য যে বিন্ধ্যপর্বতকে খর্ব করেছিলেন, আমরা এই ধাবড়ী কুণ্ডে যে পর্বতের কোলে বসে আছি, এই বিন্ধ্যপর্বত তিন ভাগে বিভক্ত — (১) পারিপাত্র অর্থাৎ অমরকন্টক

হতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত (২) ঋক্ষপর্বত অর্থাৎ মেকল হতে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত এবং (৩) সুক্তিমান্ অর্থাৎ মধ্যদেশের দক্ষিণ পূর্বস্থিত যে ভাগে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির বিরাজ করছে।

পারিপাত্র হতে বিন্ধ্যের একটি শাখা উত্তর-পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়েছে। এই শাখার বর্তমান নাম অ্যারাভেলি পর্বত। অ্যারাভেলির প্রাচীন নাম অর্বুদ পর্বত হলেও তার একাংশই এখন অর্বুদ পর্বত বা আবু পর্বত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অগস্ত্য মুনি দক্ষিণে আর্যোপনিবেশ স্থাপন করলে বশিষ্ঠদেব এই অর্বুদ পর্বতে একটি আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে আবুতে এখনও যে বশিষ্ঠকুণ্ড বর্তমান, তা হিন্দু ও জৈন ভক্তদের কাছে একটি বিশিষ্ট পুণ্যতীর্থ।

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা তোমারা জেনে রাখ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে, আজ হতে অন্ততঃ দশ হাজার বছর পূর্বে সপ্তসিন্ধুর পূর্ব হতে পারিপাত্রের শাখাস্বরূপ প্রাচীন অর্বুদ পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত অর্থাৎ বর্তমান রাজপুতনাদি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল এবং বিন্ধ্যপর্বতের তাৎকালিক উচ্চতাও এখনকার চেয়েও অনেক বেশী ছিল। একথা এখনকার ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরাও স্বীকার করে থাকেন। সপ্তসিন্ধু হতে দক্ষিণ ভারতে আর্যদের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের জন্য মান মুনি যখন উদ্যোগী ছিলেন, তখন কোন না কোন প্রচণ্ড ভূমিকম্পাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এই সমুদ্রগর্ভ উদ্‌গত হওয়ায় ভীষণ জলপ্লাবন হয়েছিল। ঐ জল পশ্চিম সমুদ্রে নির্গত হয়ে যাবার পর উদ্‌গত সমুদ্রগর্ভের মরুময় প্রদেশ অতিক্রম করে মান মুনি আর্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণাপথে উপস্থিত হন এবং তার কিছুকাল পরেই সমুদ্রগর্ভে উদ্‌গমবশতঃ পূর্ববর্ণিত ত্রিখণ্ডান্বিত বিন্ধ্যপর্বতের কতক পরিমাণ ভূগর্ভে প্রোথিত হয় । এই দুইটি ঘটনাকে পৌরাণিক কবিরা নিজেদের কল্পনার আতিশয্যে এই বলে প্রকাশ করেছেন যে মান মুনি তপস্যা প্রভাবে সমুদ্রকে শোষণ করে বিন্ধ্যপর্বতকে খর্ব করেন এবং অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হন।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, আজ হতে অন্ততঃ দশ হাজার বছর পূর্বে সপ্তসিন্ধুর পূর্ব দিকে সমুদ্র বিদ্যমান ছিল। কথাটি বিশ্বাসযোগ্য এই কারণে যে, রাজপুতনার বালুরাশিময় ভূমিখণ্ডই তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই কারণে একথা আরও উল্লেখযোগ্য, ঐ স্থানে সমুদ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করলে ঋগ্বেদোক্ত কতকগুলি মন্ত্রের সুন্দর অর্থ সংগতি হয়। এখন পাঞ্জাবের শতদ্রু, রবি, চন্দ্রভাগা (চেনাব) এবং বিতস্তা (ঝিলাম্) সিন্ধু নদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। কিন্তু ঋগ্বেদ হতে বুঝা যায় যে, বৈদিক যুগে সরস্বতী, বিপাশা (বিয়াস্), আশিক্নি (চন্দ্রভাগা), বিতস্তা (ঝিলাম্) ও সিন্ধুনদ — সকলেই স্বতন্ত্রভাবে সমুদ্রে গিয়ে পড়ত। সেইজন্য সামবেদের ১।২।১।৫।৩। মন্ত্রে এবং ঋগ্বেদের ৫। ৮।১০ মন্ত্রে আম্নাত হয়েছে —

সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বনমন্ত কৃষ্টয়ঃ। সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ॥

ভগবান মনুর সময়ে বা এখন সরস্বতী নদী বিনশন দেশে অর্থাৎ মরুময় সিরহিণ্ড (Sirhind) জেলার বা রাজপুতনায় লুপ্ত হয়েছে সত্য কিন্তু বৈদিক যুগে ঐ নদী হিমালয় হতে অবতরণ করে সমুদ্রে গিয়ে পড়ত। সেইজন্য ঋগ্বেদে আম্নাত হয়েছে — একা চেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ (৫।৬।১৯ বর্গ)। সায়নাচার্য এই মন্ত্রের ভাষ্য করেছেন — নদীনাং শুচিঃ শুদ্ধা গিরিভ্য সকাশাৎ। আসমুদ্রাৎ সমুদ্রপর্যন্তং যতী গচ্ছন্তী সরস্বতী একা অচেতৎ নাহুষস্য প্রার্থনামজ্ঞাসীৎ।

এইসকল মন্ত্রের বিবরণ দেখে আমরা ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের অনুমান সঙ্গত বলেই মনে করি। ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রদ্রষ্টা কান্ববৎস ঋষির সময়ে যদি সরস্বতী নদী হিমালয় হতে আবির্ভূত হয়ে সমুদ্রে পতিত হতেন আর মনুর সময়ে মরুময় বিনশন দেশে প্রবেশ করে থাকেন, তাহলে এই মরুময় বিনশন দেশ কোথা হতে আসল? অবশ্যই সমুদ্রগর্ভ হতেই উদ্গত হয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে। ঋগ্বেদের প্রথমোক্ত মন্ত্রদ্রষ্টা বশিষ্ঠ ঋষির সময়ে যদি সাতটি নদনদী স্বতন্ত্রভাবে বা সাক্ষাৎভাবে সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে থাকে এবং এখন যদি সাতটির পরিবর্তে পাঁচটি নদনদী একত্র মিলিত হয়ে সমুদ্রে গমন করে, তাহলে কি বলতে পারি না যে ঋগ্বেদের পরে কোন না কোন ভীষণ প্রাকৃতিক ঘটনাবশতঃ ভূভাগ ব্যবস্থার বিপর্যয় হওয়ায় দুটি নদীর লোপ এবং পাঁচটি নদনদীর গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছে? কে না জানেন যে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সমগ্র ভূভাগের কোথাও অভ্যুত্থান (Upheaval) আবার কোথাও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জনের (Submerge) অবস্থা প্রায়শঃই ঘটে থাকে ?

বৈদিক সাহিত্য ভাল করে পর্যালোচনা করলে এই প্রাকৃতিক ঘটনার বাহুল্যও কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তখন কোথাও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পাতালগর্ভে প্রবেশ করে অতল জলধির সৃষ্টি করেছে, কোথাও বা বালুময় সমুদ্রতল উদ্গত হয়ে মরুভূমির সৃষ্টি করেছে, কোথাও গগনস্পর্শী পর্বত চূড়া পৃথিবীগর্ভে নিমজ্জন হেতু বা শিখরসমূহ ভেঙে পড়ার জন্য খর্বাকার হয়ে গেছে আবার কোথাও বা মৈনাকাদি পর্বতসমূহ পক্ষবানের মত হিমালয়স্থিত শিবালিক শ্রেণীর (Range) অর্থাৎ মেনকাগিরির অঙ্কদেশ হতে অতল সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করছে — এইসকল প্রাচীন বিপর্যয়ের সংবাদ ভূতত্ত্ববিদগণের অজানা নাই। শুধু ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কেন, জগতের পরমগুরু বেদ পৃথিবীর তাৎকালিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন — 'কিমেতে বহিন্যানাং শোষণং মহার্ণবানাং শিখরিণাং প্রপতনং ধ্রুবস্য প্রচলনং প্রস্থানং বা তরূণাং নিমজ্জনং পৃথিব্যাঃ স্থানাদপসরণং সুরাণাং সোহহমিত্যেতদ্বিধেহস্মিন্ সংসারে কিং কামাপভোগৈঃ ...... ভগবং স্থং নো গতি স্থং নো গতিঃ' (মৈত্রায়ণ ব্রাহ্মণ ১।৭)।

এইসকল প্রলয়ঙ্কর ঘটনা যদি সত্য হয়, জীবের যখন 'ভগবন্! রক্ষা কর, ভগবন্! রক্ষা কর' এই পরিত্রাহি আর্তনাদ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, এইসব বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহলে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের বর্তমান ইতিহাসও পরিবর্তন করা আবশ্যক। এই সমস্ত ইতিহাসে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেছেন ৭।৮ হাজার বছর পূর্বে মিশরাদি দেশের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম ঋগ্বেদ চার হাজার বছরের অধিক হতে পারে না। বোধহয়, মিশরাদি দেশ হতে ইউরোপ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছেন বলেই হয়ত তাঁরা ঐরকম কথা বলে থাকেন। অথচ ঐসব পণ্ডিতরাই কিন্তু খতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, বৃক্ষতত্ত্ব, পশুতত্ত্ব এবং মানবতত্ত্বাদি বিষয়ে গবেষণা করার সময় কিন্তু নিরপেক্ষ মতামতই প্রকাশ করেছেন। এখন তাঁদের ঐসব মতবাদের সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রোক্তি মিলিয়ে দেখে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ভারতের ঋগ্বেদাদি গ্রন্থই মিশরাদি দেশে সভ্যতা বিস্তার করার একমাত্র কারণ। এমন কি মান মুনি তথা অগস্ত্য যখন দক্ষিণযাত্রা করেন, তখন মিশরের গিলগামেশ, পারস্যের আবেস্তা বা ইহুদিদের প্রাচীন সংহিতাদি ধর্মপুস্তকের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

এই পর্যন্ত বলে একলিঙ্গস্বামী চুপ করলেন। পরে দণ্ডী সন্ন্যাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন — আগামী বৃহস্পতিবার আমি আসব না। ১৩ই ভাদ্র রবিবার এসে তোমাদের সঙ্গে পুনরায় সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করব। তোমরা যথারীতি স্বাধ্যায়ও নিদিধ্যাসনে রত থাকবে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — আমি জানি তুমি পুনরায় পথে বেরিয়ে পড়বার জন্য অস্থির হয়েছে। আগামী ১৪ই ভাদ্র সোমবার শুক্লা দ্বিতীয়াতে তোমাকে যেতে অনুমতি দিব। বৃষ্টি ধার কমে এসেছে, আর যদি দু'একবার বৃষ্টিও হয়, তবুও সেই বৃষ্টি তোমার পথ পরিক্রমায় কোন অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। এ কয়দিন তুমি আমাদের কাব্যরসিক সম্বিদানন্দের সঙ্গে কাব্যচর্চা করে সময়টা কাটিয়ে দাও। প্রাণভরে এই প্রাচীন ধারাতীর্থের ছবি মনে মনে এঁকে নাও। তোমার সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে। লোকালয়ে থেকেও যাতে তুমি মা রেবার নিত্যসান্নিধ্য লাভ করতে পার সেই আশীর্বাদই তোমাকে করছি। হর নর্ম্মদে।

তিনি উঠে পড়লেন বেদী থেকে। আমরা সবাই প্রণাম করলাম।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা যথারীতি সম্বিদানন্দজী আমার গুহাতে আসতেই তাঁকে হাসতে হাসতে বললাম — আপনার গুরুদেব বলে গেছেন কাব্যরস পরিবেশন করতে। আপনার মনে আছে ত ? সম্বিদানন্দজী হাসতে হাসতে বললেন — বেশ ত ! তুমি বল কোন কবির কাব্যরস তুমি আস্বাদন করতে চাও।

আমি — সংস্কৃত সাহিত্যসেবীরা বলেন —

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ ।।

অর্থাৎ মহাকবি কালিদাসের কাব্যে উপমা, ভারবির কাব্যে ব্যবহৃত প্রতি শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্য ও অর্থগৌরব, নৈষধের কাব্যে পদলালিত্য পাঠক মাত্রকেই অভিভূত করে। আবার মহাকবি মাঘ রচিত কাব্যে ঐ তিনটি গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। আমি ঐ চারজন কবিরই কাব্যরস আপনার কাছে আস্বাদন করতে চাই।

সম্বিদানন্দজী — লেকিন্ 'চাই' বললেই ত হবে না। যে কোন একজন কবির কাব্য প্রসঙ্গ আলোচনা করেই মাসাধিক কাল কেটে যেতে পারে। কিন্তু শ্রীমানজী ! তুমি ত ১৪ তারিখে এখান থেকে চলে যাবে! এই অল্প সময়ের মধ্যে সকল মহাকবির কাব্যরস যৎকিঞ্চিতও আস্বাদন করা সম্ভব নয়। যে কোন একজন কবির কথা জানতে চাইলে আমি আমার স্থূলদেহের জন্মস্থল মারাঠা দেশের মহাকবি ভারবির কথাই সর্বাগ্রে বলতে ইচ্ছা করি তাতেই তোমার ১৩ই ভাদ্রের সান্ধ্যবৈঠকগুলি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে।

আমি — এ বিষয়ে কি আপনি নিঃসংশয় যে, ভারবি মহারাষ্ট্র দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

সম্বিদানন্দজী — সত্যি কথা বলতে কি, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারবির যখন আবির্ভাব ঘটে, তখন তাঁর জন্মস্থানের নাম ছিল বিদর্ভ। তখন বিদর্ভের পশ্চিমাংশ মহারাষ্ট্র নামে খ্যাত ছিল না। মারহাট্টা জাতির বসতির পর তাদের নামানুসারে বিদর্ভের পশ্চিমাংশ মহারাষ্ট্র নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত গবেষক পণ্ডিত তাঁর মারাঠী ভাষায় লেখা 'মার্হাঠ্যাঞ্চ্যাসংবংধানে চার উদ্গার' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে ভারবি বিদর্ভদেশের অন্তর্গত মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাছাড়া স্বয়ং কবি তাঁর কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের ১৮শ সর্গে ৫ম শ্লোকে লিখেছেন —

উরসি শূলভৃতঃ প্রহিতা মুহুঃ, প্রতিহতিং যযুরর্জুনমুষ্টয়ঃ।
ভৃশরয়া ইব সহ্য ভৃতঃ পৃথুনি রোধসি সিন্ধু মহোর্ময়॥

অর্থাৎ সমুদ্রের ঊর্মিমালা যেরূপ ভাবে সহ্য পর্বতের তটদেশে আহত হয়, সেইরূপ অর্জুনের মুষ্ঠি মহাদেবের বক্ষস্থলে মুহুর্মুহু আহত হয়েছিল।

এই কবিতাটির উপমাভঙ্গী দেখলেই যেন মনে হয়, সহ্যাদ্রি পর্বতমালার পাদদেশে অনেকবার সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সন্নিহিত স্থানবাসী কবির পক্ষে ঘন ঘন সমুদ্রদর্শন যত সম্ভব হয়, সুদূর অন্য প্রদেশবাসী কাব্যরচয়িতার পক্ষে কোন প্রকারেই তা সম্ভব হতে পারে না। সহ্যাদ্রির গায়েই মহারাষ্ট্র দেশ, অতএব উল্লিখিত কবিতাটি পাঠ করলে কবির জন্মভূমি যে মহারাষ্ট্রদেশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

আমি — আপনি যদি কিছু না মনে করেন তাহলে বলি, একমাত্র কবি যদি তাঁর কাব্যে স্পষ্ট ভাষায় নিজ জন্মভূমির কথা উল্লেখ করে থাকেন কিংবা কোন গবেষক পণ্ডিত শিলালেখ ও ইতিবৃত্তের সাহায্যে কবির জন্মভূমির কোন নিশ্চিত প্রমাণ পান তাহলে স্বতন্ত্র কথা নতুবা কাব্যের কোন শ্লোক দিয়ে কবির জন্মস্থান কল্পনা করা স্বপ্নবিলাস মাত্র। সহ্যাদ্রির নামোল্লেখ দেখেই যদি ভারবিকে মহারাষ্ট্রবাসী বলে অঙ্গীকার করতে হয়, তাহলে দক্ষিণভারতের মলয় পর্বত, ঐ সহ্যাদ্রি, গোদাবরী, তাম্রপর্ণী কাবেরী প্রভৃতি নদীর বর্ণনাকারী সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরী কবি হর-বিজয় কাব্যের লেখক রত্নাকরকেও মহারাষ্ট্রের অধিবাসী বলা উচিত নয় কি? আর বিন্ধ্যারণ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যের নিপুণ বর্ণনাকারী মহাকবি বাণই বা বিন্ধ্যারণ্যবাসী একজন ভীল হবেন না কেন? কে না জানেন যে, কবিমাত্রেই কল্পনাপ্রভাবে অনেক অদেখা ও অজানা বস্তুকেও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতে পারেন? কবিতার একটি বিশেষ শ্লোকে মহারাষ্ট্রের সহ্যাদ্রির উল্লেখ আছে বলে তা থেকে যদি কবির জন্মস্থান অনুমান করতে হয়, তাহলে ত তাঁদেরকে সুরলোক বা নাগালোকের বাসিন্দা বলে স্বীকার করে নিতে হয়!

আমার কথাতে সচ্চিদানন্দজী স্পষ্টতঃই বিরক্ত হলেন। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন — লেকিন্, হরবখৎ আপ্ তর্ক করেঙ্গে ত ক্যায়সে কাব্যকা রস আস্বাদন হোগা? শিলালেখ ও তাম্রশাসনের উপর তোমার এতই যখন আস্থা তখন শুনে রাখ ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ প্রদত্ত তাম্রশাসনে ভারবির নাম পাওয়া যায়। তাঁর উষ্মা দেখে আমি হাতজোড় করলাম। শান্তকণ্ঠে মহাত্মা বলতে লাগলেন — প্রথমেই ভারবির পরিচয় শোন, তারপর তাঁর কাব্যের অপার সৌন্দর্য্য ও অর্থগৌরব সম্বন্ধে আলোচনা করব। কবি জন্মেছিলেন বিদর্ভদেশের এক নির্ধন ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁর পিতাঠাকুর দরিদ্র হলেও সুপণ্ডিত ও তেজস্বী ছিলেন। শিশুকালেই পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তিনি পুত্রের নাম রাখেন ভারবি, ভা (প্রতিভায়) রবি (অর্থাৎ সূর্যের মত দীপ্তিশালী)। পিতৃদত্ত নামকরণ থেকেই বুঝা যায়, তাঁর পিতা পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় বেশী আশা করেছিলেন। সত্য সত্যই ভারবি ১৭ বৎসর বয়সের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন কিন্তু যৌবনে পদার্পন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কুসঙ্গে পড়ে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেন। তেজস্বী পিতা এজন্য ভারবিকে মাঝে মাঝে কঠোর শাসন করতে থাকলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্রকে ভদ্রস্থ করতে পারলেন না। মর্মাহত হয়ে তিনি ভারবি নামের পরিবর্তে অবশেষে 'দুর্বিনীত' নামে সকলের কাছে ছেলের পরিচয় দিতে

থাকলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ভারবির উচ্ছৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। অবশেষে একদিন তাঁর মা স্বামীর অনুপস্থিতিকালে ছেলের হাত দুটি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন — বাবা, তোর কাছে আমরা আর কিছুই চাই না, কেবল মৃত্যুর পূর্বে তোকে যদি বিনীত ও সংযত দেখে যেতে পারতাম, তাহলেই আমাদের মৃত্যু বড়ই সুখের হত। স্নেহময়ী জননীর চোখের জল ও কাতর বাক্যে ভারবির চৈতন্যোদয় হল। তাঁর মনে এমনই ধিক্কার জন্মাল যে তিনি সমস্ত কুসংসর্গ ত্যাগ করে, আবার শাস্ত্র পাঠে মন দিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারবির পাণ্ডিত্য এবং কাব্য রচনার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মায়ের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু তাঁর পিতার ব্যবহারে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি পূর্বের মতই ভারবিকে 'দুর্বিনীত চরিত্রহীন' বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভারবির পাণ্ডিত্য ও কবি-প্রতিভার প্রশংসা করলে তিনি বলতেন, 'আপনারা ওর প্রশংসা করবেন না, ওর কিছুমাত্র চরিত্র সংশোধন হয়নি, ভারবিকে আপনারা ভীষণ জন্তুর মত দুর্বৃত্তই বলে মনে করবেন।

এইরকম প্রতিনিয়ত পিতার দুর্বাক্য শুনে শুনে ভারবি অস্থির হয়ে উঠলেন। একদিন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে সংকল্প করে বসলেন 'সম্পূর্ণ সৎভাবে জীবন যাপন করে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্র অনুশীলন করে পিতার জন্য জনসমাজে মুখ দেখাতে পারছি না, কাজেই আজই পিতার প্রাণ বিনাশ করে নিজেও আত্মহত্যা করব।' ক্রোধ মানুষকে পিশাচে পরিণত করে। ভারবি শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। সেইদিনই তিনি রাত্রে তাঁদের তৃণাচ্ছাদিত কুটীরের উপরে উঠে একটা বড় পাথর কোলে নিয়ে বসে রইলেন। অভিপ্রায়, পিতা নিদ্রিত হলেই তিনি তৃণ সরিয়ে তাঁর মাথার উপরে সজোরে পাথরটি ছুঁড়ে মারবেন। এদিকে ঘরের ভিতরে আহারান্তে বৃদ্ধপিতা বিছানায় অর্ধশয়ান অবস্থায় আছেন, ভারবির মাতাঠাকুরাণী গল্প করতে করতে অনুযোগ করছেন — 'দেখ, ভারবির চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে, সে বহুশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেছে , লোকে তাকে চরিত্রনিষ্ঠ সৎ পণ্ডিত বলে সম্মানও করছে, কিন্তু আমার কি দুর্ভাগ্য, তবুও তুমি ছেলেটাকে একটুও আদর কর না, বাছাকে দুটো মিষ্টি কথাও বল না, এই দুঃখে আমার প্রাণ ফেটে যায়।' এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন, 'দেখ, তুমি আমার মনের ভাব বুঝতে পারনি বলেই কষ্ট পাচ্ছ। ভারবি আমাদের একমাত্র পুত্র, তাকে প্রাণাধিক ভালবাসি। সে ছাড়া আমাদের আর কে আছে! মনে প্রাণে আমি তার মঙ্গলাকাঙ্খী বলেই বাহ্যতঃ তাকে কোন আদর দেখাই না। আমি যদি কঠোর ভাব পরিত্যাগ করি, তাহলে সে হয়ত আর সাবধান থাকবে না, শাস্ত্রচর্চায় আর কঠোর পরিশ্রম করবে না, সে মনে করবে, পিতা যখন সন্তুষ্ট হয়েছেন তখন আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। আত্মসন্তুষ্টি তাকে এসে গ্রাস করবে। আমি এটা চাই না, কারণ আমি জানি তার যে অসাধারণ প্রতিভা এবং কাব্যরচনায় যে অতুলনীয় বিধিদত্ত ক্ষমতা, একদিন সে কালজয়ী কীর্তি রেখে যেতে পারবে। তাই বাইরে কঠোরতা দেখাই যাতে কোনমতে তার নব নব উন্মেষশালিনী সৃষ্টিকার্যে কোনমতে না ভাটা পড়ে।'

কুটীরের শীর্ষদেশে বসে ভারবি কথাগুলি শুনলেন। অনুতাপের গ্লানিতে তাঁর বুক ভরে গেল। তিনি পাথর দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিচে নেমে এসে উন্মাদের মত

ছুটতে ছুটতে ঘরের মধ্যে ঢুকে তাঁর পিতার পা দুটি জড়িয়ে ধরে মাথা ঠুকতে ঠুকতে নিজের দুষ্ট অভিসন্ধির কথা অকপটে ব্যক্ত করলেন এবং বললেন — 'বাবা, আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, আপনার মত দেবচরিত্র মহাগুরুকে আর একটু হলে হত্যা করে ফেলতাম। আমাকে ক্ষমা করুন, বলুন আমার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্য কি?'

মাতাপিতা উভয়েই ভারবিকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ভারবি মাতাপিতার আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর কীর্তিমন্দির স্বরূপ 'কিরাতর্জুনীয়ম্' মহাকাব্য রচনায় মন দিলেন। শোনা যায়, ভারবির মাতাপিতা ঐ মহাকাব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই পরলোকে গমন করেন। এর কয়েক বৎসর পরে মহাকাব্য সমাপ্ত হওয়ার পর আনুমানিক ৫০ বৎসর বয়সেই কবি-প্রতিভায় সূর্যস্বরূপ, সার্থকনামা ভারবিও চরমাচল আশ্রয় করলেন।

কথিত আছে, অন্তিম সময়ে কবি তাঁর রোরুদ্যমানা ধর্মপত্নীর হস্তে তাঁর কাব্য হতে উদ্ধৃত একটি কবিতা দিয়ে বলেন — যদি কোন দিন অভাবে পড়, তবে আমার কবিতাটি বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করো।

মহাকবির দেহত্যাগের দু' একবছর পরেই সত্য সত্যই কবি-পত্নী দুরবস্থায় পড়লেন। অনাহারে অর্ধাহারে তাঁর দিন কাটতে থাকল! এইসময় পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক ধনী বনিক পুত্র এক নূতন হাট বসিয়ে সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন — 'হাটে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হবে না হাটের অধিকারী ন্যায্য মূল্য দিয়ে সেইসকল অবিক্রীত দ্রব্য ক্রয় করে নিবেন।' কবিপত্নী সাগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগলেন সত্যসত্যই বণিকপুত্র হাটের শেষে অবিক্রীত দ্রব্যসকল বিক্রেতাকে প্রার্থিত মূল্য দিয়ে কিনে নিচ্ছেন। তাঁর মনে আশার সঞ্চার হল। তিনি একদিন স্বামীর স্বহস্তলিখিত কবিতাটি নিয়ে অবগুণ্ঠিত বদনে হাটের একটি বটগাছের তলায় গিয়ে বসে রইলেন। সমস্ত দিন ধরে হাটে বহু দ্রব্যেরই ক্রয় বিক্রয় হয়ে গেল, ক্রমে হাট ভাঙার পর বণিকপুত্রের কর্মচারীরা অবিক্রীত দ্রব্যগুলি ক্রয় করতে লাগলেন। কবিপত্নী বিষন্নবদনে বসে আছেন। কর্মচারীরা অবশেষে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা! তোমার কোন্ জিনিষ বিক্রয় করতে পার নি?' কবিপত্নী নীরবে তাঁর হস্তধৃত কবিতাটি তাঁদের সামনে এগিয়ে দিলেন।

— এই জিনিষের মূল্য কত? আপনি কত টাকা প্রত্যাশা করেন?

— বিংশতি সহস্র রজত মুদ্রা।

এত অধিক মূল্য দিয়ে কোন জিনিষ ক্রয় করার অধিকার কর্মচারীদের ছিল না। তাঁরা সম্ভ্রমে কবিপত্নীকে সঙ্গে নিয়ে বণিকপুত্রের কাছে গিয়ে সকল কথা নিবেদন করলেন। বণিকপুত্র কোটিপতি হলেও এত অধিক মূল্যে কবিতা বিক্রয়কে প্রথমে নিছক প্রতারণা বলে মনে করলেন কিন্তু অবশেষে অনেক বিচার-বিতর্কের পর নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার অনুরোধে কবিপত্নীকে তাঁর প্রার্থিত মূল্য প্রদান করে কবিতাটি কিনে নিলেন।

বহুমূল্যে ক্রীত কবিতাটি যাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য তিনি নিজ শয়নগৃহের রৌপ্যনির্মিত দ্বারদেশের উপরিভাগে কবিতাটি সোনালী অক্ষরে উৎকীর্ণ করে রাখলেন।

কিছুদিন পরেই বণিকপুত্রকে বাণিজ্যের জন্য সিংহল যাত্রা করতে হল। তখন তাঁর নববধূ প্রথম অন্তর্বত্নী অর্থাৎ অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। ঐ সময়ে যে সকল সাংযাত্রিক বা পোত-বণিক নিজেদের বাণিজ্যপোত নিয়ে সিংহলে যেতেন, ভারতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে এবং

সিংহলজাত দ্রব্য ক্রয় করে স্বদেশে ফিরে আসতে তাঁদের প্রায় একবৎসর সময় লেগে যেত। কিন্তু কিছু নিয়মভঙ্গের ফলে, সিংহলের কিছু রাজকর্মচারীর চক্রান্তে বণিকপুত্র সিংহলে কারারুদ্ধ হলেন। তাঁকে চৌদ্দ বৎসর যাবৎ সিংহলে পড়ে থাকতে হল। পরে তাঁর কয়েকজন পিতৃবন্ধুদের সহায়তায় তিনি উচ্চতর আদালতের শরণাপন্ন হয়ে নিরপরাধ বলে প্রমাণিত হলেন এবং ধনসম্পদও ফিরে পেলেন। দীর্ঘকাল বিদেশ বাসের পর বণিকপুত্র ফিরে এলেন স্বদেশে। তিনি স্ত্রীকে চমকে দিবার জন্য ইচ্ছা করেই বাড়ীতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের কোন সংবাদ পাঠালেন না। চুপি চুপি একদিন গভীর রাত্রিতে প্রাসাদে প্রবেশ করে, গৃহরক্ষীদেরকে কোন আনন্দ কলরব করতে নিষেধ করে অন্তঃপুরে সরাসরি শয়নগৃহের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। উন্মুক্ত জানালাতে উঁকি মেরে দেখলেন, তাঁর পত্নী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাঁর বুকে মাথা লুকিয়ে আর একজনও কেউ যেন ঘুমিয়ে আছে! গৃহমধ্যস্থ ঝাড়-লণ্ঠনের স্বল্পালোকে পুরুষটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাঁর পশ্চাৎভাগ দেখে তাকে একজন নবীন-যুবা বলেই বণিকপুত্রের মনে হল।

এই দৃশ্য দেখে তাঁর আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলে উঠল। কোষমুক্ত তরবারি হাতে দরজাতে ঠেলা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাবেন দরজার উপর দিকে দৃষ্টি পড়তেই তাঁর চোখের সামনে ভারবি-পত্নীর কাছে ক্রীত সোনালী অক্ষরে উৎকীর্ণ সেই কবিতাটি তাঁর চোখে পড়ল —

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্ অবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধা স্বয়মেব সম্পদঃ॥

অর্থাৎ

সহসা করো না কার্য সুবুদ্ধি মানব!
অবিবেক সর্ববিধ বিপত্তি কারণ।
গুণের লোভেতে লক্ষ্মী আপনি আসিয়া
বিবেকী জনেরে লন করিয়া বরণ॥

তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল —'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্! সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্! হঠকারিতাবশে অকস্মাৎ কোন কাজ করে বস না!'

বণিকপুত্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিজেকে কতকটা সংযত করে ভাবলেন,'এখন অপরাধিনী ও অপরাধী দুজনেই আমার হাতের মুঠোয়, কাজেই নিতান্ত কাপুরুষের মত নিদ্রাভিভূতকে অস্ত্রাঘাত করা উচিত হবে না, পরে যথোচিত দণ্ডবিধান করলেই চলবে।' এই চিন্তা করতে করতে তিনি তরবারিটি পুনরায় কোষবদ্ধ করলেন। তাঁরই ঈষৎ ঝন্‌ঝন্ শব্দে তার পত্নী জেগে উঠলেন। বিরহিনী বহু বৎসর পরে স্বামীকে দেখতে পেয়ে তার বক্ষলগ্ন সেই 'নবীন-যুবাকে' ঠেলা দিয়ে বলতে লাগলেন — 'ওরে ওঠ, ওঠ, সোনামণি! চেয়ে দেখ তোর বাবা ফিরে এসেছেন!' সিংহল যাত্রার সময় তাঁর পত্নী যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, সে কথা তাঁর মনে পড়ল। আনন্দ আর ধরে না। পত্নীপুত্রকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে করতে তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন— 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ তোরা দৌড়ে আয়। তোরা দেখে যা বিংশতি সহস্র মুদ্রায় যে কবিতা ক্রয় করেছিলাম তা কত সার্থক হয়েছে! বিংশতি সহস্র মুদ্রা কেন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা, এমনকি আমার যথাসর্বস্ব দিয়েও এ কবিতা কিনলেও তা যথার্থ মূল্য হত!'

আখ্যায়িকা শেষ করেই সচ্চিদানন্দজী মন্তব্য করলেন — এই হল মহাকবি ভারবির কবিতার অর্থগৌরব। তাঁর কবিতার প্রতিটি বাক্য কেন, বাক্যস্থিত প্রতিটি শব্দপ্রয়োগের মধ্যেই এই রকম ব্যঞ্জনা আছে , যা একাধিক ভাব প্রকাশ করে দেয়। মহাকবির প্রতিটি শ্লোকই মন্ত্রের মত স্নিগ্ধ ও গভীর অর্থবহ।

৩রা ভাদ্রের সান্ধ্য বৈঠক শেষ হল। ৪ঠা ভাদ্র থেকে ৮ই ভাদ্র পর্যন্ত তিনি প্রতিদিনই আমার কাছে ভারবি সম্বন্ধেই আলোচনা করতে লাগলেন। ৪ঠা ভাদ্র শুক্রবার সন্ধ্যায় এসে প্রথমেই তিনি বললেন — দেখ, কাব্যরস আস্বাদনে তোমার রুচি দেখে আমি খুবই তৃপ্তিবোধ করছি। জগতে শ্রুতিমধুর ও মনোহারী পদার্থ অনেক থাকলেও কাব্যের তুলনায় সকল বস্তুই নিকৃষ্ট। মধুলুব্ধ ভ্রমরের গুঞ্জনই হোক আর বসন্তে মদমত্ত কোকিলের কলকণ্ঠগানই হোক, রসমধুর কবিতার কাছে সকলেই পরাজিত।

দ্রাক্ষা ম্লানমুখী জাতা শর্করা চাশ্মতাং গতা।
সুভাষিতরসস্যাগ্রে সুধা ভীতা দিবং গতা॥

অর্থাৎ কাব্যরসের কাছে সুমিষ্ট দ্রাক্ষাফলের মুখ মলিন, শর্করা ত প্রস্তর চূর্ণে পরিণত হয়, এমন কি সুধাও ভয় পেয়ে দেবলোকে পলায়ন করেন।

মহাকবি ভারবির কাব্যরসের কাছে সুধাও হার মানে। এ রস তোমাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে।আমি কেবল তোমার কাছে তাঁর লেখা 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃতি দিয়ে তোমার সামনে তুলে ধরছি। কবির জীবনবৃত্তের কিছুটা পরিচয় দিয়েছি , আজ 'কিরাতার্জুনীয়' মহাকাব্যের আখ্যান বস্তু তোমাকে বলছি।

মহাভারতের বনপর্বের ২৬ অধ্যায় হতে ৪১ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণিত বৃত্তান্তই কিরাতার্জুনীয়ের মূল উপজীব্য বিষয়। তবে কবি মূল মহাভারতের ঘটনা অবিকল গ্রহণ করেননি, নিজের প্রতিভাবলে তার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন।

কিরাতার্জুনীয়ের বৃত্তান্তটি এই ঃ— পাণ্ডবগণ ছলপূর্ণ পাশাখেলায় শকুনির চাতুরীতে পরাজিত হয়ে রাজ্যহারা হয়েছেন। তখন তাঁরা হৃতসর্বস্ব বনবাসী। যখন দ্বৈতবনে বাস করেছেন, সেই সময় যুধিষ্ঠির একদিন গোপনে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন প্রণালী এবং প্রজাদের মধ্যে কোন বিক্ষোভ আছে কিনা তা জানার জন্য একজন গুপ্তচরকে পাঠালেন হস্তিনাপুরে . গুপ্তচর ফিরে এসে অকপটে যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের প্রজানুরঞ্জন ও সুশাসনের ভূয়সী প্রশংসা করল। সঠিক বৃত্তান্ত নিবেদনের আগে সে ভূমিকা হিসাবে যা বলেছিল, তা ভারবির অনুপম ভাষাতেই শোন,

ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষো ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ॥

'মহারাজ ! গুপ্তচররাই রাজাদের চক্ষু ; প্রভুগণকে প্রতারিত করা তাদের কখনই উচিত নয়। অতএব আমার বর্ণিত সংবাদ আপনার পক্ষে প্রিয়ই হোক আর অপ্রিয়ই হোক, আমাকে তা বলতেই হবে। কেন না, হিতকর অথচ মনোহর বাক্য এ জগতে একান্ত দুর্লভ।'

গুপ্তচরকে ধন্যবাদ সহকারে বিদায় দিয়ে দ্রৌপদীর ঘরে গিয়ে যুধিষ্ঠির সকলের কাছে গুপ্তচরের বিবরণ জানালেন। শত্রুদের সর্ববিষয়ে সাফল্যের সংবাদ দ্রৌপদী সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ক্রুদ্ধা হয়ে সে সময় যুধিষ্ঠিরকে যেসব রূঢ় বাক্য বলেছিলেন তার

দু'তিনটি শ্লোক তোমাকে শুনাচ্ছি। তাহলে তুমি নিজে নিজেই ভারবির সুনির্বাচিত শব্দচয়নের কৌশল এবং অর্থগৌরব অনুভব করতে পারবে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের অতিরিক্ত সরলতাকে ধিক্কার দিয়ে ভীমের অতুলনীয় বাহুবল, অর্জুনের বিক্রম ও যুদ্ধকৌশল, রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে অর্জুনের দিগ্‌বিজয়, ইদানীং বনবাসের দুঃসহ কষ্ট এবং নিজের মনোব্যথার সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন —

দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ।
পরৈরপর্যাসিতবীর্যসম্পদাং পরাভবোহপ্যুৎসব এব মানিনাম্॥

'শত্রুর জন্য তোমার এইরকম দুরবস্থা হয়েছে বলেই আমি আরও বেশী দুঃখিত হয়েছি; কেননা, শত্রু যাঁদের বাহুবল অতিক্রম করতে পারে না, তাদৃশ মানী ব্যক্তিদের দুর্দশাও উৎসব বিশেষ।'

বিহায় শান্তিং নৃপধাম তৎপুনঃ প্রসীদ সন্ধেহি বধায় বিদ্বিষাম্।
ব্রজন্তি শত্রূনবধূয় নিঃস্পৃহাঃ শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো ন ভূভৃতঃ॥

'হে রাজন্! শমগুণ পরিত্যাগ করুন, শত্রুবধের জন্য উদ্যোগী হন, সুখ লাভ করুন। নিস্পৃহ মুনিগণই শমগুণের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন, রাজাদের পক্ষে শমগুণ অবলম্বন করা উচিত নয়।'

অথ ক্ষমামেব নিরস্তবিক্রম শ্চিরায় পর্যেষি সুখস্য সাধনম্।
বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ্ম কার্মুকম্ জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্॥

'আর যদি আপনি বিক্রমকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমাকেই চিরকালের জন্য সুখের সাধন বলে মনে করে থাকেন, তাহলে আর রাজচিহ্ন ধনুর্ধারণ কেন? ধনুর্বাণ ত্যাগ করে জটাধারণপূর্বক আজ হতেই অগ্নিতে হোম করতে লেগে যান।'

দ্রৌপদী এও বললেন যে আরও তের বৎসরকাল শত্রুকে শক্তিবৃদ্ধি করার কোন সুযোগ দিবার প্রয়োজন নাই। অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করুন। শত্রু রাজারা প্রয়োজনবোধে যে কোন অজুহাতে সন্ধিভঙ্গ করে থাকেন। দ্রৌপদীকে সমর্থন করে ভীমও বলতে লাগলেন কৌরবদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করা কর্তব্য —

অথ চেদবধিঃ প্রতীক্ষ্যতে, কথমাবিস্কৃতঃ জিহ্মবৃত্তিনা।
ধৃতরাষ্ট্রসুতেন সুত্যজা শ্চিরমাস্বাদ্য নরেন্দ্রসম্পদঃ॥

'আর যদি ১৩ বছরকাল অপেক্ষাই করেন, তাহলেই কি সেই কপটাচারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সুদীর্ঘকাল রাজ্যসম্পদের সুখ অনুভব করে সহজে কি তা পরিত্যাগ করতে চাইবে?'

দ্বিষতা বিহিতং ত্বয়াথবা যদি লব্ধা পুনরাত্মনঃপদম্।
জননাথ তবানুজন্মনাং কৃতমাবিষ্কৃতপৌরুষৈর্ভুজৈঃ॥

'অথবা, শত্রুগণ যদি ১৩ বৎসর গত হলে রাজ্যসম্পদ প্রত্যার্পণও করে, তাহলে আপনার অনুজদের পরাক্রমশালী বাহুর আর কি প্রয়োজন?'

মদসিক্তমুখৈ র্মৃগাধিপঃ করিভির্বর্তয়তে স্বয়ং হতৈঃ।
লঘয়ন্ খলু তেজসা জগন্ ন মহান্ উচ্ছতি ভূতিমন্যতঃ॥

'পশুরাজ সিংহ মদমত্ত হস্তীকে হত্যা করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে। মহীয়ান ব্যক্তি জগতের সকলকে নিজের চেয়ে লঘু মনে করেন। তিনি কখনও অন্যের অনুগ্রহ প্রদত্ত সম্পদ লাভ করতে ইচ্ছা করেন না।'

দ্রৌপদী ও ভীমের এইসব ভর্ৎসনা এ ক্রোধোদ্দীপক বাক্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি স্থির ধীর প্রশান্তচিত্তে ভীমের বাক্‌পটুতার প্রশংসা করে বললেন — এখন যুদ্ধের সময় নয়, ধৈর্য্য ধরে উপযুক্ত কালের জন্য আমাদের প্রতীক্ষা করা উচিত। এই সময় তিনি বললেন সেই পূর্বালোচিত শ্লোকটি যেটি বিক্রয় করে ভারবি-পত্নী বণিকপুত্রের কাছ হতে 'বিংশতি সহস্র রজতমুদ্রা' গ্রহণ করেছিলেন — 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্' ইত্যাদি। তিনি আরও জানালেন,

অভিবর্ষতি যোহনুপালয়ন্ বিধিবীজানি বিবেকবারিণা।
স সদা ফলশালিনীং ক্রিয়াং শরদং লোকইবাধিতিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ কৃষক যেমন বীজ বপন ও তাতে জলসেচ করে শস্যশালিনী শরৎকালের জন্য প্রতীক্ষা করে, সেইরকম যিনি বিবেচনা করে উপযুক্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

তিনি ভীমকে লক্ষ্য করে আরও বললেন — তুমি যে বাহুবলে রাজ্যলক্ষ্মী জয় করার কথা বলালে, চিরকালের জন্য রাজ্যলক্ষ্মীকে বশে রাখাই বা যায় কোথায়? শরৎকালের মেঘের মত চঞ্চলা রাজলক্ষ্মী বহুচ্ছলে মানুষকে পরিত্যাগ করে যান। তুমিও দ্রৌপদী উভয়কে দেখছি, দুর্যোধনের উন্নতিতে নিজেদের ভবিষ্যৎকে বড় অন্ধকারময় দেখছ, তাতেই তোমরা ক্রোধ ও উষ্মাতে ফেটে পড়তে চাইছ, তোমরা বোধ হয় জান না,

মতিমান্ বিনয়প্রমাথিনঃ সমুপেক্ষেত সমুন্নতিং দ্বিষঃ।
সুজয়ঃ খলুতা দৃগন্তরে বিপদন্তা হ্যবিনীত সম্পদঃ॥

অর্থাৎ দুর্বিনীত শত্রুর উন্নতিকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উপেক্ষা করা উচিত। কারণ, সে রকম শত্রুকে যে কোন সময় বিপাকে ফেলে জয় করা যায়। দুর্বিনীত ব্যক্তির সম্পদ যখন তখন বিপদ্‌গ্রস্ত হতে পারেন। দুর্যোধন স্বভাব-দুর্বিনীত, কাজেই তার উন্নতিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে লাভ নাই।

এইভাবে যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদী এবং সহোদরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, সেইসময় সেখানে সহসা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এসে উপস্থিত। সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁর পাদবন্দনা করলেন। মহর্ষি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে কাছে ডেকে তাঁকে একটি মন্ত্র শুনিয়ে বললেন — 'ইন্দ্রকীল পর্বতে গিয়ে সশস্ত্র হয়ে জপ ও উপবাসের দ্বারা এই মন্ত্রের সাধনা করতে লেগে যাও। নিজের আসন কাউকে দিবে না। মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে পারলে মহাদেবের কৃপায় তুমি পাশুপত অস্ত্র লাভ করতে পারবে। আমি চলে যাবার পরেই তোমাকে পথ দেখিয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে নিয়ে যাবার জন্য একজন যক্ষ আসবে। তার সঙ্গে অবিলম্বে চলে যেও।' সত্যসত্যই মহর্ষি অন্তর্হিত হওয়ার পরেই সেখানে একজন যক্ষ এসে উপস্থিত হলেন। কালমাত্র বিলম্ব না করে অর্জুন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যক্ষকে অনুসরণ করলেন। তখন শরৎকাল, তিনি যক্ষের সঙ্গে যেতে যেতে পথের দুদিকে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মোহিত হলেন। বনরাজি শোভিত তুষারশুভ্র হিমালয়কে দেখে অর্জুনের মনে হল, যেন স্বয়ং বলদেব নীলাম্বরে আবৃত হয়ে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন।

যক্ষ দূর থেকে ইন্দ্রকিল পর্বতস্থিত তাঁর জপের স্থান দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। সুরু হল অর্জুনের দুশ্চর তপস্যা। তপস্যায় নিমগ্ন থাকবেই, বিশেষ সাধকের তপোনিষ্ঠা পরীক্ষা

করার জন্য দেবতারা সদাই তৎপর থাকেন। মহাকবি ভারবি দেখিয়েছেন, ইন্দ্রের ইঙ্গিতে সুন্দরী অপ্সরারা এসে নানা কৌশলে অর্জুনকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। তখন স্বয়ং ইন্দ্র মুনি বেশে উপস্থিত হলেন অর্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করে মোক্ষপথের জয়গান করলেন। তারপর সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন — তোমার এই তপস্যার গূঢ় উদ্দেশ্য কি। অর্জুন স্পষ্ট ভাষায় জান :লেন — বৈর নির্যাতনই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি আবেগের সঙ্গে জানালেন —

বিচ্ছিন্নাভ্রবিলায়ং বা বিলীয়ে নগমূর্ধনি।
আরাধ্য বা সহস্রাক্ষমযশঃ শল্যমুদ্ধরে॥

অর্থাৎ তপস্যা করতে করতে হয় আমি এই পর্বত-শিখরেই লয় প্রাপ্ত হব নতুবা সহস্রনয়ন দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করে অযশ রূপ শল্য (শত্রুরূপী কাঁটাকে) সমূলে উৎপাটিত করব।

অর্জুনের কথায় তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন — 'মহাদেবের আরাধনা কর। তাঁর কৃপায় তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।'

ইন্দ্রের নির্দেশে অর্জুন কঠোরতর শিব তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। যোগ প্রভাবে তাঁর দেহের তেজ ও প্রভা এত বেড়ে গেল যে ইন্দ্রকিল পর্বতের তাপসবৃন্দ তা সহ্য করতে না পেরে মহাদেবের কাছে গিয়ে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। তাপসদের কথায় অর্জুনের উপর মহাদেবের দৃষ্টি পড়তেই তিনি দেখতে পেলেন যে ঐ সময় মূক দানব অর্জুনকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। অর্জুনকে অনুগ্রহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মূক দানবকে প্রতিহত করার জন্য মহাদেব কিরাতরাজ বেশে সসৈন্যে যাত্রা করলেন। মূক দানব বরাহবেশে অর্জুনকে আক্রমণোদ্যত, তখন অর্জুন ভাবলেন এই জন্য মহর্ষি বেদব্যাস তাঁকে সশস্ত্র হয়ে তপস্যায় বসতে বলেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বরাহের প্রতি শর নিক্ষেপ করলেন। একই সময়ে মহাদেবও শর নিক্ষেপ করেছিলেন। বরাহ নিহত হল। অর্জুন যখন বরাহের অঙ্গ হতে নিজ শর উদ্ধার করে নিজের তপস্যাস্থলে ফিলে আসছেন কিরাতবেশী মহাদেবের এক অনুচর অর্জুনের সঙ্গে দেখা করে অতি বিনীতভাবে বললেন — 'যে শরটি আপনি নিয়েছেন, ঐটি আমার প্রভুর। তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়ে বরাহটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, হয়ত আপনার ভুল হয়ে থাকবে। যাই হোক, আমার প্রভুর বাণটি আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। আপনি আমার প্রভুকে জানেন না, তিনি সকল ঐশ্বর্যের অধিপতি দয়া ক্ষমা মহত্ত্ব প্রভৃতি দেবগুণ তাঁর ভুষণ।' অর্জুন কিন্তু কিরাতের অনুচরের কোন কথাই শুনলেন না। তখন কিরাতরাজবেশী দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং এসে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল। মহাদেব কর্তৃক অর্জুনের চাপ ভঙ্গ হলে উভয়ে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। একবার মহাদেব জয়ী হন, ত আর একবার অর্জুন! যুদ্ধ করতে করতে মহাদেব ঊর্ধে লাফ দিলে অর্জুন তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। সেই সময়ে মহাদেব অর্জুনকে বুকে চেপে ধরে নিষ্পেষিত করতে গিয়ে বুঝলেন, অর্জুন অসাধারণ দৈহিক বলের অধিকারী। তিনি পূর্বেই অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হয়েছিলেন, এখন তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়ে আরও পরিতুষ্ট হলেন।

মহাদেব কিরাতবেশ পরিত্যাগ করে স্বমূর্তিতে তাঁর সামনে প্রকট হলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণেরও আবির্ভাব ঘটল সেখানে। অর্জুন দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন

হিমশুভ্রভস্মবিভূষিত স্বয়ং চন্দ্রশেখর। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন এবং স্তবের শেষে বর প্রার্থনা করলেন। ভক্তবৎসল আশুতোষ প্রসন্ন হয়ে অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্রের সঙ্গে ধনুর্বেদের গুহ্য উপদেশও দান করলেন। ইন্দ্রাদি দেবতারাও স্ব স্ব অস্ত্র দান করলেন অর্জুনকে। সিদ্ধকাম অর্জুন অবশেষে ফিরে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

এই হল, ভারবি কৃত 'কিরাতার্জুনীয়' মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত ঘটনা। এখন এই মহাকাব্যের অন্যান্য দিক আলোচনা করছি, মন দিয়ে শুন। এই কাব্যের নায়ক তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, নায়িকা দ্রৌপদী এবং প্রতিনায়ক কিরাতরাজবেশী মহাদেব। আলংকারিকরা কাব্যে যে চার রকমের নায়কের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে এই কাব্যের নায়ক 'ধীরোদাত্ত' গুণসম্পন্ন। যাঁর বৃথা অহংকার নাই, যিনি ক্ষমাশীল, গম্ভীর অতিশয় বলবান্‌, বিপদেও স্থির, যাঁর আত্মগৌরববোধ প্রচ্ছন্ন, তাঁকেই ধীরোদাত্ত নায়ক বলা হয়। ভারবি দেখিয়েছেন, অর্জুনে এই সমস্ত গুণই বিদ্যমান।

তপস্যায় যাত্রাকালে দ্রৌপদী অর্জুনকে বলেছিলেন — 'দুঃশাসন যখন প্রকাশ্য রাজসভায় আমার কেশাকর্ষণ করে যৎপরনাস্তি অপমান ও লাঞ্ছনা করেছিল এবং আমি অনাথার মত আর্তনাদ করেছিলাম, তখন লোকে তোমাদের বাহুবলের নিন্দা করেছিল। জিজ্ঞাসা করি, সভা মধ্যে সশরীরে উপস্থিত থেকে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত যে আমার চরম লাঞ্ছনা নিজের চোখে দেখেছিল, তুমিই কি সেই ধনঞ্জয়? যে ক্ষত্র অর্থাৎ বিপদ হতে ত্রাণে সমর্থ সেই যথার্থ ক্ষত্রিয়, কর্মে যার শক্তি আছে সেই কার্মুক বা ধনুর্ধারণের যোগ্য। যিনি নিষ্ফল ক্ষত্রিয় নাম এবং কার্মুক বহন করেন, তাঁর দ্বারা শব্দের প্রকৃত অর্থ দূষিত হয়। অতএব তুমি শীঘ্র মহর্ষির আজ্ঞা পালন করে সিদ্ধকাম হয়ে ফিরে এস। তুমি কৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে আমি তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করব, এই আশায় প্রতীক্ষা করে রইলাম।'

অর্জুন দ্রৌপদীর কথা শুনে ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন, মনে হল শত্রুরা যেন তাঁর সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাঁর মুখে একটিও কথা ফুটে উঠল না, ক্রোধের কোন অভিব্যক্তিও দেখা গেল না। তিনি নীরবে যক্ষের সঙ্গে ইন্দ্রকিল পর্বতাভিমুখে যাত্রা করলেন। কি সুন্দর সংযম ও গর্বহীনতা! অন্য কোন সাধারণ নায়ক হলে তার মুখে কত না অহংকারপূর্ণ আস্ফালনের কথা শোনা যেত! কিন্তু অর্জুন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্তব্যকর্মে ধীর-স্থির। আবার অর্জুন যখন বরাহরূপী দানবকে বধ করে বাণটি নিয়ে ফিরছিলেন, সেই সময় কিরাতরাজরূপী মহাদেবের অনুচর সেখানে উপস্থিত; তাঁর সঙ্গে অর্জুনের অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হল, কিরাত অর্জুনকে উত্তেজিত করার জন্য এমন কথাও বললেন — 'আপনি যে শুধু অন্যের বাণ অপহরণ করছেন তা নয়, অপরের বিদ্ধ বরাহকে বধ করার ভান করে আরও দোষ করেছেন, এজন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।' অর্জুন ইচ্ছা করলে ঐ কিরাতকে তৎক্ষণাৎ দণ্ড দিতে পারতেন কিন্তু তিনি সামান্য অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করলেন না বরং সম্পূর্ণ শিষ্টাচার সহকারে তার কথার উত্তর দিলেন। ভারবি দেখিয়েছেন, অর্জুন কত ধীর স্থির এবং ক্ষমাশীল!

অর্জুনের গাম্ভীর্যও অসাধারণ। তিনি যখন ইন্দ্রকিল পর্বতে তপস্যায় রত হলেন, তখন দেবরাজ প্রেরিত গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ এসে তাঁর তপোভঙ্গের জন্য তাঁর আসনের কাছে

এসেই নানারকম গীতবাদ্য এবং কেলি কৌতুক সুরু করে দিল। অসাধারণ রূপসী, যৌবন মদোন্মত্তা কামিনীর দল অর্জুনকে কামচঞ্চল করার জন্য নানারকম অঙ্গভঙ্গীও করলেন। তবুও কিছুতেই অর্জুনের চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তারা অর্জুনের কানের কাছে এসে নিজেদের অঙ্গসৌরভে তাঁকে ব্যাকুল করার জন্য বলতে লাগলেন — 'ওহে তাপস-যুবক ! মনের কাঠিন্য পরিত্যাগ কর, কথা বল। কেন, মুনিদের মন ত খুব কোমল হয়, অভব্য ব্যক্তিরাই গৃহাগতকে উপেক্ষা করে কিন্তু তুমি মুনি বেশে আমাদের প্রতি উদাসীনতা দেখাচ্ছ কেন!' আর একজন টীপ্পনি কেটে বলল — 'ওহে শঠ ! তোমার মনে যদি শান্তি বিরাজ করত, তাহলে তুমি ধনুর্ধারণ করতে না। তোমার বয়স ও রূপই বলে দিচ্ছে সংসারের ভোগ্যবস্তুই তোমার প্রিয় — মুক্তি নয়। এস, আমাদের যাকে ইচ্ছা তুমি উপভোগ কর। ওহো বুঝেছি! তোমার মনে অন্য কোন কামিনী বিরাজ করছে, তাই আমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছ না!' ইত্যাদি। তবুও অর্জুনকে নিরুত্তর দেখে কামিনীদের যা শেষ অস্ত্র — চোখের জল — সেই চোখের জল ফেলতে ফেলতেও তারা অর্জুনকে অনেক মিনতি করল। কিন্তু তবুও অর্জুনের তিলমাত্র গাম্ভীর্য নষ্ট হল না। যাঁর হৃদয়ে শত্রুজয়ের বাসনা, তাঁর আবার অন্য সুখাভিলাষ কোথায়! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জুনের লক্ষ্য কত স্থির, এই দৃশ্যে ভারবি তার সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন।

কিরাতরাজবেশী মহাদেবের অনুচর এসে অর্জুনের বাণটি নিবার জন্য নানা বাগ্জাল বিস্তার করেছিল, তখন অর্জুন তাকে স্মিতহাস্যে বলেছিলেন — 'তুমি যেমন বাক্যবিন্যাসে প্রবীন, তাতে মনে হচ্ছে, তুমি বনচর হলেও একজন প্রধান বাগ্মীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য। তুমি তোমার প্রভুর ঐশ্বর্য ও দয়ার পরিচয় দিয়ে একবার আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছ, আবার আমার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করার জন্য একবার একবার ভয়ও দেখাচ্ছ। এতে মনে হচ্ছে তুমি কেবল বাণের প্রার্থী, ন্যায়ের প্রার্থী নও। তোমার প্রভু, সিদ্ধির বিরোধী কার্যে প্রবৃত্ত, তুমি যখন তাঁর দূত হয়ে এসেছ, তাঁর মঙ্গলকামী হলে তোমার উচিত তাঁকে একাজ হতে নিবৃত্ত করা। তোমার প্রভুর বাণটি নিশ্চয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্য কোথাও হারিয়ে গেছে। পর্বতে গিয়ে খুঁজে দেখ, সেটাই তোমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কাজ হবে। অহেতুক কোন সজ্জনকে দোষারোপ করা উচিত নয়, কারণ সজ্জনকে অবজ্ঞা করলে সমূহ বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।'

এ অংশে ভারবি অর্জুনের বিনয়, আত্মমর্যাদাবোধ এবং বাগ্‌বিভূতি কত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিরাতবেশী মহাদেবের দ্বারা তাঁর চাপ ভঙ্গ হয়ে গেলেও অর্জুন হতোদ্যম না হয়ে তাঁর সঙ্গে বাহুযুদ্ধে রত হয়েছিলেন। এই ঘটনার বর্ণনায় কবি দেখিয়েছেন, অর্জুন বিপদেও কত স্থির!

কাব্যাদর্শ রচয়িতা দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন — প্রতিনায়কের গুণের উৎকর্ষতা দেখিয়ে পরে তার পরাজয় দেখিয়ে নায়কের গৌরব বৃদ্ধি করা উচিত। আমরা কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যে সেই আদর্শই দেখতে পাই। কবি প্রতিনায়ক কিরাতরাজরূপী মহাদেবের সর্বাংশে উৎকর্ষতা দেখিয়ে নায়ক অর্জুনের গৌরবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই কাব্যে বীররসই প্রধান উপজীব্য হলেও আনুষাঙ্গিকরূপে অন্যান্য রসের বর্ণনাও প্রচুর আছে। দ্রৌপদী ও ভীমের বাক্যাবলীতে, কিরাতসৈন্য ও কিরাতরাজরূপী মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বীররসের বর্ণনা সমুজ্জ্বল। বন, পর্বত, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঋতু প্রভৃতি

বর্ণনাও মহাকাব্যের একটি প্রধান অঙ্গ; এই কাব্যে তারও অভাব নাই। দু'একটি কবিতা উদ্ধৃত করে শোনাচ্ছি, তুমি অনুধাবন করার চেষ্টা কর। শরৎকাল উপস্থিত, আকাশমণ্ডল মেঘমুক্ত এবং নির্মল নীলিমায় অলঙ্কৃত। ভারবি এই বলে তার বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

পতন্তি নাস্মিন্ বিশদাঃ পতত্রিণো ধৃতেন্দ্রচাপা ন পয়োদপঙ্ক্তয়ঃ।
তথাপি পুষ্ণাতি নভঃ শ্রিয়ঃ পরাং ন রম্যমাহার্যমপেক্ষতে গুণম্॥

'নভোমণ্ডলে আর শুভ্র বকশ্রেণী সঞ্চরণ করে না, মেঘের পাশে আর ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয় না — তথাপি তার কী অপূর্ব শোভা। স্বভাব-সুন্দর পদার্থ প্রযত্নসাধ্য গুণের অপেক্ষা করে না।'

আবার যখন তিনি হিমালয়ের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা দিচ্ছেন, তখন তিনি লিখেছেন,

আমত্তভ্রমরকুলাকুলানি ধুন্বন্, উদ্ভূতগ্রথিতরজাংসি পঙ্কজানি।
কান্তানাং নগনদীতরঙ্গশীতঃ সন্তাপং বিরময়তিস্ম মাতরিশ্বা॥

অর্থাৎ এই হিমালয়-অঞ্চল বিলাসিনীদের পক্ষে কিরূপ সুখদ দেখুন। এখানে নির্ঝরিণীতরঙ্গে সুস্নিগ্ধ বাতাস মত্ত ভ্রমরকুলের গুঞ্জরণে গুঞ্জরিত হয়ে পদ্মের পরাগগুলিকে ঈষৎ কম্পিত করে প্রমদাদের শরীর সন্তাপ দূর করে দেয়।

মহাকবি ভট্টি তাঁর প্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের শরৎ বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং দ্বাদশ সর্গের রাজনীতির আলোচনায় কিরাতার্জুনীয়ের অনেক ভাব ও পদবিন্যাসের অনুকরণ করেছেন। ভট্টির চেয়ে মহাকবি মাঘ ভারবির কাছে আরও বেশী ঋণী। কিরাতার্জুনীয় কাব্যের তৃতীয় সর্গে মহর্ষি বেদব্যাস ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন এবং মাঘ প্রণীত 'শিশুপাল বধ' কাব্যের প্রথম সর্গে দেবর্ষি নারদ ও দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন একসঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে মনে হয় মহাকবি মাঘ ভারবির কিরাতার্জুনীয় কাব্যখানি সামনে রেখে তাঁর 'শিশুপাল বধ' কাব্য লিখেছিলেন।

এইবার আমি মহাকবির ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি শোন।

ভারবির ভাষার 'অর্থগৌরব' সম্বন্ধে যে উঁচু ধারণা বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত তা নিরর্থক নয়; প্রসাদগুণ বিশিষ্ট গভীর অর্থবহ ও মনোজ্ঞ শব্দ প্রয়োগে ভারবির জুড়ি মেলা ভার। তিনি লোকরঞ্জক হৃদয়গ্রাহী ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে নিজেই বলে গেছেন —

ভবন্তি তে সভ্যতমা বিপশ্চিতাং মনোগতং বাচি নিবেশয়ন্তি যে।
নয়ন্তি তেষ্বপ্যুপপন্ননৈপুণা গভীরমর্থং কতিচিৎ প্রকাশতাম্॥

অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁরাই সমধিক নিপুণ, যাঁরা মনোগত ভাব বাক্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ। সেই সকল বক্তার মধ্যে আবার তাঁরাই কুশলী, যাঁরা নিগূঢ় অর্থ শ্রোতাদের সামনে সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে পারেন।

ভারবির কাব্য মনোযোগ দিয়ে পড়লে পাঠকমাত্রেরই অনুভব হবে যে তিনি সুকৃতিশালী প্রকৃত বিদ্বান কবির ভাষা প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা তাঁর পক্ষেও সমধিক প্রযোজ্য। নর্মদা পরিক্রমার শেষে দেশে ফিরে গিয়ে যখন সময় ও সুযোগ পাবে, তখন ভারবির কাব্য চর্চা করলে তুমি নিজেই তাঁর ভাব ও ভাষার মাধুর্য অনুভব করতে পারবে। অনুভব করতে পারবে তাঁর নিজ উক্তির সার্থকতা,

স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা,
ন চ ন স্বীকৃতমর্থগৌরবম্।।

অর্থাৎ পদগুলির বিশদ অর্থ কোথাও পরিত্যক্ত হয় নি, অথচ সেগুলিতে যথেষ্ট অর্থগৌরব আছে।

ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' মহাকাব্যের টীকাকার হলেন মল্লিনাথ। সার্থক টীকাকার মল্লিনাথ ভারবির অর্থগৌরব প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছেন —

নারিকেলফল সম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্ বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতং।।

'ভারবির কাব্য নারকেল ফলের মত প্রচ্ছন্ন রস বিশিষ্ট; সম্প্রতি তা ভগ্ন করছি। কাব্যরসিকগণ অতঃপর রসপূর্ণ সার ইচ্ছামত আস্বাদন করুন।'

সত্যই মল্লিনাথ তাঁর টীকায় ভারবির ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থগৌরব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। যেমন ধর, রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে কবি এক একটি যুক্তিজালের এমন এক একটি স্থল ধরে বর্ণনা করেছেন যে তার আদি ও অন্ত স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি কিন্তু যেটুকু বর্ণনা করেছেন, তা হতে আদি-মধ্য-অন্ত বুঝে নিতে কোন কষ্ট হয় না। তিনি হয়ত অল্পই বলেছেন, নিছক দুইচারটি শব্দে কিন্তু তাতেই অর্থের প্রতীতি হয়ে থাকে। পূর্বে তোমাকে ভীমের উক্তি 'মদসিক্তমুখৈর্মৃগাধিপঃ' ইত্যাদি যে কবিতাটি শুনিয়েছিলাম তাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, ভীম বাহুবল প্রয়োগের দ্বারা রাজ্য উদ্ধারের পক্ষপাতী। কিন্তু কবিতাটি বারবার পড়লে তার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা, মনু কথিত সাম, দান, ভেদনীতি যে পৌরুষহীন রাজাদের পক্ষে প্রযোজ্য সে কথা তিনি প্রকাশ্যে না বললেও প্রকারান্তরে তা ব্যক্ত করেছেন। এইভাবে শব্দনির্বাচন ও অর্থনির্বাচনের চাতুর্যের দ্বারা মহাকবি ভারবি তাঁর কাব্যে অর্থগৌরবের পরিচয় দিয়েছেন।

ভারবির কাব্য আলোচনা শেষ হল। আলোচনা শেষ করে সম্বিদানন্দজী আমাকে বললেন, 'তোমাকে অন্যান্য মহাকবিদের কথাও শোনাতাম, কিন্তু তুমি তো ১৪ তারিখে চলে যাচ্ছ, কাজেই তার আর সুযোগ হবে না।'

আমি বললাম — আপনার কাছে শুনতে পারলে আমিই লাভবান হতাম। কিন্তু একই স্থানে দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না। এখনও দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে হবে রেবাসংগমে পৌঁছতে। আপনি প্রসন্ন মনে বিদায় দিলে শান্তি পাব। এই ধাবড়ী কুণ্ডে আপনার সস্নেহ সাহচর্য আমার জীবনে মধুর স্মৃতি হয়ে থাকবে। আপনি যেভাবে কাব্যরস পরিবেশন করলেন, তাতে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

— না হে না, লেকিন্ তোমার কৃতজ্ঞ থাকার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে বলেছিলাম না যে, আমি গুরুদেবের দর্শন পাওয়ার আগে তোমার জন্মস্থল বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর সঙ্গমে দীর্ঘকাল ছিলাম। আমি সেখানে থাকতে থাকতেই কলাপ ব্যকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করি। আমার আচার্য ছিলেন বাঙালী পণ্ডিত শ্রী শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী। তাঁর কাব্য পড়ানোর ধারায় আমি এতই মোহিত হয়েছিলাম যে একবার তিনি ইংরাজী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ার স্থিত 'ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুটে' ভারবি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তা শুনবার লোভে আমি সুন্দরবন হতে নিজের আসন ছেড়ে সন্ন্যাসী

বেশেই সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। সেই আমার প্রথম ও শেষ কলিকাতা দর্শন। সেদিন তাঁর কাছে যা শুনেছিলাম, তা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। ভারবির অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁর কাব্যরস সম্বন্ধে এ কয়দিন ধরে যা কিছু তোমাকে বলেছি, তাঁরই কথা বলে জানবে। বাংলার কোলে বসে যা শিখেছিলাম, তার কিছুটা বাংলামায়েরই এক সন্তানকে বলতে পেরে নিজেই গভীর তৃপ্তিবোধ করছি। যাও এখন শুয়ে পড়। রাত্রি হয়ে গেছে। আমার গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, বোধহয় এবারে বৃষ্টি ধরে গেল। নিরাপদেই তুমি যাত্রা করতে পারবে।

অবশেষে সেই ১৩ই ভাদ্র এসে গেল। সকালে উঠেই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ধাবড়ী কুণ্ডে প্রফুল্ল মনেই স্নান ও পূজা করে এলাম। প্রফুল্লতার কারণ, আগামীকাল সকালেই এখান থেকে চলে যেতে পারব! নিজের মনের এই আস্বাভাবিক ভাবান্তর দেখে নিজেই লজ্জা পেলাম। কারণ এখানে সন্ন্যাসীদের কাছ হতে যথেষ্ট স্নেহ দয়া পেয়েছি। একলিঙ্গস্বামীর মূল্যবান প্রবচন বিশেষতঃ মহাত্মা সম্বিদানন্দজীর সাহচর্য এবং সরস আলোচনা থেকে আমি এখানে বসেই অনেক কিছু শিখেছি ও জেনেছি। নর্মদাতটের আর কোথাও এইরকম আদর্শ তপোবন-সুলভ পরিবেশ পাই নি। যোগচর্চা ও বিদ্যাচর্চার এই আশ্রমিক পরিবেশ সত্যই অতুলনীয়। মহাত্মা প্রলয়দাসজী কিংবা চব্বিশ অবতারের সেই পাগলা বাঙালী সাধু সিদ্ধাবধূত সোমানন্দজীর সঙ্গ ও হাবভাবে একটা অতীন্দ্রিয় রহস্যঘন কুহেলী সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখত, কিন্তু এই ধারাতীর্থ বা ধাবড়ী কুণ্ডে এসে এখানকার জীবনচর্যায় আর্য ঋষিদের তপোবনের বাস্তবচিত্র যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। তবু আমার মনে এই যে সাময়িক বিরূপতা, এই যে এখান হতে পালাবার জন্য ছটফট করছি, সে বোধহয় এই অতিরিক্ত বর্ষার দাপটে বাধ্য হয়ে আটকে থাকাটাই তার একমাত্র কারণ। আমি তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করে একলিঙ্গস্বামীর নির্দ্দিষ্ট বেদীর কাছে গিয়ে বসলাম। সন্ন্যাসীরা সকলে উপস্থিত। যথা সময়ে মহাত্মা এসে বেদীর উপর বসলেন। বন্দনাদির পর তিনি প্রথমেই আমাকে সম্বোধন করে বললেন —

শৈলেন্দ্রনারায়ণজী বিহানমেঁ (আগামীকাল) সুবা সুবা হিঁয়াসে আপ্ খুশীসে যাত্রা কর সকতে হ্যায়, সম্বিদানন্দ আপকো ভেটাখেড়াকি আখেরী সীমাতক্, যাঁহাসে মুড়কে সীতাবনকী তরফ্ যানে পড়তা হৈ, যাঁহা আপ্‌কা সাথ মহাত্মা সোমানন্দজীকো দুসরাবার মোলাকাৎ হুয়ি থী, উঁহা তক্ আপকো সাথমেঁ যায়েঙ্গী। ব্যস্, উসকাবাদ সম্বিদানন্দ লোটকে আয়েঙ্গে, আপ চব্বিশ অবতার হোকর ওঁকারেশ্বর বা শূলপানি কি ঝাড়ি যাত্রা করেগা। হরবকত রেবামন্ত্র জপ করনা। তব্ রেবামায়ী তুমহারা দেখ্‌ভাল করেগী। মাতা অপার দয়াময়ী হৈ। তুমহারা কোঈ পুছনা হ্যায় ত পুছ লিজিয়ে।

— ভগবন! আমি যখন অমরকন্টক হতে পরিক্রমা সুরু করি, তখন মহাত্মা শংকরনাথ ও সুমেরদাসজী বলেছিলেন নিরন্তর রেবামন্ত্র জপ করতে করতে পরিক্রমা করবে। মুণ্ডমহারণ্য হতে ওঁকারেশ্বর ঝাড়িপথেও মহাত্মা শোভানন্দজী, সূর্যনারায়ণজী, দরিয়াজী প্রভৃতি যত মহাত্মার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তারাও বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রেবা রেবা জপ করে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত দুর্গম জঙ্গল পথ পরিক্রমা করতে। এখন আপনিও বলেছেন —'হরবখৎ রেবামন্ত্র জপ করনা' আপনার শ্রীচরণে আমার জিজ্ঞাসা, এই রেবামন্ত্রটি

কি? একি অনবরত 'রেবা রেবা, দ্ব্যক্ষর বীজ উচ্চারণ, না 'হর নর্মদে, হর নর্মদে জপ? পরিক্রমাকালে অবশ্য করণীয় বিধান নর্মদাকে অনবরত চোখে চোখে রেখে পরিক্রমা করতে হয়। তার সঙ্গে যদি নিরন্তর রেবা মন্ত্র জপ করতে হয়, তবে গুরুদত্ত ইষ্টবীজ কখন জপ করব?

একলিঙ্গস্বামী — মহাকন্যকা শক্তি নর্মদার স্থূলরূপ হল এই নর্মদার জলপ্রবাহ। নর্মদার জলের দিকে তাকালেই বিশ্বের আদিকারণভূতা মহাশক্তি শিবপুত্রী নর্মদাকে স্মরণ মনন হয়ে যায়। তার মধ্যেই সমস্ত দেবশক্তি ও দিব্যশক্তির প্রকাশ আছে। স্বয়ং মহেশ্বরের বরে তাঁর তেজোসম্ভূতা রেবা শৈবতেজের মূর্ত প্রতিমা। তবুও মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত বিধান এই যে, নর্মদা পরিক্রমাকালে রেবামন্ত্র জপ করতে হবে। নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে স্বীয় ইষ্টমন্ত্র জপ করলেও নর্মদা সদৈব তুষ্টা থাকেন। তথাপি শিব বাক্যকে মর্যাদা দেবার জন্য রেবামন্ত্র জপ করাই কর্তব্য। কিন্তু এই 'রেবামন্ত্র' শব্দটি ভাল করে অনুধ্যান কর। রেবামন্ত্র মানে রেবার মন্ত্র। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সেটি 'রেবা রেবা' শব্দ মাত্র নয়, নিশ্চয়ই 'রেবা' শব্দ হতে পৃথক কিছু। আমি তোমার কাছে নিজেই সেই রহস্য ভেদ করে দিচ্ছি ; রেবামায়ীর বীজ যড়ক্ষর, যথা — ওঁ হ্রুঁ। হ্রোং হ্রুং হ্রৈং হ্রৌং হ্রুঃ। এই মন্ত্রকে প্রণব দিয়ে পুটিত করলে সপ্তাক্ষর হবে, তখন তা হবে শিবের সপ্তাক্ষর মহাবীজের সমতুল্য। এই সপ্তাক্ষরের শেষে 'নর্মদায়ৈ নমঃ' যোগ করলে সেই পঞ্চাদশ অক্ষরাত্মক বীজের দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সমূহ দেবদেবীর পূজা ও স্মরণ মনন পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে। তোমার ইষ্টমন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা ও টান আছে বলে এবং তা তোমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শ্বাস প্রশ্বাসে গাঁথা হয়ে গেছে বলে তুমি তাতেই মগ্ন থাক; তবুও যতদিন নর্মদাতটে পরিক্রমা করছ, ততদিন প্রাতঃকালে উঠে প্রথমেই নর্মদা স্পর্শ করে গায়ত্রী পাঠ করবে — ওঁ রুদ্রাদেহায়ৈ বিদ্মহে মেকলকন্যকায়ৈ ধীমহি তন্নো রেবা প্রচোদয়াৎ। তারপর অন্ততঃ ১০ বার জপ করবে — ওঁ হ্রুঁ হ্রোং হ্রুং হ্রৈং হ্রুঃ নর্মদায়ৈ নমঃ॥ প্রাতে মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে যখনই স্নানের জন্য নর্মদায় নামবে, তখনই এই গয়ত্রী ও মন্ত্রপাঠ করবে। তারপর সূর্যার্ঘ্য প্রদান ও পিতৃতর্পণের বিধান। এই অনুষ্ঠানটি করতে তোমার বেশী সময় লাগবে না। তারপর বাকী সময় দিবারাত্র তোমার ইষ্ট চিন্তায় বিভোর থেকো। ঔর কুছ পুছনা?

তাঁর কাছে আশ্বাস পেয়ে আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম — আমি এখানে আসার আগে শুনেছি, এখানেও সন্ন্যাসীরা বলেছেন যে পরম শৈব বাণাসুরের প্রার্থনায় তাঁর যজ্ঞস্থলী ধাবড়ী কুণ্ডই বাণলিঙ্গের একমাত্র উৎপত্তি স্থল। জগতের কুত্রাপি এমনকি নর্মদাতটের আর কোথাও নাকি বাণলিঙ্গের উদ্ভব ঘটে না। আমি প্রায় আড়াই মাস ধরে এখানে আছি। প্রতিদিনই এই সব দণ্ডিস্বামীদের সঙ্গে গিয়ে কুণ্ডস্থিত বাণলিঙ্গের পূজা করে আসছি, কিন্তু এই বাণলিঙ্গের সঙ্গে নর্মদাতে উদ্ভূত অন্যান্য শিবলিঙ্গের পার্থক্য কোথায়? যদি সাদা রংটাই পার্থক্যের হেতু হয়, তবে অমরকন্টকের নিকটবর্তী কপিলাশ্রমে কপিলধারার সন্নিহিত দুগ্ধধারাতেও ত সাদা শিবলিঙ্গ উদ্ভূত হচ্ছে। সেই সকল শ্বেত শিবলিঙ্গই বা বাণলিঙ্গ নামে অভিহিত হবে না কেন? একই নর্মদাতে উদ্ভূত অন্যান্য নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গের সঙ্গে বাণলিঙ্গের তফাৎটা কোথায়?

একলিঙ্গস্বামী — নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গও জাগ্রত, বাণলিঙ্গও জাগ্রত। উভয়ের মধ্যে চিন্ময় শক্তি নিহিত বলে পূজক নিষ্ঠা সহকারে পূজা করতে করতে উভয় প্রকার লিঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের

দিব্যচিহ্ন ফুটে উঠতে দেখেন। তবুও অন্যান্য নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গের সঙ্গে বাণলিঙ্গের পার্থক্য এই যে — বাণলিঙ্গস্য সান্নিধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে নরৈঃ। স্নানং দানং তপোহোমঃ সর্বং তদক্ষয়ং ভবেৎ। অর্থাৎ বাণলিঙ্গের সামনে স্নান, দান, তপস্যা, জপ হোম যাই অনুষ্ঠান করা যাক না কেন তার ফল অক্ষয় হয়। অন্যান্য নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গকে সামনে রেখে ঐ সব অনুষ্ঠান করলে সিদ্ধিলাভ করা যায় বটে কিন্তু তার ফল তাৎকালিক; অক্ষয় সিদ্ধিলাভ করতে হলে বাণলিঙ্গই বরণীয়। তা ছাড়া অন্যান্য নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন কালে আবাহন প্রতিষ্ঠা জপ হোমাদি নানাবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে হয়, কিন্তু বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকালে কোন, সংস্কার বা আবাহনাদির প্রয়োজন হয় না।

বাণলিঙ্গানি রাজেন্দ্র! স্থিতানি ভুবনত্রয়ে।
ন প্রতিষ্ঠা ন সংস্কারস্তেষামাবাহন ন চেতি॥
ব্রাহ্মে মুহূর্তে চোত্থায় যঃ স্মরেৎ বাণলিঙ্গকম্।
সর্বত্র জয়মাপ্নোতি সত্য সত্য মহেশ্বর॥

শৈবাগমের ঋষি উৎপলাচার্য★ প্রণীত "যোগসার" গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঋষি বাক্যের প্রমাণানুসারে তোমাকে এই কথা বলছি।

এই ধাবড়ী কুণ্ড বা ধারাতীর্থই প্রকৃত বাণলিঙ্গের উৎপত্তি স্থল। বাণাসুরের প্রার্থনায় মহাদেব তার উপর তুষ্ট হয়ে স্বতঃই তার যজ্ঞস্থলীতে বাণলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হচ্ছেন, মহারাজ বাণ কত যুগ আগে যে মহাদেবের বর পেয়েছিলেন তার কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবু আজও দেখা যাচ্ছে, নর্মদাজলের প্রবল ঢেউ কুণ্ডগাত্রে ধাক্কা খেয়ে বিঘূর্ণিত হচ্ছে, আর তার ফলে আজও এখানে বিভিন্ন শিবচিহ্ন নিয়ে নিত্যনূতন বাণলিঙ্গের আবির্ভাব ঘটছে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ হল —

স্বয়ং সংস্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্মদা জলে।
পুরু বাণাসুরেণাহং প্রার্থিতো নর্মদাতটে।
অবিবসং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
বাণলিঙ্গমপি খ্যাতং অতোহর্থাৎ জগদীতলে॥

এইভাবে যে বাণলিঙ্গ স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হচ্ছে, এ কোন মনুষ্য নির্মিত (man made) কারুকলার নিদর্শন নয়, এটি সম্পূর্ণ কুদরৎ-ই কা খেল্ অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর ঐশ্বরিক মহিমা ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে? ঋষিদের স্পষ্ট ঘোষণা —

অন্যোষাং কোটিলিঙ্গানাম্ পূজনে যৎ ফলং লভেৎ।
তৎফলং লভতে মর্ত্যো বাণলিঙ্গৈক পূজনাৎ॥

অর্থাৎ সাচ্চা নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে এককোটি শিবলিঙ্গ পূজায় যে ফল পাওয়া যা,

---

★ উৎপলাচার্য — উৎপলাচার্য কাশ্মীরবাসী ছিলেন, ইনি অভিনবগুপ্তের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী (৯-১০ম খৃষ্টশতাব্দী) ।'শিবদৃষ্টি' নামক শৈবাগমের গ্রন্থ রচয়িতা সোমানন্দের শিষ্য। কল্লটেন্দু প্রণীত স্পন্দকারিকার উপর ইনি স্পন্দপ্রদীপিকা নামক টীকা রচনা করেছিলেন। ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা সূত্রে ইনি নিজেকে উৎপলদেব বলে পরিচয় দিয়েছেন। কারও কারও মতে প্রত্যভিজ্ঞাকার রচয়িতা উৎপলাচার্য এবং স্পন্দপ্রদীপিকার রচয়িতা উৎপল বৈষ্ণব। সুতরাং এঁরা নামে মিল থাকলেও স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু কাশী হতে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের অন্যতম আচার্য ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভেনিস সাহেব প্রকাশিত স্পন্দপ্রদীপিকায় এঁদের দুজনকে একই ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

যথোচিতভাবে একটি বাণলিঙ্গ পূজা করলে ঐহিক ও পারত্রিক সেইসব ফলই পাওয়া যায়।

ভগবন! আমি কাশীতে একটি ঘটনা দেখেছিলাম। কাশীতে দণ্ডী সন্ন্যাসীদের আচার্য-পীঠ কামরূপ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দ তীর্থ মহারাজের কাছে একদিন বসেছিলাম, এমন সময় দেখলাম, এক প্রবীন ভদ্রলোক বাঁ হাতে একটি যোনি-পীঠ সহ শিবলিঙ্গ এনে স্বামীজীর সামনে মেঝেতে খুব অশ্রদ্ধাভরে আছাড়ে ফেলে দিয়ে বললেন — এই সর্বনেশে বস্তুটি এই মঠে এসে থাকতে চেয়েছিল, তাই এখানে ফেলে দিয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী একে কয়েক ঘা ঝাঁটার বাড়ি মেরেছে। তার ইচ্ছে ছিল, বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে ঝাঁটা মারতে মারতে এখানে আনতে। আপনার সামনে সেই অবস্থায় আনলে আমাদের বেয়াদপি হত। তাই স্ত্রীকে নিরস্ত করে আমি নিজেই এনে রেখে গেলাম। এইবলে স্বামীজীকে প্রণাম করে দুপ্‌দাপ্ শব্দে পা ফেলতে ফেলতে খুবই উত্তেজিত অবস্থায় ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি এইরকম দৃশ্য কখনও দেখিনি। তাই স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি উন্মাদ?

তিনি হাসতে হাসতে শিবলিঙ্গটি মাথায় পুনঃপুনঃ ঠেকিয়ে ঠাকুর ঘরের বেদীতে স্থাপন করে বললেন, লোকটি এখন সাময়িকভাবে উন্মাদই হয়ে গেছেন বটে! ভদ্রলোক আমাদের মঠের পাশেই ভূতেশ্বর গলিতে বাস করেন, প্রবীন উকিল, বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তি। দু'বছর আগে দশাশ্বমেধ ঘাটে জনৈক সন্ন্যাসী এই বাণলিঙ্গ শিবটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভদ্রলোককে বাড়ীতে পূজা করার জন্য দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক নিজেও শিবভক্ত। কাজেই শিবলিঙ্গটি পেয়ে পরম নিষ্ঠা সহকারে পূজা করতে লেগে যান। মাসখানিক পরে তিনি স্বপ্নে দেখেন, শিবলিঙ্গটি যেন বলছেন, আমাকে তুই কামরূপ মঠে রেখে আয়, তাতে তোর মঙ্গল হবে। আমি তোর পূজার্হ নই। একই সময়ে একই স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর ধর্মপত্নীও। কিন্তু ভদ্রলোক পয়সা ও পৌরুষের গরমে স্বপ্নকে স্বপ্ন দেখেন। তখন ইনি আমার কাছে এসেছিলেন। আমি উপদেশ দিই, একই স্বপ্ন দুবার যখন দেখলেন, শিবলিঙ্গটি মঠে রেখে যাওয়াই ত ভাল। কিন্তু কে শোনে কার কথা! উল্‌টে তিনিই আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়ে গেলেন যে, স্বামীজী! আপনি জানেন ত শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। শিবভূমিতে সন্ন্যাসীর কাছে শিব পেয়েছি, সে শিব কি আমি পরিত্যাগ করতে পারি? কাল ও মায়া স্বপ্ন দিয়ে কিংবা মনোবিশ্বাস ও দ্বিধার সৃষ্টি করে এইভাবে বিভ্রান্ত করতে চায়। সে সব কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে আমি অনেক পড়েছি। আমি অত কাঁচা ছেলে নই যে মায়ার ভড়কিতে ভুলাবো!

কিছুদিন পরেই দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে উকীলবাবুর বড় ছেলেটি জলে ডুবে মারা যায়। এই সংবাদে বিচলিত হয়ে আমি কয়েকদিন পরে আমার শিষ্য দণ্ডী-সন্ন্যাসী স্বামী ভোলানন্দকে পাঠাই ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে শিবলিঙ্গটি দেখে আসতে। শিবলিঙ্গের লক্ষণাদি বিষয়ে ভোলানন্দ বিশেষজ্ঞ। সে গিয়ে দেখে শিবলিঙ্গটি বাণলিঙ্গ সন্দেহ নেই , তবে বড় রুক্ষ এবং কর্কশ। ভোলানন্দ উকীলবাবুকে বলেন, এই শিবলিঙ্গ গৃহীর পুজনীয় নয়। আপনি স্বপ্নাদেশানুসারে লিঙ্গটি আমাদের মঠেই দিয়ে দিন। মঠ থেকে শুভলক্ষণযুক্ত একটি শিবলিঙ্গ বরং আপনাকে দান করব। এইকথা শুনে উকীলবাবু ভোলানন্দকে যথেচ্ছ অপমান করে তাড়িয়ে দেন। জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর একবছর পরে গতকাল বৈকালে তাঁর মধ্যমপুত্রটি তাঁর তিনতলা বাড়ীর ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। তাই উকীলবাবু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শিবলিঙ্গটি মঠে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন।

আমি নিজের চোখে দেখা এই ঘটনাটির আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করে একলিঙ্গস্বামীর কাছে জানতে চাইলাম — শিব ত মঙ্গলময়; কাশীর সেই উকিলবাবু সন্ন্যাসী-প্রদত্ত শিবলিঙ্গকে ত নিষ্ঠাভরেই পূজার্চনা করছিলেন, তবুও বাণলিঙ্গ সেবায় তাঁর এই সর্বনাশ হল কেন?

একলিঙ্গস্বামী — শিব যে মঙ্গলময় একথা ত লোকে শাস্ত্রমুখে শুনে তবেই বলে থাকে, সকলের ত শিবজ্ঞান হয়নি বা সকলের ভাগ্যে শিবদর্শন ঘটেনি। যে শাস্ত্রবাণী শুনে আমরা শিবকে মঙ্গলময় বলি, সেই শাস্ত্রই ত কোন ধরণের শিবলিঙ্গ শুভ, কোনটি অশুভ তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা বলে গেছেন, কোন্ শিবলিঙ্গ গৃহীর পূজনীয়, কোনটি সন্ন্যাসীর পূজনীয়! শাস্ত্রের একটি কথা মানব, অন্যটি মানব না, এমন ত আর হয় না! তাছাড়া যারা পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যকে সম্বল করে কেবল কথার কচকচি করে এবং উঠন চালাকি বুদ্ধি দ্বারা ধর্মরহস্যেও কিস্তিমাৎ করতে চায়, তাদের পরিণতি এই রকমই হয়। তোমার কথিত গল্পের নায়ক উকীলবাবু স্বপ্নাদেশকে অগ্রাহ্য করেছে। স্বপ্নাদেশের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের মনকে আঁখি ঠারিয়েছে। তাই ঐ রকম বেদনাদায়ক মর্মান্তিক ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে গেল। তার জন্য শিব দায়ী নন, তাঁর মঙ্গলময়ত্বেও কোন হানি ঘটেনি। ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ বলা আছে যে কোনটি পূজা করলে গৃহীর পক্ষে ধর্মার্থ ও সাংসারিক কামনা-বাসনায় সিদ্ধি ঘটে, আর কোনটি পূজা করলে সাংসারিক বা মায়িক বস্তুতে বৈরাগ্য আসে, মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ ঘটে। যিনি মোক্ষ দান করেন সেই শিবলিঙ্গ সন্ন্যাসীর পূজনীয়। মোক্ষার্থীর তিনি এইভাবে মঙ্গল সাধন করেন। মায়ায় আবদ্ধ গৃহী ত মোক্ষ চায় না, তাই ঐ শিবলিঙ্গ তার পক্ষে অশুভই বটে! আবার সন্ন্যাসী যদি ধর্মার্থ ও কামকামনা পূরণকারী শিবলিঙ্গের অর্চনা করেন তাহলে তাঁর সাংসারিক ঋদ্ধিসিদ্ধি লাভ হতে পারে তবে মোক্ষ তাঁর কাছে ক্রমে সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে। এই জন্য শিবদর্শী তত্ত্বদর্শী ঋষিসমাজে শাস্ত্রে শিবলিঙ্গের বিভিন্ন চিহ্ন নির্দেশ করে তার ফলাফলেরও বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এই যেমন কাশীর সেই উকীলবাবুর বাড়ীতে অযাচিতভাবে গিয়ে ভোলানন্দজী কর্কশ শিবলিঙ্গটি পূজা করতে নিষেধ করেছিলেন, তিনি ঠিক উপদেশই দিয়েছিলেন, কারণ শিবলিঙ্গ বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ 'হেমাদ্রিধৃত-লক্ষণকাণ্ডে' এ বিষয়ে স্পষ্টই বলা আছে —

(১) কর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদারক্ষয়ো ভবেৎ অর্থাৎ রুক্ষ বা কর্কশ শিবলিঙ্গ পূজা করলে স্ত্রী-পুত্রের জীবননাশ ঘটে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঋষিরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শাস্ত্র লিখে গেছেন। শাস্ত্র বাক্য তাই মানা উচিত।

এই প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থে 'নিন্দ্যলিঙ্গমাহ তত্রৈব' এই অধ্যায়ে কোন কোন শিবলিঙ্গ নিন্দনীয় বা বর্জনীয় সে সম্বন্ধে যে কয়টির লক্ষণ বর্ণনা আছে তাও শুনে রাখ ঃ

(২) চিপিটে পূজিতে তস্মিন্ গৃহভঙ্গো ভবেৎ ধ্রুবম্ অর্থাৎ চ্যাপ্টা শিবলিঙ্গ পূজা করলে গৃহভঙ্গ হয়। (৩) শিরসি স্ফুটিতে বাণে ব্যাধির্মরণ মেব চ — বাণলিঙ্গের শিরোদেশে ফাটা ফাটা চিহ্ন থাকলে সে শিবলিঙ্গ পূজা করলে ব্যাধির আক্রমণ এমন কি মৃত্যু ঘটে। (৪) ছিদ্রলিঙ্গেহর্চিতে বাণে বিদেশে গমনং ভবেৎ — যে বাণলিঙ্গের গাত্রে ছিদ্র থাকে তাঁর পূজা করলে স্বদেশ ছাড়া হয়ে বিদেশে বাস করতে হয়। (৫) লঘু বা কপিলং স্থূলং গ্রহী নৈবার্চয়েৎ কচিৎ —- যে শিবলিঙ্গ হাল্কা পিঙ্গল বর্ণের কিংবা অত্যধিক পিঙ্গল সেইরকম শিবলিঙ্গও গৃহীর পূজা করা উচিত নয়। (৬) তীক্ষ্ণাগ্রং বক্রশীর্ষঞ্চ এত্র লিঙ্গং বিবর্জয়েৎ — যে

শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ সূচালো, বাঁকা কিংবা তিনকোণা (ত্রিশিরাযুক্ত) সেগুলিও গৃহীর অর্চনীয় নয়। সেরকম শিবলিঙ্গ, তিনি নর্মদেশ্বরই হোন বাণলিঙ্গই হোন, তাঁর পূজা করলে গৃহীর সর্বনাশ অনিবার্য। (৭) অতিস্থূলঞ্চাতিকৃশং স্বল্পং বা ভূষণান্বিতম্। গৃহী বিবর্জয়েৎ তাদৃক তদ্ধি মোক্ষার্থিনো হিতম্ — যে সব শিবলিঙ্গ অতিস্থূল, অতিকৃশ কিংবা তাতে যদি কোন অলঙ্কারের চিহ্ন থাকে, গৃহীর তা পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ ঐ রকম শিবলিঙ্গ মোক্ষার্থিদের পক্ষে মঙ্গলজনক হলেও গৃহীর পক্ষে তা শুভ হবে না; কারণ গৃহীরা সাধারণতঃ সংসারের অনিত্যতা বুঝে নির্বাণ পদের অভিলাষী হন না।

— ভগবন্! গৃহীর পক্ষে অশুভ ফলদায়ক শিবলিঙ্গের কথা ত শুনলাম, কিরকম শিবলিঙ্গ গৃহীর পক্ষে মঙ্গলপ্রদ তা দয়া করে বলবেন কি?

একলিঙ্গস্বামী — 'বীরমিত্র' নামক শৈবাগম দর্শনের একখানি বই এ 'শুভলিঙ্গনাহ' নামক অধ্যায়ে তারও বর্ণনা আছে —

অর্থদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্ অর্থাৎ কপিল বা পিঙ্গলবর্ণের (পীতের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের) শিবলিঙ্গই অর্থকামী গৃহীকে অর্থদান করে থাকেন। কিন্তু সেই পিঙ্গলবর্ণ যদি গাঢ় হয়, তবে তা মোক্ষার্থীকে মোক্ষফল দান করে থাকেন।

পূজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্।
তৎ সপীঠমপীঠম্ বা মন্ত্রসংস্কারবির্বর্জিতম॥

গৃহস্থের পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গলপ্রদ ভ্রমরকৃষ্ণ বর্ণের শিবলিঙ্গ, যোনিপীঠ থাক বা না থাক, মন্ত্রসংস্কার বর্জিত অবস্থাতেও যদি কোন গৃহী ঐ রকম শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাতে তার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

এছাড়া 'হেমাদ্রিকৃত লক্ষণকাণ্ড' হতে তোমাকে কতকগুলি উদ্ধৃতি শোনাচ্ছি, তা হতেও বুঝতে পারবে কোন্ কোন্ শিবলিঙ্গ গৃহী বা সন্ন্যাসীদের পক্ষে সর্বাভীষ্ট প্রদায়ক; সর্বদাই মঙ্গলপ্রদ। একবার দেবর্ষি নারদ ইতঃস্তত ভ্রমণ করতে করতে মহর্ষি কশ্যপের মীর বা আশ্রমের (কাশ্মীর) সন্নিকটস্থ এক পরম শিবভক্তের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের শিবনিষ্ঠা দেখে সেই ব্রাহ্মণের কাছে শিবলিঙ্গের মঙ্গলময় নাম এবং চিহ্নাদির রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন, আমি তোমাকে তাও শুনিয়ে দিচ্ছি। তুমি তোমার ডায়েরীতে এগুলি লিখে নাও।

নারদ উবাচ —

অথ বক্ষ্যামি তে বিপ্র চিহ্নমেকাদশং পরং।
শ্রবণাদ্ যস্য পাপানি নাশমায়াস্তি তৎক্ষণাৎ॥

অর্থাৎ নারদ বলছেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমায় এগারটি শুভচিহ্নের কথা বলছি। শিবলিঙ্গে এর যে কোন একটি দেখলেই বুঝতে হবে সেই শিবলিঙ্গ পূজকের নিরন্তর মঙ্গলসাধন করবেন। এই চিহ্নের বর্ণনা শুনলেই সমূহ পাপ নষ্ট হয়।

মধুপিঙ্গলবর্ণাভং কৃষ্ণকুণ্ডলিকাযুতম
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাখ্যাতং সর্বসিদ্ধৈনিষেবিতম্॥

যে শিবলিঙ্গের বর্ণ মধুপিঙ্গল এবং যাতে কুণ্ডলী পাকানো কালো রং লিঙ্গের মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে সেই শিবলিঙ্গের নাম স্বয়ম্ভু। সমস্ত সিদ্ধমুনিগণ এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গের পূজা করে থাকেন।

নানাবর্ণসমাকীর্ণং জটাশূলসমন্বিতং।
মৃত্যুঞ্জয়াহ্বয়ং লিঙ্গং সুরাসুর নমস্কৃতম্॥

যে শিবলিঙ্গ নানাবর্ণ রঞ্জিত এবং যার মধ্যে জটা ও ত্রিশূল চিহ্ন বর্তমান, তার নাম মৃত্যুঞ্জয়। যেখানেই এই শিবলিঙ্গ বিরাজ করুন না কেন, সুরাসুরগণ অলক্ষ্যে তাঁকে নমস্কার করে থাকেন। যে গৃহীর বাড়ীতে এই মৃত্যুঞ্জয় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, সেই বাড়ীতে কারও অকালমৃত্যু ঘটে না বা অপঘাত মৃত্যু হয় না।

দীর্ঘাকারং শুভ্রবর্ণং কৃষ্ণবিন্দুসমন্বিতম্।
নীলকণ্ঠং সমাখ্যাতং লিঙ্গং পূজ্যং সুরাসুরৈঃ॥

লম্বা সাদা রং এর শিবলিঙ্গে যদি কোন কালো বিন্দু থাকে, তাহলে তাঁকে নীলকণ্ঠ বলা হয়। দেবতা এবং অসুর সকলেরই ঐ শিবলিঙ্গ পূজনীয়। যে গৃহে নীলকণ্ঠ শিবলিঙ্গের অর্চনা হয়, সেখানেও কারও শরীরে আগন্তুক রোগবীজাণু বা কোন বিষক্রিয়া কোন ক্ষতি করতে পারে না।

শুক্লাভং শুক্লকেশঞ্চ নেত্রত্রয়সমন্বিতম্
ত্রিলোচনং মহাদেবং সর্বপাপপ্রণোদনং॥

শুক্লবর্ণের যে শিবলিঙ্গে শুক্লকেশ ও স্পষ্টতঃ ত্রিনয়নের চিহ্ন থাকে, তাঁর নাম ত্রিলোচন ; ত্রিলোচন শিবলিঙ্গের যিনি অর্চনা করেন, তাঁর জন্মার্জিত সমূহ পাপের বিনষ্টি ঘটে।

জ্বলৎপিঙ্গং জটাজুটং কৃষ্ণাভং স্থূলবিগ্রহম্।
কালাগ্নিরুদ্রমাখ্যাতং সর্বসত্ত্বৈর্নিষেবিতম্॥

এক ধরণের শিবলিঙ্গ আছে যাঁর দিকে তাকালে মনে হয় লিঙ্গের মধ্যে আগুন জ্বলছে, স্পষ্টতঃই অগ্নিশিখা দেখা যায়। এই শিবলিঙ্গ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণের হয় এবং কিঞ্চিৎ স্থূলও হয়। সেই বাণলিঙ্গের নাম কালাগ্নিরুদ্র। সকল জীবই এই শিবলিঙ্গের পূজা করতে পারেন।

মধুপিঙ্গলবর্ণাভং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকম্
শ্বেতপদ্মাসমাসীনং চন্দ্ররেকাবিভূষিতম্॥
প্রলয়াস্ত্রসমাযুক্তং ত্রিপুরারি সমাহ্বয়ম্॥

যে শিবলিঙ্গের বর্ণ মধুপিঙ্গল তাতে যদি শ্বেত যজ্ঞোপবীতের চিহ্ন, ত্রিশূল চিহ্ন, ঊর্ধ্বভাগে অর্ধচন্দ্র এবং তলার দিকে শ্বেতপদ্মের চিহ্ন থাকে, তাহলে সেই বাণলিঙ্গের নাম ত্রিপুরারি। ইনিও সর্বাভীষ্ট প্রদায়ক।

শুভ্রাভং পিঙ্গলজটং মুণ্ডমালাধরং পরং
ত্রিশূলধরমীশানং লিঙ্গং সর্বার্থ সাধনং॥

সাদাটে রং-এর যে শিবলিঙ্গে পিঙ্গলবর্ণের জটার চিহ্ন, গলদেশে মুণ্ডমালার চিহ্ন এবং ত্রিশূল চিহ্ন রয়েছে, তার নাম ঈশান। ঈশানের অর্চনা করলে সর্বার্থ সিদ্ধি হয়। ঈশানরূপী শিবলিঙ্গের পূজা করলে তিনদিনের মধ্যে মন্ত্রচৈতন্য ঘটে থাকে। এটি আমার উপলব্ধ সত্য।

ত্রিশূলডমরুধরং শুভ্রারক্তার্ধভাগতঃ।
অর্ধনারীশ্বরাহ্বানং সর্বদেবৈরভীষ্টদম্॥

যদিও প্রতিটি শিবলিঙ্গই তত্ত্বতঃ অর্ধনারীশ্বর কারণ শিবশক্তি স্বতন্ত্রই অভিন্ন, তবুও অর্ধনারীশ্বর শিবলিঙ্গের প্রত্যক্ষ স্বরূপ হচ্ছে, এই শিবলিঙ্গের অর্ধেকটা লালাচে রংএর হয়।

অর্ধনারীশ্বরের পূজা করার সৌভাগ্য যাঁর ঘটে থাকে, তাঁকে সর্বাভীষ্ট প্রদান করার জন্য সমস্ত দেবতারাই উন্মুখ হয়ে থাকেন। যোগজ ঋষির সিদ্ধি এবং ঐহিক সমৃদ্ধি সেই ভাগ্যবান সেবকের করায়ত্ত থাকে।

ঈষৎরক্তময়ং কান্তং স্থূলং দীর্ঘং সমুজ্জ্বলম্।
মহাকালং সমাখ্যাতং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্॥

যে শিবলিঙ্গ ঈষৎ রক্তাভ, স্থূল, দীর্ঘাকার এবং অত্যন্ত দীপ্তিময়, তাঁর নাম মহাকাল। মহাকালের অর্চনায় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গেরই প্রাপ্তি ঘটে।

দেবর্ষি নারদ সেই কশ্যপমীর বা কাশ্মীরবাসী শিবভক্ত ব্রাহ্মণের কাছে শিবলিঙ্গের সমস্ত চিহ্ন বর্ণনা করে মন্তব্য করেছিলেন —

এতত্তু কথিতং তুভ্যং লিঙ্গ চিহ্নং মহেশিতুঃ।
একেনৈব কৃতার্থ স্যাৎ বহুভিঃ কিম্ সুব্রত!

শিবলিঙ্গের এই এগারটি চিহ্নের মধ্যে লিঙ্গমধ্যে একটি চিহ্ন থাকলে তাঁরই সেবা করে জীব কৃতার্থ হয়ে যায়, হে সুন্দর ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ! বহুচিহ্ন অন্বেষণের প্রয়োজন কি?

একলিঙ্গস্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। মিনিট পাঁচেক পরে চোখ খুলে আবার বলতে লাগলেন — কাশীর সেই উকিলবাবুকে যে সন্ন্যাসী সেই নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গটি দিয়েছিলেন, তিনি মোটেই ভাল কাজ করেননি। সন্ন্যাসীকে তার জন্য ফলভোগ করতে হবে। শিবময় ভারতবর্ষে হিন্দু মাত্রেরই মহাদেবের প্রতি স্বাভাবিকী নিষ্ঠা আছে। গেরুয়াধারী সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতি একটা সহজাত শ্রদ্ধাও আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, শিবলিঙ্গ চেনেন এমন সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। একমাত্র শিবাচার্যরা এবং শৈবাগম সাধনার পথিকরাই শিবতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন। তারা ছাড়া আর কেউ, তিনি যত বড়ই সিদ্ধসাধক বা যোগী হোন না কেন, তাঁদের পক্ষে শিবলিঙ্গের চিহ্ন চিনে কোন শিবলিঙ্গ ধর্মার্থ কাম দান করেন কিংবা কোনটি মোক্ষদান করে থাকেন বলা সুদুস্কর। তুমি ত অমরকন্টক হতে মুণ্ডমহারণ্য এমনকি ওঁকারমান্ধাতা পর্যন্ত ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ির সমস্তটাই একরকম পরিক্রমা শেষ করে ফেললে, শিবভূমি নর্মদার তটে তটে বহু শিবলিঙ্গই ত দেখেছ, বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গেও তোমার মোলাকাৎ হয়েছে, শিবলিঙ্গ নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ এমন কয়জনের তুমি সাক্ষাৎ পেয়েছ আমাকে অকপটে বল। ধাবড়ী কুণ্ড বসে আজ তুমি যা শুনলে, তা কি এর পূর্বে কোথাও শুনেছ?

আমি — সত্যি কথা বলতে কি, পরিক্রমাকালে আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে অকপটে বলতে পারি তাঁদের দু'একজনকে ছাড়া আর সকলকেই শিবলিঙ্গের লক্ষণ বিচারে অজ্ঞ বলেই মনে হয়েছে। যে ৮। ১০ জন সমাধিবান সিদ্ধ সাধকের দর্শন পেয়েছি, তাঁরাও শিবলিঙ্গের লক্ষণ-বিচার জানেন বলে মনে হয়নি। ওঁকারের মহাত্মা প্রলয়দাসজী যে অত্যন্ত উচ্চকোটির ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রতীতি আছে। শিবলিঙ্গ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি, কাজেই তিনি বিশেষজ্ঞ কিনা তা বলা আমার সম্ভব নয়। সীতামায়ীর বনে মহাত্মা সোমানন্দের মধ্যে আমি এমন কিছু দেখেছিলাম, যাতে আমি তাঁকে এবিষয়ে সিদ্ধাচার্য বলে মনে করি। আপনি অন্তর্যামী পুরুষ, আমার বক্তব্য দয়া করে বুঝে নেবেন। তবে আমার বাবা গৃহী হয়েও, নর্মদাতটে না এসেও

নিজের গ্রামে কংসাবতী নদীর ধারে বাস করেও যে নিজের সাধন শক্তিতে শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কারণ আজ আপনার কাছে বসে শিবলিঙ্গের চিহ্ন সম্বন্ধে যা যা কথা শুনলাম, এসব কথা আমি সর্বপ্রথম বাবার কাছেই শুনেছিলাম। বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন শিবমন্দিরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে magnifying glass সহযোগে তিনি আমাকে নানা চিহ্ন চিনিয়ে দিলেন এবং লক্ষণ অনুযায়ী কোন কোন শিবলিঙ্গের কি কি নাম হওয়া উচিত তা আমাকে শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন।

একলিঙ্গস্বামী — সাধু! সাধু! তুমহারা বাত্ শুনকে মুঝে বহোৎ প্রসন্নতা আতী হৈ। ঔর কুছ পুছনা হৈ, ত পুছ লিজিয়ে।

মহাত্মার অভয়বাণী পেয়ে আমি নিবেদন করলাম, আমার অন্তরের বিশ্বাস আশুতোষ শিবসুন্দর সতত মঙ্গলময়। যে কোন চিহ্নযুক্ত শিবলিঙ্গের অর্চনায় জীবের মঙ্গলই হয়, এই আমার দৃঢ় ধারণা। শিবের উপাসনায় কারও কোন অমঙ্গল হয় বা সর্বনাশ ঘটে একথা আমি বিশ্বাস করি না। কাজেই যে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে তা কোন ঋষিই লিখুন বা কোন শিবাচার্যই লিখুন, তাতে 'নিন্দ্যলিঙ্গমাহ তত্রৈব' বা ইতি দুষ্টবাণলিঙ্গলক্ষণম্' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় উক্তি বলেই আমি মনে করি। যে শিবলিঙ্গ গৃহীকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন, সংসারের অনিত্য বন্ধন ছিন্ন করে মনে বৈরাগ্য এনে দেন, তা গৃহীর মনঃপুত না হলেও সেইরকম অবস্থাকে অমঙ্গলসূচক বা 'সর্বনেশে' কেন বলব? কত জন্মের সাধনা ও সুকৃতি থাকলে তবে মানুষের মোক্ষাবস্থা লাভ হয়! মোক্ষ কি হেলাফেলার জিনিষ? মোক্ষ মানে পরম নিঃশ্রেয়স লাভ। শিবপূজা করে তা যদি কারও ভাগ্যে ঘটে, সে ত পরম সৌভাগ্য! তবে যে গৃহী উত্তরোত্তর সম্পদ বৃদ্ধিকেই প্রকৃত ধর্মকার্য বলে মনে করেন তিনি মোক্ষফলদাতা সেইরকম শিবলিঙ্গের পূজা না করলেই পারেন। ঐহিক সম্পদ প্রাপ্তির সহায়ক শিবলিঙ্গেরও ত অভাব নেই। সে ত আপনার বর্ণনা থেকে বোঝা গেল। কারও মনে আসক্তি পূরণের সহায়ক শিবলিঙ্গ পূজা করতে ইচ্ছে হলে তাঁর উচিত হবে লক্ষণ ধরে শিবলিঙ্গ নির্বাচন করা। তবে সেই নির্বাচনকাণ্ডে যখন অধিকাংশ সাধু সন্ন্যাসীরাই অপারগ, তা হলে গৃহীদের ত ভুল হতেই পারে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, এমন কোন উপায় বা অব্যর্থ সংকেত আছে কি যার সাহায্যে যে কোন সাধন-ভজনহীন লোকও তার অভীষ্ট পূরণ করবেন যিনি, সেইরকম শিবলিঙ্গ সহজেই নির্বাচন করে নিতে পারেন?

একলিঙ্গস্বামী — লাও বেটা অভয়ানন্দ, ইনকো সব কুছ খোলসা করকে দেখা দিজিয়ে। তুলাধিকরণং তণ্ডুলেন, তুলাদণ্ড ঔর তণ্ডুল ব্যাগারা লে আইয়ে। হম্ দেখতা হৈ, ভবিষ্যৎকালমেঁ এহি লেড়কা স্বয়মেব হাজার হাজার শিবলিঙ্গ ভক্তলোগোঁকো বিলায়েঙ্গে।

তার কথা শুনে আমি ধাঁধায় পড়লাম। দাঁড়িপাল্লা এবং চাল কেন যে অভয়ানন্দজীকে আনতে বলছেন, তা বুঝতে পারলাম না। আমি দেখলাম তাঁর আদেশ শুনে অভয়ানন্দজী তড়িঘড়ি করে একটি সুদৃশ্য দাঁড়িপাল্লা এবং আধসেরটাক চাল তাঁর সামনে এনে উপস্থিত করলেন। মহাত্মার ইঙ্গিতে প্রত্যেক দণ্ডী সন্ন্যাসী তাঁদের নিজেদের জটা হতে এক একটি শিবলিঙ্গ বের করে তাম্রপাত্রে রাখলেন। সচ্চিদানন্দজীর মাথায় টাক, তাঁর জটা নেই, তিনি দেখলাম তাঁর কোমরবন্ধনী খুলে একটি শিবলিঙ্গ বের করে সেই নির্দিষ্ট তাম্রপাত্রে রাখলেন।

পাকশালার এককোণে কতকগুলি ছোট বড় শিবলিঙ্গ জমা হয়ে পড়েছিল, আমি দেখেছিলাম। সেখান থেকেও কয়েকটি শিবলিঙ্গ এনে হরিস্বামী আলাদা একটি পাত্রে রাখলেন। একলিঙ্গস্বামী আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন — শিবলিঙ্গপ্রার্থী কোন শিবভক্ত পূজা করার জন্য বাণলিঙ্গ প্রার্থনা করলে তুলাদণ্ডের একদিকে শিবলিঙ্গটি বসিয়ে অন্যদিকে আতপচাল দিয়ে ওজন করতে হয়। ওজন সমান করে অর্থাৎ শিবলিঙ্গের সম পরিমাণ চাল একটি কৌটায় রেখে মিনিট পাঁচেক ধরে শিবের কাছে প্রার্থনা করতে হয় 'প্রভু! তুমি যদি এই ভক্তের পূজা গ্রহণ করতে চাও, তাহলে চালগুলির পরিমাণ তোমার অনুগ্রহদৃষ্টিতে বেড়ে যাক্। নতুবা ওজন কমে যাক। পাঁচ মিনিট পরে আবার তুলাদণ্ডের একদিকে শিব এবং অন্যদিকে সেই কৌটা ঢাকা চালগুলি রেখে ওজন করলে দেখা যায় চালের ওজন বেড়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে শিব প্রসন্ন মনে ঐ ভক্তের পূজা গ্রহণ করতে চাচ্ছেন এবং ঐ ভক্ত গৃহীই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন ঐ শিবলিঙ্গের অর্চনায় সব দিক দিয়েই শুভ হওয়ার সুনিশ্চিত সম্ভবনা; আর যদি চালের ওজন কমে যায়, তাহলে ঐ শিবলিঙ্গের অর্চনায় ভক্তের অনিষ্ট হবে অর্থাৎ তিনি ভক্তের অর্চনীয় নন। যদি উভয় বস্তুর ওজন পাঁচ মিনিট পরেও সমানই থকে, তাহলে ঐ ভক্তের ঐ শিবলিঙ্গ গ্রহণ করা উচিত নয়। ঐ শিবলিঙ্গ অর্চনায় ভক্তের কোন ক্ষতি হবে না বটে তবে কোন অভীষ্ট সিদ্ধিও হবে না। যে কোন প্রকৃতির নর্মদেশ্বর বা বাণলিঙ্গ সম্বন্ধে ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য।

বিভিন্ন শিবলিঙ্গ নিয়ে নিজেদের হাতে ঐ পদ্ধতিতে তুলাদণ্ডের সাহায্যে চাল দিয়ে ওজন করে করে প্রসিদ্ধ শিবাচার্যরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাণলিঙ্গ নির্বাচন করার ঐ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এইজন্য শাস্ত্রের বিধান হল —

ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং পরীক্ষাতত্ত্বকোবিদৈঃ।
ত্রিসপ্তপঞ্চবারং বা তুলাসাম্যং ন জায়তে।
তদা বাণং সমাখ্যাতং শেষং পাষাণ-সম্ভবং॥ (বীরমিত্রোদয়)

অনেক পরীক্ষা করে শিবতন্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন যে ৫ বা ২১ বার ওজন করেও যদি শিবলিঙ্গ এবং চালের তুলাসাম্য না ঘটে অর্থাৎ একবার চালের ওজন আরেকবার শিবের ওজন বেড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটি বাণলিঙ্গ। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে বুঝতে হবে শিবলিঙ্গটি বাণলিঙ্গ নন। সর্বাবস্থায় শিব ও চালের ওজন সমান থাকলে সেটিকে প্রস্তর নির্মিত কোন সাধারণ বলে বুঝতে হবে। শিবাচার্যগণ আরও বলে গেছেন — অপরতুলাদিষু তণ্ডুলা যদ্যধিকাঃ স্যুস্তদা তল্লিঙ্গং গৃহিনাং পূজ্যমবধার্যাম্ — তুলাদণ্ডের যে দিকটাতে চাল রাখা হয়, শিবলিঙ্গের তুলনায় তা যদি কেবলই বেড়ে যেতে থাকে, তাহলে তা গৃহীদের পূজ্য বলে অবধারিত।

সূতসংহিতাতে কোন্‌টি বাণলিঙ্গ আর কোন্‌টি বা নর্মদেশ্বর তা চেনবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় —

সপ্তকৃত্বস্তুলারূঢ়ং বৃদ্ধিমেতি ন হীয়তে।
বাণলিঙ্গমিতিখ্যাতং শেষং নার্মদমুচ্যতে॥

অর্থাৎ প্রথমে শিবলিঙ্গ ও চাল সমান সমান করে নিয়ে পূর্ব পদ্ধতিতে পাচ মিনিট পরে ওজন করলে বার বার সাতবার ওজন করে যদি প্রতিবারেই চালের ওজন ক্রমশ উত্তরোত্তর

বেড়ে যেতে দেখা যায়, তা হলে বুঝতে হবে শিবলিঙ্গটি বাণলিঙ্গ। প্রথম বারের ওজনে চাল যেটুকু বাড়ল, পরপর সাতবার ওজন করলেও যদি চালের পরিমাণ ঐ একই অবস্থায় থাকে, ক্রমে ক্রমে চাল না বাড়তে থাকে, তাহলে শিবলিঙ্গটি নর্মদেশ্বর তবে বাণলিঙ্গ না হোন, প্রতিটি নর্মদেশ্বরই পূজার্হ।

একটি শিবলিঙ্গ বাণলিঙ্গ কিনা, তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে —

নদ্যাং বা প্রক্ষিপেৎ ভুয়ো যদা তদুপলভ্যতে
বাণলিঙ্গং তদা বিদ্ধি নূনং সুখবিবর্ধনং॥

প্রকৃত বাণলিঙ্গ হলে তাঁকে যদি নদীপ্রবাহে ছুঁড়ে ফেলা যায়, তাহলে নদীতে নেমে কিছুক্ষণ জলে হাত চুবিয়ে খুঁজতে থাকলে সেই বাণলিঙ্গ পুনরায় হাতে এসে ঠেকবেন, অর্থাৎ হারানিধি আবার ফিরে পাওয়া যাবে। এই রকম মহাজাগ্রত বাণলিঙ্গের পূজায় ভক্তের সুখ-সমৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান হয়ে থাকে।

মহাত্মার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অভয়ানন্দজী এক এক করে তাম্রপাত্রস্থিত শিবলিঙ্গ সমপরিমাণে চালের সঙ্গে ওজন করে আলাদা আলাদা করে রাখতে লাগলেন। পরে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে পুনরায় নির্দিষ্ট চালের সঙ্গে নির্দিষ্ট শিবলিঙ্গ পুনরায় ওজন করে দেখাতে লাগলেন। দেখলাম, প্রতিটি ক্ষেত্রেই চালের ওজন বেড়ে গেছে। হরিস্বামী পাকশালা হতে যে লিঙ্গগুলি এনেছিলেন তার মধ্যে থেকেও তিনটি শিবলিঙ্গ এবং তাদের সমপরিমাণ চাল প্রথমে পাল্লায় চাপিয়ে পাঁচ মিনিট পরে আলাদা আলাদাভাবে ওজন করে দেখালেন। ঐ শিবলিঙ্গগুলির ক্ষেত্রে দেখলাম, চালের চেয়ে শিবের ওজন বেশী হয়ে গেছে, তার মানে এগুলির পূজা গৃহী বা উদাসীন কারও পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়। এইভাবে বাণলিঙ্গ নির্বাচনের পদ্ধতি (practical demonstration) দেখানো শেষ হলে একলিঙ্গস্বামী যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে বললেন, হাতে এখনও সময় আছে, মধ্যাহ্নভোজনের পর তুমি অভয়ানন্দের সঙ্গে ধাবড়ী কুণ্ডের কাছে যাবে। বাণলিঙ্গ নির্বাচনের যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি, উনি তোমাকে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাবেন। আগামীকাল সকালেই তুমি সম্বিদানন্দের সঙ্গে এখান হতে যাত্রা করো, তুমি আগেই চব্বিশ অবতার ও ওঁকারেশ্বরজীকে দর্শন করে এসেছ। কাজেই তোমার ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ি পরিক্রমা শেষ হয়ে গেল ধরে নিতে পারো। ভয়ঙ্কর দুর্গম শূলপাণির ঝাড়ি অতিক্রম করে রেবা সংগমে পৌঁছে তুমি কৃতকৃত্য হও, এই আশীর্বাদ তোমাকে করছি। শিবানং সন্তু পন্থানঃ — তোমার পথ মঙ্গলময় হোক।

মহাত্মা দ্রুতবেগে তাঁর গুহার দিকে উঠে গেলেন। আমরা সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে 'কুর্নিশ' জানাতে থাকলাম।

তিনি গুহায় ঢুকে যাবার পর আমাদের মধ্যাহ্নভোজন পর্ব সমাধা করা হল। নিজের গুহায় যখন ফিরলাম, তখন বেলা বোধহয় একটা। আকাশ পরিষ্কার, সূর্য মধ্যগগনে। বেলা তিনটে নাগাদ আমি অভয়ানন্দজীর গুহায় গেলাম। গুহায় দেখলাম, সম্বিদানন্দজীসহ সকল সন্ন্যাসীই সমবেত হয়েছেন। তাঁদের স্বাধ্যায় পর্ব চলছে তাই উঁকি মেরেই ফিরে আসার জন্য পা বাড়াতেই আমাকে দেখে অভয়ানন্দজী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বললেন — লৌটাতে হৈ কেঁও? চলিয়ে আপকো লেকর্ ধাবড়ী কুণ্ডকা পাশ চলেঙ্গে। গুরুজীকা হুকুম হৈ, আপকো

বাণলিঙ্গকা স্বরূপকী খেল দেখায়েঙ্গে। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাঁর গুহায় বসে রইলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে মূলকুণ্ড থেকে দূরে আর একটি কুণ্ডের ধারে জলের কাছে গিয়ে বসলেন। এই কুণ্ডেও জলের ঘূর্ণিপাকে নানা শিবলিঙ্গ উঠছে পড়ছে, কোন কোনটা ঠিকরে পড়ে কুণ্ডগাত্রে ধাক্কা খেয়ে আবার কুণ্ডের জলে গিয়ে পড়ছে। এখানে জলপ্রপাতের অবিরাম ধারাবর্ষণ গায়ে এসে পড়ছে না। অভয়ানন্দজী জটা খুলে নিজের শিবলিঙ্গটা আমার হাতে দিয়ে বললেন — গুরুজীনে দিয়া থা। ইনকো হম্ নিত্য পূজা করতে হৈ। আচ্ছিতরাসে দেখ্ লিজিয়ে ইন্‌কা শিরমেঁ অর্ধচন্দ্র স্পষ্ট দেখাই দেতে হৈ। ইন্‌কা নাম শশীমৌলিশ্বর বাণলিঙ্গ। নমঃ শিবায় বোলকে পানীমেঁ ফেক্ দিজিয়ে। ফেক্ দিজিয়ে। ফেক্ দিজিয়ে। তিনি পীড়াপীড়ি করতে, আমি সেই অপরূপ শিবলিঙ্গটিকে 'নমঃ শিবায়' বলে কুণ্ডের জলে ফেলে দিলাম। দুজনেই হাত জোড় করে বসে আছি। প্রায় পনের কুড়ি মিনিট পরে জলের পাল্টা ঢেউ এর ঘূর্ণিপাকে একটি শিবলিঙ্গ ঠিকরে এসে অভয়ানন্দজীর কোলে পড়ল। জয়গুরু জয়গুরু বলতে বলতে অভয়ানন্দজী সাগ্রহে শিবলিঙ্গটি কুড়িয়ে মাথায় ঠেকালেন। পরে আমার হাতে দিয়ে বললেন — এহি হ্যায়, 'নদ্যাং বা প্রক্ষিপেৎ ভূয়ো যদা তদুপলভ্যতে' মন্ত্রকী জ্বলন্ত প্রমাণ।

আমি শিবলিঙ্গটি হাতে নিয়ে দেখলাম সেই একই শশিমৌলীশ্বর বাণলিঙ্গ, শিরোভাগে অর্ধচন্দ্র জ্বলজ্বল করছে! আমার মুখ দিয়ে তখন কোন কথা সরছে না। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত। আমি তখন রীতিমত কাঁপছি। অভয়ানন্দজী জটার মধ্যে তাঁর বাণলিঙ্গটি গুঁজে নিয়ে আমার হাত ধরে তাঁর গুহার কাছে নিয়ে এলেন। গুহার মুখে আমাকে দাঁড়াতে বলে তিনি গুহাতে ঢুকে গেলেন এবং একটু পরেই সকালের সেই তুলাদণ্ড এবং একটা কৌটায় কিছু চাল নিয়ে এসে জটা থেকে শিবলিঙ্গটি পুনরায় বের করে আমাকে বললেন — আপনা গুহামেঁ সব লে যাও। আপনা হাতমেঁ পুনঃপুনঃ তৌল করকে 'ত্রিসপ্ত-পঞ্চবারং বা তুলাসাম্যং ন জায়তে' ঔর 'সপ্তকৃত্বস্তুলারূঢ়ং বৃদ্ধিমেতি ন হীয়তে' ঋষিয়োঁকা মন্ত্রবাণীকা প্রতাপ আপ্ খুদ্ পরীক্ষা কর লিজিয়ে। বাণলিঙ্গকা বারেমেঁ আপকো নিঃসংশয় হোনা চাহিয়ে। সুবে যানে কা বখৎ শিউজী ঔর এহি সব চিজ্ মুঝে আপস্ দেকর যাইয়ে গা।

বাণলিঙ্গ, চাল আর দাঁড়িপাল্লাটি হাতে পেয়ে আমার আনন্দ আর ধরে না। আমি এক রকম প্রায় দৌড়ে নিজের গুহাতে এসে ঢুকলাম। তখন অপরাহ্ন, বেলা বোধ হয় পাঁচটা। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লেও চারিদিক তখনও রোদে ঝলমল করছে। আমি মোমবাতিটি জ্বালিয়ে নিজের হাতে পরখ করতে বসে গেলাম। সকালে অভয়ানন্দজী যেমন করেছিলেন আমিও সেইভাবে দাঁড়িপাল্লার একদিকে বাণলিঙ্গ এবং অন্যদিকে সমপরিমাণ চাল মেপে নিয়ে কৌটায় রাখলাম, পাঁচ মিনিট ধরে ইষ্টমন্ত্র জপ করলাম, পরে দাড়িপাল্লায় চাপিয়ে দেখলাম, চালের ওজন শিবলিঙ্গের চেয়ে বেড়ে গেছে। পাঁচবার, সাতবার, ক্রমে একুশ বার পর্যন্ত শিবলিঙ্গ ও চাল চাপিয়ে চাপিয়ে মেপে দেখলাম। প্রতিবারেই চালের ওজন — বৃদ্ধিমেতি ন হীয়তে। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা!

বাণলিঙ্গ নির্বাচনের কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেছি বলে মনে হল। আমি বাণলিঙ্গের স্পর্শ পুনঃপুনঃ মাথায় ও বুকে নিয়ে প্রণামান্তে কৌটায় ভরে মাথার শিয়রে রেখে দিলাম। সব গুছিয়ে রেখে কম্বলের উপর আরাম করে বসেছি, এমন সময় সম্বিদানন্দজী গুহায় এসে

ঢুকলেন। আমাকে বললেন — 'লেকিন, আমি আরও একবার এসে ফিরে গেছি। তখন তুমি বাণলিঙ্গ পরীক্ষায় তন্ময় ছিলে। তোমার গবেষণা-কার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিনি। এখন রাত্রি সাড়ে-সাতটা'।

তিনি কম্বলের উপর বসলেন, মুখে কোন কথা নেই। তাঁকে নীরব দেখে আমি বললাম — ধাবড়ী কুণ্ডে না এলে আমি অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হতে বরাবরের জন্য বঞ্চিত থাকতাম। এখানকার দণ্ডীস্বামীদের স্নেহ ও সদয় ব্যবহারের কথা কোনদিন ভুলব না। আমার মনের মণিকোঠায় আপনার পুণ্যস্মৃতি চিরকাল জেগে থাকবে। এখানে আপনার কাছে যা শিখে গেলাম, জেনে গেলাম তা আমার জীবনে এক অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

মহাত্মা নীরব। গল্পপ্রিয় রসিক সাধুর ভাবান্তর দেখে আমি চমকে গেলাম। আজ তাঁর চোখে মুখে বেদনার ছায়া। কার্যকারণ বুঝতে না পেরে আমি তাঁর হাত দুটি ধরে করুণকণ্ঠে বললাম, জানি না আজ আপনি এত গম্ভীর কেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মনের অজ্ঞাতসারে আপনার শ্রীচরণে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আপনি কথা না বললে আজ রাত্রে ঘুমোতে পারব না, যন্ত্রনায় ছটফট করব...........।

এইবার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর চক্ষুদুটিতে জল চিক্ চিক্ করছে। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন — মানুষের সাধারণ সুখ-দুঃখকে সহজ সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করতে মহাকবি ভাসের তুলনা পাওয়া বিরল। তাঁর 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' নাটকে কন্যার বিবাহের পর আসন্ন বিরহ-কল্পনায় ব্যথিত চিত্তে মায়ের উক্তি আছে —

অদত্তেতি আগতা লজ্জা দত্তেতি ব্যথিতং মনঃ।
ধর্মস্নেহান্তরে ন্যস্তা দুঃখিতা খলু মাতরঃ॥

কন্যাদান করা ধর্ম, কিন্তু কন্যাকে রাখতে চায় স্নেহ। অদত্তা কন্যা লজ্জার কারণ — দত্তা কন্যা বেদনার কারণ। ধর্ম ও স্নেহের মধ্যে পড়ে মায়েরা শুধু দুঃখ ভোগই করে থাকে।

দরদী মহাকবির এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় — তোমাকে এখান থেকে ছেড়ে দেওয়াই ধর্ম, কারণ তুমি নর্মদা পরিক্রমার শপথ নিয়েছ কিন্তু স্নেহ চায় তোমাকে ধরে রাখতে। তোমাকে ছেড়ে না দিলে সেটা অপরিসীম লজ্জার কারণ হবে, তুমি তপোভ্রষ্ট হবে, অথচ তুমি চলে গেলে সেটা অন্তর্বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধর্ম ও স্নেহের মধ্যে পড়ে মায়েরা যেমন দুঃখভোগ করে, তেমনি আমার মনও বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েছে। তোমার কোন অপরাধের প্রশ্নই এখানে আসে না।

এই প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাসের একটি সার্থক উক্তি মনে পড়ছে। আনন্দবেদনাময় বাৎসল্যের এই কথাই তিনি শকুন্তলা কাব্যের চতুর্থ অঙ্কে বলেছেন —

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

অর্থাৎ শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের গৃহে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর পালকপিতা কণ্বমুনি স্বগতোক্তি করেছিলেন — আজ শকুন্তলার যাবার দিন! হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। কণ্ঠ বাষ্পগদগদ স্তম্ভিত! চিন্তামগ্ন দৃষ্টি তাই আচ্ছন্ন। আমি বনবাসী তবু তনয়া বিরহ-দুঃখে আমার এই দশা — না জানি গৃহীদের এতে কতই কষ্ট!

আমারও আজ কণ্বমুনির মতই দশা। মাত্র আড়াই মাস তুমি আমাদের কাছে আছ। আমি সন্ন্যাসী হলেও মনটা এখনও ততখানি কঠোর করতে পারিনি। আমার অজান্তেই মনের মধ্যে তোমার প্রতি বাৎসল্য স্নেহ জমে গেছে। আজ রাস্তার পরিচয় রাস্তাতেই শেষ হতে চলেছে। তবুও মনের মধ্যে কান্না উজিয়ে আসছে। কিছুদিন তোমার চিন্তা আমার মনকে উদ্‌ব্যস্ত করবে, সন্দেহ নেই। অনুমান করতে পারছি তোমার মায়ের উৎকণ্ঠা না জানি আরও কত বেশী! তিনি তোমার বিষয়ে দিনরাত্রি কতই না চিন্তা করছেন! তিনি যেমন অসহায়ভাবে ঠাকুরের কাছে তোমার নিয়ত কল্যাণ কামনা করছেন, অতঃপর আমাকেও তা করতে হবে!

এই পর্যন্ত বলে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বিদায় নিলেন। আপনভোলা সদানন্দময় সন্ন্যাসীর এতখানি স্নেহের পরিচয় পেয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। অনেকরাত্রি হয়ে গেল ঘুম আসতে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল আজ ১৪ই ভাদ্র, সোমবার, এখনই যাত্রা করতে হবে, আমি বাইরে বেরিয়ে নর্মদামাতাকে দর্শন করে প্রণাম করলাম, তখনও সূর্যোদয় হয়নি। গুহাতে ঢুকে কৌটা খুলে অভয়ানন্দজীর বাণলিঙ্গকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখলাম বাণলিঙ্গটি নেই। চারদিক তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু নাঃ! কোথাও নেই। আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল, মাথা ঝিমঝিম করছে, অভয়ানন্দজীকে এখন কি জবাব দেব? তিনি কি ভাববেন, কি বলবেন, এই দুশ্চিন্তায় আমি গুহার মেঝেতেই থপ করে বসে পড়লাম। এমন সময় এসে পৌঁছলেন সচ্চিদানন্দজী, গুহার মধ্যে উঁকি মেরেই বললেন — ক্যা আপ্ আভি তক্ তৈয়ার নাহি হুয়া? গাঁঠরী ভি নাহি বান্ধা? তারপর আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে, আরে তুমহারা হালৎ ক্যায়সে হো গিয়া?

আমি কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। তিনি সব শুনে বললেন — লেকিন্ ইস মে তুমহারা কসুর ক্যা? শিবজী খুদ্ অন্তর্হিত হো গিয়া ত ক্যা কিয়া যায়? সিধা অভয়ানন্দজীকা পাশ চলা যাও, সাফ্ সাফ্ বাত বাতা দেও? সচ্ বোলনেসে ডর কেয়া? আভি চলা যাও। হম আপকো গাঁঠরী বান্ধ্ দেতা হৈ।

আমি তাঁর কথা শুনে তুলাদণ্ড এবং চালের কৌটাটি নিয়ে অভয়ানন্দজীর গুহার দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালাম, কাঁপা কাঁপা গলায় সব কথা বলতে গিয়ে আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে নিজের জটা খুলে তাঁর সেই শশিমৌলিশ্বর বাণলিঙ্গটি দেখিয়ে বললেন — 'হমারা ইষ্টদেবতা, দেখিয়ে হমারা পাশ চলা আয়া। রোনেকা কোঈ বাত নেহি। আপ্ গুরুজীকো পুছতে থে, সাচ্চা বাণলিঙ্গ পয়ছান কে লিয়ে অব্যর্থ নিদর্শন ক্যা হৈ? সাচ্চা নিদর্শন এহি হ্যায়, উনকো পানি মে ফিক্ দো ঔর দুসরা কিসিকা পাশ রাখ দো, পূজা কা বখত্ উনকা ভক্তকা পাশ কৃপানিধান খুদ আবির্ভূত হো যাতা হ্যায়'। তিনি বাণলিঙ্গটি হাতে নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন — প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্। কারণাঞ্চ কারণং ত্বং সংসার দহনক্ষমম্। যাক্, এর মধ্যে শিব বা শিবভক্ত যারই কেরামতি থাক ; তাঁর শশিমৌলীশ্বর বাণলিঙ্গটি দেখতে পেয়ে আমার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। আমি তাঁকে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি হাসিমুখে গুহায় ফিরে এলাম। এসে দেখি, আমার কম্বলাদি বিষয় সম্পত্তি সব কিছু গুছিয়ে সচ্চিদানন্দজী গাঁঠরী বেঁধে ফেলেছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হল এইমাত্র অভিনীত নাটকের দৃশ্যটির সূচনা বিয়োগাত্মক হতে হতে যে মিলনাত্মক

পরিণতি লাভ করল, এ সবই যেন তাঁর জানা। আমি তাকে প্রণাম করে গাঁঠরী কাঁধে তুলে কমণ্ডলু ও লাঠি হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে।

— লেকিন্, সবসে বিদা লে লো।

তাঁর কথায় আমি প্রত্যেকটি গুহায় ঢুকে ঢুকে সকলের কাছে বিদায় নিলাম। প্রণাম করলাম। সকলে আমার পেছনে পেছনে এগিয়ে এলেন পাকসালার নিকটস্থ বেদী পর্যন্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে একলিঙ্গস্বামীর গুহার দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি গুহার বাইরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। মন ভরে গেল আনন্দে। দণ্ডী সন্ন্যাসীরা তাঁর উদ্দেশ্যে কুর্নিশ করতে থাকলেন। সকল সন্ন্যাসীকে পুনরায় যুক্তকরে প্রণাম করে, সকলের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম সেই তপোবন থেকে। ধাবড়ী কুণ্ড বিদায়! জয় মা নর্মদা! নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ।

আগে আগে চলেছেন সচ্চিদানন্দজী, তাঁর বাম স্কন্ধে ঝুলছে একটি থলি, অভয়ানন্দজী সেই থলিতে আমাদের দুজনের জন্য নারকেল, অমৃত (পেয়ারা) এবং কতকটা খোয়া ভরে দিয়েছেন। বাঁ হাতে নিজের দণ্ড এবং ডান হাতে একটি মোটা লাঠি নিয়ে তিনি তপোবন থেকে প্রথমে ধাবড়ী কুণ্ডের নিকটে এসে আমাকে কুণ্ডস্থ বাণলিঙ্গ ও নর্মদামাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে লাগলেন। প্রণাম করে উঠবার পর তিনি আমাকে নিয়ে চললেন উত্তর দিকে। কিছুটা এগিয়ে যাবার পরই আমি চিনতে পারলাম রাস্তাটা; এই রাস্তা দিয়েই আমি এসেছিলাম ধাবড়ী কুণ্ডস্থ একলিঙ্গস্বামীর তপোবনে। সমস্ত বিন্ধ্যপর্বতস্থিত জঙ্গলের উপর সূর্যরশ্মি সেইমাত্র এসে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে, বর্ষায় অজস্র বৃষ্টিপাতের ফলে দেখছি এই আড়াই মাসের মধ্যে গাছপালা বেশ বেড়ে উঠেছে। পর্বতের অধিত্যকা গাছপালার সবুজ আভায় বড় চমৎকার দৃশ্য রচনা করেছে। পার্বত্য পথের দুধারে গাছপালা বেড়ে গিয়ে পথের উপর লুটিয়ে পড়ায় সচ্চিদানন্দজী লাঠি দিয়ে সেগুলির অগ্রভাগ সরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। এইভাবে প্রায় ঘন্টা দেড়েক হাঁটার পর আমরা এসে পৌঁছালাম সেইস্থানে যেখান হতে আমি মহাত্মা সোমানন্দের কাছ হতে বিদায় নিয়ে তাঁরই নির্দেশে ধাবড়ী কুণ্ডে গিয়ে বর্ষাকালটা কাটিয়ে এলাম। আমাকে বিদায় দেবার সময় তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন — 'যা যা ধাবড়ী কুণ্ডে গিয়ে রাবড়ী খাগে যা'! তাঁর কথা আক্ষরিক অর্থে না মিললেও ভাবার্থ বিচার করলে তা খুবই সার্থক হয়েছে। গত আড়াই মাস ধরে ধাবড়ী কুণ্ডে থেকে আমি অনেক শিখেছি, অনেক জেনেছি। সূক্ষ্ম যোগতত্ত্ব, নানা শাস্ত্রের নির্যাস এবং কাব্যের রস প্রাণ ভরে পান করে এসেছি। সচ্চিদানন্দজীর কথায় আমার টনক নড়ল। তিনি বললেন — লেকিন্, বাঁয়া তরফ দেখিয়ে সীতামায়িকা বন। মহাত্মা সোমানন্দজী কভি কভি ইধর আকর্ সীতামায়ীকা মন্দিরমেঁ নিবাস করতা হৈ। আমি সোমানন্দজীর উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণাম জানালাম।

এবার সচ্চিদানন্দজী একটা রাস্তার মোড়ে এসে বাঁক নিলেন। এতক্ষণ ধাবড়ী কুণ্ড হতে উত্তরাভিমুখে আসছিলাম, এবারে চলতে লাগলাম দক্ষিণ দিকে । সীতামায়ীর ঘোর জঙ্গলকে ডান দিকে রেখে ক্রমশঃ যেন উপর দিকে উঠে যাচ্ছি বলে মনে হল। কিছুদুর যাবার পর সচ্চিদানন্দজী 'হর নর্মদে' চিৎকার করে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম,

একা ময়াল সাপ গাছের উপর থেকে পাক খুলে নেমে আসছে। মহাত্মা কয়েক পা পিছিয়ে এসে আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। গাছটা ছিল রাস্তার ধারেই, সেই বীভৎস দর্শন প্রকাণ্ড সাপটা গাছ থেকে নেমে ধীরে ধীরে রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল। 'হর নর্মদে' বলতে বলতে আমরা সেইটুকু রাস্তা দ্রুত গতিতে পার হয়ে এলাম। প্রায় ঘন্টাখানিক ধরে নীরবে হাঁটার পর তিনি মুখ খুললেন। আমাকে বললেন, 'ধাবড়ী কুণ্ডে যাবার সময় মহাত্মা সোমানন্দজীর সীতামায়ীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গেছলে। লেকিন, ইহ্ হৈ দুসরা রাস্তা। ঔর তুরন্ত যানে পড়েগা।' এই কথা বলে তিনি চলার গতি দ্রুততর করলেন। অধিত্যকার এই অংশটি নিচের দিকে নামছে বলে মনে হল। বেলা বোধ হয় এগারটা নাগাদ্ আমরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছলাম যে এবার প্রবহমানা নর্মদার ধারা দেখতে পেলাম। বর্ষার জন্য দুদিকের গাছপালা খুব বেশী ঘন হয়ে গেছে। পথের অধিকাংশ স্থান ঢাকা পড়েছে নতুন গজিয়ে ওঠা লতাগুল্মে। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই সচ্চিদানন্দজী লাঠি দিয়ে লতাগুল্ম এবং গাছের ঝুঁকে পড়া ডাল সরিয়ে সরিয়ে হাঁটছিলেন। একদল হরিণকে বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে আসতে দেখা গেল, তাদেরকে তাড়া করে আসছে একদল বুনো কুকুর। তাদের একটানা 'ঘেউ ঘেউ' শব্দে সমগ্র বনভূমি যেন প্রকম্পিত হচ্ছে। সচ্চিদানন্দজী একটা প্রকাণ্ড কেঁদগাছের আড়ালে লাঠি বাগিয়ে দাঁড়ালেন, আমাকেও গাঁঠরী ফেলে শক্ত হাতে লাঠি ধরতে বললেন। তাঁর ঠোঁট নড়া দেখে বুঝলাম, তিনি যেন বিড়বিড় করে কোন মন্ত্র আওড়াচ্ছেন! যাক্, কুকুরগুলো এ পথে এল না, তারা রাস্তার দুদিক দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

তারা চলে যেতেই সচ্চিদানন্দজী বললেন — বুনো কুকুরের দলকে সামান্য ভেবো না। এরা নেকড়ে বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। বাঘ বাঘের মাংস খায় না, এমন কি সর্বভুক্ যে কাক, সেও স্বজাতীয় অন্য কাকের মাংস ঠোঁট দিয়েও ঠোকরায় না। বরং একটা কাক মারা গেলে, অন্য কাকরা কা কা শব্দে দলে দলে এসে সমবেদনা জানায়, কিন্তু বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি এই বুনো কুকুরের দল। এরা ক্ষুধার্ত হলে অন্য বুনো কুকুরকে মেরে ফেলে তার মাংস খেয়ে পেট ভরায়। শূলপাণির ঝাড়িই বল আর ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির অন্তর্গত এই ভেটাখেড়া বা সীতামায়ীর জঙ্গলেই বল, এখানে সর্বত্র মৃত্যু ওৎ পেতে আছে। পরিক্রমাকারীকে নর্মদামায়ীই রক্ষা করেন। সর্বদা মায়ীকে স্মরণ করে পথ চলবে।

বেলা বোধ হয় বারটা নাগাদ মার্তণ্ডদেব যখন মধ্যগগনে, তখন আমরা এমন এক স্থানে এসে পৌঁছলাম যেখানে পথের ধারেই একটা অশ্বত্থ গাছের গায়ে কতকটা কাটা কাটা দাগ দেখতে পেলাম। আমার মনে পড়ে গেল, নাগফণী সম্প্রদায়ের সাধুদের সঙ্গে সেবারে যখন চব্বিশ অবতারের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন ঘরে ফেরার আনন্দে উন্মত্ত হয়ে এক সাধু অহেতুক হাতের টাঙ্গি দিয়ে এই গাছটাকে কুপিয়ে ছিল। এত দিনেও সেই চটানো ছাল নূতন করে গজিয়ে ওঠেনি। আমি সচ্চিদানন্দজীকে সেই কথা জানালাম। তিনি বললেন — হ্যাঁ, দু একটা পাকদণ্ডীর বাঁক বাদ দিলে আমরা সেই একই পথ দিয়ে এলাম বলতে হবে। বর্ষায় গাছপালা আরও ঘন হয়ে যাওয়ায় তুমি সেই একই পথকে চিনতে পার নি।

আরও ঘন্টাখানিক চলার পর একটা পাকদণ্ডী দেখিয়ে বললেন — এই পাকদণ্ডী পথে ডান দিকে বেঁকে গেলেই সীতামায়ীর বনের অভ্যন্তরভাগে গিয়ে ঢুকতে পারবে। এই পাকদণ্ডীর প্রারম্ভস্থলই হল ভেটাখেড়া জঙ্গলের শেষভাগ এবং সীতাবনের প্রারম্ভস্থল। ঠিক একটা

জংশনের মত। ঐ অদূরেই দেখ নর্মদা কলকলনাদে বয়ে যাচ্ছেন। এখান থেকে উৎরাই-এর পথে নেমে গেলেই উপত্যকা অঞ্চল পাবে। ভাল করে চেয়ে দেখ, ঐ চব্বিশ অবতারের মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। আর আমার এগিয়ে যাবার হুকুম নেই। এবার আমি বিদায় নেব। তুমি সকাল থেকে কিছু খাও নি, স্নানও করনি। কমণ্ডলুর জলে হাত মুখ ধুয়ে এস, এইখানে বসে আমরা খেয়ে নিই। বিকালে চব্বিশ অবতারের ঘাটে পৌঁছে ভাল করে স্নান করবে। আজ রাত্রিটা ঐখানে থাকলেই ভাল করবে। আমি বললাম, আর কিছুটা গেলেই ত নর্মদার তীরে পৌঁছে যাবো। ওখানে গেলে স্নান করতে পারব, আসুন না ঐখানে যাই।

— লেকিন গুরুজীকা হুকুম নেহি।

— আপনি ত চব্বিশ অবতারের পাগলা সাধু অর্থাৎ মহাত্মা সোমানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আপনি আমার সঙ্গে চলুন না, চব্বিশ অবতার পর্যন্ত, তাঁর দর্শন পেলে খুবই আনন্দের ব্যাপার হবে। সেখানে রাত কাটিয়ে সকালে উঠেই ফিরে যাবেন ধাবড়ী কুণ্ডে।

— নেহি জী, হুকুম নেহি।

— সকাল ছ'টার যাত্রা করে এখানে পৌঁছতেই বেলা একটা বেজে গেল তার মানে সাড়ে ছ'ঘন্টা আমরা ক্রমাগত হেঁটেছি। আপনি আধ ঘন্টার মধ্যে এখান থেকে যাত্রা করলেও রাত্রি ৮টার আগে কিছুতেই ধাবড়ী কুণ্ডে পৌঁছতে পারবেন না। দিনের বেলা যত দ্রুত আমরা হাঁটতে পেরেছি সন্ধ্যা হলে অত দ্রুততালে আপনার পক্ষে হাঁটা সম্ভব হবে না। পথ দুর্গম ও বিপদসংকুল, আমিই বা আপনাকে একা ছেড়ে দিয়ে কিভাবে স্থির থাকব?

— হুকুম এ্যায়সাই হ্যায়। এ্যাতনা দূর তক্ আপকা সাথ আনেকা লিয়ে গুরুজী হুকুম জারী কিয়া থা। এই বলে তিনি হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন — মেরে লিয়ে আপ্ ফিকর মৎ করো। অভি থোড়া কুছ পা লেও। এই বলে তিনি ঝোলা থেকে নারকেল পেয়ারা এবং খোয়া বের করে শালপাতায় সমান দুভাগ করে নর্মদার দিকে তাকিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে থাকলেন,—

ওঁ গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণেসিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গা ফেণসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি।
সোহয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা॥

অর্থাৎ যে পশুপতির গাত্র ভস্ম দ্বারা শুভ্র, যাঁর হাসি শুভ্র, যাঁর হস্তের নরকপাল শুভ্র, খট্টাপদাকার নরকপালযুক্ত দণ্ডটিও শুভ্র, যাঁর বৃষব শুভ্র এবং মস্তিকের চন্দ্র শুভ্র, এইরূপে যিনি সর্বশুভ্র, তিনি আমাকে সর্বদা পাপক্ষয়রূপ বিভব প্রদান করুন।

এইভাবে শিবস্মরণের পর খেতে আরম্ভ করলেন। আমিও খেতে লাগলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের খাওয়া শেষ হলে তিনি বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, আপনি জ্ঞানের জীবন্ত বিগ্রহ, আপনার কাছে যে কত জেনেছি শিখেছি তার ইয়ত্তা নেই, আপনার কাছে থাকতে থাকতে কত যে শঙ্কা নিরসন করে নিয়েছি, তা বলে বোঝাতে পারব না। আপনাকে দেখলে এবং আপনার বাণীবচন শুনলেই স্বতঃই প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগে। এইমাত্র আপনার শিবস্মরণ মন্ত্রটি শুনেও আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, জাগল যদি তাও শেষ হগে, এ জন্মে আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। আশীর্বাদ করুন নর্মদামায়ীর কৃপায় আমার

সকল জিজ্ঞাসার যেন সমাধান ঘটে। এই বলে আমি তাঁকে প্রণাম করার জন্য নত হওয়ার চেষ্টা করতেই আমার হাত ধরে বসিয়ে দিলেন এবং নিজেও বসে পড়লেন। বললেন — লেকিন্, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি আধঘন্টা দেরী হয়, তাতে আর আমার কতটুকু কষ্ট হবে? রাত্রি আটটায় পৌঁছব। তুমি তোমার প্রশ্ন নির্দ্ধিধায় জিজ্ঞাসা কর, না হলে আমিও স্বস্তি পাবো না।

মহাত্মার আশ্বাস পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এইমাত্র আপনার উচ্চারিত মন্ত্রে শুনলাম, আপনি মহাদেবের সম্বন্ধে বললেন — গাত্রং ভস্মসিতং বেদব্যাস প্রণীত 'বেদসারশিবস্তোত্রম'-এ পাই ,'বিভুং বিশ্বনাথং বিভুত্যঙ্গ ভুষম্' অর্থাৎ যিনি বিভু-বিশ্বনাথ, ভস্ম যাঁর অঙ্গের ভূষণ, স্বয়ং বশিষ্ঠদেবও, 'দারিদ্র্যদহন স্তোত্রম্' নামক বিখ্যাত স্তবে শিব সম্বন্ধে বলেছেন — 'চর্মাম্বরায় শবভস্ম বিলেপনায়' অর্থাৎ তিনি চর্মাম্বর এবং অঙ্গে শবভস্ম বিলেপন করে থাকেন, অর্ধনারীশ্বর স্তোত্রেও পাচ্ছি — কস্তুরিকা চন্দন লেপনায়ৈ শ্মশানভস্মাঙ্গ বিলেপনায় অর্থাৎ যিনি (গৌরীরূপ অর্ধাঙ্গে) মৃগনাভিসহ চন্দন লেপন করেছেন এবং শিবরূপ অর্ধাঙ্গে শ্মশানভস্মরূপ অঙ্গলেপ মেখেছেন ইত্যাদি। এই শ্মশানভস্মের অর্থ বা তাৎপর্য কি? মহাদেব স্বয়ং বিশ্বম্ভর এবং বিশ্বেশ্বর হয়েও জগতে এত সুস্নিগ্ধ এবং সুগন্ধিযুক্ত অঙ্গরাগ থাকতেও তিনি গায়ে ছাই মাখেন কেন?

— লেকিন, ভস্ম শব্দের অর্থ ত তুমিও জান, সবাই জানে। অগ্নিতে দগ্ধীভূত হবার পর যে দেহাবশেষ পড়ে থাকে তাকেই বলা হয় ভস্ম বা ছাই। মতিচ্ছন্ন কামদেব ধ্যানমগ্ন ধূর্জটিকে কামচঞ্চল করার জন্য, তাঁর প্রতি যে কামশর নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই সময় অকালে ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় তাঁর তৃতীয় নেত্র হতে যে অগ্নি উদ্ভূত হয়েছিল তাতেই কামদেব ভস্মীভূত হন। কামদেবের পত্নী রতিদেবীর বিলাপে আশুতোষ পরে বিচলিত হয়ে করুণাবশে আবার কামদেবকে পুনর্জীবিত করেন এবং কৃপা ও স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ কামদেবের দেহাবশেষ নিজের অঙ্গে লেপন করে নেন — ললাটচক্ষুঃসম্ভূতো ভস্মাকার্ষীন্মনোভবং। শাস্ত্রে আছে —

মহাদেবোঽথ তদ্ভস্ম মনোভব শরীরজং।
আদায় সর্বগাত্রেষু ভূতিলেপং তদাকরোৎ॥

মনোভব, মন হতে জাত হন যিনি অর্থাৎ কন্দর্পের দেহাবশেষ নিয়ে নিজের গায়ে লেপে নিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন — আজ থেকে ভক্ত অভক্ত সকলের দেহাবশেষই আমার শ্রেষ্ঠ অঙ্গভূষণ, যারা আমার পূজা করবে, তারা ভস্মবিভূষিত হলে আমি প্রসন্ন হব। এই জন্যই আমাদের 'আহ্নিকতত্ত্বম্' গ্রন্থে আছে — বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া। 'পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাৎ তস্য ফলপ্রদঃ — ভস্মত্রিপুণ্ড্র এবং এবং রুদ্রাক্ষমালা ধারণ না করে শিবপূজা করলে তা তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না। প্রভু বিশ্বেশ্বর প্রেমবশে ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহের স্মারক চিহ্ন হিসাবে ভস্মকেই নিজের শরীরে শ্রেষ্ঠ অঙ্গলেপ করে নিয়েছেন বলে তাঁর ভক্তরাও প্রভুর যা প্রিয় সেই ভস্ম এবং রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করে থাকেন। ভস্মের নিজস্ব একটা বস্তুগুণও আছে। ভস্ম দেহমল শোধন করে থাকে। ভস্মমাখাকে আগ্নেয় স্নান হিসাবে ধরা হয় — যথা, ভস্মম্রক্ষণং সপ্তবিধস্নানান্তর্গতাগ্নেয়স্নানং। যামলগ্রন্থের নির্দেশ — আগ্নেয়ং

ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতং ইত্যাদি। সাতরকম স্নানের মধ্যে আগ্নেয় স্নানই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই স্বয়ম্ভূ ভস্মলেপনরূপ আগ্নেয় স্নানকে নির্বাচন করে নিয়েছেন।

আরও একটু গুহ্যতত্ত্ব শোন। 'ভস্ম' শব্দটিতে ভ ও স্ম এই দুটি অক্ষর আছে। 'স্ম' ক্রিয়াপদে অতীতকালের বাচক। সৃষ্টির আদি হতে এ পর্যন্ত কালে কালে কল্পে কল্পে যত জীবেরই দেহাবসান ঘটেছে, ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে সকলেরই ভস্ম পুনরায় সৃষ্টির বীজ স্বরূপ ভক্তবৎসল বিশ্বেশ্বর নিজের কাছে ধরে রেখেছেন। পিতা যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম অর্থে সতত পুত্রকে বুকে নিয়ে শান্তি পান, পুত্র গত হলে পুত্রের ব্যবহৃত কোন স্মৃতিচিহ্নকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, তেমনি পরমপিতা শিবসুন্দর তাঁর ভক্তের দেহাবশেষকে শ্রী অঙ্গের ভূষণ করে তাঁর অপার ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিচ্ছেন। ভস্মের 'ভ' বা ভাবের 'ভ' সম্বন্ধে আরও একটি গুহ্যতত্ত্ব বলছি শোন। এটি স্বাধ্যায়ের বস্তু। মহেশ্বর স্বয়ং মহেশ্বরীকে 'ভ' কারের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন।

ভকারং শৃণু চার্বঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
মহামোক্ষপ্রদং বর্ণং তরুণাদিত্যসংপ্রভং॥
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং প্রিয়ে।
আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্তং ভকারং প্রণমাম্যহং।

শৈবাগমের 'বর্ণোদ্ধারতন্ত্রং' হতে এই শ্লোকটি উদ্ধার করে তোমাকে শোনালাম। চারু + অঙ্গী = চার্বঙ্গী, সম্বোধনে চার্বঙ্গি। এর অর্থ চারু (সুন্দর) দেহধারিণী। মহাদেবীকে সম্বোধন করে মহাদেব বলছেন, 'ভ' — কার হচ্ছে পরমকুণ্ডলী ★; মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নার যে অংশটিকে আশ্রয় করে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মনিপুর অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা প্রভৃতি সাধারণ যোগিগণের অনুভূত যে যঠ্চক্র আছে , তার নাম অপরা সুষুম্না। আজ্ঞাচক্র হতে ব্রহ্মারন্ধ্রের দিকে সুষুম্নার যে অংশটি গেছে তার নাম উত্তরা সুষুম্না। অপরা সুষুম্নার পথে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন। আর উত্তরা সুষুম্না পথে যে শক্তির জাগরণের ফলে মোক্ষদ্বার বা কৈলাশ পর্যন্ত সাধকের গতি হয় তার নাম 'পরমকুণ্ডলী' মহাদেব 'ভ'-কারের দ্বারা এই পরাকুণ্ডলীকে সূচিত করছেন, বলছেন — এই 'ভ' মহামোক্ষপ্রদ, তার প্রকাশ সূর্যের মত তেজোময়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের শক্তি এতে নিহিত। ভস্মবিভূষণের দ্বারা মহাদেব গুহ্যতত্ত্ব বিশারদ মরমী সাধকের দৃষ্টি আর্কষণ করছেন পরাকুণ্ডলীকে জাগ্রত করে উত্তরা সুষুম্নার পথে এগিয়ে যেতে। উদ্দীপ্ত করছেন শিবময় হয়ে যেতে। এই হল শিবের ভস্ম ধারণের রহস্য।

এই পর্যন্ত বলে মহাত্মা আমার চিবুক স্পর্শ করে বললেন — ক্যা, আভি খুশ্ হ্যায় তে ? আভি চল্ পড়ে। তিনি উঠে দাঁড়াতেই আমিও উঠে পড়লাম। দণ্ডায়মান অবস্থাতেই বললাম, খুশী ত বটেই, আপনার কাছে যে এই তত্ত্বটি শুনতে পেলাম, এ আমার মহাসৌভাগ্য। তবে আপনার উত্তরটি শিবতত্ত্ববেত্তা যোগী সম্বিদানন্দজীর মতই হল একলিঙ্গস্বামীর 'রসরাজ বা রসিকরাজ' সম্বিদানন্দজীর মত হল না।

দু'তিন মিনিট চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বলতে লাগলেন --

★ উত্তরা সুষুম্না ও পরকুণ্ডলীর তত্ত্ব বিশদভাবে জানতে হলে লেখক প্রণীত 'পিতৃত্রৌ' নামক গ্রন্থের দশম পৃষ্ঠায় 'চিত্রপরিচিতি ও তৎপ্রসঙ্গে' পড়ে দেখুন।

একাভার্যা সমররসিকা নিম্নগা চ দ্বিতীয়া।
পুত্রো জেষ্ঠৌ দ্বিরদবদনঃ ষন্মুখোহতঃ কনিষ্ঠঃ।
নন্দী ভৃঙ্গী চ কপিবদনং বাহনং পুঙ্গবেশঃ,
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ।।

একভার্যা ভালবাসে করিবারে রণ
দ্বিতীয়টি নিম্নগামী তায় সর্বক্ষণ,
জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশের হস্তিমুখ আর,
কনিষ্ঠ কার্তিক যেটি ছটি মুখ তার,
নন্দীর ভৃঙ্গীর মুখ বানরের প্রায়
বাহন গরুটি বটে দুধ নাই তায় —
এসব দুঃখের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া
ছাই ভস্ম মাখে শিব পাগল হইয়া।।

স্বভাবকবি এই মধুর শ্লোকে শিবের ভস্মধারণ তত্ত্বকে রসস্নিগ্ধ করে বললেন — প্রায় দুটো বাজতে যায়, আর তোমার বা আমার কারও অপেক্ষা করা চলে না। উংরাইয়ের পথে কিছুদূর গেলেই তুমি নর্মদাতটের উপত্যকা অঞ্চল পাবে। ওঁকারেশ্বর পর্যন্ত পথ তোমার চেনাই আছে। নিমাড় জেলা অতিক্রম করে পরে ইন্দোর জেলায় প্রবেশ করবে। মা নর্মদাকে স্মরণ করতে করতে এগিয়ে যাও শূলপাণির ঝাড়ির দিকে। আর একটা কথা। পরিক্রমার অন্তে আর কোথাও অপেক্ষা কোর না। বাড়ী ফিরে যাবে। তোমার মা তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে প্রায় পাগল হতে বসেছেন।

আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। তিনি আমার বাঁ হাতটা তাঁর ডান হাতে ধরে নিয়ে উপরের দিকে তুলে উদাত্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন —

ওঁ দেবানাং ভদ্রা সুমতিঋজুয়তাম্
দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্ততাম্।
দেবানাং সখ্যমুপসেদিমা বয়ং
দেবা ন আয়ু তিরন্ত জীবসে।।

দেবতারা তাঁদের ভদ্র প্রসন্নতায় আমাদের জীবন দীপ্ত করুন। তাঁদের সৌম্য প্রসাদ আমাদের চারিদিকে বিরাজ করুক। আমরা যেন দেবতাদের সখ্যলাভ করি এবং তাঁরা আমাদের পরিপূর্ণ জীবনের জন্য দীর্ঘায়ু প্রদান করুন। ওঁ স্বস্তি।।

মন্ত্রপাঠের পর আর তিনি একমিনিটও অপেক্ষা করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন। দু'মিনিট স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুকের ভেতরটা যেন তোলপাড় করছে। মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে যুক্তকরে প্রণাম নিবেদন করে নিজের গাঁঠরী ইত্যাদি তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম চব্বিশ-অবতারের মন্দির চূড়া লক্ষ্য করে।

লক্ষ্য শূলপাণির ঝাড়ি

মহাত্মা সচ্চিদানন্দজী চলে যাবার পর নিজেকে বড় অসহায় বোধ হল। ধাবড়ী কুণ্ডে আড়াই মাস কাল বড়ই স্বচ্ছন্দে কাটল। একলিঙ্গস্বামীর তপোবন, গুরুগতপ্রাণ অভয়ানন্দজী, বিশেষতঃ সচ্চিদানন্দজীর স্নেহময় সান্নিধ্য আমার একে একে মনে পড়তে লাগল। গাঁঠরী

কমণ্ডলু এবং লাঠি হাতে এগিয়ে চললাম। কাঁধের ঝুলিতে অভয়ানন্দজী প্রদত্ত কন্দমূল সম্বিদানন্দজী দিয়ে গেছেন, আড়াই মাস কাল সুখময় পরিবেশে থাকার পর এখন সবই যেন সবই যেন ভার লাগছে। দ্রুত হাঁটিতে পারছি না, পা দুটো যেন ভারী হয়ে গেছে। পার্বত্যপথে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, বর্ষার জল পেয়ে পাথরের খাঁজে খাঁজে লতাগুলো বেড়ে গেছে, ছোট বড় পাথর ঢেকে গেছে। নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে হাঁটছি, কেবলই ভেসে উঠছে সম্বিদানন্দজীর মুখখানা। কেবলই মনে হচ্ছে সম্বিদানন্দজীর সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার কোন পূর্বজন্মের সম্বন্ধ ছিল, না হলে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর এত অযাচিত স্নেহ পেলাম কি করে? কিছুতেই চোখের জল বাগ মানছে না। আমি গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে চলেছি —

প্রভু! তোমার নেই ত কোন নাম
তবুও করি প্রণাম।
নামী অনামী সবই তুমি
অসীম তোমার দাম।
তোমার নেই ত কোন রূপ
(তবু) জ্বালাই প্রাণে পূজার ধূপ —
রূপে অরূপে বিরূপে তুমি
মিলনে বিরহে অপরূপ পরিণাম।
তোমার নেই ত কোন শেষ
নেই ত কোন সুরু
আমার জনম মরণ তোমার হাতে
তাই তো তুমি গুরু !
তোমার নেই তো কোন কিছু
তবুও ছুটছি তোমার পিছু
তুমি শূন্য, তুমি পূর্ণ
তোমার ত হ্যায়! নেই ত কোন বিরাম।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, আমার এই গানের কোন মাথামুণ্ডু নেই। 'গাছ' তার তলায় 'আছ' তার পরেই 'মাছ' দিলেই যেমন কবিতা হয়ে যায় না কিংবা আধুনিক গানে যেমন চাঁদ উঠেছিল গগনে, মিলনের লগনে। বিরহেতে সবই ফাঁকা, মেঘ সেজেছে চাকা চাকা। সুর সংযোগে ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে এইটা গাইলেই যেমন সমঝদারদের কাছে বাহবা পাওয়া যায়, তেমনি আমার গানের মুন্সিয়ানাটাও সেইরকম। চাঁদ ত গগনেই উঠে থাকে, কারও পুঁই মাচায় যেমন তা উদিত হয় না, তেমনি আমিও যে মনের খেয়ালে রূপ অরূপ বিরূপ অপরূপ ইত্যাদি অনুপ্রাস সাজিয়ে গান রচনা করলাম, তারও দশা এই রকম। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে, মানুষের জীবনে কখন কখন এমন মুহূর্ত আসে যখন স্ফূর্তিতে বিষাদে স্বতোৎসারিত ভাবে মনের মধ্যে গানের ঝঙ্কার গুণগুণিয়ে ওঠে।

-- আপ্ কাঁহাসে আতে হৈঁ। আপ্ পরিক্রমাবাসী হৈ? আজ এহি গাঁও মেঁ চার পাঁচটো চিতা জঙ্গলসে আকর হামলা কিয়া হ্যায়। হোঁশিয়ার সে জায়েগা।

আপনমনে হাঁটছিলাম। বারবার সম্বিদানন্দজীর স্নেহময় সদানন্দ মুখখানা মনের দর্পণে

ভেসে উঠছিল। লোকটির কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। নর্মদার উত্তর তটস্থ এই পার্বত্য পথের বেশ কতকটা জুড়ে সারি সারি তাল ও শালগাছ রয়েছে। আমি সেই পাহাড়ী ভাইকে 'সুক্রিয়া' জানিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। গতবারে যখন এখানে এসেছিলাম, তখন কারও মুখে হিংস্র জন্তুর উপদ্রবের কথা শুনিনি। কারণ জঙ্গল এখান থেকে বহুদূরে। যাই হোক, আমি তাড়াতাড়িই হাঁটতে লাগলাম। সন্ধ্যার আগেই চব্বিশ অবতারে পৌঁছে যাওয়াই ভাল। বর্ষার জলে নর্মদা এখন ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। কূল ছাপিয়ে নর্মদা বয়ে চলেছেন কলকলনাদে। সূর্যরশ্মি এসে পড়ায় নর্মদা গতিপথকে দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন একটি রূপার চওড়া পাত পড়ে আছে।

বাঁক ফিরতেই দেখতে পেলাম দূরে একটি চিতাগ্নি জ্বলছে। বুঝলাম, কোন পুণ্যবান এই উত্তরায়ণকালে মহাপ্রয়াণ করেছেন, তাঁরই শবদাহ হচ্ছে নর্মদার পবিত্রতটে। কাছাকাছি আসতেই শব স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। যাঁরা শবদাহ করছেন তাঁদের প্রত্যেকের গলায় উপবীত দেখে এবং শবদেহকে দক্ষিণ শিরস্ক দেখে বুঝলাম দেহটি ব্রাহ্মণদেহ ত বটেই তবে কোন সামবেদী ব্রাহ্মণের। কারণ ঋগ্বেদী, যজুর্বেদী অথবা অথর্ববেদী ব্রাহ্মণের হলে শবদেহকে উত্তর শিরস্ক করে দাহ করা হত। চিতার উপর শবদেহ উপুড় করে শোয়ানো আছে, বুঝলাম কোন পুরুষদেহেরই সৎকার করা হচ্ছে, নারীদেহ হলে চিৎ করে শোয়ান থাকত। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। এই রকম একটি বিয়োগান্তক দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে কারও ভাল লাগার কথা নয়, আমার পক্ষে ত নয়ই, তবুও নর্মদাতটের শবদাহের একটি বিশেষ পদ্ধতি দেখে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। "বল হরি হরিবোল" কিংবা "রাম নাম সত্য হ্যায়" বলে শববহন ও শবদাহকালে যে বিকট চিৎকার অন্যত্র করা হয়, এইখানে সেইরকম কোন রক্ত হিমকরা উৎকট শব্দ শোনা যাচ্ছে না। চারজন ব্রাহ্মণ সরাতে ঘি নিয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করতে করতে চিতার ওপর ছিটিয়ে দিচ্ছেন। বেদমন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে আমি গাঁঠরী ইত্যাদি রেখে একটু দূরে বসে পড়লাম।

শবদাহকারীরা বিশুদ্ধ স্বর ও ছন্দে চিতাতে ঘৃতপ্রোক্ষণ করতে করতে বলছেন—

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেযুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্॥

(ঋ ১০ম/১৪/৭)

আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে পথ দিয়ে, যে স্থানে গিয়েছেন, তুমিও সেই পথ দিয়ে সেইস্থানে যাও। ★ যম ও বরুণ যেখানে স্বধা প্রাপ্ত হয়ে আনন্দে আছেন। হে প্রেত! তুমি সেখানে গিয়ে তাঁদেরকে দর্শন কর।

সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন ইষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায় অবদ্যাম্ পুনঃ অস্তম্ এহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ॥

(ঋ ১০ম/১৪/৮)

বিদেহীর পুত্রগণ প্রার্থনা করছেন — তুমি পরমব্যোমে গিয়ে পিতৃপুরুষের সঙ্গে মিলিত

★ যম – ঋগ্বেদোক্ত যম পৌরাণিক যম নন। নরকের অধিপতিও নন। ঋগ্বেদের যম পুণ্যকর্মের ফলদাতা। সুখবিধান কর্তা। ঋগ্বেদের ১০ম ও ১৭শ সূক্তে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উচ্চার্য মন্ত্রগুলিতে যমকে যজ্ঞের ভাগী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হও, মিলিত হও যমের সঙ্গে। তোমার এ জীবনের অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্মের সঙ্গে। কর্মময় দেহত্যাগে তুমি পরলোকে প্রবেশ করে উজ্জ্বল দেহ প্রাপ্ত হও।

পুষা ত্বা ইতঃ চ্যাবয়তু প্র বিদ্বান্ নষ্টপশুঃ ভুবনসা গোপাঃ।

স ত্বা এতেভ্যঃ পরিদদৎপিতৃভ্যোহগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদা ত্রিয়েভ্যঃ।

পুষণ্দেব যিনি জগতের জ্ঞানী এবং রক্ষাকর্তা, তিনি তোমাকে এ স্থান হতে উত্তম স্থানে নিয়ে যান । তিনি তোমাকে ইহলোক হতে পিতৃগণের নিকট বহন করুন। অগ্নিদেব তোমাকে দয়ালু দেবতাবর্গ এবং দিব্য পিতৃপুরুষদের নিকট গিয়ে সমর্পণ করুন।

ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা, সোমায় পিতৃমতে স্বাহা।। (যজুঃ ২৯ কণ্ডিকা)

হে অগ্নি! তুমি কব্য বহন করে থাক, অতএব পিতৃগণের উদ্দেশ্যে এই কব্য তোমার নিকট সমর্পণ করা হচ্ছে, হে সোম! তুমি পিতৃগণের অধিষ্ঠান, অতএব তোমার উদ্দেশ্যে এই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে।

আমার আর বসে থাকলে চলবে না। সূর্য পশ্চিমে অস্তাচলে ঢলে পড়েছেন। বিকেল বোধহয় পাঁচটা হবে। শবদাহের এই রকম শুচিসুন্দর ভাব-গম্ভীর অনুষ্ঠান এর আগে আমি কখনও দেখিনি। মনে হল যেন আমি ''মড়া-পোড়ানো'' দেখলাম না, দেখলাম একটি পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান। বেদে যে পুরুষ-মেধ যজ্ঞের কথা আছে, আমি যেন সেই পুরুষ-মেধ যজ্ঞই আজ নিজের চোখে দেখতে পেলাম।

যাইহোক, পরলোকগত আত্মাকে নমস্কার জানিয়ে আমি ঝোলা কম্বল নিয়ে হাঁটতে লাগলাম চব্বিশ অবতারের ঘাটের দিকে। কিছুক্ষণ এগিয়ে যেতে পেলাম সেই নাগকর্ণী সম্প্রদায়ের মহেশগিরিদের ঘাট। সেই ঘাট পেরিয়ে প্রায় পনের মিনিট হাঁটার পরেই চব্বিশ অবতার মন্দিরের ঘাটে পৌঁছে, ঝোলা গাঁঠরী নামিয়ে রাখলাম। সারাদিন স্নান করিনি। প্রায় সকাল থেকেই হেঁটেছি আজ, হাত পা ব্যথায় যেন ভেঙে পড়ছে। নর্মদার জলে নেমে স্নান করতে লাগলাম। শ্রান্তিহরা ক্লান্তিহরা নর্মদার স্নিগ্ধ জলধারায় সব ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল। স্নান জপাদি সেরে ভাবতে লাগলাম এখন কি করা যায়? মন্দিরেই যাবো, না, মহাত্মা সোমানন্দজীর ঝোপড়ায় গিয়ে রাত্রি কাটাবো? তিনি যদি এখন না থাকেন? থাকলেও যে পাগলা সাধু তাঁর কাছে থাকতে দেবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই। তাড়িয়ে দিতে পারেন। তা হোক, তবুও ত তাঁর আর একবার দর্শন পাবো। এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই আমি এগিয়ে চললাম তাঁর কুটীরের দিকে। যখন তাঁর কুটীরে গিয়ে পৌঁছিলাম, তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। কুটীরের মধ্যে কোন সাড়া শব্দ নেই। কয়েকবার 'হর নর্মদে', 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিলাম, তবুও কোন সাড়া নেই। গাঁঠরী রেখে ঝোলা থেকে মোমবাতি এবং দিশলাই বের করে মোমবাতিটা জ্বাললাম। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে চর্কট মর্দন অবস্থা। বর্ষার বৃষ্টি পড়েছিল, এখনও ভিজে মাটি, হয়তো গরু মহিষ ঢুকেছিল, তাদের পায়ের চাপে কাদামাটি শুকিয়ে এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেছে। কিছু ছেঁড়া-ন্যাকড়া এবং কয়েকটা মাটির ভাঁড় মেঝের উপর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে। কুটীরের দরজাটা বাইরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি কুটীর থেকে বেরিয়ে এলাম।

মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে ঝোলাতে রাখছি, এমন সময় চমকে উঠলাম একজনের কণ্ঠস্বরে, আরে ভেইয়া সাবজী! হম্ ত পহেলে দফেই আপ্‌কো হোশিয়ার কর্ চুকা না, ইধর্ টিকাও

ডর হ্যায়। কুটীর মেঁ কেঁও ঘুসে থে। ওহি পাগলাবাবা করীব্ তিন মাহিনা ইধর নেহি হ্যায়, কাঁহি ভাগ্ গয়া হোঙ্গে। কথা বলতে বলতে লাঠি হাতে সামনে সে দাঁড়ালেন বিকেলে দেখা সেই লোকটি। একই কর্কশ কণ্ঠস্বর! আমাকে বললেন — আভি চলা যাইয়ে মন্দরমেঁ, উধর কাঁহি পড়া রহেগা। আমি আরেকবার তাঁকে "সুক্রিয়া" জানিয়ে মন্দিরের পথ ধরলাম।

মন্দিরে যখন এসে পৌঁছলাম তখন আরতি হচ্ছে। আমাকে মন্দিরের ভেতর হতে লক্ষ্য করে দীনদয়াল দৌড়ে আমার কাছে ছুটে এল। তাকে এসময় এখানে দেখতে পাবো আশা করিনি। সে হাসি মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপ্‌কো রেবা-সংগম তক্ ক্যা পরিক্রমা হো চুকা? আপ্ ক্যা লৌটকে আতা হৈ? আমি সংক্ষেপে দীনদয়ালকে সব জানালাম। জানালাম, কিভাবে নাগাদের সঙ্গে ভেটাখেড়া জঙ্গল অতিক্রম করে আসার সময় ভুল করে ধাবড়ী কুণ্ড এড়িয়ে এসেছিলাম এবং ওঁকারেশ্বরে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে আসার সময় কিভাবে একজন মহাপুরুষের নির্দেশে ধাবড়ী কুণ্ডে গিয়ে বর্ষার জন্য আড়াই মাস আটকে গেছলাম ইত্যাদি। রামদাসজীর কুশল সংবাদ তার কাছে জানতে চাইলাম। দীনদয়াল জানাল — চাররোজ হুয়া উনোনো উনকা গুরুস্থান চিত্রকূটমেঁ দো মাহিনাকে লিয়ে চলা গয়ে। উন্‌কা যানেকে বাদ হম্ ভি ইধর আ গয়ি।'

দীনদয়াল আমার গাঁঠরী ইত্যাদি নিয়ে মন্দিরের পেছন দিকে তাদের আবাসস্থলে আমাকে নিয়ে এল। পূর্বে যে কামরায় আমি রামদাসজীর এখানে থাকাকালে বাস করে গেছলাম, সেই কামরাতেই সে আমার থাকার বন্দোবস্ত করে দিল। আমি হাত পা ধুয়ে কম্বল পেতে বসে আছি এমন সময় মন্দির থেকে তার বাবা ও কাকা ফিরে এলেন। আমাকে দেখে তাঁরা খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। দীনদয়াল আমার পুনরায় আসার মূলে যে বিভ্রাট, তার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জানাল। সব শুনে দীনদয়ালের বাবা বললেন — আমিও একবার এক মহাত্মার সঙ্গে ধাবড়ী কুণ্ডে গেছলাম বছর পাঁচেক আগে। উদ্দেশ্য ছিল, একটি বাণলিঙ্গ সংগ্রহ। আমি বা আমার সঙ্গী সেই মহাত্মা অনেক চেষ্টা করেও একটি বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করতে পারিনি। কুণ্ডের মধ্যে দেখেছেন ত হাজার হাজার বাণলিঙ্গ অনবরতই জলের ঘূর্ণিতে ঠিকরে ঠিকরে জল থেকে লাফিয়ে উঠছে, তবুও আমরা দুজনেই আপ্রাণ চেষ্টা করেও একটিকেও জাপটে ধরে রাখতে পারিনি; অবশেষে মহাত্মা একলিঙ্গস্বামীর নির্দেশ পেয়ে তাঁর জনৈক দণ্ডীশিষ্য আমার সঙ্গী মহাত্মাকে, তিনি সন্ন্যাসী বলে, তাঁকে একটি বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আমি নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম — আপনারা ধাবড়ী কুণ্ডে গিয়ে তিনদিন যাবৎ কোথায় ছিলেন?

— ওখানে কুণ্ডবাসী সন্ন্যাসীরাই একটি গুহাতে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁরা তিনদিন খেতেও দিয়েছিলেন। দুদিন সকাল সাতটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত আমরা রামনাম জপ করতে করতে জলপ্রপাতের ধারায় অনবরত ভিজতে ভিজতে কুণ্ডের কাছে বসে থাকতাম। জলে ভেজার ফলে যখন কাঁপতে থাকতাম, তখন উপরে উঠে গুহায় ঢুকে যেতাম। তৃতীয় দিনে একজন সন্ন্যাসী বলেন — উপরের গুহায় আমাদের গুরুজী একলিঙ্গস্বামী থাকেন। তিনি আদেশ দিয়েছেন এই সাধুজীকে একটি বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করে দিতে। আমাকে বললেন, আপ্‌তো গৃহী হ্যায়, লালচী ভি হ্যায়, বাণলিঙ্গ লেকর্ ক্যা করেঙ্গা। আপকো লিয়ে শিবনাম রামনাম জপ করনা হি আচ্ছা হ্যায়। তাঁর কথা শুনে আমার

প্রাণে খুবই আঘাত লেগেছিল। আমি নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বুঝতে পারলাম, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মনে খুবই ক্ষোভ আছে। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, ধাবড়ী কুণ্ডে আমি যেসব সন্ন্যাসীকে দেখে এলাম, তাঁদের কারও ত রুক্ষ মেজাজ দেখিনি। কাউকে ত রুক্ষভাষা বলতেও শুনিনি। শিবলিঙ্গ, কেউ যদি একলিঙ্গস্বামীর নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে অভয়ানন্দজী ছাড়া আর তিনি কে হবেন? একমাত্র তাঁরই সঙ্গে ত একলিঙ্গস্বামী নিত্য যোগাযোগ রাখেন। অভয়ানন্দজী ত খুবই দয়ালু ও প্রেমিক প্রকৃতির মহাত্মা। তবে? তবে কে? শিবলিঙ্গ পূজায় ত সবারই অধিকার। আশুতোষের দয়া ত সকলের উপরে সমান। তাছাড়া, ধাবড়ী কুণ্ডস্থিত বাণলিঙ্গগুলির উপর ত ঐ সব সন্ন্যসীকে কেউ একচ্ছত্র অধিকার দিয়ে পাট্টা লিখে দেননি? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মনে সন্ন্যাসী হয়ে কেন ব্যথা দিলেন, তা বুঝতে পারছি না। চার বছর পরেও ব্রাহ্মণ সেই ঘটনা স্মরণ করতে গিয়ে এখনও তাঁর মুখ-চোখ বেদনার্ত হয়ে উঠছে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই, আমার সূক্ষ্মদৃষ্টি নেই বলে ধরতে পারছি না, ধাবড়ী কুণ্ডের সেই সাধু বুঝতে পেরেছিলেন যে ইনি ঘোর পাপিষ্ঠ, তাতেই বা কি আসে যায়? পাপিষ্ঠ বলে ত এঁরই বেশী পতিতপাবন শিবপূজার অধিকার।

পুণ্যবাণে দয়া সে ত দয়া তব নয়,
পাপীরে যে দয়া সেই ত দয়ার পরিচয়!

আমার ঝোলাতে গোটা পাঁচেক বাণলিঙ্গ আছে। আমি সহসা ঝোলাতে হাত পুরে দিয়ে যেন কতকটা অবশ ও বিবশ হয়েই 'খ্যাতা চ তে পতিত পাবনতা হি যস্মাৎ, তস্মাৎ ত্বমে শরণং মম শূলপাণে!' মন্ত্রটি মনে মনে উচ্চারণ করে দীনদয়ালের পিতাঠাকুরের হাতে একটি শিবলিঙ্গ দিয়ে বললাম — 'এই বাণলিঙ্গ আমি ধাবড়ী কুণ্ড থেকেই আনছি। আপনার প্রাণ চাইলে আপনি এটি পূজা করার জন্য নিন।' বাণলিঙ্গটি পেয়ে বুড়োর আর আনন্দ ধরে না। পুনঃপুনঃ সেটিকে মাথায় ও বুকে ঠেকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন আমি এখনই এঁর পূজা করব। আমি বললাম — আপনি যা ইচ্ছে করুন, এখন আমাকে শোবার অনুমতি দিন, আজ সকাল থেকে প্রায় একটানা বারঘন্টা যাবৎ পঁচিশ ত্রিশ মাইল হেঁটে এসেছি। হাত পা ব্যথায় টনটন করছে। কাল সকালেই আমাকে চলে যেতে হবে। আমার কথায় সকলেই শশব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন। দীনদয়াল আমাকে একলোটা গরমজল এবং তার কাকার দেওয়া একটা কবিরাজী ঔষুধের চূর্ণ দিয়ে খেয়ে নিতে অনুরোধ করল। আমি তা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে আমি ব্রাহ্মণের বম্ বম্ ববম্ গালবাদ্য শুনতে পাচ্ছি, তাঁর মানে তিনি সদ্যপ্রাপ্ত বাণলিঙ্গের পূজা করছেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্ন দেখছি, আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই পাগলা বাঙ্গালী সাধু, তাঁর ছড়ানো বিছানো জটা দুলিয়ে দুলিয়ে বলছেন —

আমি নাই, তুমি নাই
আমি তুমি মিশে গেছি
অসীমে হারিয়ে গেছি
ভাষা নাই ভাব নাই
আমি নাই, তুমি নাই।

মিশে গেছে আলো ছায়া —
মিশে গেছে কায়া মায়া।
একাকার হয়ে গেছে,
সব আছে , কিছু নাই।
চাওয়া পাওয়া কারে বলে
সে ত কিছু জানি না।
জপ তপ কারে বলে
সেও ত হায় বুঝি না।
নিত্যানিত্য যারা বোঝে
আসল নকল তারা খোঁজে,
বোঝাবুঝি খোঁজাখুঁজির
আমার কোন নাই বালাই
আমি নাই, তুমি নাই।

'আমি নাই, তুমি নাই' এই গানের রেশ আমার কানে গুণগুণ করে বাজছে, এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ভোর হয়ে আসছে। আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। মহাত্মা সোমানন্দজীকে এই রকম অবস্থায় দেখলাম কেন? অবিকল সেই ছবি, সেইরকম ভাবোন্মাদ অবস্থায়, তবে তাঁর চেহারাটা দেখলাম বেশ আনন্দোজ্জ্বল ও উজ্জ্বল। বুকের ভেতরটা গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। তবে কি তিনি আর ইহজগতে নেই? অপ্রকট হয়েছেন? শেষ তাঁকে দেখেছিলাম সীতামায়ীর বনে। তিনি আমাকে জঙ্গল পেরিয়ে ধাবড়ী কুণ্ডের পথে রেখে এসেছিলেন; গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর কুটীরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখে এসেছি। অল্পদিনের পরিচয়, তবুও তাঁকে অত্যন্ত আপনজন বলে মনে করি। কিছুক্ষণ কেঁদে বুকটা হাল্কা হল। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, এ ত স্বপ্ন, স্বপ্ন-দর্শন সব সময়েই ত সত্য হয় না। মনে কিছুটা জোর এনে নর্মদার ধারে গেলাম শৌচাদি সারতে। নর্মদার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলাম; 'মা! আমার এ স্বপ্ন যেন মিথ্যে হয়।' স্নান শৌচাদি সেরে ফিরে আসতেই দীনদয়ালের পিতাঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি আনন্দে গদ গদ হয়ে বললেন — আপনি আমার মনের অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আজ দয়া করে এখানে থেকে বিশ্রাম করুন। বিহানমেঁ চলা জায়েগা। আমি তাঁকে বললাম, আপনার ভাই গতরাত্রে গরমজলের সঙ্গে যে চূর্ণ খেতে দিয়েছিলেন, বিশ্বাস করুন, তা খেয়ে আমার শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে, কোন অবসাদ নেই। দয়া করে প্রসন্ন মনে বিদায় দিন। আপনার গুরুজী চিত্রকূট থেকে ফিরে এলে তাঁকে এই বাণলিঙ্গটি একবার দেখিয়ে দেবেন।

দীনদয়াল জিজ্ঞাসা করল, 'এবারে আপনি ওঁকারেশ্বরে যাবেন না?'

— না। রেবাসংগমে পৌঁছে যখন দক্ষিণতট দিয়ে ঘুরব, তখন অবশ্যই ওঁকারেশ্বরে যেতেই হবে। সেই সময় তোমাদের আশ্রমে গিয়ে মহাত্মা রামদাসজীর সঙ্গে দেখা করব

এই বলে আমার ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে নিয়ে তাঁদের কাছে বিদায় নিলাম। দীনদয়াল তার দাদা এবং কাকাকে সঙ্গে নিয়ে নর্মদার ধার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। পশ্চিমগামিনী নর্মদার

পাদদেশের দিকে লক্ষ্য রেখে হাঁটতে লাগলাম। নদীর বিস্তার ক্রমশঃ বাড়ছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল পার্বত্যপথে হাঁটছি। সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষভাগ রোদে ঝলমল করছে। উভয় পর্বতের শীর্ষদেশ নীলাভ ঘন বনের শোভা চোখে যেন এক অপরূপ মায়ার কাজল পরিয়ে দিয়েছে। কাছাকাছি যে সব বন চোখে পড়ছে, পুষ্প পল্লবে শোভিত সেইসব গাছের সবুজ আভা দেখে চমকে যাচ্ছি। বর্ষার পর গাছপালায় যেন নবীন প্রাণের ঢল নেমেছে। কোথায় সমতল অঞ্চলে বাজরা জোয়ার বেশ পরিপুষ্ট হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ক্রমে ওপারে দৃষ্টি দিয়ে ভাণ্ডারী তীর্থ এবং এরণ্ডী সংগমের নিশানা চোখে পড়ল। বেলা সাড়ে নটা নাগাদ ওঁকারেশ্বর মন্দিরের ঝক্‌মকে রৌদ্র সমুজ্জ্বল চূড়া দেখতে পেলাম। সেদিকে দৃষ্টি দিতেই মনে হল, কিছুক্ষণের জন্য আমার চোখ ঝলসে গেল। কোটিতীর্থের ঘাটে গিয়ে নর্মদা স্পর্শ করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালাম ওঁকারেশ্বরের উদ্দেশ্যে। নর্মদাতে মুখ চোখ ধুতে গিয়ে সোমানন্দজীর চিন্তায় আবার কাতর হয়ে পড়লাম। বারবার চোখে জল দিয়েও চোখের জলকে বাগ মানাতে পারছি না। বৈদূর্য পর্বতগাত্রে ওঁকারেশ্বরের ধবলশুভ্র বিশাল মন্দিরের স্বর্ণচূড়ার দিকে তাকিয়ে আমার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। আবার চোখে মুখে জল দিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম — ঠাকুর! মহাত্মা সোমানন্দজী যেন ভাল থাকেন।

— আপ্ ক্যা উস্‌পার যায়েঙ্গে? আইয়ে হমারা নাও মেঁ সওয়ারী হো যাইয়ে।

চমকে তাকিয়ে দেখি, এ সেই নৌকা, যে নৌকাতে আমি এ পথেই রামদাসজীর সঙ্গে ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। আমি মাঝিকে বললাম — নেহি ভেইয়া, ইস্ বখৎ হম্ যায়েগা নেহি। নৌকা এগিয়ে যেতেই মন চঞ্চল হল এই ভেবে যে গেলেই হত, যদি ভাগ্যক্রমে মহাত্মা প্রলয়দাসজীর দর্শন পেয়ে যেতাম। হয়ত তিনি পূর্বের মত ওঁকারেশ্বরের মন্দিরেই বসে আছেন। মনে পড়ল তিনি বারবার হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন — 'খবরদার নিজে দেখা করার চেষ্টা করবে না। প্রয়োজন বুঝলে আমি নিজেই দেখা করব'। মনের রাস্ জোর করে টেনে ধরলাম। মনকে শাসন করতে লাগলাম, এত ছিঁচকাঁদুনে হলে পরিক্রমায় বেরিয়েছিলি কেন? ভাব আর উচ্ছ্বাসের গদগদানি ফেনা এত উথলে ওঠে কেন? বাংলার জল হাওয়া আর পলিমাটির গুণেই কি এইরকম কুসুম পেলব মন গড়ে উঠেছে? তবে এইরকম রুক্ষ কঙ্করময় পাহাড়ের পথে মরতে এসেছিলি কেন? নিজের মনেই এইরকম প্রলাপ বকতে বকতে আমি জিদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম পাথর ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে। যেখানেই একটু সমতলভাব দেখতে পাচ্ছি, সেখানেই দৌড়নোর মত করে দ্রুতবেগে হাঁটছি। পথে কতকগুলো গরু মহিষ চরছিল, তাদের তালে ধীরে ধীরে হেঁটে বা আস্তে আস্তে তাদেরকে কাটিয়ে যেতে আমার তর্ সইল না। গরু মহিষের কারও গায়ে ধাক্কা দিয়ে; কারও লেজ মুড়ে, কাউকে লাঠি দিয়ে সরিয়ে আমি ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে হাঁটতে লাগলাম। প্রত্যেকটি গরু মহিষের গলায় ঘন্টা বাঁধা। আমার হুড়োহুড়িতে তাদের মধ্যেও হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ঘন্টাগুলো ঘন ঘন বাজতে লাগল — ঢং ঢং টং টং টুঙ্গ টুঙ্গ ঝুন্ ঝুন্। দুজন রাখাল যুবক আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তব্য করল — " ইয়ে বাবাজী পাগলপন্ কর রহা হৈ। দিমাগ্ বিগড় গয়া"।

আমি তাদের কথায় কর্ণপাত করলাম না। নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে এগিয়ে চললাম।

কোথাও বিন্ধ্যপর্বতের ঢাল ছুঁয়ে কোথাও বা একটু দূরে রেখে নর্মদা এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বিচিত্র গতিপথ কোথাও বা অর্ধচন্দ্রাকারে বয়ে চলেছে। শিলাতটে প্রতিহত হচ্ছে নর্মদার নির্মল জলধারা। দূরে নিশ্চয়ই কোথাও গ্রাম আছে, কিন্তু আমি গোচারণরত সেই দুটি রাখাল যুবক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। নর্মদার জলের শব্দকে এই নির্জন পরিবেশে মনে হচ্ছে যেন বনশ্রীর অনন্ত সঙ্গীত।

এই মনোরম পরিবেশে কিছুক্ষণ বসতে ইচ্ছে হল। কিন্তু মনের ইচ্ছে দমন করে আমি হাঁটতে লাগলাম। চলার আনন্দ যেন আমায় পেয়ে বসেছে। ধাবড়ী কুণ্ডে আড়াই মাস কাল বর্ষার জন্য আবদ্ধ থাকায় সেই আটকে থাকার যন্ত্রনাটা মনের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল। বুঝতে পারছি, মুক্ত আকাশের তলে ঝক্ঝকে রৌদ্রে এই যে অবাধ বিচরণের সুযোগ তাতেই যেন আমি বর্তে গেছি। এ হচ্ছে তারই প্রতিক্রিয়া ! সূর্য যখন মাথার উপরে তখন দূর থেকে একটা শ্বেত মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম। পত্‌পত্‌ করে গৈরিক পতাকা উড়ছে। এই অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে সেগুন গাছের সঙ্গে কতকগুলি শিশুগাছও দেখতে পেলাম। মুণ্ডমহারণ্য পরিক্রমাকালে এইরকম দুচারটে গাছ চোখে পড়েছিল। মহাত্মা শোভানন্দজী আমাকে এই গাছ চিনিয়ে দিয়েছিলেন। শিশুগাছ সাধারণতঃ পাহাড়ে দেখা যায় না, বনে পাওয়াও কঠিন। আমাদের বাংলাদেশে যা শিশুগাছ বলে চলে তা হল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমদানি 'রেইন ট্রি'। যাইহোক এতক্ষণ একজন দেহাতি বৃদ্ধকে নর্মদাতে স্নান করতে দেখলাম। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ভিজে কাপড়েই আমার কাছে উঠে এলেন। আমি তাঁকে ভাঙাভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলাম — ঐ যে দূরে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে ওটি কোন্ দেবতার মন্দির?

— মহেশ্বরজীকা। নর্মদাতটমেঁ ঔর কোঈ দেবতা নেহি। সর্বত্র শিউজী হ্যায়। ইধর আকর ঝাড়ি খতম হো যাতা হৈ। ইসীওয়াস্তে ইহ বহোৎ প্রসিদ্ধ ঔর সিদ্ধস্থান ভি হ্যায়। ইসকা নাম খেড়িঘাট হ্যায়।

এই বলে, তিনি আর আমাকে কোন কথা বলতে না দিয়ে গড়গড় করে বলে চললেন — 'নর্মদা পরিক্রমার মাহাত্ম্য পূর্বে কেউ জানত না। নর্মদা-মহিমার প্রথম প্রচার কর্তা মার্কণ্ডেয় মুনি। মার্কণ্ডেয় মুনি যে সপ্তকল্পান্তজীবী তা বোধহয় আপনি শুনে থাকবেন। কল্পান্তে প্রলয়কালে একবার মার্কণ্ডেয়জী একলা এক কুমারী কন্যাকে অপার সমুদ্রজলে খেলা করতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হন। অন্যান্য কল্পান্তেও পৃথিবীর সব কিছু বিনষ্ট হয়ে গেলেও সেই একই কুমারী কন্যাকে সমুদ্র জলে খেলা করতে দেখে তিনি সেই অদ্ভুত কুমারীর চরণ যুগল ধরে পরিচয় জানবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করতে থাকেন। তখন তিনি নিজেকে শিবপুত্রী নর্মদা বলে পরিচয় দেন এবং একথাও বলেন, যে তাঁর কখনও বিনাশ নেই, তিনি তপস্যায় সিদ্ধিদায়িনী। মহামুনি মার্কণ্ডেয়, নর্মদার মাহাত্ম্য যে সর্বাধিক তা বুঝতে পেরে তিনি পরিক্রমা সুরু করেন, এবং প্রতিঘাট ও সংগমস্থলে অবস্থান করে সেগুলিকে জাগ্রত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম জগতে প্রচার করেন যে নর্মদা পরিক্রমায় তপোসিদ্ধি হয়। সামনে যে মন্দির দেখা যাচ্ছে, জনশ্রুতি (কহানী) এই যে ঐ মন্দিরের শিউজীকে মার্কণ্ডেয় মুনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐখানে এখন একজন বিদ্বান্ তপস্বী বাস করছেন।

তাঁর কথা শেষ হলে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেই মন্দির লক্ষ্য করে হেঁটে চললাম।

আমার পরিক্রমার পথ থেকে কিছুদূরে দেখতে পেলাম একটা রাস্তা চলে গেছে অনুর্বর পার্বত্য প্রান্তরের বুক চিরে শৈলমালা ও অরণ্যানীর দিকে। দূরে দূরে দু'একটা লোকালয় দেখা যাচ্ছে, হয়ত সে সব স্থানে বাজার হাটও আছে।

আধঘন্টাটাক হাঁটার পরেই পৌঁছে গেলাম মন্দিরের কাছে। দেখলাম চারজন সাধু মন্দিরের চত্বরে বসে জপ করছেন। আমি গাঁঠরী ফেলে রেখে মন্দিরস্থ দেবতার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলাম। প্রণাম করে উঠেই দেখি, একজন শ্যামলকান্তি শুভ্রকেশ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ আমার গাঁঠরীটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ছোট ছোট চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। কোমরে একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র জড়ানো আছে। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে পরিষ্কার ইংরাজীতে বললেন — আজ আপনি আমার অতিথি। নিত্য একজন অতিথি সেবা করানো আমার ব্রত। মা নর্মদা আজ আপনাকে জুটিয়ে দিয়েছেন।

— আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখান থেকে মণ্ডলেশ্বর কতদূর? এই পথ ধরে গেলেই শূলপাণির ঝাড়িতে প্রবেশ করতে পারব ত ?

— ঐ দূরেই মায়ানন্দজীর আশ্রম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে এখন কেউ নেই। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মিলিয়ে মাত্র চারজন ঐ আশ্রমে থাকেন। কিন্তু তাঁরা সবাই পরিক্রমায় বেরিয়ে গেছেন, বোধ হয় বর্ষার জন্য কোথাও আটকে গেছেন। তাই ফিরতে দেরী হচ্ছে। আপনি এমনভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, পারলে আজই যেন শূলপাণির ঝাড়িতে পৌঁছে গেলে বেঁচে যান; জানবেন আপনি এখনও ওঁকারের ক্ষেত্রের মধ্যেই আছেন। ওঁকারেশ্বর থেকে মাত্র ন মাইল আপনি এগিয়ে এসেছেন। এখান থেকে আরও আট মাইল হাঁটলে মণ্ডলেশ্বর। সেখান থেকে চার পাঁচ মাইল হেঁটে গেলে মহেশ্বরে গিয়ে পৌঁছাবেন। মহেশ্বর থেকে আরও অনেক মাইল গেলে শূলপাণির ঝাড়ি আরম্ভ হবে। সে পথ এখনও অনেক দূর, অনেক দুর্গম। এখন আপনি মার্কণ্ডেয় মহাদেবকে প্রণাম করে আমার কুটিরে চলুন।

আমি তাঁর নির্দেশমত নর্মদাতে নেমে মুখ হাত ধুয়ে এক কমণ্ডলু জল নিয়ে মার্কণ্ডেয় পূজিত শিবলিঙ্গের পূজা করে ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে তাঁর কুটীরে এসে পৌঁছালাম। কুটীর বলতে খোলার ছাউনি একটি ঝোপড়া, মাথা নুইয়ে ঢুকতে হয়। মাথয় না লেগে যায় এজন্য তিনি বারবার সাবধান করে দিলেন! আমি বললাম, আপনার ঝোপড়াটি ভাল, সাধুর ঝোপড়া এইরকমই হওয়া উচিত। সাধুর ঝোপড়াতে ঢুকতে হলে অহংকে নত করেই প্রবেশ করতে হয় এই শিক্ষাই যেন পেলাম। ঝোপড়ার মধ্যে ছোট ছোট দুখানি ঘর, ঘেরা বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা।

তিনি আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। রুটি এবং শাক সেদ্ধ। তিনি খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন — এ ফকিরের আয়োজন অল্পই, মহাদেব যা জুটিয়ে দিয়েছেন, আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে না।

— আমিও ত ফকির। মা নর্মদা যে এই জুটিয়ে দিলেন এই যথেষ্ট। পরিক্রমায় বেরিয়ে আমি কি রাজভোগের কল্পনা এঁকে রেখেছি নাকি ? তাছাড়া আপনি বিশ্বাস করুন আমার কাছে এই শাক রুটি রাজভোগেরও বাড়া। আমার বাবা বলতেন — ভোজনং গতজীর্ণানি সাদরং অজরামরঃ। রাজভোগ বা শুক্‌নো রুটি সবই ত জীর্ণ হয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আন্তরিক আদর ও আপ্যায়নের বিনাশ নেই।

দু'জনের আহার সমাপ্ত হল। আমি খুব পরিতৃপ্তি সহকারেই খেলাম। খাবার পর দুজনেই অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করতে করতে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে নর্মদা যে তপস্যাভূমি সে সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কিছুটা বললাম। এবার আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রম জানতে চাওয়া অনুচিত, কিন্তু গুরুর আশ্রম-পরিচয় জানতে চাওয়ায় কোন দোষ নেই। তাই আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে দয়া করে আপনার গুরুধারার কিঞ্চিৎ আভাস দেবেন কি? তিনি আমার কথা শুনেই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমাকে বলতে লাগলেন — আমার গুরু ছিলেন তামিলনাড়ুর অধিবাসী, পরম শৈব। তাঁর নাম কোদিক্কারাই স্বামী। তাঁর গুরু ছিলেন তিরুচিরাপল্লীর বিখ্যাত মহাত্মা তায়ুমনবর। আমার গুরুদেব ছিলে সম্পূর্ণতঃ গুরুগতপ্রাণ। গুরুদেব ছাড়া তাঁর কোন স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, ঋদ্ধি-সিদ্ধ বা মহিমার কথা প্রকাশ করতে আমাদের উপর নিষেধ ছিল। সব সময় তাঁর গুরুর মহিমা ও সাধনতত্ত্বই নিরন্তর প্রচার করতে বলতেন। শৈব সিদ্ধান্তের প্রবর্তক শ্রীমৈকন্দদেবর যিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁর ধারাই আমাদের ধারা, তাঁর শিবসাধনার পদ্ধতিই আমাদের জীবনবেদ। শ্রীমৈকন্দদেবরের প্রধান শিষ্য শিবাচার্য শ্রী অরুল্লনন্দীদেব তাঁর গুরুর অনুভূত শিবসত্যকে স্ফুটতর করার জন্য 'শিবজ্ঞান সিদ্ধিয়ার' নামক একখানি শৈবগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাতে শৈবসিদ্ধান্তের তাৎপর্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তানুসারে জগৎ অনাদি এবং সম্পূর্ণ সৎ বলে নিরূপণ করা হয়েছে এবং বদ্ধ জীবাত্মার মুক্তির জন্য শিবের কৃপাকে অনিবার্যভাবে আবশ্যক বলে বলা হয়েছে। আত্মারে পরমশিবে লীন বা একীভূত হয়ে যাওয়াটাই এই সিদ্ধান্ত মতে পরামুক্তি। শ্রীমৈকন্দদেবরজী জীবন্মুক্তির জন্যও শিবের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন। আমার পরমগুরুদেব তায়ুমনবরজী শ্রীমৈকন্দদেবরের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও অদ্বৈতবাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এইভাবে তিনি শৈব সিদ্ধান্ত ও বেদান্তের সমন্বয় করে গেছেন। তাঁর নির্দিষ্ট পন্থাকে 'বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সমরসনন্নেরী' বলা হয়। এই মতবাদ বা সাধনধারার অপর নাম — 'নন্নেরী সন্মার্গ।' এই পথে সাধনা করলে প্রতিনিয়তই শিবের কৃপা আপন জীবনে অনুভব করা যায়।

পরমগুরু পরমশৈব তায়ুমনবরের জীবন কাহিনী বড়ই চিত্তাকর্ষক। তামিলনাড়ুর অন্তর্গত তাঞ্জোর জেলায় বেদারণ্য নামক গ্রামে তায়ুমনবরজী এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শ্রীবল্লার কেডিলিয়প্পা পিল্লে। তাঁদের স্বামী স্ত্রী উভয়েরই আরাধ্য দেবতা ছিলেন তিরুচিরাপল্লীর প্রসিদ্ধ জাগ্রত দেবতা শ্রীতায়ুমনবর অর্থাৎ দক্ষিণামূর্তি মহাদেব। আরাধ্য দেবতার নামানুসারে তাঁরা পুত্রের নামকরণ করেছিলেন। শ্রীতায়ুমনবরজীর মধ্যে বাল্যকাল হতেই দৈবী প্রতিভার প্রকাশ দেখা গেছল। তিনি কৈশোর অতিক্রম করার পূর্বেই তামিলভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ছিলেন। বাল্যকাল হতেই দক্ষিণামূর্তির প্রতি তাঁর অসাধারণ ভক্তি ও নিষ্ঠা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। ঐ সময় তিরুচিরাপল্লীর রাজা ছিলেন বিজয় রঘুনাথ চোকলিঙ্গ (১৭০৪ - ১৭৩১ খৃঃ)। তায়ুমনবরজীর পিতা পণ্ডিত পিল্লেজী ছিলেন তাঁর প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে

রাজা বিজয় রঘুনাথ তায়ুমনবরজীকে তাঁর পিতার শূন্য আসনে অভিষিক্ত করতে অভিলাষী হন। তায়ুমনবরজী প্রথমে ঐ পদ গ্রহণ করতে চান নি। কারণ ঐ সময় তিনি শৈবসাধনায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজার পীড়াপীড়িতে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। রাজকার্য ছাড়া অবশিষ্ট সময় তিনি একান্তে বসে সাধনাতেই লেগে থাকতেন। প্রাসাদের তত্ত্বধায়ক হিসেবে তিন বছর অতীত হতে না হতেই তাঁর জীবনে এক ভীষণ দুর্দৈব দেখা দেয়। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে রাজা আকস্মিকভাবে পরলোকগমণ করলে তাঁর রাণী মীনাক্ষী যখন দেখলেন, তিনিই এখন রাজ্যের সর্বেসর্বা; তাঁকে শাসন করার কেউ নেই, তখন তিনি এই তরুণ তাপসকে নিজের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে লাগলেন। তাঁর নানাবিধ আকার ইঙ্গিত বা ছলাকলায় যখন কাজ হল না, তখন তিনি একদিন গভীর রাত্রে তায়ুমনবরজীর শয়ন কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কামিনী তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা ঃ তায়ুমনবরজী হাতজোড় করে তাঁকে বলতে লাগলেন — আপনি সকল প্রজার মাতৃতুল্য, আমারও অন্নদাত্রী মা। আপনার মত একজন সম্মানিতা রাজমহিষীর পক্ষে আমার মত একজন অধীনস্থ কর্মচারীর নিকট এই রকম কলুষ প্রস্তাব করা উচিত নয়। উত্তরে রাণী বললেন — আমি তোমার বর্তমানে স্বামিনী, আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি আমাকে বিনা দ্বিধায় সুখী কর। তায়ুমনবরজী ভীষণ ফাঁপরে পড়লেন। তিনি সেই রাত্রিটুকুর জন্য সময় প্রার্থনা করে রাণীকে কোনমতে নিরস্ত করলেন। রাণী কামজর্জর অবস্থায় কোন মতে টলতে টলতে ফিরে গেলে তিনি নতজানু হয়ে দক্ষিণামূর্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন — হে শিবসুন্দর ! তুমি আমাকে ভীষণ সঙ্কট হতে রক্ষা কর প্রভু ! সহসা ধীরে ধীরে তাঁর চোখের সামনে আকারিত হয়ে উঠল এক যোগীর মূর্তি, তাঁর মুখকমল এক উজ্জ্বল জ্যোতির রেখায় উদ্ভাসিত। সেই প্রতিমূর্তির ওষ্ঠাধর হতে প্রস্ফুট হল — 'তিরুচিরাপল্লীতে দক্ষিণামূর্তির মন্দিরে পালিয়ে এস'। এই দিব্যদর্শনের পরেই সেই রাত্রেই তিনি তাঁর একান্ত অনুগত সহকর্মী অরুল্যয়কে সঙ্গে করে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। অন্ধকারের মধ্যে হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁরা দুজনে যখন তিরুচিরাপল্লীর ভগবান দক্ষিণামূর্তির মন্দিরে এসে পৌঁছলেন, তখন মন্দিরে মঙ্গলারতি হচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর পূর্বদৃষ্ট সেই যোগী দক্ষিণামূর্তির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দর্শন মাত্রই তাঁর শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। নিজেকে কোনমতে সংযত করে পাশের এক ভক্তকে ঐ যোগীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। ভক্ত জানালেন — উনি তিরুমূলর শৈব সম্প্রদায়ের আচার্য, মহাযোগী। তায়ুমনবরজী মন্দির হতে নেমে এসে সেই মহাযোগীর জন্য সিঁড়ির পাদদেশে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মঙ্গলারতির শেষে যখন সেই মহাপুরুষ নেমে এলেন, তিনি তাঁর পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে সাশ্রুনয়নে তাঁর প্রাণের আকুতি নিবেদন করতে লাগলেন এবং দীক্ষা প্রার্থনা করে বসলেন। মহাপুরুষের শেষ পর্যন্ত দয়া হল। তিনি তায়ুমনবরকে উষালগ্নে মন্দিরের এক কোণে বসে শৈবসিদ্ধান্তের গূঢ় সাধন সঙ্কেত দান করলেন। দীক্ষা দেবার পর তিনি তায়ুমনবরকে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের পথে যাত্রা করতে বললেন।

অরুল্যয়কে সঙ্গে নিয়ে তিনি রামেশ্বরমে পৌঁছে শিবসাধনায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ঢেলে

দিলেন। ঐ সময় প্রায়ই তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেত। ফুলে মধু জমলে ভ্রমরকে ডাকতে হয় না। মধুর গন্ধে আকুল হয়ে আপনা হতেই ভমররা ছুটে আসে। ধীরে ধীরে একজন প্রসিদ্ধ শিবযোগী হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ল। ঐ সময় রামেশ্বরমে ভীষণ আকাল দেখা দেয়। বর্ষার অভাবে শস্য হওয়া ত দূরের কথা, গাছপালাও শুকিয়ে গেল। পশুপক্ষী মানুষের আর্তনাদে কাতর হয়ে তিনি সহস্র সহস্র লোকের সামনে নতজানু হয়ে শিবসুন্দরের কাছে দুহাত তুলে প্রার্থনা জানালেন —

(১) যদি শৈবধর্ম মহান্ হয়, সত্য হয়।

(২) যদি শৈবগণের আরাধ্য দেবতা মহাদেবের ললাটে চন্দ্রশোভিত থাকেন, এবং

(৩) ইন্দ্রিয় জয়ের পরিণামস্বরূপ আনন্দলাভ যদি মোক্ষ হয়, তবে হে মেঘ, তুমি মুষলধারে বৃষ্টি দান কর।

শ্রীতায়ুমনবরজীর প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়ে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল। চারদিকে তাঁর জয়জয়কার উঠল। অসংখ্য লোকের ভীড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি রামেশ্বর ত্যাগ করে বিভিন্ন শৈবতীর্থে পর্যটন আরম্ভ করলেন। এই দুষ্কর তীর্থ পর্যটনে তাঁর সাথী ছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য ও সেবক অরুল্যয়। সর্বত্র পর্যটন করে শৈবসিদ্ধান্ত এবং শিবসাধনার গুহ্যরহস্য লোকসমক্ষে প্রচার করা ছিল তাঁর প্রধান ব্রত। তিনি এই উদ্দেশ্যে গভীর ভাবোদ্দীপক ১৪৫২ খানা শিবসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তামিলভাষায় রচিত এই সঙ্গীতগুলি তামিলভাষীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। পর্যটন শেষে তিনি রামনাদের রাজার আগ্রহে রামনাথপুরমের নিকটবর্তী কটুরাণী নামকস্থানে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাস করেছিলেন। এই সময়েই তিনি শৈবসিদ্ধান্তের উপর পরাপরক্কনি, পৈঙ্গিলিক্কনি, এন্নলক্কনি এবং আনন্দক্কলিপ্পু নামক চারখানি উচ্চকোটির সাধন-গ্রন্থ তামিল ভাষায় রচনা করেন। এই চারখানা গ্রন্থই তাঁকে সমগ্র ভারতবাসী শৈবপন্থীদের কাছে 'শিবাচার্যের' মর্যাদা দান করে। তাঁর রচনার মাধুর্য রস আস্বাদনের জন্য তাঁর 'আনন্দক্কলিপ্পু' হতে তোমাকে কিছুটা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি।

এই বলে তিনি আবৃত্তি করতে সুরু করলেন।

তামিলভাষার বিন্দু-বিসর্গ বুঝি না। তবে দরবিগলিত-অশ্রু হয়ে তিনি যে রকম সরসভাবে আবৃত্তি করলেন, তাতে আমার মন উন্মনা হয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে তিনি যেন আকুলকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। কুটীরের বাতাবরণ মুহূর্তে বদলে গেল। পরে তিনি ধীরে ধীরে ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিতে বুঝলাম। শিবাচার্য তায়ুমনবর শিবসুন্দরের কাছে এই বলে আকুতি জানাচ্ছেন — হে বিশ্বনাথ! আমি তোমার পূজা এবং প্রণাম এখন কিভাবে করি বলত ? তোমার পূজার জন্য যে শিশিরস্নাত সুগন্ধি পুষ্প চয়ন করব, সে ফুলে ত তোমার নিবাস! কিভাবেই বা তোমার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াব বা সাষ্টাঙ্গে তোমার চরণ কমলে লুটিয়ে পড়ব, আমি যে দেখছি আমার সম্পূর্ণ দেহ-মন-প্রাণ বুদ্ধি চিত্ত-অহংকার সমস্তই ব্যাপ্ত করে তুমি বিরাজমান! যেভাবেই আমরা তোমার পূজা করি না কেন, তা ত অপূর্ণ পূজাই হবে। কারণ তুমি ত অসীম আকাশের ন্যায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ! তুমি পরব্রহ্ম পরমাত্মা ওঁকার স্বরূপ, চারবেদ তোমারই রূপ, তুমিই বেদপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব, সকল প্রাপ্তির মধ্যে পূর্ণ ও পরমপ্রাপ্তি। তোমাকে প্রাপ্ত হলে আর আর কিছুই প্রাপ্তব্য থাকে না। তুমিই সর্বদর্শনের

শ্রেষ্ঠ দর্শন। একমাত্র জ্ঞেয়তত্ত্ব। হে শিবসুন্দর! তুমিই সকল শব্দ এবং সকল শব্দের অর্থও তুমি; তুমিই সকল মৌনের প্রত্যক্ষ-স্বরূপ, জ্ঞানসাম্রাজ্যের সান্দ্রানন্দ মূল অধিষ্ঠান স্বরূপ। মহাত্মার বাচনভঙ্গীতে এমনই যাদু যে কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমার বাক্যস্ফূর্তি হল না। প্রায় পাঁচ মিনিট নীরব থেকে তিনি পুনরায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে থাকলেন — জীবনের শেষের দিকে পরম গুরুমহারাজ সব সময়েই বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থাতে থাকতেন এবং ঐ রকম সমাধিমগ্ন অবস্থতেই তিনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের মাঘীপূর্ণিমার দিনে শিবলোক প্রাপ্ত হন। তাঁর দেহান্তের সময় আমার গুরুদেবের (শ্রীমৎ কোদিক্কারাইজী) বয়স ছিল মাত্র দু বছর। তিনি যখন এক বছর বয়সের শিশু তখনই তাঁর কানে পরমগুরুদেব শিবনাম শুনিয়ে যান এবং বড় হলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দীক্ষা সংস্কারের ভার দিয়ে যান তাঁর প্রধান শিষ্য শিবাচার্য অরুল্যায়জীর উপর। অরুল্যায়জীরও দেহান্ত হয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দের মাঘী দিনে ১০২ বছর বয়সে। তাঁর পরে আমার গুরুদেব শিবাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও ১৩০ বছরে বয়সে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শুভ মাঘী পূর্ণিমায় শিবধাম প্রাপ্ত হয়েছেন। গুরুজীর দেহাবসান ঘটলে আমি নর্মদাতটে চলে এসেছি এবং সেই থেকে এই শিবভূমিতে পড়ে আছি। এই হল আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এখন বাইরে চলুন, সন্ধ্যাবন্দনা করে আসি।'

তাঁর ঝোপড়া থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তিনি নর্মদার তীরে গিয়ে সন্ধ্যাবন্দনায় রত হলেন। শিবমন্দিরে তখন লোকসমাগম সুরু হয়েছে। সন্ধ্যারতির আয়োজন হচ্ছে। যিনি পুরোহিত তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে বার করেক তাকিয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন — আপ্ নয়া পধারেঁ? চিদাম্বরমকা পাশ আয়েঁ?

জী হাঁ — সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।

পুরোহিতমশাই-এর কথায় বুঝতে পারলাম যে আমার আশ্রয়দাতা সাধুর নাম — 'চিদাম্বরম্'। অনেকক্ষণ ধরে আরতি দেখলাম। আরতির শেষে নর্মদাতটে গিয়ে দেখলাম, সাধু স্থির হয়ে বসে আছেন, একেবারে ধ্যানস্থ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কুটীরে গিয়ে মোমবাতি জ্বেলে নিজের আত্মকর্মে মন দিলাম। রাত্রি ৯টা বা ১০টা হবে, তখনও সাধু নর্মদাতট থেকে ফেরেন নি দেখে আমি পুনরায় ঘাটে গেলাম। গিয়ে দেখি, তাঁর জপ শেষ হয়েছে। তিনি আসন গুটিয়ে কুটীরে ফেরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন — ওপারে দক্ষিণতটের দিকে তাকিয়ে দেখ ঐ পারের নামও খেড়িঘাট। এপারেও যেমন ঐখানেও তেমনি ওঁকারের ঝাড়ি শেষ হয়েছে। তবে দক্ষিণতটস্থ খেড়িঘাটের সুবিধে এই যে ঐদিকে নর্মদার কিনারে পাকা সড়ক আছে। ঐ সড়ক মোরটক্কা স্টেশন পর্যন্ত চলে গেছে। এখানে যেমন ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ির শেষপ্রান্তে মহাদেবের মন্দির আছে। ঐপাশে ঝাড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রাজরাজেশ্বরের মন্দির আছে, মন্দিরের চূড়ায় টিম্‌টিম্ করে বিজলীবাতি জ্বলছে দেখতে পাচ্ছেন ত? মন্দিরের পাশেই রয়েছে একটি পুরানো ধর্মশালা। ধর্মশালার কাছাকাছি স্থানেই আছে ইন্দোর যাবার রেলপুল। কাল সকালে মণ্ডলেশ্বর যাবার পথেই সেই রেলপুল দেখতে পাবেন। এখন চলুন কুটীরে ফেরা যাক্।

কুটীরে ফিরেই চিদাম্বরমজী আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন। নিজেও ঢুকে গেলেন পাশের ঘরটিতে। আমি নিজের কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছি, তখনও ঘুম আসেনি, এমন সময় সাধুর মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ শুনতে পেলাম

ইদং ব্রহ্মা পুরাকৃত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
সর্বস্তবানাং রাজত্বে দিব্যানাং সমকল্পয়ৎ॥
তদা প্রভৃতি চৈবায়ং ঈশ্বরস্য মহাত্মনঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতো জগত্যমরপূজিতঃ॥

অর্থাৎ পূর্বকালে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই অষ্টোত্তর সহস্রনাম রূপ স্তব আবিষ্কার করে উৎকৃষ্ট সমস্ত স্তবের রাজপদে কল্পনা করেছিলেন। তদবধি মহাদেবের দেবপূজিত এই স্তব জগতে স্তবরাজ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

আমি চমকে উঠলাম মন্ত্র শুনে। আমার মনে পড়ে গেল, এই স্তবরাজই ত আমাকে ওঁকারেশ্বরে দান করেছিলেন মহাত্মা প্রলয়দাসজী! আমার আর শোওয়া হল না। আমি নিঃশব্দে পা টিপে টিপে তাঁর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। একটি যোনিপীঠের উপর একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছে, প্রদীপ জ্বলছে আর সাধু নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করে চলেছেন;

ব্রহ্মালোকাদয়ং স্বর্গে স্তবরাজোহবতারিতঃ।
যতস্তণ্ডিঃ পুরাপ্রাপ তেন তণ্ডিকৃতোহভবৎ॥
স্বর্গাচ্চৈবাত্র ভূর্লোকং তণ্ডিনা হ্যবতারিতঃ।
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্বপাপ প্রণাশনম্॥

ব্রহ্মা এই স্তবরাজকে ব্রহ্মালোক হতে স্বর্গে অবতারিত করেছিলেন আর স্বর্গ হতে পেয়েছিলেন ব্রহ্মর্ষি তণ্ডি। এইজন্য এই স্তবরাজ তণ্ডিকৃত বলে মর্ত্যলোকে প্রচারিত হয়েছে।

নানা রকমের বুনো ফুলে শিবলিঙ্গ ঢাকা পড়েছে। চারদিক সুগন্ধে ভরে গেছে। সাধুর পূজায় পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে এইজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবকে প্রণাম নিবেদন করে আবার চুপিসারে ফিরে এলাম ঘরে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, যখন ঘুম ভাঙল, তখনও শুনতে পেলাম সাধুজী তন্ময় হয়ে ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে তখনও মহাদেবের স্তব পাঠ করে চলেছেন।

নির্বাণং হলাদনশ্চৈব ব্রহ্মলোকপরাগতিঃ।
দেবাসুরবিনির্মাতা দেবাসুরপরায়ণঃ॥
দেবাসুরগুরুর্দেবো দেবাসুরনমস্কৃতঃ।
দেবাসুরমহামাত্রো দেবাসুরগণাশ্রয়ঃ॥

মন্ত্র শুনে বুঝতে পারলাম তণ্ডিকৃত বিরাট শিববন্দনার পাঠ সাধুজী শেষ করে এনেছেন। ক্রমে তাঁর ববম্ ববম্ শব্দের গালবাদ্য শুনে বুঝলাম, স্তবপাঠ শেষ হল। পরে ছোট্ট একটি ঘন্টার একটানা ধ্বনি শুনে বুঝলাম, সাধুজীর আরতিও শেষ হয়েছে। আমি কুটীরের ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে কুয়াশা নেমে চারধার ঢেকে ফেলেছে, পাহাড় দেখা যাচ্ছে না, জঙ্গলের গাছপালাও খুব স্পষ্ট নয়। এই পার্বত্য অঞ্চলের সামনে পেছনে সব যেন ঘষা পয়সার মত লেপে মুছে একাকার হয়ে গেছে। পাখীদের কলরব শোনা যাচ্ছে। তার মানে ভোর হয়ে আসছে। আমি শৌচাদি সেরে আবার ঝোপড়াতে ঢুকলাম। আমি আশা করেছিলাম যে চিদাম্বরম্‌জী নিশ্চয়ই এতক্ষণে পূজাপাঠ শেষ করে উঠে পড়েছেন, হয়ত শৌচাদির জন্য বাইরে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর ঘরে উঁকি মেরে সে ভুল আমার ভেঙে গেল। তিনি চিত্রার্পিতবৎ তাঁর আসনে তখনও সমাবিষ্ট রয়েছেন।

আমি আমার ঘরে ঢুকে চুপ করে বসে রইলাম। ঘরের মধ্যে তখনও অন্ধকার। ক্রমে চারদিকে আলোর আভাস ফুটলো। ধাবড়ী কুণ্ড হতে আসার সময় আমি অভয়ানন্দজী প্রদত্ত বাণলিঙ্গের ঐশী ছলনায় যখন বিভ্রান্ত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম, তখন আমার ঝোলা গাঁঠরী বইপত্র সচ্চিদানন্দজী বেঁধে দিয়েছিলেন। বইপত্রের বাণ্ডিলে কোথায় কোনটা রয়েছে তা আমি ভাল করে খুলে সব দেখে নিইনি। ওঁকার-মান্ধাতার মুক্ত আকাশতলে সিদ্ধেশ্বর বা প্রকৃত ওঁকারেশ্বরের পূজা করার সময় মহাত্মা প্রলয়দাসজী মহাভারতের ষোড়শ অধ্যায়ের যেখানে মহর্ষি উপমন্যু শ্রীকৃষ্ণকে দীক্ষা দিয়ে অষ্টোত্তর সহস্র শিবনাম রূপ স্তোত্র শিখিয়েছিলেন, আমি বইপত্র ঘেঁটে সেই প্রতিলিপিটি খুঁজে বের করলাম। বাইরে রোদ বেরিয়েছে বুঝতে পেরে আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম। নর্মদাতে স্নান তর্পণাদি সেরে গেলাম শিবমন্দিরে। শিবের মাথায় জল ঢেলে মন্দিরের এককোণে বসে তণ্ডিকৃত সেই শিবস্তোত্র পাঠ করলাম। ফিরে এলাম চিদাম্বরমজীর কুঠীতে। এসে দেখি তখনও তিনি আসনে স্থির হয়ে বসে আছেন। সমস্ত কুঠীর এক অনাস্বাদিত পূর্ব সুগন্ধিতে ভরে আছে। প্রথম যে সুগন্ধ পেয়েছিলাম, যাকে আমি শিবের মাথায় চাপানো বুনোফুল হতে নির্গত হচ্ছে বলে মনে করেছিলাম, এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এই গন্ধ তা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি আবার পা টিপে টিপে সাধুর ঘরে উঁকি মারলাম। না! তার কোন বাহ্যচেতনা আছে বলে মনে হল না। চক্ষুনিমীলিত, কিন্তু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। অত্যন্ত চুপিসারে আবার ফিরে এলাম বাইরে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে হল বেলা বোধহয় দশটা বা সাড়ে দশটা হবে। গত রাত্রিতে প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ সাধু পূজায় বসেছিলেন, প্রায় ১২ ঘন্টা কেটে গেল, এখনও তাঁর হুঁশ এল না। উভয় সংকটে পড়ে গেলাম। সাধুর সমাধি না ভাঙলে এখান থেকেই যাই বা কি করে? আজ ষোলই ভাদ্র, ক্রমাগত প্রত্যেক স্থানে যদি অবস্থার চাপে পড়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে পড়ি তাহলে রেবাসংগমে পৌঁছাবো কবে? এইভাবে তিক্ত বিরক্ত মনে গজরাতে গজরাতে আমি নমর্দার ধারে গিয়ে বসলাম। সাধুর কুটীরের ঝাঁপ খোলাই পড়ে রইল। ভাবলাম, এখানে ত কাউকে চোখে পড়ছে না! কেইবা আসবে এখানে? অনেক দূরে দূরে মহল্লা রয়েছে, এখানে গরু মহিষাদিকেও চরতে দেখছি না। তাছাড়া কমণ্ডলু, পূজার দু'চারটে তামার তৈজসপত্র এবং কয়েকটা মাটির হাঁড়ি, ভাঁড় ও সরা ছাড়া ত কিছু সাধুর নেই। তাছাড়া এই নর্মদাতটে পরিক্রমা করতে করতে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, এখানকার গ্রামগঞ্জের অধিবাসীরাও অত্যন্ত সাধুভক্ত, সদাচারী ও সত্যনিষ্ঠ। আমি নর্মদার দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। এখানে নর্মদার বিস্তার অনেকখানি। দক্ষিণতটে মন্দির, পাথরের অট্টালিকা এবং ঘাটে লোক সমাগম দেখতে পেলেও এই উত্তরতটে যতদূর নজর যাচ্ছে, ততদূরই কাকস্য পরিবেদনা! মনে মনে ভাবলাম, এইজন্যই অধিকাংশ পরিক্রমাবাসী দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা করেন, কারণ সেই পথ কম বিপদসংকুল; লোকজনের বাস বেশী বলে মানুষজনের মুখ দেখতে পাওয়া যায়, দক্ষিণতটে যতত্র সদাবর্তও আছে। অমরকন্টক হতে যাত্রা সুরু করে কপিলধারার কাছাকাছি এসে সেই যে আমি মহাত্মা শংকরনাথের দলছুট হয়ে পড়লাম, তারপর যেন কোন রহস্যময় কারণে ছিটকে পড়লাম উত্তরতটে, সেই থেকে উত্তরতট ধরেই আসছি, নিত্যনূতন নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ঘটলেও দুর্দশা ঘটছে বিচিত্র বিচিত্র। রোদের তাপ বড় তীব্র মনে হচ্ছে, আমি মা নর্মদাকে প্রণাম করে কুটীরের দিকে বাঁক নিতেই দেখতে পেলাম কেউ যেন

কুটীরের মধ্যে ঢুকলেন। আমি ত্রাস্তব্যস্তে ছুটে এলাম কুটীরে। ভাবলাম, সাধুজীর হয়ত সমাধি ভেঙেছে, তিনিই হয়ত আমাকে খোঁজবার জন্য বাইরে বেরিয়েছিলেন, আমাকে নর্মদার ধারে দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কুটীরের মধ্যে ঢুকলেন! কুটীরে ঢুকেই দেখি, ওমা! ইনি ত তিনি নন! একজন বুড়ীমা। একমাথা পাকাচুল ও ফোকলা দাঁত নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিট-মিট হাসছেন। তাঁর সামনে একটি ছোট লাঠি পড়ে আছে। সাধুর দিকে উঁকি মেরে দেখি, তিনি নির্বিকার ভাবে বসে আছেন, একই অবস্থায়; শরীরে কোথাও কোন স্পন্দন আছে বলে মনে হচ্ছে না। সাধুর দেহের অবস্থা কাছ হতে দেখার জন্য তাঁর আসনের কাছাকাছি গেলাম, শিবলিঙ্গ সেই একই রকম বুনোফুলে ঢাকা, প্রদীপ জ্বলছে, তাঁর মুখে ও কপালে একই রকম দীপ্তির ছটা। এবারে বুঝতে পারলাম, সুগন্ধিটা ফুল থেকে আসছে না, তাঁর দেহ থেকেই নির্গত হচ্ছে। আমি ধীরে ধীরে সরে এলাম তাঁর কাছ হতে। বড়জোর এক মিনিট বা দেড় মিনিট সময় লেগেছে সাধুকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর ঘর হতে বেরিয়ে আসতে, এরই মধ্যে দেখি সেই বুড়ীমা ঝট্‌পট্ তাঁর ময়লা গেরুয়া কাপড়ের পোঁটলা থেকে কিছু বের করে একটি তাম্রপাত্রে রেখে সরা চাপা দিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আপ্ কৌন হৈ? সাধুবাবাকে সাথ আভি মোলাকাৎ নেহি হোগা। উনোনে পূজামেঁ বৈঠা হৈ।

বুড়ীমা মিটমিট করে তাকিয়ে মুখে আঙুল চাপা দিলেন অর্থাৎ সঙ্কেত করলেন চুপ থাকতে। আমি নদীর ধারে গিয়ে রৌদ্রে বসেছিলাম অনেকক্ষণ, তাই ঘেমে গেছি। বুড়ীমা তাঁর সেই ময়লা গেরুয়া নেকড়াটা দিয়ে আমার মুখ ও কপালে ঘাম মুছে দিতে দিতে হাসিমুখে বললেন — বাচ্চে! বাচ্চে! আমি মুখটা বিরক্তিভরে সরিয়ে নিতে ঝট্ করে আমার পেছনে গিয়ে আমার পিঠের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন — বেটা! বেটা! বাচ্চে! আমি আড়মোড়া দিয়ে উঠে পড়বার চেষ্টা করতেই আমার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে সাধুর পূজার ঘরে ঢুকে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি সন্তর্পণে তাঁর কমণ্ডলুটা সরিয়ে এনে আমার মুখের সামনে ধরে হাঁ করাতে ইঙ্গিত করলেন। আমার সত্যিই তখন তৃষ্ণা পেয়েছিল, তা ছাড়া পাগলীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমি নিতান্ত সুবোধ বালকের মত হাঁ করলাম, তিনি জল ঢেলে দিতে লাগলেন। আমার জলপান শেষ হতেই আবার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কমণ্ডলুটা সাধুর কাছে রেখে এসে 'বেটা! বেটা! বাচ্চে! বাচ্চে! বলতে বলতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ঝোপড়া থেকে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বুড়ীমা নিশ্চয়ই সাধুর খুব পরিচিত। দেহাত থেকে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকেন। ঝোপড়ার মধ্যে কোথায় কি আছে সবই তাঁর জানা আছে দেখলাম। নতুবা কেমন সতি্য কারের পাগলী ঝোপড়ার ঝাঁপ খোলা দেখে হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে সাধু জেগে ওঠার পর যদি জিজ্ঞাসা করেন যে কে এসেছিল, কোথা থেকে এসেছিল, আমি তাঁর কি উত্তর দেবো? এই কথা মনে উদয় হওয়া মাত্রই বুড়ীমা কোন দিকে গেলেন, তা দেখার জন্য বাইরে বেরিয়ে এসে শিবমন্দিরের দিকে দৌড়ে গেলাম। মন্দিরে না দেখে নর্মদার ধারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম জলের কিনারে কিনারে বুড়ীমা পশ্চিমদিকে বেশ দ্রুত তালে হেঁটে যাচ্ছেন। অনেকখানি চলে গেছেন, সূর্য তখন মাথার ওপরে, এই চড়া রৌদ্রে আর এগোতে ইচ্ছে হল না। সাধুর কুটীরে ফিরে এলাম। এসে দেখলাম, সাধু 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা

করছেন, কিন্তু পারছেন না। আমি তার হাত ধরে ঘরের বাইরে এনে দরজার সামনেই বসিয়ে দিলাম। তিনি কমণ্ডলু হাতেই উঠে এসেছিলেন। জল খাবার জন্য কমণ্ডলুটি শূন্যে ওঠাতে গিয়ে কমণ্ডলুর হাতলের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি 'আম্মাজী আম্মাজী' বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কমণ্ডলুটি হাতে নিয়ে ভাববিহ্বল দৃষ্টিতে কেবলই মাথায় ঘষতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে আমি ত হতভম্ব! ভাবলাম, সেই দেহাতি পাগলী বুড়ীটা তাঁর কমণ্ডলু নিয়ে এসে আমার মুখে জল ঢেলে দিয়েছিলেন বলে কি কোন দোষ হল? আমি সাত পাঁচ চিন্তা না করতে করতে বলে ফেললাম, এই কিছুক্ষণ আগে একজন বুড়ীমা এসেছিলেন। তিনি আপনার জন্য কিছু জিনিষ ঐখানে সরা চাপা দিয়ে রেখে গেছেন। বুড়ীমা আমার কোন কথা বলবার অপেক্ষা করেন নি, সরাসরি আপনার আসনের কাছ হতে কমণ্ডলু তুলে এনে একরকম জোর করে আমার মুখে জল ঢেলে দিয়েছিলেন। আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম ঠিকই তবে তাঁর কাছে জল চাইনি। এতে যদি কোন দোষ হয়ে থাকে ক্ষমা করুন।

আমার কোন কথা তাঁর কর্ণে প্রবেশ করল বলে মনে হল না, তিনি সেই সরা চাপা তাম্রপাত্রটার উপরে টিপ করে প্রণাম করে আবার 'আম্মাজী আম্মাজী' বলে কাঁদতে থাকলেন। আমি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম, কার্যকারণ কিছুই বুঝতে পারছি না, আম্মাজী যে কে, তাও বুঝছি না। নর্মদাতটে এইরকম ভাবোন্মাদ সাধক যে দেখিনি তা নয়, কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁদের হাবভাব কথাবার্তায় তাঁদেরকে চিনতে কোন ভুল হয়নি, কিন্তু কাল থেকে এই মানুষটার আচার আচরণে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে নি কিন্তু প্রায় ১২ ঘন্টা ধ্যানাসনে বসে থাকার পর আজ এইমাত্র যাকে একজন শান্তদান্ত স্থিতধী তপস্বী বলে ধারণা করেছিলাম, তাকে এখন বড়ই বিহ্বল অবস্থায় দেখছি! নিয়ত যাঁরা ভাবমার্গে বিচরণ করেন তাঁদেরকে এইজন্য আমি ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলি। কথায় কথায় বৈষ্ণবদের মত হাপুস্ নয়নে কান্না আর ধর্মের নামে নাটুকেপনাকে আমি আদৌ সহ্য করতে পারছি না। যাই হোক আজকে ত আর যাত্রা করার উপায় নেই, কাল সকালে উঠেই আমি পালাবো আমার গন্তব্যপথে। তা রাত্রে উনি মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেও আমার এ সিদ্ধান্ত আর বদলাবে না।

আমি মনে মনে এইসব কথা ভাবছি, দেখি তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে বললেন — আপনাকে আর আমার সঙ্গে যেতে হবে না। আমি ধীরে ধীরে গিয়ে নিজেই স্নান করে আসছি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নর্মদায় ডুব দিয়ে ফিরে এলেন। স্নান করে আসার পরেই তাঁকে খুব স্বাভাবিক দেখলাম। তিনি আমার সামনেই সরার ঢাকনা খুললেন। তাঁর মুখ-চোখ লাল থমথমে হয়ে উঠল, কেবল একবার অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন 'আম্মা'! দেখলাম পরিষ্কার কাঁচা শালপাতায় কতকটা চরু রয়েছে। ঢাকনা খুলতেই চরুর গন্ধ পেলাম। বড় বড় কিস্‌মিস্ পেস্তা ঘি ও দুধে সেদ্ধ বিশুদ্ধ চরু। ব্রাহ্মণ মাত্রেই এই চরুর স্বাদ জানেন। কারণ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ কুমারকেই উপনয়নকালে তিন দিন যাবৎ একবার মাত্র চরু খেয়েই কাটাতে হয়। চিদাম্বরমজী সেই বুড়ীমা প্রদত্ত চরুকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ আমাকে দিলেন এবং একভাগ নিজে খেলেন।

চরু খেয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। আমিও কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। চরু খেয়ে আমার মনে হল বহুদিন পরে আমি এই রকম সুখাদ্য চরু খেলাম, এইরকম ভোজনে পরিতৃপ্তি ক্বচিৎ

কদাচিৎ এই পরিক্রমাকালে ঘটেছে বলে মনে হল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি চিদাম্বরমজী উঠে বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে কালকের মত নর্মদার তটে এসে বসলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — সকালে যিনি এসেছিলেন সেই বুড়ীমা কে?

— আম্মাজী !

— আম্মা মানে ত মা? তিনি আপনার কি রকম মা?

— আম্মাজী!

— উনি কি আপনার কাছে প্রতিদিন আসেন? না মাঝে মাঝে আসেন?

— আম্মাজী!

— তাঁকে দেখে ত মনে হল নিকটবর্তী কোন পাহাড়ী বস্তির দেহাতী মেয়ে। তিনি চরু কোথায় পেলেন? তিনি নিজেই কি ঐ যজ্ঞীয় চরু পাক করে এনেছিলেন?

সেই একই সংক্ষিপ্ত উত্তর পেলাম — আম্মাজী!

এ ত বড় বিড়ম্বনায় পড়লাম! বুড়ীমাকে যখনই কিছু জিজ্ঞাসা করছি , তাঁর একমাত্র বুলি ছিল — বেটা! বেটা ! বাচ্চে ! বাচ্চে ! আর ইনি অন্য সব বিষয়ের যথাযথ উত্তর দিলেও এ বিষয়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেই 'খোকন্' সেজে যাচ্ছেন। বুড়ো খোকন্ আমার! আসল কথা চেপে গিয়ে কেবলই বলছেন — আম্মাজী! আম্মাজী!

উত্তর যদি কেউ না দিতে চান তাহলে কী-ই বা করা যায়। আমি তখন অন্য প্রসঙ্গ ফেললাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — আপনি বলছেন আপনার পরমগুরু মহাত্মা তাবুমনবর, তাঁর প্রধান শিষ্য অরুল্যর এবং আপনার গুরুদেব কোদিক্কারাইজী সকলেই শিবাচার্য ছিলেন। এই 'শিবাচার্য' বলতে কি বোঝায়? কাশীতে জঙ্গমবাড়ী নামক বিখ্যাত শৈব মঠের আচার্যদেরকেও 'শিবাচার্য' বলা হয়? জঙ্গমবাড়ী বীরশৈব সম্প্রদায়ের মঠ হিসেবে সুপরিচিত। তাহলে আপনারা কী বীরশৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

এখন সাধুর মুখে খৈ ফুটতে লাগল। তাঁর সেই খোকন্ খোকন্ ভাবটি আর নেই। তিনি সোৎসাহে বলতে লাগলেন — আমাদের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে শিবলিঙ্গের উপাসনা অত্যন্ত প্রচলিত। সেখানে স্বতন্ত্র একটি লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। তাঁর আবার তিনিটি ভাগ — লিঙ্গায়েৎ , লিঙ্গবন্ত ও জঙ্গম। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে বীরশৈব সম্প্রদায়ের এক ব্রাহ্মণ বংশে আচার্য বসভ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই জঙ্গম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে কল্যাণপত্তনের অধিপতি বিজল রাজার সময়ে ঐ অঞ্চলে জৈন ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। বসভের জন্মস্থান ভাগোয়ান। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগম জেলার মধ্যে এটি একটি গ্রাম। ভাগোয়ানের এক শিব মন্দিরে বসে বসভ কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শিবের দর্শন পান। শোনা যায়, স্বয়ং মহেশ্বরের প্রত্যাদেশেই তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে জঙ্গম সম্প্রদায় স্থাপন করেন এবং দেখতে দেখতে জঙ্গম ধর্ম এমন প্রচারলাভ করে যে জৈন ধর্ম ঐ অঞ্চল থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জঙ্গমেরা বসভকে শিবের ভৈরব নন্দীর অবতার বলে বিশ্বাস করেন। বসভ-পুরাণ, পণ্ডিতারাধ্য প্রণীত শ্রীকরভাষ্যম এবং অগস্ত্য মুনির গুরু রেণুকাচার্য প্রণীত সিদ্ধান্ত-শিখামণি শিবাদ্বৈতমঞ্জরী এবং লিঙ্গধারণ চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে জঙ্গম ধর্মের তত্ত্ব ও সাধনার বর্ণনা আছে। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত শংকর সংহিতা এবং মাহেশ্বর খণ্ডের অন্তর্গত কেদার খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়েও বীরশৈব সম্প্রদায়ের সবিস্তারে মত ও পথের বিবরণ আছে।

যথা—

সন্তিরুদ্রেণ কথিতাঃ শিবধর্মাঃ সনাতনাঃ।
বীরভদ্রো যথা রুদ্রস্তথান্যে গুরবঃ স্মৃতা॥
লিঙ্গস্য মহিমানং তু নন্দী জানাতি তত্ত্বতঃ।
তথা স্কন্দো হি ভগবান্ অন্যেতে নাম ধারকাঃ॥

অর্থাৎ স্বয়ং রুদ্র ভগবানের শ্রীমুখের বাণী অনুসারেই সনাতন শিবধর্মের উৎপত্তি। বীরভদ্র নন্দী ভৃঙ্গী বৃষভ এবং কার্তিকেয় এই পাঁচজন প্রমথ অর্থাৎ মহাদেবের নিজজনারই শৈবধর্মের সবিস্তারে প্রচার করে গেছেন। এঁরাই শিবতত্ত্ব তত্ত্বতঃ জানেন। তাঁরাই গুরু, অন্যেরা নামধারী মাত্র।

বীর সম্প্রদায়ের মতানুসারে ঐ পঞ্চাচার্যই জগদ্‌গুরু। প্রত্যেক যুগেই তাঁরা মহাদেবের আদেশানুসারে বিভিন্ন শিবলিঙ্গে আবির্ভূত হয়ে শিব তপস্যার ধারা জগতে প্রচার করে গেছেন। ক্রমপর্যায়ে তাঁদের নাম — (১) রেণুকাচার্য (২) দারুকাচার্য (৩) একোরাম আরাধ্যাচার্য (৪) পণ্ডিতারাধ্যাচার্য এবং (৫) বিশ্বারাধ্যাচার্য। শিবসাধনার ধারাকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা বিভিন্ন শিবক্ষেত্রে পাঁচটি পীঠও স্থাপন করে গেছেন। ভগবান্ রেণুকাচার্যের পীঠের নাম বীরপীঠ; এটি মহীশূর রাজ্যের ভদ্রানদীর তীরে মলয় পর্বতের সন্নিকটস্থ রম্ভাপুরীতে অবস্থিত। ভগবান্ দারুকাচার্যের পীঠের নাম সর্দ্ধমপীঠ। এটি উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরের নিকটে স্থাপিত। ভগবান একোরাম আরাধ্যাচার্যের পীঠের নাম বৈরাগ্যপীঠ। হিমালয়ের যেখানে বর্তমানে কেদারনাথ বিরাজিত, তাকে পূর্বে ঊষা মঠ বলা হত। ঐখানে কেদারনাথের সেবকরাওল মোহান্তরূপে পরিগণিত। ভগবান একোরামের আবির্ভাব ঘটেছিল ঐ কেদারনাথ শিবলিঙ্গ হতে। ভগবান পণ্ডিতারাধ্যাজীর পীঠের নাম সূর্যপীঠ। এটি শৈলক্ষেত্রে এখনও দেদীপ্যমান্। ভগবান বিশ্বারাধ্যজীর পীটরে নাম জ্ঞানপীঠ। জ্ঞানক্ষেত্র কাশীতে এটি বিরাজিত। এরই নাম জঙ্গমবাটিকা বা জঙ্গমবাড়ী —

কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরে লিঙ্গে বিশ্বারাধ্যস্য সম্ভবঃ।
স্থানং শ্রীকাশিকাক্ষেত্রে শৃনু পার্বতি! সাদরম্॥ (স্বয়ম্ভুবাগম)

ঐ পঞ্চপীঠের আচার্যকেই সাধারণতঃ শিবাচার্য বলা হয়। আমরা পরমগুরু তায়ুমনবর, আচার্য অরুল্যয়জী এবং গুরুদেব কোদিক্কারাইজীকে সেই অর্থে শিবাচার্য বলি না। বেদমন্ত্রের দ্রষ্টাকে যেমন ঋষি বলা হয়, তেমনি শিবমন্ত্রের দ্রষ্টা, শিবতত্ত্বে পারংগম শিবদর্শীকেই আমরা শিবাচার্য বলে থাকি, সেই অর্থেই আমাদের গুরুবর্গ আক্ষরিক অর্থে শিবাচার্যরূপে পূজিত হয়ে থাকেন। বীরশৈব সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের তত্ত্বতঃ মিল থাকলেও আচারগত ভাবে তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক পার্থক্য আছে। একমাত্র মহেশ্বরই আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা হলেও বীরশৈব সম্প্রদায় কট্টরপন্থী। তাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্ম কঠোরভাবে মেনে চলেন। তাঁদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণদেরকেই জঙ্গম বলা হয়। তাঁরা শিখা, যজ্ঞোপবীত, শিবলিঙ্গ, রুদ্রাক্ষধারণ এবং ভস্ম মাখাকে অবশ্য করণীয় আচার বলে মনে করেন।

ব্রাহ্মণা বীরশৈবস্থা শিখা যজ্ঞোপবীতিনঃ।
লিঙ্গ-রুদ্রাক্ষ-ভস্মাঙ্কা ব্রহ্মকর্ম সমাশ্রিতাঃ॥ (পারমেশ্বরাগম)

এছাড়া তাঁরা আহার-বিহারেও অনেক বাছ বিচার মেনে চলেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারও অন্ন তাঁরা গ্রহণ করেন না। এইখানেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য।

আমরা বর্ণাশ্রমধর্ম এবং জাতিভেদের উপর তেমন গুরুত্ব দিই না। মহাত্মা ত্রিপুরলিঙ্গ ভস্ম ও রুদ্রাক্ষধারণের নির্দেশ দিলেও সব সময় বীরশৈবদের মত কণ্ঠে লিঙ্গধারণ করতে বলে যাননি। শিবধ্যান, শিবজ্ঞান এবং নিরন্তর শিবনাম জপই আমাদের প্রধান তপস্যা।

তাঁর বক্তব্য যখন শেষ হল, সূর্য তখন অস্তোন্মুখ। অস্তগামী সূর্যের লাল রশ্মি নর্মদার স্বচ্ছ জলে হিল্লোলিত হয়ে অপূর্ব দৃশ্যের রচনা করেছে। সাধুজী সন্ধ্যাবন্দনায় তৎপর হলেন। শিবমন্দিরে তখন সন্ধ্যারতির আয়োজন চলছে। মন্দিরে পুরোহিতসহ পাঁচজন লোক। সকলের হাতেই সেগুন-গাছের মজবুত লাঠি। লাঠি দেখে মনে হল, ঠিক এই স্থানে জঙ্গল না থাকলেও দূরে জঙ্গল দেখাই যাচ্ছে, কখনও কখনও বন্যজন্তু ছিটকে ছাটকে এদিকে চলে আসতে পারে, তাই হয়ত হাতে লাঠির ব্যবস্থা কিংবা এদেশে ত লাঠি ছাড়া স্ত্রী-পুরুষ কাউকেই হাঁটতে দেখি না। পথে বেরোলেই লাঠি রাখাই হয়ত রেওয়াজ। মন্দিরে ঢং ঢং ঘন্টাধ্বনি সুরু হল, তার সঙ্গে শিঙা ও ডম্বরু; আরতি সুরু হয়ে গেছে। চিদাম্বরমজী সন্ধ্যাবন্দনায় রত আছেন, আমিও একধারে বসে সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করলাম।

ইতিমধ্যে মন্দিরে আরতি শেষ করে সবাই চলে গেছেন, মন্দির ফাঁকা। আমি মন্দিরের বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ জপ করলাম। জপের শেষে সাধুজীর কাছে এসে দেখি তিনি তখনও তন্ময় হয়ে বসে আছেন। রাত্রি ন'টা বা সাড়ে ন'টার সময় তাঁর সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হল। তাঁর সঙ্গে তাঁর ঝোপড়ায় ফিরলাম। তিনি প্রদীপ জ্বাললেন। এই সময় আমি তাঁকে বললাম — আজ রাত্রেও আপনি হয়ত শিবপূজায় বসবেন। কাল কখন যে আপনার পূজা শেষ হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। কাল সকালেই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। তাই এখন থেকে আপনার কাছে বিদায় প্রার্থনা করে রাখছি।

— না, না, কাল সকালে আপনি যাবার আগে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

এই বলে তিনি তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন। আমিও আমার নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। তারপর কালকের মতই পা টিপে টিপে মহাত্মার পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর শিবপূজার পদ্ধতি দেখতে লাগলাম। দেখলাম, আচমন, অঙ্গন্যাস করণ্যাসাদি করে খুব আবেগের সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করাতে করতে বাঁ হাতের চেটোতে (করতলে) একটি শিবলিঙ্গ রেখে নর্মদার জল ঢেলে স্নান করাতে লাগলেন। মন্ত্রটি অপূর্ব —

ওঁ অনন্তপরমানন্দং মকরন্দমধুব্রতং।
আত্মশক্তিলতাপুষ্পস্ত্রিলোকীপুষ্পকোরকং॥
ব্রহ্মাণ্ডকুণ্ডিকাষণ্ড পিণ্ডীকরণ পণ্ডিতং।
সমস্তদেবতাচক্র-চক্রবর্ত্তিপদে স্থিতং॥
চূড়ালং সোমকলয়া সুকুমার বিসাভয়া।
কল্যাণ পুষ্প কলিকাকর্ণপূরমনোহরং॥
মুক্তাবলয়সংবদ্ধরুণ্ডমালা বিরাজিতং।
পর্য্যাপ্তচন্দ্রসৌন্দর্য পরিপন্থি মুখশ্রিয়ম্॥
গণ্ডমণ্ডল পর্যন্ত ক্রীড়ন্মকর কুণ্ডলং।
কালিম্না কালকূটস্য কণ্ঠনালে কলঙ্কিতং॥

গৌরীপয়োধরাশ্লেষকৃতার্থভুজমধ্যমং।
সুবর্ণব্রহ্ম সূত্রাঙ্কং সূক্ষ্মকৌশেয়বাসসং॥
নাভিস্থানাবলম্বিন্যা নবমৌক্তিকমালয়া।
গঙ্গয়েব কৃতাশ্লেষং মৌলিভাগবতীর্ণয়া॥
পদেন মণিমঞ্জীরীপ্রভাপল্লবিতশ্রিয়া।
চন্দ্রবৎ স্ফাটিকং পীঠং সমাবৃত্য স্থিতং পুরঃ॥

মহাদেবের দিব্যরূপ মন্ত্রটিতে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাধু প্রত্যেকটি মন্ত্র পাঠ করছেন আর দু'তিন মিনিটকাল চুপ করে যাচ্ছেন। আবার দু'লাইন পাঠ করছেন আবার ধ্যানস্থ হচ্ছেন। হাতের চেটোতে শিবলিঙ্গ ধরাই আছে। কখনও মন্ত্রপাঠ করতে করতে কেঁপে উঠছেন! আবার দু'তিন মিনিট পরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে আবার হয়ত দু'লাইন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, আবার চুপ, তাঁর সারা অঙ্গে মুহুর্মুহু শিহরণের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ষোল লাইন মন্ত্রপাঠ করতে মনে হল তাঁর আধঘন্টার উপর সময় গেল। এত দরদ দিয়ে পূজা করতে আমি কাউকে দেখেছি বলে সেই মুহূর্ত মনে করতে পারলাম না। তিনি কেবল মন্ত্রোচ্চারণ করছেন না মন্ত্রার্থ মনন করতে করতে মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বরকে দর্শন করছেন।

মন্ত্রের শেষ লাইনের শেষ শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে শিবলিঙ্গটিকে করতল হতে করতলের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন এবং বাম হাতের আঙুলগুলিকে তদনুযায়ী সমানভাবে আকুঞ্চিত করে শিবকে চন্দন মাখালেন। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে, মনে হল নিজের ইষ্টমন্ত্রে শিবলিঙ্গের উপর পাঁচটি বনফুল নিবেদন করলেন, কর্পূর জেলে আরতি করলেন। বামহস্তের করতল পৃষ্ঠে শিব তদ্‌বস্থাতেই রয়েছেন, ডান হাতে তিনি একটি পাত্রের উপর কর্পূর রেখে অপূর্ব কৌশলে তাঁর জাগ-প্রদীপের শিখায় তা ধরিয়ে নিলেন। তিনি তখন সম্পূর্ণ দরবিগলিত অশ্রু। পেছনে দাঁড়িয়ে অনুমান করলাম, তাঁর দু'চোখ দিয়ে অবিরলধারে জল গড়িয়ে পড়ছে। আরতির শেষে দেখলাম, তিনি শিবলিঙ্গটিকে দুই অঙ্গুলিতে ধরে সামনের একটি গৌরীপট্টের উপর স্থাপন করলেন। সেইসময় আমার নাকে এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ এসে ঢুকল।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হল না। যদি আমার উপস্থিতি টের পান, তাহলে কি ভাববেন! এই চিন্তার উদয় হওয়া মাত্রই আমি অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকলাম। একটু পরেই শুনতে পেলাম তাঁর কণ্ঠস্বর। মহর্ষি উপমন্যু শ্রীকৃষ্ণকে দীক্ষা দেবার পর তাঁর কাছে ব্রহ্মর্ষি তণ্ডিকৃত যে অষ্টোত্তর সহস্র শিবনাম উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, সাধুজী সেই স্তবরাজ পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। বুঝলাম আজ রাত্রি কাবার হবে। এই বোধহয় তাঁর নিত্যকৃত্য। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, সত্যই নর্মদা তপোভূমি। নর্মদার তটে তটে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এইভাবে যে কত মহাত্মা শিব-তপস্যা করছেন তার ইয়ত্তা নেই। সম্পূর্ণ শিব-নিবেদিত প্রাণ এইসব মহাত্মাই ঋষিসেবিত ভারতবর্ষে তপস্যার অগ্নি প্রজ্বলিত করে রেখেছেন আর মা নর্মদাই তাঁদের লালয়িত্রী এবং পালয়িত্রী। শিবপুত্রী নর্মদাকে প্রণাম করে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম মহাত্মার শিবস্তোত্রের উদাত্ত ধ্বনি শুনতে শুনতে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছি, ভেটাখেড়া জঙ্গলের শেষপ্রান্তে সীতাবনের দিকে যাবার সেই পাকদণ্ডীর বাঁকে মহাত্মা সোমানন্দজী একটি পাথরের চাঙড়ের উপরে পা ঝুলিয়ে বসে

আছেন, পরিধানে সেই মার্কামারা মলিন ছিন্ন পোষাক। মাথায় সেই ছড়ানো-বিছানো জটা দুলিয়ে দুলিয়ে তিনি আপন মনে গান গেয়ে চলেছেন —

গুরুপদে মন করো অর্পণ, ঢালো ধন তাঁর ঝুলিতে।
লঘু হবে ভার, রবে নাকো আর ভবের দোলায় দুলিতে।
হিসাবের খাতা নাড় বসে বসে, মহাজনে নেয় সুদ কষে কষে —
খাঁটি যেই জন সেই মহাজনে কেন থাক হায় ভুলিতে।
দিন চলে যায় টাঁকে টাকা হায়, কেবলি খুলিতে তুলিতে।।

পাগলা সাধু রয়েছেন আমার দিকে পেছন ফিরে, আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম তাঁর কাছে। পাথর ও বড় বড় গাছের মোটা মোটা শেকড় ডিঙিয়ে একটু ঘুরে বেঁকে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছি এমন সময়,

হ্যাঁচ্ছোঃ! হ্যাঁচ্ছোঃ! হ্যাঁচ্ছোঃ।
বলি কি ভয় দেখাচ্ছ?
ধরি টিপে টুঁটি, মুখে মারি মুঠি —
বলো দেখি কী আরামটা পাচ্ছ!
হ্যাঁচ্ছোঃ! হ্যাঁচ্ছোঃ।।

তাঁর হাঁচির চোটে পা পিছলে আমি পড়ে যাচ্ছিলাম। কোনমতে একটা গাছের গুঁড়ি ধরে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। এতক্ষণে আমি তাঁর নজরে পড়লাম। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন —

বুঝলি বাপুঃ! ইচ্ছে! — ইচ্ছে!
সবই হচ্ছে মায়ের ইচ্ছে!
সেই ত ভাঙছে, সেই ত গড়ছে,
সেই ত দিচে, সেই ত নিচ্ছে।
সেই ত আঘাত করছে তালায়, সেই ত বাঁধন ছিঁড়ে পালায় —
বাঁধন পড়তে সেই ত আবার ফিরছে!
হ্যাঁচ্ছোঃ! হ্যাঁচ্ছোঃ!

আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। এই নিয়ে দু'বার মহাত্মা সোমানন্দজীকে স্বপ্ন দেখলাম। কেন যে তাঁকে স্বপ্ন দেখছি, ভেবে তার কোন কূলকিনারা পেলাম না। কান খাড়া করতে পাশের ঘরে চিদাম্বরমজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তাঁর মন্ত্রপাঠ শুনে বুঝতে পারলাম, তাঁর স্তবপাঠ শেষ হয়েছে, তিনি স্তবরাজের মহাত্ম্য পাঠ করছেন —

ইদং পুণ্যং পবিত্রঞ্চ সর্বদা পাপনাশনম্।
যোগদং মোক্ষদঞ্চৈব স্বর্গদং তোষদন্তথা।।

অর্থাৎ এই পবিত্র স্তব সর্বদা পুণ্য উৎপাদন ও পাপনাশ করে এবং যোগ মোক্ষ স্বর্গ ও সন্তোষ দান করে থাকে।

এবমেতৎ পঠন্তে য একভক্ত্যা তু শংকরম্।
যা গতি সাংখ্যযোগানাং ব্রজন্ত্যেতাং গতিং তদা।।

যাঁরা ভক্তিপূর্বক মহাদেবের উদ্দেশ্যে এই স্তব পাঠ করেন, সাংখ্যজ্ঞানী ও যোগসিদ্ধ পুরুষদের যে রকম গতি হয়, তাঁরাও অন্তিমে সেই রকম গতি লাভ করে থাকেন।

স্তবমেতং প্রযত্নেন সদা রুদ্রস্য সন্নিধৌ।
অব্দমেকং চরেদ্ ভক্তঃ প্রাপ্নুয়াৎ ঈপ্সিতং ফলং॥

ভক্তপুরুষ এক বছর যাবৎ প্রত্যহ মহাদেবের নিকটে যত্নপূর্বক এই স্তব পাঠ করলে তাঁর অভীষ্ট ফল লাভ করতে পারবেন।

আজও ঝোপড়ার ভেতরটা সুগন্ধিতে ভরে আছে। আমি তাড়াতাড়ি নিজের জিনিযপত্র গুছিয়ে গাঁঠরী বেঁধে ফেললাম। শৌচাদি ক্রিয়ার জন্য ঝোপড়ার বাইরে বেরিয়ে এলাম। সবেমাত্র সকাল হয়েছে, গাছপালা বিশেষতঃ নর্মদার মধ্যস্থল কুয়াশায় বেশ ঢাকা। নর্মদাকে স্পর্শ ও প্রণাম করে ঝোপড়াতে ফিরতে ফিরতে ভাবছি, আজও যদি সাধুজী পূজান্তে কালকের মত সমাধিস্থ হয়ে পড়েন, তা হলেও আজ চলে যাবো একটা চিঠি ইংরাজীতে লিখে রেখে। কিন্তু না, তা করতে হল না। এসে দেখি, তিনি পূজা শেষ করে উঠে পড়েছেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে বিদায় চাইলাম। তিনি আমাকে স্বস্তি বাচন জানিয়ে বললেন — 'আজ ১৭ই ভাদ্র, তোমার যাত্রা শুভ হোক। মা নর্মদাই তাঁর পরিক্রমাবাসীকে রক্ষা করে থাকেন। মহাদেব তোমার মঙ্গলবিধান করুন। চল, তোমাকে নর্মদার ধারে ধারে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিই। ওঁকার মান্ধাতা থেকে তুমি আট মাইল এগিয়ে এসেছ আর ন'মাইল এগিয়ে গেলেই তুমি মণ্ডলেশ্বর অতিক্রম করে তুমি যতই এগোবে, ততই পথ দুর্গম হতে দুর্গমতর হবে। সবসময় মনে রাখবে তুমি শূলপাণির ঝাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছো। পঞ্চাশ ক্রোশ দীর্ঘ এই ঝাড়ি পথ মুণ্ডমহারণ্য যা ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির চেয়ে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর। আজ মণ্ডলেশ্বর পৌঁছে দেখতে পাবে মণ্ডলেশ্বর মহাদেব। এই শিবলিঙ্গ দিনের বেলা একরকম রাত্রিতে আর একরকম। নর্মদাতটের প্রাচীন সিদ্ধ মহাত্মা কমলভারতীজীর একটা আশ্রম আছে। জানি না এখন ওখানে কে আছেন। পারলে সেই আশ্রমেই আশ্রয় নেবে। বেলা ৩টার পর আর কিছুতেই পরিক্রমার ঝুঁকি নেবে না।'

আমি পুনরায় মহাত্মাকে প্রণাম জানিয়ে বললাম — দয়া করে আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখবেন। হাসতে হাসতে তিনি বললেন — ভঙ্গেঽপি হি মৃণালানামনুবধ্নাতি তন্তবঃ অর্থাৎ মৃণালকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করলেও যেমন তাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু সংলগ্ন থাকে তেমনি সাধুদের বন্ধুত্ব বা ভালবাসা ভেঙ্গে গেলেও অর্থাৎ বিচ্ছেদ ঘটলেও শেষ হয়ে যায় না। শিবমস্তু।

চিদাম্বরমজীর কাছে বিদায় নিয়ে যখন যাত্রা সুরু করলাম, তখন বেলা বোধহয় আটটা বেজে গেছে। একে ত এতদঞ্চলে দেরী করে সূর্য্য উঠে, তার উপর সাধুজী কথা বলতে বলতে অনেক দেরী করে দিলেন। আমি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি চিদাম্বরমজীরই কথা। বয়স বোধহয় পঁচাশী বা নব্বুই হবে। এই বয়সেও তিনি রাতভোর জেগে শিবের আরাধনা করে চলেছেন। নিজের চোখেই দেখে ত এলাম। যেদিন তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন, সেদিন তাঁর স্নানাহারের কোন ঠিক থাকে না। একা থাকেন, কোন সেবকও কাছে নেই। নর্মদাকে যে তপোভূমি বলা হয়, কথাটি বড় সার্থক। নর্মদাতটে এইভাবে কত যে তপস্বী লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির করাল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে অনাহারে অর্ধাহারে সাধনা করে চলেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

পথের মধ্যে হোঁচট খেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি বর্ষার জলে নর্মদা বেড়ে গিয়ে সামনের রাস্তাকে ঢেকে ফেলেছে। জল থৈ থৈ করছে। ধার ছেড়ে একটু উপর দিকে উঠে গিয়ে পথের রেখা খুঁজতে লাগলাম। উপরের দিকে সেগুন, জাগীর ও তাল গাছের জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। ছোট বড় পাথরের চাঙড়ে ঢাকা। পাথরের খাঁজে খাঁজে অজস্র লতাগুল্ম জন্মে পথ ঢাকা পড়েছে। হাতের লাঠি দিয়ে লতাগুল্ম সরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় আধঘন্টা হেঁটে একটা পার্বত্য পথের রেখা খুঁজে পেলাম। ডানদিকে পাহাড়ের ঢাল চেপে হাঁটতে হাঁটতে দূরে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রাম চোখে পড়ল। মাঠের মধ্যে গরু, মহিষ এবং মানুষজন ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে মনে হল। কিন্তু নর্মদাকে ত চোখে দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে কি পথ ভুল করলাম? ভাবলাম সত্যিই যদি পথ ভুল করে থাকি, তাহলে এখন হেঁটে কি লাভ ? যতই হাঁটব, তত ত গন্তব্যস্থল হতে দূরে চলে যাবো অন্য ঘুর পথে, তার চেয়ে একটা গাছতলায় বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক্। একটু অপেক্ষা করা যাক্ কারও দেখা পাই কিনা! প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরে দেখলাম দুজন পাহাড়ী লোক কথা বলতে বলতে এই পথেই উঠে আসছে, আমারই কাছাকাছি। তাদের কালো চিক্ চিক্ দেহের বর্ণ। লৌহদৃঢ় পেশীবহুল শরীর এবং হাতে বড় বড় টাঙ্গি দেখে অনুমান করলাম তারা নিশ্চয়ই ভীল হবে। শুনেছি ভীলরা সাধারণতঃ দুর্ধর্ষ ডাকাত হয়। তা আমার কাছে আর কী সম্পদ আছে যে নেবে! আমি চুপ করে বসে রইলাম। তারা কাছাকাছি আসতেই আমি হিন্দীতে তাদেরকে পথের নিশানা দেখিয়ে দিতে বললাম। তারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি নর্মদার কিনার হতে ছিটকে দূরে এসেছি। কোন্ রাস্তা দিয়ে গেলে নর্মদা কিনারে গিয়ে পৌঁছতে পারব? তাদের মুখ দেখে মনে হল, আমি যেন গ্রীক ভাষায় কথা বলছি! তারা আমার ভাষা আদৌ বুঝছে না। বাধ্য হয়ে তখন বারবার উচ্চারণ করতে থাকলাম মণ্ডলেশ্বর, মণ্ডলেশ্বর, মর্কটি সংগম, মর্কটি সংগম। এবার তাদের মুখে হাসি ফুটল বলে মনে হল। আমাকে ইঙ্গিত করল তাদের সঙ্গে যেতে। আমি ঝোলা, গাঁঠরী, লাঠি এবং কমণ্ডলু হাতে তাদেরকে অনুসরণ করে হাঁটতে লাগলাম। আমি গাছপালায় ঢাকা একটা উঁচু টিলার মত জায়গায় এসে পড়েছিলাম। তাদের সঙ্গে যেতে যেতে দেখতে পেলাম আমাদের সামনে সাপের মত আঁকা-বাঁকা একটা পথ্ চলেছে আগে আগে — কখনও পাহাড়ের গা বেয়ে, কখনও সংকীর্ণ উপত্যকায় নেমে আবার কখনও বা দূর দিকচক্রবালে অদৃশ্য হয়ে পথটা বরাবর চলেছে আগে আগে। পথের ঝোপ বা বর্ষায় হঠাৎ বেড়ে ওঠা ছোট ছোট গাছপালা তারাই টাঙির ঘায়ে সাফ করে এগিয়ে চলেছে। এইভাবে প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর কলনাদিনী নর্মদার ধারা আবার দেখতে পেলাম। নর্মদার দর্শন পেয়ে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম যে এখন যদি আমার সঙ্গীরা তাদের গাঁয়ে চলেও যায়, তবুও নর্মদার তটরেখা ধরে, মা নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে আমি মণ্ডলেশ্বরে গিয়ে পৌঁছে যেতে পারব। যাইহোক, তারা কিন্তু আমাকে ছেড়ে গেল না। বেলা বোধহয় বারটা নাগাদ তারা আমাকে নর্মদাতটের একটি মনোরম পল্লীতে এনে একজনের বাড়ীতে হাজির করল। দূর থেকে আগেই দেখতে পাচ্ছিলাম পাথরের একটি সুউচ্চ শিবমন্দির। যে বাড়ীটিতে তারা আমাকে আনল, সেখানে একজন ষাট বা পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খাটিয়াতে বসে তামাক টানছেন, গলায় উপবীত ও রুদ্রাক্ষমালা ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্র। সে

পাহাড়ী দুজন লোক সেই ব্রাহ্মণটিকে কিছু বলল। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করে তাদেরকে বিদায় দিলেন। আমাকে বসার জন্য চৌকি দিয়ে ভেতর বাড়ীতে হাঁক পাড়লেন — এক পরিক্রমাবাসী পধারেঁ। গোড় ধোনেকা পানি দে যাও। আমাকে বললেন — কি ধারসে আ রহা হৈ। আমি উত্তর দিলাম — খেড়ীঘাটসে।

— করীব ন মিল রাস্তা আনেসে এ্যাতনা টায়েম (time) ক্যায়সে লাগ গিয়া?

আমি যে পথ ভুল করেছিলাম তাও তাঁকে জানালাম। যে পাহাড়ী দুজন আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছিল তাদের প্রশংসা করে বললাম — পরস্পরের ভাষা না জানায় দুজন ভীলকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ পেলাম না।

— উহ্ লোগ্ ভীল নেহি হ্যায়। হো জাতীয় হ্যায়। ভীল লোগ দুর্দান্ত হোতি হ্যায়। লেকিন হো আদমী বহোৎ সিধে-সাধা আচ্ছাই হ্যায়। উহ্লোক হমারা মণ্ডলেশ্বরকে পাশমেঁ নিবাস করতা হৈ।

আমি তাঁদের জলে মুখ হাত ধোওয়ার কাজ করলাম না। নর্মদায় যেতে চাইলাম স্নান করতে। বৃদ্ধ তাঁর ছেলেকে আমার সঙ্গে দিলেন এবং বললেন — আজ ঋষিপঞ্চমী, কোথাও কোথাও আজকের দিনে ষট্পঞ্চমীর ব্রতও পালন করা হয়। একে আপনি পরিক্রমাবাসী তার উপর অতিথি। আমার ধর্মপত্নী ঐ দেখুন দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছেন, আজ তিনি ঋষি পঞ্চমীর ব্রত করেছেন, আপনাকে আজ আমার এখানেই ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমি দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম কপাটের আড়ালে থেকে ব্রাহ্মণী মা তাঁর দুটি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর উদ্দেশ্যে বললাম — মা, আপনি আমার মায়ের বয়সী; আপনাকে হাত জোড় করতে হবে না। আমি আপনার প্রদত্ত ভিক্ষাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করব।

ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম রামদয়াল, আমারই সমবয়সী। আমি তাকে প্রশ্ন করে জেনে নিলাম, তার পিতার নাম শ্রীভট্টনারায়ণ ভার্গব। পণ্ডিত ব্যক্তি। এখানে যে কমলভারতীজীর আশ্রম ছিল সেটি কোথায়? জিজ্ঞাসা করতেই সে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল প্রায় তিন-চারশ গজ দূরেই একটি একতলা পাকাবাড়ী, তার চারপাশে রয়েছে অনেকগুলি কুটীর। নর্মদাতে স্নান সেরে মণ্ডলেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে ফিরে এলাম পণ্ডিত ভট্টনারায়ণজীর বাড়ীতে।

আসন পেতে আমাকে বসিয়ে সেই ব্রাহ্মণী আমার কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে আমার মাথায় চার পাঁচটি ফুল দিলেন। ভোজ্য বস্তু সাজিয়ে দিলেন রুটি শব্জী ও ঘোল। খেয়ে উঠে দেখি বাইরের বারান্দার কোণের একটা ঘরে আমার গাঁঠরী খুলে সেই ব্রাহ্মণী মা আমার কম্বল ও চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, এ ত কেবল অতিথি সেবা নয়, এ ত অতিথিকে পূজা। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের রীতি ছিল এইরকম। ভগবান মনুর বিধান — অতিথিঃ নারায়ণঃ। অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানেই সেবা পূজা করতে হয়। যে তাঁকে উপেক্ষা বা অনাদর করে তাকে নরকগামী হতে হয়। মহাভারতে অতিথি পরায়ণতার অনেক উপাখ্যান আছে। প্রচীন ভারতের চিরাচরিত রীতি অনুসারে সদ্ গৃহস্থ মাত্রেই অতিথিকে আজও সম্মানের চক্ষে দেখে থাকেন, সাধ্যমত সেবাযত্নও করেন। অতিথি সেবা আমাদের কৃষ্টি র অঙ্গ। তবে অতিথিকে শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে অর্চনা আজকাল আর দেখা যায় না। কিন্তু নর্মদাতটে এসে সে অভিজ্ঞতাও আমার হল। শিবদয়ালের মাতাঠাকুরাণীর

মত ধর্মনিষ্ঠ স্নেহব্রতা মহিলারাই ভারতীয় কৃষ্টির ধারাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ভট্টনারায়ণজীর সাড়া পেয়ে আমি ঘর থেকে উঠে এসে বাইরে বসলাম। তিনি বলতে লাগলেন — আপ্ মহাত্মা কমলভারতীজী কা বারেমেঁ লেড়কাকো পুছা থা, হামনে শোনা হৈ। কমলভারতীজী ছিলেন নর্মদা মাতাজীর বর পুত্র। নানারকম যোগসিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত্ব ছিল। প্রায় শ' সাল বীত গয়া, আভিতক্ হিয়াঁসে অমরকন্টক, অমরকণ্টকসে রেবাসংগম, উনকা প্রভাও ফেলা হুয়া হ্যায়। তিনিই নর্মদা পরিক্রমাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁর ঝাণ্ডা নিয়ে গৌরীশংকরজীও নর্মদা পরিক্রমার ধারাকে তপস্যার অঙ্গ হিসাবে পরিণত করেছিলেন। কমলভারতীজী এখানে আশ্রম স্থাপন করে কিছুকাল বাস করেন, পরে চব্বিশ অবতারেও একটি আশ্রম স্থাপন করে অন্তিমকাল পর্যন্ত সেখানে বাস করে নর্মদা সলিলেই মহাসমাধি গ্রহণ করেন। আমার ছেলে বোধহয় আপনাকে তাঁর আশ্রম দূর থেকে দেখিয়েছে। মূল আশ্রমের চিহ্নমাত্র নেই। রেওয়ার তৎকালীন মহারাজা এবং ইন্দোরের হোলকার কমলভারতীজীকে গুরুবৎ মান্য করতেন। তাঁদের প্রদত্ত প্রচুর ভূ-সম্পত্তি এখনও আছে, এখানে তাঁর নামাঙ্কিত আশ্রমের মোহান্ত শ্রীনগেন্দ্রভারতীজী। মোহনভারতী নামে আর একজন সন্ন্যাসী এখন মোহন্তগিরির দাবীদার হয়ে মোকর্দমা করছেন। এখন নগেন্দ্রভারতজী এখানে নেই। তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদেরকে নিয়ে ভারোচের পথে ছদিন আগে যাত্রা করেছেন। আশ্বিন মাসের শেষে বোধহয় ফিরে আসবেন। চব্বিশ অবতারেও কমলভারতীজীর একটি আশ্রম আছে। সেই আশ্রমের দখল নিয়েছেন মোহনভারতীজী। বিশাল ভূ-সম্পত্তি এখন ছ'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এইজন্য পণ্ডিতরা সাবধান বাণী উচ্চারণ করে গেছেন —

'সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভা বিভবা ভবেহস্মিন্'

অর্থাৎ পার্থিব ভূ-সম্পত্তি বৈভবাদি মিথ্যা, তা সন্ধ্যাকাশের মতই বিভ্রম উৎপাদন করে। এখন চলুন মন্দিরে আরতি সেরে আসি। আমিই ভগবান মণ্ডলেশ্বর মহাদেবের পুরোহিত। আপনি ত নিশ্চয়ই চব্বিশ অবতার হয়েই আসছেন। সেখানে মন্দিরের পুরোহিত শ্রীমান উদয়নারায়ণ ভার্গব, আমারই ছোটভাই। আমরা সাজোত্রা গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ। গুজরাটে আমাদের গোত্রীয় বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন।

তাঁর সঙ্গে মন্দিরে গেলাম আরতি দেখতে। যেতে যেতেই বললেন — আপনি ত সকালে স্নানের পর মণ্ডলেশ্বরজীকে নিশ্চয়ই দর্শন করেছেন। তখন তাঁকে নিশ্চয়ই দেখেছেন নীলাম্বর মূর্তিতে। এখন দেখবেন চলুন, তাঁর রূপের পরিবর্তন হয়েছে, তাঁকে দর্শন করবেন শ্বেতাম্বর মূর্তিতে। মণ্ডলেশ্বর মহাদেব এতই জাগ্রত যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দুবার স্বতঃই তাঁর রূপ ও রঙ বদলে যায়।

মন্দিরে প্রায় পনের ষোলজন লোকের ভীড় রয়েছে। আমরা মন্দিরে পৌঁছাবার আগেই আর একজন ব্রাহ্মণ এসে আরতির সব আয়োজন করে রেখেছেন। ভট্টনারায়ণজী আরতি করতে আরম্ভ করলেন। গালবাদ্য করে ববম্-ববম্ ধ্বনি দিতে দিতে দেখলাম তিনি পায়েও তাল ঠুকছেন! ঘণ্টা শিঙা ডম্বরুর নাদের সঙ্গে তাথ-তাথৈ-তাথৈ, তা-তা-থৈ, তা-তা-থৈ ছন্দ যেন অল্প সময়ের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল। লক্ষ্য করে দেখলাম, মধ্যাহ্নের দৃষ্ট শিবলিঙ্গের বর্ণ নীলাভ দেখাচ্ছে না, শ্বেতাভই দেখাচ্ছে। রাত্রি প্রায় আটটা বেজে গেল আরতি শেষ হতে। ভক্তরা চলে যাবার পর তিনি নর্মদার জলে মণ্ডলেশ্বরকে ভাল করে স্নান করিয়ে একবাটি

চন্দন সযত্নে ঢেলে দিলেন শিবলিঙ্গের উপর। এর পারিভাষিক নাম 'হিমচন্দন'। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরেও দেখেছি সান্ধ্য-আরতির পর এইভাবে বিশ্বনাথেরও হিমচন্দন করা হয়।

মন্দিরের দরজা বন্ধ করে আমরা দুজনে ফিরে এলাম তাঁর বাড়ীতে। তাঁর যে আরতির পদ্ধতি দেখলাম, তা খুবই পরিশ্রম-সাপেক্ষ। তিনি তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছেন। তিনি আমার হাত ধরে ভেতর দেউড়িতে প্রবেশ করলেন। ভেতর-বাড়ীর চারদিকে প্রশস্ত বারান্দা, মাঝখানে মস্ত উঠোন। একটি খাটের উপর তিনি বসলেন। শিবদয়াল সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্ত করছিল, সে দৌড়ে এসে তার পিতাজীকে পাখার বাতাস করতে লাগল। ব্রাহ্মণী মা তামাক সেজে গড়গড়াটা সামনে রেখে গেলেন। শিবদয়াল অনুযোগ করতে লাগল — এই দেখুন না, আমি কতদিন ধরে বলছি, তুমি মণ্ডলেশ্বরের পূজারতির ভার উচিত শর্মার হাতে ছেড়ে দাও। মন্দিরে উচিত শর্মাকে দেখে থাকবেন। তিনিও বাবার ভক্তিমান ছাত্র। আমাকে পূজারতি করতে দেবেন না, কারণ তাহলে আমার দুবেলা পড়ার ক্ষতি হবে। বুড়ো বয়সে এত ধকল কি সহ্য হয়, আপনিই বলুন?

আমি আর কি উত্তর দেব? ব্রাহ্মণকে মহাদেবের পূজা করতে নিষেধ করি কি করে? কাজেই আমি নীরব থাকলাম। ভট্টনারায়ণজী দু'চারবার গড়গড়ায় সুখটান দিয়ে বলতে লাগলেন, যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমি মরতে মরতে হলেও নিজের হাতেই দেবতার সেবা করে যাব। মণ্ডলেশ্বরজী শুধু ত আমার ইষ্ট দেবতাই নন, তিনি আমার গৃহদেবতাও বটেন। আমি গৃহস্থ। নিত্য দেবসেবা গৃহস্থের ধর্ম — গৃহস্থস্য নিত্যোঽয়ং বিধিঃ। আমি মহাকবি শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক নামক সংস্কৃত নাটক থেকেই এই উদ্ধৃতিটি দিলাম। ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন পাণিনি ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা শেষ হলে তোমাকে আমি যখন কাব্য পড়াব, তখন তোমাকে এই মৃচ্ছকটিক পড়তে হবে। মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়কের নাম চারুদত্ত। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, উজ্জয়িনীর বিশিষ্ট নাগরিক। একসময় তিনি ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন কিন্তু পণই-জন-সংকামিদবিহব (প্রণয়িজন সংক্রামিত বিভবস্য) অর্থাৎ দরিদ্র বন্ধুজনকে দান করতে করতে তিনি নিঃস্ব হয়ে গেছেন। একমাত্র সম্বল রয়েছে তাঁর জীর্ণ বিশাল বাড়ীটা। সংসারে বড়ই অভাব, বন্ধুবান্ধবও তাঁকে ত্যাগ করেছে। যে গৃহ একসময় অতিথি সমাগমে মুখর থাকত, সেই গৃহে এখন আর কোন অতিথি আসে না। সেই নিয়ে তিনি তাঁর বয়স্য বিদূষকের কাছে একদিন দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। বিদূষক তাঁকে বোঝালেন — বন্ধু, এই সব নীচ অর্থলোভী অতিথিরা সুবিধাবাদী রাখাল বালকের মত যে মাঠে যতক্ষণ সুবিধে পায়, সেই মাঠে ততক্ষণই থাকে। তার উত্তরে চারুদত্ত তাঁকে বললেন — আজ আমার ঐশ্বর্য নেই বলে যে আমি দুঃখিত তা ঠিক নয়। ভাগ্যক্রমেই ধন আসে ধন যায়। শুধু দুঃখটা কী জান? ধনসম্পদ চলে গেলে লোকের কাছ হতে স্নেহ-ভালবাসা আর পাওয়া যায় না — নষ্টধনাশ্রয়াসা সৎসৌহৃদাদপি জনাঃ শিথিলীভবন্তি! যাইহোক বন্ধু! আমি গৃহদেবতার পূজা শেষ করেছি, তুমি এখন রাজপথের চৌমাথায় গিয়ে মাতৃপূজার নৈবেদ্য দিয়ে এস।

বিদূষক পূজা দিতে যেতে চাইলেন না। চারুদত্ত তার এই অনীহার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিদূষক উত্তর দিয়েছিল — জদো এব্বং পূইজ্জন্তো বি দেবদা ণ দে পসীদান্তি, তা কো' গুণো দেবেসু অচ্চিদেসু? বিদূষকের এই প্রাকৃত সংলাপের শুদ্ধ সংস্কৃত হল — যত এবং পূজ্যমানা

অপি দেবতা ন তে প্রসীদন্তি তৎ কো গুণো দেবেষু অর্চিতেষু? অর্থাৎ এত পূজাতেও যদি দেবতা প্রসন্ন না হন তাহলে মিছিমিছি দেবতার পূজা করে কি লাভ?

এর উত্তরে এইমাত্র আমি যে উদ্ধৃতিটি শুনিয়েছি, চারুদত্ত তাই বলেছিলেন তাঁর প্রিয় বয়স্যকে। তিনি বলেছিলেন — বয়স্য! মা মৈবম, গৃহস্থস্য নিত্যোহয়ং বিধিঃ। বয়স্য, ও কথা বলো না, গৃহস্থ মানুষের এটা নিত্য কার্য, অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

তপসা মনসা বাগ্‌ভিঃ পূজিতা বলিকর্মভিঃ।
তুষ্যন্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতৈঃ?

অর্থাৎ শুদ্ধ দেহে, সভক্তি অন্তঃকরণে, প্রসন্নবাক্যে এবং প্রশান্ত এবং নৈবেদ্য দানে পূজা করলে দেবতারা সব সময়েই তুষ্ট হন, এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলে কী হবে?

প্রসঙ্গ শেষ করে পণ্ডিতজী আমাকে বললেন — রামদয়াল এবং তার গর্ভধারিণী সব সময়েই আমার শরীর নিয়ে ব্যস্ত, আমাকে তারা ভক্তি করে, ভালবাসে, বুড়ো হয়েছি, মহাদেবের পূজারতিতে আমার ধকল যথেষ্ট হয়, সেইজন্যই তারা বারবার উচিত শর্মাকে পূজার ভার দিয়ে দিতে বলে। রামদয়ালকে আমি পূজা করতে দিইনি, কারণ সকাল সাতটা হতে বেলা দশটা এগারটা পর্যন্ত আর সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত্রি আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত যদি পূজাতেই কেটে যায়, তাহলে পড়বে কখন। পূজার কালও যে সময়, পড়ারও সেইটি উপযুক্ত কাল। তাছাড়া উচিত শর্মা বা রামদয়াল যে কেউ হোক না কেন অন্য কারো হাতে কি নিজ ইষ্টদেবতার ভার দিয়ে আমি তৃপ্তি পাব? আমার দেবতাকে আমি আমার মত করে পূজা করি। তাতে যে শান্তি পাই , সে কি অন্যে করলে পাবো? মণ্ডলেশ্বর মহাদেব আমার শ্বাস প্রশ্বাসে জড়িয়ে আছেন। তাঁর একদিন পূজা না করলে আমি মরে যাব। আমি ব্রাহ্মণ; যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ এটি আমার নিত্যকর্ম, মহাকবি শূদ্রকও ত এই কথাই বলে গেছেন না?

রামদয়াল — বাবুজী! মৃচ্ছকটিককা কিস্যা শুনাইয়ে না! আজকা পাঠ হম আয়ত্ত কর লিয়া।

ভট্টনারায়ণজী — লেকিন ব্রহ্মচারীজীকা কোই নিত্যকর্মমেঁ দের ন হো যায়। আমি — না, না আমার কোন নিত্যকর্মে বাধা পড়বে না, আপনি গল্প বলুন, আমিও শুনতে আগ্রহী

সোৎসাহে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গল্প সুরু করলেন — মৃচ্ছকটিক একটি দশম অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক কুশীলবের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে চারুদত্ত, নগরনটী যৌবন-মদে-মত্তা বসন্তসেনা, তার দাসী মদনিকা, উজ্জয়িনীর রাজা পালক, ভাবী রাজা গোপ বালক আর্যক, রাজার শ্যালক অত্যন্ত খল প্রকৃতির শকার, চারুদত্তের সাধ্বীপত্নী ধূতা, বালকপুত্র রোহসেন, শর্বিলক নামে চৌর্যবিদ্যার পটু ব্রাহ্মণ যুবা, সে আবার মদনিকার প্রণয়ী, চারুদত্তের বয়স্য বিদূষক মৈত্রেয়, চারুদত্তের ভৃত্য চেট বা বর্ধমানক, শকারের দুই ভৃত্য বিট ও স্থাবরক এই ক'জনকে নিয়েই নাটকের গল্প দ্রুততালে আবর্তিত হয়েছে। আমি যত সংক্ষেপে পারি গল্পটা বলে যাচ্ছি। তবে নিজে নিজে না পড়লে এই বিরাট নাটকের রস সম্পূর্ণতঃ আস্বাদন করা সম্ভব নয়।

উজ্জয়িনী নগরীতে সেদিন বসন্তোৎসব। কামদেবের মন্দিরে সেদিন সবাই গেছেন, চারুদত্ত গিয়াছেন, বসন্তসেনাও। জন্মসূত্রে বসন্তসেনা গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করলেও গণিকাবৃত্তির উপর তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তিনি চারুদত্তের গুণাবলী শুনে মনে মনে তাঁকেই হৃদয় দান করে বসে

আছেন। কামদেবের মন্দিরে উভয়ে উভয়কে দেখে পঞ্চশরে বিদ্ধ হলেন। বসন্তোৎসব থেকে চারুদত্ত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকের তাড়া ছিল কিন্তু বসন্তসেনার ফিরতে রাত হল। তিনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন তখন রাজার শ্যালক শকার এবং তার যোগ্য সহচর বিট বসন্তসেনার পথ রোধ করল। শকার লম্পট, চরিত্রহীন। বসন্তসেনার প্রতি লোভ তার বহুদিনের, কিন্তু বারবণিতা হলেও বসন্তসেনা এই নিচকে কোনদিন প্রশ্রয় দেয়নি। শকার জানত চারুদত্তই বসন্তসেনার হৃদয়বল্লভ। পরস্পরের মধ্যে কথা-কাটাকাটি করতে করতে অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে বসন্তসেনা নিকটস্থ চারুদত্তের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। দ্বার রুদ্ধ ছিল কিন্তু সেই সময় চারুদত্তের বয়স্য মৈত্রেয় ও দাসী রদনিকা প্রদীপ হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল চতুষ্পথে পূজা দিতে মাতৃমন্দিরে। সেই সুযোগে বসন্তসেনা অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন। চারুদত্ত তাকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। চারুদত্তের 'মাননীয়া' সম্বোধন ও সসম্মান আপ্যায়নে আরও আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল বসন্তসেনা। রাত্রি বেলা সালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে পথচলা নিরাপদ নয় ভেবে বসন্তসেনা অলংকার গুলি পুঁটলি বেঁধে রেখে গেলেন চারুদত্তের কাছে।

এই ঘটনার দু'একদিন পরেই চারুদত্তের শয়নগৃহে সিঁধ কেটে ঢুকল এক চোর। তার নাম শর্বিলক ; সে ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত কিন্তু অতীব দরিদ্র, চৌর্য তার পেশা নয়, সে ভালবাসে বসন্তসেনার দাসী মদনিকাকে, কিন্তু মুক্তিমূল্য না দিলে সে মদনিকাকে আপন করে পাচ্ছে না। এই মুক্তিমূল্য সংগ্রহের জন্যই সে চুরি করতে এসেছে। চারুদত্ত নিদ্রামগ্ন। তার ঘরের মধ্যে বসন্তসেনার পুঁটলি-বাঁধা গহনাগুলো পেয়ে সে চুরি করে নিয়ে গেল। গহনার পুঁটলি নিয়ে গিয়ে শর্বিলক সমর্পন করল মদনিকার হাতে। গহনাগুলো চিনতে পেরেই মদনিকা তার প্রেমিককে বলল — এ তুমি করেছ কি ? এ ত আমাদের দেবীর অলংকার। তুমি আর্য চারুদত্তের লোক হিসেবে এ গহনা তাঁর কাছেই গিয়ে সমর্পণ করো। আড়াল থেকে সবই লক্ষ্য করেছিলেন বসন্তসেনা। শর্বিলক যখন বসন্তসেনার কাছে গিয়ে বলল — 'গৃহ জীর্ণ, তস্করের ভয়, অলংকার রক্ষা করা দুরূহ, তাই চারুদত্ত এই গহনা আমার হাতে দিয়ে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।' তখন বসন্তসেনা পরিহাস করে বললেন — 'আমার জবাবটাও নিয়ে যান।'

— কি জবাব?

— মদনিকাকে গ্রহণ করুন। আর্য চারুদত্ত আমাকে বলেছেন যে এই অলংকার নিয়ে যাবে তার হাতেই মদনিকাকে অর্পণ করবে।

শর্বিলক বসন্তসেনার উদারতায় অভিভূত হয়ে পড়ল।

পরদিন চারুদত্ত যখন সকালে উঠে জানতে পারলেন যে তাঁর প্রেমিকা বসন্তসেনার মূল্যবান গহনা সবই চোর চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এখন করেন কি? স্বামীর এই দুরবস্থা তাঁর সাধ্বীপত্নী ধূতা তাঁর রত্নহারটি দিলেন বিদূষক মৈত্রেয়ের হাতে বসন্তসেনাকে দিয়ে আসার জন্য। বিদূষক বারবণিতার ঐশ্বর্য ও সুরম্য অট্টালিকা দেখে চমকে গেলেন। যাইহোক বিদূষক চুরির কথা চেপে গিয়ে রত্নহারটি বসন্তসেনার হাতে দিয়ে বললেন — আমার বন্ধু চারুদত্ত পাশা খেলার ঝোঁকে আপনার সব অলংকার হারিয়েছেন। বিনিময়ে তিনি এই রত্নহারটি পাঠিয়েছেন। বসন্তসেনা বুঝলেন সব। তিনি

কেবল বিদূষককে বললেন — আপনার বন্ধুকে বলবেন, আমি রাত্রে তাঁর কাছে যাবো।

বসন্তসেনা সেইরাত্রে চারুদত্তের গৃহে এসে থাকলেন। তিনি আসার সময় পথে শুনে এসেছিলেন লোকের মুখে মুখে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ — দৈবজ্ঞ বলেছেন বর্তমান রাজা পালক রাজ্যচ্যুত হবেন। উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসবেন আর্যক নামে রাখাল বালক।

সকালে উঠে চারুদত্ত গেলেন পুষ্পকরণ্ডকে অর্থাৎ উপবনে। তাঁর অনুচর বর্ধমানককে বলে গেলেন একটি শকটে চাপিয়ে বসন্তসেনাকে সেই উপবনে নিয়ে যেতে। উপবনে যাবার আগে বসন্তসেনা দেখা করলেন ধূতাদেবীর সঙ্গে, তাঁকে তাঁর বহুমূল্য রত্নহার ফিরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু তার উত্তরে ধূতাদেবীর কণ্ঠস্বরে যা ধ্বনিত হল তা ভারতীয় স্বাধ্বী নারীর শাশ্বত হৃদয় বাণী। তিনি রত্নহার প্রত্যাখ্যান করে বসন্তসেনাকে বললেন, — অজ্জউত্তোজ্জেব মম আহরণবিসেসো — আর্যপুত্রই আমার বিশেষ অলংকার, প্রধান অলংকার। তিনি ঋণমুক্ত হলেই আমার শান্তি।

ধূতাদেবীর সঙ্গে কথা শেষ করেই গাড়ীতে চাপতে গিয়েই ঘটনার শ্রোত অন্যদিকে মোড় নিল। ভিড়ের চাপে চারুদত্তের গৃহের সামনে তখন অনেক গাড়ীই দাঁড়িয়েছিল। শর্বিলকের চেষ্টায় কারাগার থেকে পালিয়ে এসে উজ্জয়িনীর ভাবী রাজা সেই রাখাল বালক আর্যক পথে বেরিয়ে চেপে বসলেন বর্ধমানকের গাড়ীতে আর বসন্তসেনা ভুল করে দুর্বৃত্ত শকারের অনুচর স্থাবরকের গাড়ীতে চেপে বসলেন। স্থাবরক বসন্তসেনাকে এনে তুলল শকারের পুষ্পকোরণ্ডকে। শকার যেন হাতে চাঁদ পেল। শকার অনেকভাবে বসন্তসেনাকে ভজনা করল, কিন্তু বসন্তসেনা অটল। অতঃপর ভীতিপ্রদর্শন। অবশেষে বলাৎকারের চেষ্টা। সব কিছুতে অপারগ হয়ে শকার ক্রোধে অন্ধ হয়ে বসন্তসেনার গলা টিপে অচৈতন্য করে ফেলল। মৃত ভেবে বসন্তসেনার অচৈতন্য দেহ পাতার আড়ালে ঢেকে পালিয়ে গেল সে। শকটচালক পাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করে ফেলে সেইজন্য স্থাবরককে নিজের অট্টালিকার ছাদে নিয়ে গিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখল শকার।

বসন্তসেনার অচৈতন্য দেহ যেখানে পড়েছিল সেইখানেই ঘটনাচক্রে সংবাহক উপবনের সরোবরে স্নান করে কাপড় শুকোবার স্থান খুঁজছিল। এই সংবাহকের এক সময় পাশাখেলার নেশা ছিল। পাশায় দশ মোহর হেরে গিয়ে না দিতে পারায় তার খেলার সাথীদের হাতে বেদম মার খেয়েছিল সে। সে চারুদত্তের পুরাণো সেবক বলে বসন্তসেনা সে সময় তাকে দশ মোহর দান করে ঋণমুক্ত করেছিলেন। সেই ঘটনার পর সংবাহক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল। উপবনের মধ্যে বসন্তসেনাকে পড়ে থাকতে দেখে সে তার পুরাতন রক্ষাকর্ত্রীকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলল এবং নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিল তার বৌদ্ধমঠে।

এদিকে শকার ভাবল বসন্তসেনাকে হত্যার ঘটনা প্রকাশ পেলে তার বিপদ হবে, তাই সে আগে ভাগে গিয়ে ধর্মাধিকরণে অভিযোগ করল যে চারুদত্ত অলংকারের লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করেছে। বিচার সুরু হল। আনা হল বসন্তসেনার জননীকে। আনা হল চারুদত্তকে। বসন্তসেনার মা সাক্ষ্য দিলেন — চারুদত্ত স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তিনি হত্যা করতে পারেন না তাঁর কন্যাকে। কিন্তু শকার জোর দিয়ে বলতে লাগল চারুদত্তই হত্যাকারী। সুরু হল জেরা। চারুদত্তকে দুর্ভাগ্য যেন গ্রাস করতে চায়। এক সময় বসন্তসেনা বালক রোহসেনকে কতকগুলি সোনার গহনা দিয়েছিলেন, তার মাটির গাড়ীর পরিবর্তে সোনার গাড়ী তৈরী

করবার জন্য। কিন্তু অমন করে দান নেওয়া চারুদত্তের মর্যাদার বাধছিল। তিনি সেগুলি বসন্তসেনাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য বিদুষকের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। সেগুলি তার কাছেই ছিল, সেই অবস্থায় সে ছুটে এসেছিল বিচারালয়ে। শকারের অভিযোগ শুনে সে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে হাত পা নেড়ে প্রতিবাদ আরম্ভ করাতেই তার কক্ষ হতে খসে পড়ল অলংকারের রাশি। আর যায় কোথায়! বসন্তসেনার গহনা চারুদত্তের বন্ধুর কাছে দেখতে পেয়ে বিচারক সিদ্ধান্ত করলেন চারুদত্তই বসন্তসেনাকে অলংকারের লোভে হত্যা করেছেন। তিনি রায় দিলেন — মৃত্যুই এর দণ্ড, তবে স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধানানুসারে ব্রাহ্মণের মৃত্যুদণ্ড হয় না। চারুদত্তকে নির্বাসিত করা হোক। এই খবর শুনে শকারের ভগ্নিপতি রাজা পালক স্বয়ং বিচারকের রায় বাতিল করে হুকুম পাঠালেন — ওকে শূলে দাও।

দুজন চণ্ডাল চারুদত্তকে নিয়ে চলল বধ্যভূমিতে। নগরীর পথে পথে প্রজাদের ক্ষোভ ও দুঃখ ফেটে পড়তে চাইছে। চারুদত্তের সদাশয়তা, ধর্মনিষ্ঠা ও নানা সদ্‌গুণের অনুস্মরণে সকলেরই চোখ অশ্রুসিক্ত। স্থাবরক শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থতেই শকারের বাড়ীর ছাদ থেকে চীৎকার করে আসল সত্য সকলের কাছে ব্যক্ত করল। জনতার উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। চণ্ডালেরা রাজাদেশে স্বকার্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন চারুদত্ত, সামনে দাঁড়িয়ে বালকপুত্র রোহসেন সজলনেত্রে। এই নিদারুণ সংবাদ শুনে ভিক্ষু সংবাহকের সঙ্গে দৌড়ে এসেছেন বসন্তসেনা বৌদ্ধমঠ থেকে। যে বসন্তসেনার হত্যাপরাধে চারুদত্তকে শূলে চাপানো হবে, সেই বসন্তসেনাকে সশরীরে উপস্থিত দেখে ঘাতকের উদ্যত হস্ত নিরস্ত হল যেন মন্ত্রবলে। আবার ঘটনার চমক। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করল শর্বিলক। তিনি অধীরকণ্ঠে ঘোষণা করলেন — এইমাত্র কিছুক্ষণ আগে আর্যক অত্যাচারী শাসক পালককে হত্যা করে উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেছেন। নূতন রাজা তাঁর একসময়ের উপকারী বন্ধু চারুদত্তকে মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বেণানদীর তীরে বিস্তীর্ণ রাজ্য তিনি দান করেছেন চারুদত্তকে। সর্বসমক্ষেই তিনি বসন্তসেনাকে সম্বোধন করে বললেন — আর্যে বসন্তসেনে, পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূশব্দেন অনুগৃহ্নাতি — আর্যা বসন্তসেনা, রাজা খুশী হয়ে আপনাকে বধূ শব্দের দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

ওদিকে স্বামীর আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ধূতাদেবী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছিলেন। বসন্তসেনা এবং অন্যান্য অনেকেই তাঁকে এই সুসংবাদ দিয়ে রক্ষা করলেন। ধূতাদেবী বুকে টেনে নিলেন বসন্তসেনাকে।

এইভাবে সবই ত সুন্দরভাবে ঘটল কিন্তু প্রজাদের রোষ ফেটে পড়ল শকারের উপর। পৌরজন চিৎকার করে বলতে লাগল — ব্যাপাদয়ত, কিং নিমিত্তং পাতকী জীব্যতাম্। ওকে হত্যা কর, হত্যা কর, এমন পাপী বেঁচে থাকবে কেন?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শকার তখন চারুদত্তের পায়ে পড়ে তাঁর কৃপাভিক্ষা করলে, জনতার মুখপাত্র হিসেবে শর্বিলক তখন বলছেন — অরে, অরে অপনয়ত। আর্য চারুদত্ত! আজ্ঞাপ্যতাম্ — কিমস্য পাপস্যানুষ্ঠীয়তাম্ — ওরে, তোরা একে সরিয়ে নে। আর্য চারুদত্ত! আপনি বলুন, এই পাপীকে কি করা হবে?

চারুদত্ত — কিমহং যদ্ব্রবীমি তৎ ক্রিয়তে? আমি যা বলব তা করা হবে?

শর্বিলক — কোঽত্র সন্দেহঃ? এ বিষয়ে সন্দেহ কী?

চারুদত্ত — সত্যম্?

শর্বিলক — সত্যম্।

চারুদত্ত — যদ্যেবং শীঘ্রময়মং ......যদি তাই হয় তাহলে শীঘ্র একে ....

শর্বিলক — কিং হন্যতাম্? বধ করা হবে?

চারুদত্ত — নহি নহি মুচ্যতাম্। না, না, মুক্তি দেওয়া হবে।

শত্রুঃ কৃতাপরাধঃ শরণমুপেত্য পাদয়োঃ পতিতঃ। শাস্ত্রেণ ন হন্তব্য। শত্রু যদি অপরাধ করে শরণার্থী হয়ে পায়ে পড়ে, তখন তাকে অস্ত্র দিয়ে মারতে নেই —

শর্বিলক — এবম্, তর্হি শ্বভিঃ খাদ্যতাম্। তাহলে কুকুর দিয়ে ওকে খাওয়ানো হোক।

চারুদত্ত — নহি, উপকারহতস্ত কর্তব্যঃ। না, উপকার দিয়ে তাকে প্রত্যাঘাত করতে হবে। তন্মুচ্যতাম্ — তাই ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

'মৃচ্ছকটিক' নাটকের গল্প শেষ হল। গল্প শেষ করেই পণ্ডিতজী বললেন — চারুদত্তের শেষ বাক্যটি লক্ষ্য করুন, এখানে চারুদত্তের মুখ দিয়ে মহাকবি শূদ্রক ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ঋষিজন পরীক্ষিত চিরকালীন সত্যকে প্রকাশ করেছেন — উপকারহতস্ত কর্তব্যঃ অর্থাৎ কোন অপকারী খলের অপকার করে প্রত্যাঘাত দেওয়া যায় না। বিনিময়ে তার উপকার করে তাকে উদারতা দেখালেই তবে তাকে যথার্থ প্রত্যাঘাত করা যায়, কারণ এতে খলের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে। তার খলতা বৃত্তি নষ্ট হয়। এ ছাড়াও দেবতার নিত্য সেবা, নিত্য অতিথি সেবা এবং শরণাগতকে সতত রক্ষা করা এবং শরণাগত শত্রুকেও ক্ষমা করা যে আমাদের চিরন্তন আর্য সংস্কৃতি সে সব কথাও কবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই নাটকে।

এই নাটকে বহুতর অর্থবহ ও গভীর ভাবোদ্দীপক শিক্ষার কথা আছে। যেমন ধরুন শর্বিলক রাত্রে সিঁদ কেটে চারুদত্তের শয়নগৃহ হতে বসন্তসেনার গচ্ছিত অলংকার চুরি করে নিয়ে গেল, তার পরদিন সকালে উঠেই চারুদত্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁর পত্নী ধূতাদেবীর রত্নহারটি বসন্তসেনাকে দিয়ে আসার জন্য বন্ধু বিদূষককে অনুরোধ করলেন। বিদূষক তাঁকে বললেন, 'চার সাগরের সার এই মহামূল্য রত্নহারটি সামান্য মূল্যের অলংকারের পরিবর্তে দিয়ে দেওয়াটা মোটেই উচিত নয়। কারণ সে অলংকার আমরা ভোগও করি নি, আত্মসাৎও করি নি — চোরে নিয়ে গেছে। উত্তরে চারুদত্ত বলেছিলেন — 'না বন্ধু, তা ঠিক নয়। যে বিশ্বাস নিয়ে সে আমাদের কাছে সেটা গচ্ছিত রেখেছিল, আমি সেই বিশ্বাসের দাম দিচ্ছি —

যৎ সমালম্ব্য বিশ্বাসং ন্যাসোহস্মাসু তয়া কৃতঃ।
তস্যৈ তৎ মহতো মূল্যং প্রত্যয়স্যৈব দীয়তে॥ (তৃতীয় অঙ্ক, শ্লোক ২৯)

বিদূষক যা বলছিলেন তা হল হিসেবের কথা। হিসেবী মন এইভাবেই সব জিনিষের দাম কষে এবং বিচার করে। তার উত্তরে চারুদত্ত যা বললেন তা হল মনুষ্যত্বের কথা। মানুষের বিবেক মনুষ্যত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

অষ্টম অঙ্কের প্রথমেই শূদ্রক বৌদ্ধ ভিক্ষু সংবাহকের মুখ দিয়ে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন —

শিরো মুণ্ডিতং তুণ্ডং মুণ্ডিতং চিত্তং ন মুণ্ডিতং কিমর্থং মুণ্ডিতং।
যস্য পুনশ্চ চিত্তং মুণ্ডিতং সাধু সুষ্ঠু শিরস্তস্য মুণ্ডিতম্॥

অর্থাৎ সাধু ! তুমি মাথা কামিয়েছ, মুখ কামিয়েছ, কিন্তু মন ত কামাওনি! তাহলে আদৌ কামালে কেন? দেখ, যার মন ঠিকমত কামানো, তার মাথা আর মুখও ঠিকমত কামানো। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিই বড় কথা। চিত্তশুদ্ধি না হলে কেবল রাঙানো কাপড় পরে, সাধুর বেশ ধারণ করলে কোন লাভ নেই।

পণ্ডিতজী গল্প শেষ করতেই রামদয়াল প্রশ্ন করল — বাবুজী, ইহ্ নাটককী 'মৃচ্ছকটিকম্' নাম কেঁও হুয়া? ইস্‌কা মতলব ক্যা?

পণ্ডিতজী — মৃচ্ছকটিকম্ কা মতলব — মৃৎ +শকটিকা = মৃচ্ছকটিকা অর্থাৎ মাটির ছোট শকট বা গাড়ী। ষষ্ঠ অঙ্কে একটি মাটির ছোট গাড়ীর বৃত্তান্ত আছে। চারুদত্তের বালকপুত্র রোহসেন পাশের বাড়ীর এক ধনী বণিকের পুত্রের সঙ্গে একটি ছোট্ট সোনার গাড়ী নিয়ে খেলছিল। খেলার শেষে সে ঐটি নিয়ে যাবার পর রোহসেন কান্না জুড়ে দিল। চারুদত্তের দাসী রদনিকা একটি মাটির গাড়ী এনে তাকে সামলাবার চেষ্টা করল কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ঘটনাস্থলে বসন্তসেনা হাজির ছিলেন। তিনি প্রেমিকের পুত্রের মনোরঞ্জনের জন্য গয়নাগুলো খুলে দিলেন সোনার গাড়ী তৈরী করবার জন্য। এই গয়না অতঃপর নাটকে দুর্বার গতি এনেছিল এবং মাটির গাড়ীই গয়না দেবার মূল বলে নাটকের নাম হল মৃচ্ছকটিকম্।

আমি — সোনার গাড়ীর জন্য যে গয়না দেওয়া হল, তা যদি রূপকটিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে থাকে তবে সুবর্ণশকটিকম্ নাম হল না কেন? সুবর্ণ ত দেখছি এই নাটকের বহু কর্মের মূলে। মদনিকাকে পাবার জন্য সুবর্ণ চুরি করেছিল শর্বিলক ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও। চারুদত্তকে বসন্তসেনার গহনা চুরির মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল শকার। চারুদত্তই বসন্তসেনাকে গয়নার লোভে হত্যা করেছে, এই অভিযোগের বিচারকালে বিদূষকের কাছ হতে গয়না বেরিয়ে পড়ায় সেই সোনার গয়নাকেই বসন্তসেনা-হত্যার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে ধরে বিচারক চারুদত্তকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। কাজেই আমার মনে হয় সুবর্ণশকটিকম্ নামটিই নাটকের যথোপযুক্ত নাম হত।

পণ্ডিতজী — না, তা হত না। এই নাটকটি মন দিয়ে পড়লেই দেখতে পাবেন, অতিথি ও বন্ধু-বান্ধবকে দান করে করেই চারুদত্ত যে দরিদ্র হয়ে গেছলেন, এ কথা নাট্যকার বারবার বলেছেন। ঐ দারিদ্র্য চারুদত্তের বিত্তকে হরণ করেছে কিন্তু তাঁর চিত্তকে করেছে বড়। একাধিকবার বসন্তসেনা বলেছেন এই উদারতা ও মহত্ত্বের জন্যই তিনি চারুদত্তকে এত ভালবাসেন। ঐ মাটির গাড়ী নামটি প্রতিপাদন করছে চারুদত্তের এত নিঃস্বতা। এক সময় অনেক সোনার গাড়ী দেবার ক্ষমতা যাঁর ছিল, আজ মাটির খেলনাই তাঁর একমাত্র সন্তানকে দেয়। অথচ এই দরিদ্রের পায়েই ধনজনযৌবনমতী বসন্তসেনা তনুমনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন — এতে তাঁর প্রেমের গভীরত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আপনাদের বাংলাদেশের চণ্ডীদাসজী যেমন রজকিনীর প্রেমের মধ্যে 'নিকষিত হেম' আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনই শূদ্রকও সামান্য গণিকা বসন্তসেনার প্রেমের মধ্যে নিকষিত হেমের দর্শন পেয়েছিলেন। এইজন্য মৃচ্ছকটিকম্ নামটিই উপযুক্ত।

আমি — পণ্ডিতজী, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আর একটা বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই। দশম অঙ্কে এই নাটক যখন সমাপ্তির মুখে তখন আপনার কাছেই শুনলাম, শর্বিলক বলেছিলেন : আর্যে বসন্তসেনে, পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূ শব্দেন

অনুগৃহ্নাতি — আর্যে বসন্তসেনা, রাজা আর্যক খুশী হয়ে আপনাকে বধূ শব্দের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। ফলত রাজার অনুমোদন পেয়েই চারুদত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সিদ্ধ হয়েছিল। সমাজে গণিকার বিবাহ আগেও ছিল না, এখনও নেই। তাহলে মহাকবি শূদ্রক কি তাঁর নাটকে এই দুঃসাহসিক কর্ম সম্পাদনের ছবি এঁকে এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে নোংরা জীবনযাপন করেও যারা পংক্তিতে উঠতে চায়; সমাজ তাদেরকে গ্রহণ করুক, স্বীকৃতি দিক্?

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ পণ্ডিত ফোঁস করে উঠলেন। বললেন — আমাদের সনাতন ভারতবর্ষের সমাজবিধি ভগবান মনু ও অন্যান্য সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, কোন কবি বা নাট্যকারের কথায় নয়।

আলোচনা শেষ হল। রামদয়াল লণ্ঠন নিয়ে আমাকে বাইরে শোবার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। আমি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম, সহজে ঘুম এল না, ধাবড়ী কুণ্ডের মহাত্মা সম্বিদানন্দজীর কথা মনে উদয় হল। এই সদাশয় সাধু আমাকে সংস্কৃত কাব্যের কথা ও কাহিনী অনেক শুনিয়েছিলেন। মহাকবি ভারবির কিরাতর্জুনীয়ের আলোচনা শেষ করে তাঁর ইচ্ছে ছিল আমাকে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক শোনাবেন। কিন্তু তার অবকাশ তিনি পাননি। মনের অস্থিরতায় তার আগেই আমি চলে এসেছি। কিন্তু মা নর্মদার কি দয়া! তিনি আমাকে এখানে এমন এক পণ্ডিতের আশ্রয়ে এনে ফেললেন যে তিনিও কাব্যরসিক। মৃচ্ছকটিকের কথা আমার শোনা হয়ে গেল! মা নর্মদার ষড়ক্ষরী মহামন্ত্র জপ করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিনের ভোরে উঠে শৌচাদি সেরে নর্মদার ঘাটে গিয়ে দেখি পণ্ডিতজী স্নান করছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন — আপ্‌ভি নাহা কর মন্দিরমেঁ আইয়ে। কাল সামকা বখৎ মণ্ডলেশ্বরজীকা শ্বেতাম্বর রূপ আপ্‌না আঁখমে দেখ্যা, আভি যা কর নীলাম্বর দেখেগা। আপ্‌ পূজা করনেকা বাদ হম পূজামেঁ বৈঠেগা।

স্নান তর্পণ সেরে আমি মন্দিরে গিয়ে দেখলাম সত্যই শিবলিঙ্গ নীলাম্বর রূপ ধারণ করেছেন। উচিত শর্মা চন্দন ঘষছিলেন, আমাকে চন্দনপিঁড়িটা এগিয়ে দিতেই আমি চন্দন ঘষে নিয়ে শিবলিঙ্গের পূজা সেরে নিলাম। এবার পণ্ডিতজী পূজায় বসলেন। আমি পণ্ডিতজীর বাড়ীতে গিয়ে ঝোলা হতে সেই তণ্ডিকৃত মহাদেবের স্তবরাজ, যা প্রলয়দাসজী দয়া করে ওঁকারেশ্বরে আমাকে দিয়েছিলেন, সেই পুঁথিটি এনে মন্দিরের পেছনে বসে পাঠ করতে সুরু করলাম। পাঠ যখন শেষ হল তখন বেলা বোধহয় দশটা। মন্দিরের সামনের দিকে এসে দেখি পণ্ডিতজীও সেইমাত্র নিত্যপূজা শেষ করেছেন। ভক্তদেরকে এক কুশী করে সিদ্ধির সরবৎ প্রসাদ স্বরূপ বিতরণ করছেন। এই মন্দিরে প্রতিদিন একলোটা করে সিদ্ধির সরবৎ মহাদেবকে নিবেদন করা হয়। আমি প্রসাদ পেলাম, পণ্ডিতজীও কিঞ্চিত গ্রহণ করে মন্দির থেকেই রামদয়ালের মাকে হেঁকে বললেন — ব্রহ্মচারীকো লেকর হম থোড়া ইস মহল্লেমেঁ চক্কর দেকর আতা হুঁ।

তিনি আমাকে এমন এক স্থানে নিয়ে এলেন যেখানে সেগুন, অশ্বত্থ, বেল ও পেয়ারা গাছ দিয়ে ঘেরা একটি পোড় বাড়ী আছে। দেখতে কিন্তু একটি তপোবনের মত। কল্‌কে ফুল এবং নানারকম বুনো ফুল ফুটে থাকায় এ স্থানের স্বাভাবিক শ্রী মনোরম হয়েছে। এখান থেকে নর্মদার ধারাও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। পণ্ডিতজী বললেন — এখানে থাকতেন পাথর

গিরি মহারাজ। নর্মদাতটের প্রসিদ্ধ মহাত্মা। তিনি ছিলেন পরিক্রমাবাসীদের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ। তাঁর শতাধিক ভীমকায় নাগা শিষ্য নর্মদার উভয়তটে পাহারা দিত। তিনি পরিক্রমাবাসীদেরকে নানাভাবে পরীক্ষা করতেন। কিভাবে পরিক্রমাবাসীরা পরিক্রমা করছেন। যথাযথভাবে নর্মদামায়ীর পূজা ও কড়াই প্রসাদ করা হয়েছে কিনা, কোন সময় দুবার আহার করে ফেলেছ কিনা, কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করছে কিনা, প্রতিদিন সূর্যার্ঘ্য ও পিতৃতর্পণ করা হয় কিনা, কোন দিন কোন কারণে তার ছেদ পড়েছে কিনা, পরিক্রমাকালে কটা চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করা হয়েছে, মৌনী অমাবস্যা, একাদশী ও শিবরাত্রিতে মহাদেবের যথাযথ পূজা ও স্তব পাঠ করা হয়েছে কিনা, স্তব পাঠ করা হলেও কোন স্তবে মহাদেবকে তুষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি প্রশ্ন ও পরীক্ষা করতেন। পরীক্ষায় পাশ না হলে কিংবা শূদ্র বা স্ত্রীলোককে পরিক্রমা করতে দেখলে পাথর গিরি মহারাজ ধারালো পাথর দিয়ে পরিক্রমাবাসীর চুটি বা শিখা কর্তন করে নর্মদা পারাপার করিয়ে তার পরিক্রমা খণ্ডন করে দিতেন। তাঁর ভয়ে সেজন্য কেউ অনিয়ম করতে সাহস করতেন না। তিনি গত হওয়ার পর ঐ রকম বিকট মহাত্মার অভাব হওয়ায় পরিক্রমাতে বহু খাড়ি পল্টনের আবির্ভাব ঘটেছে। 'খাড়ি পল্টন' বলতে বোঝায় খণ্ডিত বাহিনী। আগে কমলভারতীজী বা গৌরীশঙ্করজীর আমলে সব সম্প্রদায়ের সাধুরা একই ধ্বজার নীচে সমবেত হয়ে একজন দলপতি মহাত্মার অধীনে থেকে নর্মদা পরিক্রমা করতেন। এখন স্ব স্ব প্রধান হয়ে নিজের চেলা-চামুণ্ডাদেরকে নিয়ে পরিক্রমা করে থাকেন। পাথর গিরিজীর বহুশত নাগা শিষ্য ছিল, নর্মদার উভয় তটে তাঁর অনেকগুলি ডেরাও ছিল। কোন পরিক্রমাবাসীর পক্ষেই নাগাদের দৃষ্টি এড়ানোর উপায় ছিল না। নর্মদা সাম্রাজ্যের যেন কঠোর শাসক ছিলেন পাথর গিরিজী, তাঁরই অলিখিত নিয়ম এবং শাসন শৃঙ্খলায় পরিক্রমা পরিচালিত হত। পরিক্রমার শুদ্ধতা রক্ষা করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি শুধু কঠোরভাবে পরীক্ষাই করতেন না, পরীক্ষায় তুষ্ট হলে তিনি পরিক্রমাবাসীকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তাঁর প্রদত্ত চিঠির বলে পরিক্রমাবাসীরা নৌকাওয়ালাদের সাহায্য পেত, প্রত্যেকটি সদাবর্তও সাধুদেরকে সাহায্য করত। দুর্দান্ত ভীলরাও পাথর গিরিজীর পাঞ্জা পরিক্রমাবাসীদের কাছে দেখতে পেলে অত্যাচার ত দূরের কথা তাঁদেরকে বরং নানাভাবে সাহায্য করত। পাথর গিরিজী গত হওয়ার পর তাঁর প্রধান শিষ্য পূষণ গিরি এখনও বিমলেশ্বরের কিছু এদিকে বড়বাই নামক স্থানে পরিক্রমাবাসীদের যথোচিতভাবে পরীক্ষা করবার জন্য ডেরা বেঁধে বসে আছেন। তিনি তাঁর গুরুর মত কট্টরপন্থী। এইজন্যে তাঁকে পাষাণ গিরিও বলা হয়। কিন্তু তাঁর নাগা শিষ্যের সংখ্যা এত বেশী নেই যে নর্মদার উভতটে তাঁর গুরুর মত অতন্দ্র পাহারা বসাতে পারেন। তাছাড়া তিনি তাঁর নাগাবাহিনী নিয়ে বসে আছেন কেবল নর্মদার উত্তরতটে। এইজন্য খাড়ি পল্টনের সর্দাররা অর্থাৎ মোহন্তরা সাধারণতঃ দক্ষিণতট দিয়েই পরিক্রমা করে থাকেন। দক্ষিণতটের রাস্তাঘাট ভাল, অনেক নূতন রাস্তা, ধর্মশালা ও সদাবর্ত সেদিকটায় আছে। তাই এখন পরিক্রমা দক্ষিণতট দিয়েই সাধারণতঃ সবাই করে থাকে। কেবল আপনাকেই দেখছি ব্যতিক্রম, কি সাহসে যে আপনি একা একা পরিক্রমা করছেন, তা জানি না। আপনি যখন পূষণ বা পাষাণ গিরির সম্মুখীন হবেন, তখনই মজা বুঝবেন।

এই বলে পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন।

তিনি বললেন — এইবার আসুন আপনাকে দূর থেকে আর একটা পবিত্র স্থান দেখাই। মণ্ডলেশ্বরের মধ্যে এইটি একটি আশ্চর্য স্থান। তাঁর সঙ্গে আমি হাঁটতে লাগলাম উত্তর-পশ্চিম দিক অর্থাৎ বায়ুকোণে। মণ্ডলেশ্বর মহল্লার এই দিকটা অপেক্ষাকৃত ঘন জঙ্গল। সদ্য বর্ষার পর গাছপালায় রাস্তা একরকম ঢেকেই আছে। পার্বত্যপথে ছোট বড় পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে প্রায় আধ মাইলটাক যাওয়ার পর দূর থেকে পাহাড় দেখতে পেলাম। বিন্ধ্যপর্বতেরই অংশ, সবুজ গাছপালায় আচ্ছাদিত। দূর থেকে আমাকে আঙুল বাড়িয়ে প্রায় ছয়-সাতশ ফুট উঁচু একটা ছোট পাহাড়ের চূড়াকে দেখিয়ে বললেন — ঐ পাহাড়ের চূড়ায় অগস্ত্যি গুহা আছে। বিরাট গুহা, প্রায় পাঁচশ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়, মধ্যস্থলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের স্থান আছে। পাশ দিয়ে একটা ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। ঝর্ণার জল সিঁড়ি বেয়ে উপচে পড়ছে বলে সিঁড়িগুলো পিচ্ছিল। ঝর্ণা ঐ গুহার অভ্যন্তর হতে আসছে। সেই ঝর্ণার উৎস মুখে একটা প্রকাণ্ড চাঙড়ের আড়ালে রয়েছেন গুপ্তেশ্বর মহাদেব। জনশ্রুতি এই যে — অগস্ত্য মুনির এটি তপস্যাক্ষেত্র ছিল। ঐ গুপ্তেশ্বর মহাদেব নাকি অগস্ত্য মুনি দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চোলি মহেশ্বরেও ঐ রকম একটি গুহা আছে। তারও নাম অগস্ত্যি গুহা। সেখানেও নাকি অগস্ত্য মুনি কিছুকাল তপস্যা করেছিলেন।

আমি — আপনি অগস্ত্য মুনির দুটি তপস্যাক্ষেত্রের নাম করলেন। আমি শুনেছি, নেপালের উত্তরাংশে মুক্তিনাথে অগস্ত্য মুনির আবির্ভাব ঘটেছিল, দাক্ষিণাত্যে মহীশূরে ভদ্রা নদীর তীরে মলয় পর্বতের কাছেও অগস্ত্য মুনির তপস্যাক্ষেত্র আছে। কুল্লু উপত্যকায় বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধাশ্রম আছে, আবু পাহাড়েও বশিষ্ঠ গুহা আছে। এইভাবে প্রাচীন ঋষিদের বিভিন্ন স্থানে একাধিক আশ্রম বা তপস্যা স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। এর কারণ কি ? তাঁরা কি সব সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন? তাঁদের কি স্থায়ী কোন ঠিকানা ছিল না?

পণ্ডিতজী — এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? শতপথ ব্রাহ্মণে আম্নাত হয়েছে — ব্রহ্মচর্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যকাল শেষ হলে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করবে, অন্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তপস্যার অনুকূল বিভিন্ন স্থানে বাস করবে। শতপথ ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞানুযায়ী ভগবান মনুও বলেছেন — বনেষু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ। চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ। অর্থাৎ আয়ুর তৃতীয়ভাগ কালে বিজন অরণ্যে তপস্যার জন্য পর্যটন করতে হয়, বিভিন্ন সাধু মহাত্মা মুনি ঋষির সঙ্গ করে নিজের তপস্যার বনিয়াদকে দৃঢ়মূল করে ফেলতে হয়। আয়ুর চতুর্থভাগ কালে অর্থাৎ জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে সকল বহির্সঙ্গ পরিত্যাগ করে অন্তর পথে পরিব্রাজন করতে হয়। তখন কেবল চৈতন্য পথে চিদ্‌মণ্ডলের বিভিন্ন মার্গ হতে মার্গান্তরে গমন করে ব্রহ্মসমাধিলাভ। এই হল আর্য ভারতের ধারা। যেখানে জন্মালাম, সেইখানেই শৈশব, বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা কাটিয়ে প্রাণধারণের গ্লানিতে জর্জরিত হয়ে যে বার্ধক্যে রোগে-শোকে ভুগে ভুগে হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে এমন কোন কথা আছে নাকি ? তার মধ্যে পৌরুষ বা পুরুষার্থ লাভের কি আছে?

সাধু মহাত্মা এইভাবে বিভিন্ন স্থানে পরিব্রাজন ও বাস করতেন বলে তাঁদের পুণ্যস্পর্শে এক একটা স্থান তীর্থের মর্যাদা পেয়েছে। এখন চলুন বাসায় ফেরা যাক্। অপরাহ্নকালে কিংবা সান্ধ্য আরতি সেরে কালকের মত গল্প করব। সেইসময় এই গুপ্তেশ্বর মহাদেব ও

অগস্ত্য মুনি সম্বন্ধে আরও কিছু কথা আপনাকে শোনাব। এখান থেকে ঐ অগস্ত্যি গুহা খুব কাছে দেখালেও ঐখানে পৌঁছুতে আরও একঘন্টা হেঁটে যেতে হবে।

তাঁর সঙ্গে ফিরে আসতে আসতে আমি, দু'তিনবার পেছনে ফিরে গুহাটিকে দেখে নিলাম। আমার মনে হল, গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের মতই ঐ স্থানের উচ্চতা হবে। তবে দূর থেকে ঘন বনে আচ্ছাদিত বলে মনে হচ্ছে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কাজেই অপরাহ্নে তাঁর কাছে আমার বসা হল না। ঘুম থেকে উঠেই আমি নর্মদার ধারে গিয়ে বসলাম। পণ্ডিতজী সন্ধ্যা হতেই মন্দিরে গিয়ে আরতি সুরু করলেন। তাথৈ, তা-তা-থৈ ছন্দে নৃত্যের তালে তালে আজ তিনি ভগবান মণ্ডলেশ্বরের আরতি করতে করতে গাইতে লাগলেন —

জটাটবী-গলজ্জল-প্রবাহ-প্লাবিত-স্থলে
গলেহবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গ তুঙ্গমালিকাম্।
ডমড্-ডমড্-ডমড্ ডমন্নিনাদ-বড্ ডর্মবয়ং
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্॥

বলা বাহুল্য, এই স্তোত্রাংশটি রাবণ-কৃত 'শিবতাণ্ডব' স্তোত্রম্ এর প্রথম স্তবক। এর অর্থ হল, মহাদেব, যাঁর জটারণ্য হতে বিগলিত জলপ্রবাহ প্লাবিত গলদেশে (শিবের জটা হতে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে সর্পমালায় বিভূষিত সেই গলদেশে) প্রলম্বিত উন্নত ভুজঙ্গমালা পরিধান করে ডমরু দ্বারা ডমড্ ডমড্ ধ্বনি করতে করতে তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন, সেই মহাদেব আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। শিবতাণ্ডব-স্তোত্র প্রসিদ্ধ মন্ত্র, শিবভক্ত মাত্রেই এই স্তব জানেন। কাজেই এটি যে এইমাত্র আমার শ্রুতিগোচর হল তা নয়, কিন্তু পণ্ডিতজী ডমরু বাজাতে বাজাতে ঢোলকের বোলের সঙ্গে পায়ের তালে যেভাবে এই বৃদ্ধ বয়সে নাচতে লাগলেন তাতে মনে হল এই নির্জন নর্মদাতটের শুধু মন্দিরের মধ্যেই নয়, শুধু ডমরু নাদের মধ্যেই নয়, নর্মদার কলকল্লোলের মধ্যেও যেন এই ডমড্-ডমড্ ধ্বনি, মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আরতির শেষে আমিই হাত ধরে পণ্ডিতজীকে তাঁর বাড়ীতে এনে খাটের উপর বসিয়ে দিলাম। তিনি ব্রাহ্মণী প্রদত্ত তামাক টানতে টানতে বলতে লাগলেন — আজ তোমাকে যে গুপ্তেশ্বর মহাদেবের গুহা দেখলাম ঐ গুহাকে কেন্দ্র করে অনেক রহস্য জড়িয়ে আছে। রেওয়ার মহারাজা ঐ হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর গুহাতেও যাতে নিত্য গুপ্তেশ্বরের পূজা হয়, এজন্য সশস্ত্র রক্ষী কয়েকজনকে নিয়ে ব্রাহ্মণ যাতে গিয়ে পূজা করে আসতে পারেন, তার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। উচিত শর্মার বাবা ঐ মহাদেবের পুরোহিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পূজা করতে গিয়ে একদিন বাঘের হাতে প্রাণ হারান। সেই থেকে পূজা বন্ধ হয়ে গেছে। এইভাবে পুরোহিত দ্বারা পূজার ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেলেও সাধু-সন্ন্যাসীরা বিশেষতঃ পরিক্রমাবাসীরা দল বেঁধে গিয়ে পূজা করে আসতেন। কিন্তু একদিন একদল পরিক্রমাবাসী পূজা করতে গিয়ে দেখেন গুহার অভ্যন্তরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পরপর তিনদিন তাঁরা চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনদিনই গুহাকে অগ্নিময় দেখে তাঁরা নিরাশ হন, ফিরে যেতে বাধ্য হন। তারপর আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে রেওয়ার তৎকালীন মহারাজা এবং উচিত শর্মার কাকা প্রায় একই সময়ে একই দিনে স্বপ্ন দেখেন, কেউ যেন ক্রুদ্ধ মূর্তি ধারণ করে তাঁদেরকে বলছেন, কোন গৃহী বা সন্ন্যাসী যেন গুপ্তেশ্বর মহাদেবের পূজা করতে না যান,

কারণ মহামুনি অগস্ত্য স্বয়ং সূক্ষ্ম মূর্তি ধারণ করে এবং নর্মদাতটবাসী সিদ্ধ মহাত্মারা ঐখানে নিত্যপূজা করতে আসেন। যাঁরা সিদ্ধ নন, এমন কোন সন্ন্যাসী বা কামনাবাসনাপরায়ণ কোন গৃহী পুরোহিতের ঐখানে পূজা করতে যাবার প্রয়োজন নেই। এইজন্য ঐ গুহার দিকে আর কেউ যান না। এই মণ্ডলেশ্বরেই এখনও অনেক লোক জীবিত আছেন যাঁরা এই ঘটনা সম্বন্ধে সমুদয় বৃত্তান্ত জানেন। স্বপ্ন দেখেই উচিত শর্মার কাকা এই মহল্লার দু' চারজন বৃদ্ধের কাছে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছিলেন, অনেকেই তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে অগস্ত্যি গুহায় গিয়ে পূজা করতে চাচ্ছেন না। কিন্তু তারপরের দিনেই রেওয়া রাজের দেওয়ান সাহেব যখন এখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে মহাদেবের স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকলের কাছে বলে গেলেন, তখন সবাই উচিত শর্মার কাকার কথা বিশ্বাস করল। সেই থেকে নিত্যপূজা লৌকিকভাবে বন্ধ হয়েছে বটে তবে মধ্যরাত্রে ঐ পাহাড়ের তলদেশে গেলে ঐ গুহাভ্যন্তরে কখনও আলোর শিখা, ডম্বরু ধ্বনি ইত্যাদি শুনতে পাওয়া যায়। প্রায় ষোল বছর আগে আমিও কয়েকজনের সঙ্গে মধ্যরাত্রে গিয়ে ঐ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

এই পর্যন্ত বলে তিনি রামদয়ালকে কাছে ডাকলেন। সে অন্য ঘরে বসে এতক্ষণ পড়ছিল। সে আসার পরে, গড়গড়াতে দু'একবার সুখটান দিয়ে আমাকে বলতে লাগলেন — রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে নিশ্চয়ই অগস্ত্য মুনির কথা পড়েছেন। আমাদের শাস্ত্রে তিনজন অযোনিসম্ভব পুরুষ এবং দু'জন অযোনিসম্ভবা নারীর পরিচয় পাই। জানকী অযোনিসম্ভবা। হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করবার সময় মিথিলার রাজা জনক এঁকে সীতায় অর্থাৎ লাঙ্গলের রেখায় প্রাপ্ত হন বলে এঁর নাম হল সীতা। মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণও অযোনিসম্ভব। একদিন গঙ্গাস্নানকালে প্রায় নগ্না অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখে কামার্ত ভরদ্বাজের শুক্রপাত হয়। সেই শুক্র 'দ্রোণ' নামক যজ্ঞীয় পাত্রে তিনি রক্ষা করেন। দ্রোণ বা ঘৃত পরিমাপক এক যজ্ঞপাত্রে এই পুত্রের জন্ম হয় বলে এঁর নামকরণ হয় দ্রোণ। ইনি অগ্নির পুত্র অগ্নিবেশ্য মুনির কাছে অস্ত্রশিক্ষা করে কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রাচার্যরূপে নিযুক্ত হন। দ্রোণ ছিলেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সহপাঠী। রাজা হওয়ার পর দ্রুপদ দ্রোণকে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলে অবজ্ঞা করলে তিনি কুরুপাণ্ডব ছাত্রদের সহায়তায় পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করে দ্রুপদকে লাঞ্ছিত করলে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দ্রোণবধের আকাঙ্খায় গঙ্গা ও যমুনার সংগমস্থলে যাজ ও উপযাজ নামক দুই যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণের সহায়তার পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞাগ্নি হতে বর্ম মুকুট খড়্গ ও ধনুর্ধারী দ্রোণহন্তা ধৃষ্টধ্যুম্ন ও যজ্ঞবেদী হতে দ্রৌপদী উত্থিতা হন। দ্রৌপদী ছিলেন আজন্ম যুবতী, শ্যামলাঙ্গী, নীলনয়না। তাঁর আয়ত পদ্মপলাশবৎ লোচন ও সুচারু ভ্রূযুগলের সঙ্গে নীল ও কুঞ্চিত কেশদাম তাঁকে বিশ্বের ললামভূতা সৌন্দর্যের অধিকারিণী করেছিল। তাঁর শরীর হতে সর্বদা নীলোৎপলের সৌরভ বিকীর্ণ হত। এঁদের আবির্ভাবকালে আকাশবাণী হয় যে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবধ করবেন এবং যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী কৌরবকুলের এবং ক্ষত্রিয়গণের কুলক্ষয়ের কারণ হবেন। দ্রৌপদীর বিভিন্ন নাম — যজ্ঞ হতে উৎপন্ন বলে যাজ্ঞসেনী, পঞ্চাল রাজকন্যা বলে পাঞ্চালী, কৃষ্ণবর্ণ বলে কৃষ্ণা, সৈরিন্ধ্রী নিত্যযৌবনা ও বেদিজা। ইনি পঞ্চপাণ্ডবকেই পতিরূপে বরণ করেন এবং যুধিষ্ঠিরাদির ঔরসে এঁর গর্ভে যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন নামে পাঁচপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্রোণ বধের পর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য পাণ্ডব

শিবিরে রাত্রিকালে প্রবেশ করে অশ্বত্থামা তাঁদেরকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করেন। দ্রৌপদীর বিশেষ পরিচয়, তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বান্ধবী এবং সদৈব কৃষ্ণগতপ্রাণা। তৃতীয় অযোনিসম্ভব হলেন আমাদের আলোচ্য এই মহাতেজা ঋষি অগস্ত্য। ঋগ্বেদ হতে জানা যায় ইনি মিত্র অর্থাৎ তেজোময় সূর্য ও বরুণের পুত্র, এইজন্য এঁর অপর নাম মৈত্রাবরুণী। আদিত্য-যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে মিত্র ও বরুণ উভয়েই উর্বশীকে দেখে যজ্ঞকুম্ভের মধ্যে শুক্রপাত করেন। সেই কুম্ভে পতিত শুক্র থেকেই বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম হয়। অগস্ত্যের আরও কতকগুলি নাম আছে যথা — কুম্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে কলসী সুত বা ঘটোদ্ভব, সমুদ্র পান করেছিলেন বলে পীতাব্ধি, বাতাপীকে বিনাশ করেছিলেন বলে বাতাপিদ্বিট, মহাতেজা বলে আগ্নেয়, বিন্ধ্যকে শাসন করেছিলেন বলে বিন্ধ্যকূট, অত্যন্ত বেঁটে বলে তাঁর নাম হয় মান। তাঁর ধর্মপত্নীর নাম লোপামুদ্রা এবং একমাত্র পুত্রের নাম ইধ্মবাহ। বনবাসকালে রামচন্দ্র অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হলে অগস্ত্য তাঁকে বৈষ্ণবধনু এবং অক্ষয় তূনীর দান করেছিলেন। পুত্র ইধ্মবাহের জন্মের কিছুকাল পরেই অগস্ত্য যোগবলে নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হন। ঋষি পরম্পরা গুরু পরম্পরা এই জনশ্রুতি বিদ্যমান যে অগস্ত্য দক্ষিণাকাশে নক্ষত্ররূপে চির উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তিনি শরৎকালের প্রথমে দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন বলে ভাদ্র মাসের ১৭ কিংবা ১৮ তারিখে আকাশে নক্ষত্ররূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে আজ ১৮ই ভাদ্র, আপনি বাইরে চলুন, রামদয়াল তুমিও এস, আমরা অগস্ত্য নক্ষত্রকে দর্শন করে ধন্য হব। ব্রাহ্মণীমাও আমাদের সঙ্গে এলেন। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে মা নর্মদা, মণ্ডলেশ্বর মহাদেব এবং অগস্ত্য মুনির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে বললেন। তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দক্ষিণ আকাশের দিকে। আমাদের তিন জনের মনে তখন অদম্য কৌতূহল। আমরা তাঁর নির্দেশ মত নর্মদা, মণ্ডলেশ্বর এবং অগস্ত মুনির উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে চলেছি। পণ্ডিতজীর নিরীক্ষণ পর্ব আর শেষ হয় না। এইভাবে প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর তিনি আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন — 'ঐ দেখ অগস্ত্য নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। আমরা সত্যই দেখলাম আকাশস্থিত অন্যান্য নক্ষত্রের চেয়ে ঐ নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্য যেন সহস্রগুণ বেশী। লক্ষ যোজন দূরে থেকেও আমরা বেশীক্ষণ তাকিয়ে রইতে পারলাম না। আমরা সকলেই পণ্ডিতজী কথিত ঐ অগস্ত্য নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম। ফিরে এসে পুরাণ থেকে অযোনিসম্ভবদের যে গল্প তিনি শুনিয়েছিলেন তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মনের মধ্যে নানাবিধ প্রশ্ন জাগলেও সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলে পণ্ডিতজীকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে হল না। কেবল সবিনয়ে একবার বললাম — মহর্ষি অগস্ত্য যদি যোগবলেই নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হয়ে থাকেন কিংবা নক্ষত্রে স্বরূপ পেয়ে থাকেন, তাহলে কিভাবে তাঁর এই মর্ত্যভূমিতে পূর্বের ফেলে আসা তপস্থলীতে এই যেমন এখানকার গুপ্তেশ্বর মহাদেবের গুহায় তাঁর যখন তখন আবির্ভাব সম্ভব হয়? ঈশ্বরকোটির যাঁরা তাঁদের জন্ম ও কর্ম সবই দিব্য। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরকোটির যাঁরা, তাঁদের জন্ম ও কর্মরহস্য যে অলৌকিক ও অপ্রাকৃত, বুদ্ধি দিয়ে যে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। আপ্তকাম মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আত্মদৃষ্টিতে অর্জুনকে বলেছিলেন --- জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং........ইত্যাদি।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। রামদয়াল আলো দেখাতে আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, সহসা একটি রশ্মিপথ আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি দেখলাম, সেই রশ্মিপথ গিয়ে সোজা পৌঁচেছে অগস্ত্যি গুহার দ্বারে। আমি দেখে স্তম্ভিত হলাম যে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন মহাত্মা প্রলয়দাসজী। তাঁর মাথার চারদিকে এক জ্যোতির্ময় আভা (Aura) দেখে চমকে উঠলাম। ঘুম ভেঙে গেল। রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে। বিছানার উপর চুপ করে বসে থাকলাম। ভাবতে লাগলাম তাঁর কথা। ওঁকারেশ্বরে থাকার সময় তাঁর যে অযাচিত স্নেহ ও করুণার পরিচয় পেয়েছি, তার কোন তুলনা হয় না। আমার উচিত ছিল এবারে ধাবড়ী কুণ্ড হতে আসার সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করা। দর্শন না পেলে না হয় ফিরে আসতাম। আমার যাওয়া উচিত ছিল, খুবই উচিত ছিল। কিন্তু যা হবার তা ত ঘটেই গেছে, এখন আর অনুশোচনা করে লাভ কি ? আমি স্বপ্নের কথাই ভাবতে লাগলাম। অনেক ভেবেও কোন কূল কিনারা পেলাম না। আমি শৌচাদি ক্রিয়ার জন্য বিছানা গুটিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে যখন ফিরলাম, তখন পণ্ডিতজী মন্দিরে চলে গেছেন পূজা করতে। আমিও আর্দ্র বস্ত্রাদি পরিবর্তন করে মহর্ষি তণ্ডিকৃত স্তবের পুঁথিটি নিয়ে মন্দিরে গেলাম। আজ মন্দিরে খুব ভীড় দেখলাম। উচিত শর্মা জানালেন, আজ ললিতা সপ্তমীর ব্রত পালনের দিন। তাই মন্দিরে এত স্ত্রী-পুরুষের সমাগম দেখতে পাচ্ছেন। পণ্ডিতজী পূজা করছেন। আমি মণ্ডলেশ্বরজীকে প্রণাম করে মন্দিরের পেছনের চাতালে গিয়ে মহাদেবের সেই স্তবরাজ পাঠ করতে লাগলাম। প্রত্যেকটি মন্ত্রার্থ এবং মহাদেবের প্রত্যেকটি নামের রহস্য বুঝে বুঝে পাঠ শেষ করতে বেলা বোধহয় এগারোটা বেজে গেল। মন্দিরের সামনে এসে দেখি, পণ্ডিতজী হোম করছেন। হোম শেষ করে সিদ্ধির প্রসাদ বিতরণের পর বাসায় যখন ফিরলাম, তখন সূর্য ঠিক মাথার উপরে কিরণ দিচ্ছেন। আহারাদি শেষ করে পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁকারেশ্বরে আমি একজন প্রায় অন্ধ মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলাম, আপনি কোনদিন তাঁকে দেখেছেন কিংবা তাঁর নাম শুনেছেন কি ? পণ্ডিতজী বললেন — আমাকে বছরে একবার দুবার ওঁকারেশ্বরে যেতেই হয়। ঐখানে সংস্কৃত পরীক্ষার সেন্টার পড়ে। আমার যখন টোল ছিল, তখন ছাত্রদেরকে নিয়ে আমাকে যেতেই হত। ওখানে মহাত্মা রামদাসজী ছাড়া আর কোন মহাত্মা স্থায়ী ভাবে বাস করেন বলে আমি শুনিনি। রামদাসজীর আশ্রমে থেকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান দীনদয়ালও সংস্কৃত পড়ে। তবে মহাতীর্থ ওঁকারেশ্বরে পরিক্রমা করতে করতে অনেক সিদ্ধর্ষি এসে থাকেন। আপনি হয়ত সেইরকম কাউকে দেখে থাকবেন। তাঁর কথা শুনে ঐ প্রসঙ্গ চেপে গিয়ে অন্য কথা উত্থাপন করলাম।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — আপনি সেদিন মৃচ্ছকটিকের গল্প বলতে গিয়ে শুনিয়েছেন যে ভক্তি সহকারে গৃহদেবতার পূজা করা গৃহস্থস্য নিত্যোঽয়ং বিধিঃ। গৃহদেবতার পূজা ছাড়া গৃহস্থের আর কি কি অবশ্য করণীয় কর্তব্য আছে? কোন্ কোন্ নিত্যকর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেলে একজন গৃহী যোগ ধ্যানে নিরত না থাকলেও উত্তমগতি লাভ করতে পারেন? এ সম্বন্ধে আমাদের ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের নির্দেশ কি ?

পণ্ডিতজী — আমি শাস্ত্রচর্চা করে যা বুঝেছি কুলদেবতার নিত্য সেবা ছাড়াও আদর্শ ধার্মিক্ গৃহস্থের আর দুটি নিত্য কর্ম আছে —

(১) অতিথি-সেবা আর (২) আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দান এবং সেই আশ্রিতকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। হিন্দু-সংস্কৃতির মর্মবাণী ঘোষিত হয়েছে বেদে। ঋগ্বেদ (১০/১১৭/৬) উদাত্তভাবে ঘোষণা করেছেন ----

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যম্ ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদো॥

এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ভিক্ষু। তিনি বেদমুখে বলেছেন — যে কেবল অন্ন উপার্জন করে কিন্তু তা দেয় না পাঁচজনের সেবায়, দেয় না বন্ধু-বান্ধব বা অতিথির ভোজে, সে অধার্মিক, সে নির্বোধ। তার অন্নলাভ বৃথা। এমন কৃপণ স্বার্থপর মানুষ মৃতেরই সমান। কারণ, যে কেবল নিজে খায়, সে কেবল পাপই ভক্ষণ করে থাকে।

স্বার্থের পঙ্কিল জীবন মানুষের জন্য নয়। জগৎ জুড়ে চলেছে কল্যাণযজ্ঞ। অগ্নিতে কেবল ঘন ঘন ঘৃতাহুতি দেওয়াকে বৈদিক ঋষিগণ যজ্ঞের একটিমাত্র অর্থ বলে বুঝতেন না। দীন-দুঃখী, অতিথির সেবা এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ করাই ছিল তাঁদের যথার্থ যজ্ঞ। তাঁদের সমগ্র জীবন-বৃত্ত ও জীবনোপলব্ধির মূলে ছিল এই যজ্ঞ জীবন। নিবেদিত জীবন।

অতিথিকে অন্নদান ও অতিথিসেবা যে গৃহস্থের কত বড় ধর্ম তা বেদব্যাস মহাভারতের বনপর্বে বড় হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করেছেন। যুধিষ্ঠিরকে শৌনক মুনি বলেছেন,

সংবিভাগো হি ভূতানাং সর্বেষা মেব শস্যতে।
তথৈবাপচমানেভ্যঃ প্রদেয়ং গৃহমেধিনা॥

বিভাগ করে প্রাণীগণকে অন্নদান করা সকল গৃহস্থেরই কর্তব্য। বিভাগ করা বলতে বোঝায়, অন্ন যা পাক করা হবে। পোষ্যবর্গের জন্য যেমন তার একটা ভাগ থাকবে, তেমনি গৃহাগত অভুক্ত অতিথির জন্য একটা ভাগ রাখতে হবে। অপচমানেভ্যঃ শব্দের নীলকণ্ঠ টীকা করেছেন অতিথিযতিপ্রভৃতিভ্যঃ অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যক্তি অতিথি ও সাধু সন্ন্যাসীকে অন্নদান করবেনই।

দেয়মার্তস্য শয়নং স্থিতশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্॥

পীড়িত লোক এলে তাকে শয্যা দিতে হবে। কেউ পরিশ্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলে তাকে আসন দিতে হবে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে জল দিতে হবে এবং ক্ষুদার্থ লোককে অন্নদান করতে হবে। শুধু মানুষ অতিথিকেই নয়, কুকুর ও পাখীদের জন্যও সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে মাটিতে কিছু রেখে দেওয়া প্রতি গৃহস্থেরই কর্তব্য। এর নাম বৈশ্বদেব।

চক্ষুর্দদ্যাৎ মনো দদ্যাৎ বাচং দদ্যাং চ সুনৃতাম্।
অনুব্রজেৎ উপাসীত স যজ্ঞঃ পঞ্চদক্ষিণঃ॥

অর্থাৎ অতিথি উপস্থিত হলে প্রসন্ন নয়নে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করবে, প্রসন্ন মনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে, মধুর বাক্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবে, তাঁর পশ্চাৎ গমন করবে এবং অন্ন প্রভৃতি দ্বারা তাঁর সেবা করবে। এইভাবে অতিথি সেবাই পঞ্চবিধ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ। গৃহস্থের পক্ষে এটি নিত্য আচরণীয় বিধি।

তাঁর কথা শুনে বললাম — আমি এই নর্মদাতটে আসতে আসতে তিন চারজন এমন ধার্মিক গৃহস্থবধূ বা বুড়ী মায়ীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাঁরা অতিথি সেবার জন্য প্রয়োজনীয়

আহার্য নিয়ে অতিথির অপেক্ষায় বসে থাকেন। অতিথি সেবা করে তবে তাঁরা অন্নজল গ্রহণ করেন। যেদিন অতিথির দেখা পান না, সেদিন তাঁরা অভুক্তই থাকেন।

পণ্ডিতজী — তবে এমন ঘটনা কচিৎ কদাচিৎই ঘটে থাকে। তাঁদের ঐ নিত্য অতিথিসেবাব্রত নর্মদাতটে কঠোর তপশ্চরণের তুল্য। কাজেই মা নর্মদার দয়ায়, তাঁদের ভাগ্যে অতিথি জুটেই যায়। মা নর্মদাই অতিথিকে তাঁর সামনে উপস্থিত করে দেন। আমাদের পুণ্যভুমি ভারতবর্ষ ছাড়া এই রকম ব্রতপালনের দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাবেন?

এমন সময় ব্রাহ্মণীমা কলকে ঝেড়ে তাতে নূতন করে তামাক ঠেসে আগুন ধরিয়ে গড়গড়ার উপর বসিয়ে দিয়ে গেলেন। পণ্ডিতজী তাঁকে বললেন — 'যেও না। তুমিও বস। আমি ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করছি।' তিনিও একটু দূরে গুড়িসুড়ি হয়ে বসলেন। পণ্ডিতজী বলতে লাগলেন — নিত্য গৃহদেবতার সেবা এবং অতিথি সেবা ছাড়া বিপন্ন আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়া এবং তাকে রক্ষা করা গৃহীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। পুরাণে এ বিষয়ে অনেক গল্প আছে। দণ্ডী রাজাকে আশ্রয় দিয়ে ভীম তাঁদের পরম আত্মীয় এবং শ্রেষ্ঠ হিতাকাঙ্খী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এ বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আমাদের সামনেই আছে। রাজপুতানার অনেক বীর রাজা আশ্রিতকে আশ্রয় দিলে প্রবল প্রতাপান্বিত মোঘল সম্রাটের ভ্রূকুটিকেও অগ্রাহ্য করতে কোন দ্বিধা করেন নি। এমন কি আশ্রিতকে আশ্রয় দিয়ে অনেকে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হয়েছেন। এমন উদাহরণেরও অভাব নেই। তবে মহাভারতের বনপর্বে (অধ্যায় ১০৪) বেদব্যাস রাজা উশীনরের আশ্রিত বাৎসল্য সম্বন্ধে যে ছবি এঁকেছেন, সেটি হল আশ্রিত রক্ষার চরম দৃষ্টান্ত।

রাজা উশীনর ছিলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা। মহারাজ যযাতির কন্যা মাধবী ছিলেন তাঁর ধর্মপত্নী। তাঁর পুত্রের নাম পুরাণপ্রসিদ্ধ মহারাজ শিবি। উশীনর নানা যজ্ঞ এবং যোগানুষ্ঠান করে দেবরাজ ইন্দ্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁর ধর্মবল পরীক্ষা করার জন্য একদিন ইন্দ্র শ্যেনপক্ষী রূপে এবং অগ্নিদেব কপোতপক্ষীরূপে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হন। শ্যেনদ্বারা আক্রান্ত হয়ে কপোত প্রাণভয়ে উশীনরের উরুদেশে এসে পড়ল। কপোতকে অনুসরণ করে শ্যেনরূপী ইন্দ্র উশীনরের কাছে এসে তার ভক্ষ্য কপোতটিকে তাঁর আশ্রয় থেকে মুক্ত করে দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। উশীনর তার উত্তরে বললেন যে শরণাগত ও ভীতকে আশ্রয়দান করা তাঁর ধর্ম।

প্রস্পন্দমানঃ সম্ভ্রান্তঃ কপোতঃ শ্যেন! লক্ষ্যতে।
মৎসকাশে জীবিতার্থী তস্য ত্যাগো বিগর্হিতঃ॥

শ্যেন! এই কপোতটি ভয়ে কম্পিত কলেবর এবং অস্থির হয়ে পড়েছে। দেখছি, আমার কাছেই সে জীবনার্থী হয়ে এসেছে, এমতাবস্থায় একে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য।

যো হি কশ্চিৎ দ্বিজান্ হন্যাৎ গাং বা লোকস্য মাতরম্।
শরণাগতঞ্চ ত্যজতে তুল্যং তেষাং হি পাতকম্॥

কারণ, যে লোক ব্রহ্মহত্যা করে, গোহত্যা করে কিংবা যে শরণাগতকে পরিত্যাগ করে তাদের সমান পাপ হয় অর্থাৎ আশ্রিতাকে শত্রুমুখে সঁপে দেওয়া, তাকে আশ্রয় না দেওয়া ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যার তুল্য পাপজনক।

রাজার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনে শ্যেন যুক্তি দেখাতে থাকে — সকল প্রাণীই আহারের ফলে বৃদ্ধি পায়, আহারের গুণেই বেঁচে থাকে। আপনি যদি আমাকে ভক্ষ্যবস্তু থেকে বঞ্চিত করেন, তাহলে ক্ষুধার জ্বালায় আমি ত মরবই। আমার পুত্রকলত্রাদিও মারা পড়বে। সুতরাং একটি কপোতকে রক্ষা করতে গিয়ে আপনি এতগুলি প্রাণীর বিনাশের কারণ হয়ে থাকবেন। হে সত্যবিক্রম রাজা! যে ধর্ম অপর ধর্মকে নষ্ট করে সেটা ধর্মই নয়, সেটা কুধর্ম। আর যে ধর্ম অন্য ধর্মের বাধা না জন্মিয়ে স্বতঃই উৎপন্ন ও অনুষ্ঠিত হয়। সেই ধর্মই প্রকৃত ধর্ম —

ধর্মং যো বাধতে ধর্মোনস ধর্মঃ কুধর্ম তৎ।
অবিরোধাত্তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্য বিক্রম!

শ্যেন পক্ষীর যুক্তি শুনে রাজা মনে মনে চমৎকৃত হলেন। তিনি শ্যেনকে বললেন — বিহঙ্গম! ভোজনের জন্যই তোমার এই উদ্যম দেখছি, সে ভোজন ত তুমি অন্যভাবেও, আরও অধিক পরিমাণে করতে পার। আমি তোমাকে একখণ্ড রাজ্য দান করছি, প্রচুর বৃষবরাহাদি অন্যান্য পশুও দান করতে প্রস্তুত আছি কিংবা তুমি আর যা কিছু চাইবে তাই দেব কিন্তু এই আশ্রয়প্রার্থী কপোতটি তোমাকে দিতে পারব না — নহি দাস্যে কপোতকম্।

এই শ্যেন ত প্রকৃতপক্ষে শ্যেন নন। কাজেই এই প্রস্তাবে রাজী হবেন কেন? স্বয়ং ইন্দ্র এসেছেন পরীক্ষা করতে। কাজেই শ্যেন বলল — 'মহারাজ! এই কপোতের উপর যখন এতই স্নেহ তাহলে নিজের মাংস ছেদন করে তুলাদণ্ডের একদিকে এই কপোত এবং অপর দিকে আপনার সেই মাংস দিন। আপনার মাংস ঐ কপোতের সমান হলে আমাকে দান করবেন। তাতেই সন্তুষ্ট হব। রাজা তার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হয়ে বললেন —

অনুগ্রহমিমং মন্যে শ্যেন! যন্মাভিযাচসে।
তস্মাত্তেহদ্য প্রদাস্যামি স্বমাংসং তুলয়া ধৃতম॥

শ্যেন! তুমি আমার কাছে যে রকম চাইলে সেটাকে তোমার বিশেষ অনুগ্রহ বলেই আমি মনে করছি। আমি তোমাকে আজ নিজের মাংসই কপোতের সঙ্গে মেপে দান করব। রাজার যেই কথা সেই কাজ। তিনি তুলাদণ্ডের একদিকে কপোতকে স্থাপন করে নিজের শরীর হতে মাংস কেটে কেটে তুলাদণ্ডের অপর দিকে চাপাতে থাকলেন। কিন্তু ক্রমাগত মাংস কেটে কেটেও অগ্নিদেবরূপী কপোতের সমান তাঁর মাংসের ওজন হল না। তখন ছিন্নমাংস রাজা নিজেই তুলাদণ্ডের অন্যদিকে উঠে বসলেন। এইবার শ্যেন ও কপোত স্ব স্ব রূপ ধারণ করে উশীনরের কাছে প্রকট হয়ে বললেন — আমরা আপনার ধর্মবল পরীক্ষা করবার জন্য এসেছিলাম। আশ্রিতকে রক্ষা করার জন্য আপনি প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়েছেন। আমরা সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হয়েছি আপনার ধর্মবল দেখে। এই জগতে আপনার কীর্তি অক্ষয় থাকবে। অন্তে আপনি অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হবেন। সংসারে যে গৃহী আশ্রিতকে এইভাবে আশ্রয় দেবেন এবং তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার জন্য যত্নবান হবেন তিনিও মুক্তির অধিকারী হবেন।

গল্প শেষ করেই পণ্ডিতজী মন্তব্য করলেন — 'সেইজন্যই বলছিলাম, নিত্য গৃহদেবতার পূজা, অতিথিকে সমাদরের সঙ্গে অন্নদান এবং আশ্রিতকে আশ্রয়দান এই তিন ধর্মপালন

করলেই গৃহীর পক্ষে যথেষ্ট ধর্মপালন করা হয়। সেই গৃহীর অন্য কোন জপ তপ না যোগানুষ্ঠান না করলেও চলে। দৈনন্দিন জীবনে এইরকম আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের দ্বারাই মুক্তি সহজলভ্য হয়'।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পণ্ডিতজী মণ্ডলেশ্বরজীর আরতির জন্য উঠে পড়লেন। আমিও উঠে নর্মদাতটে গিয়ে বসলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নর্মদা থেকে প্রায় সত্তর গজ দূরে মন্দির। আরতির বাজনা বেজে উঠল। শিঙা ডম্বরু ও ঢোলকের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আমি মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অনেক শিব মন্দিরের আরতি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। হিমালয়ের কেদারনাথের আরতির বাজনা খুবই চিত্তাকর্যক। কিন্তু এখানে আরতি করছেন যিনি, তাঁর নৃত্যের তালে তালে আরতি করার কৌশলে এবং আন্তরিক অভিব্যঞ্জনায় অন্য যাদু! গিয়ে দেখলাম, পণ্ডিতজী তা-তা-থৈ, তাথৈ তাথৈ ধ্বনি তুলে সাশ্রুনয়নে আরতি করতে করতে বলছেন —

জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী
বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্ধনি
ধগদ্-ধগদ্-ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে
কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম।

অর্থাৎ জটারূপ কটাহ হতে বেগে বহমান গঙ্গার চঞ্চল তরঙ্গমালায় যাঁর মস্তক শোভিত যাঁর ললাট হতে ধগদ্ ধগদ্ শব্দে নিয়ত অগ্নি দেদীপ্যমান, সেই চিরকিশোর চন্দ্রশেখরে আমাদের প্রতিক্ষণ রতি হোক।

গতকাল সন্ধ্যার রাবণ-কৃত স্তোত্রের প্রথম স্তবকটি পণ্ডিতজী আরতিতে রূপায়িত করেছিলেন আজ করলেন দ্বিতীয় স্তবকটিকে। আরতি দেখতে দেখতে মনে হয় প্রত্যেকেরই শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

আরতি শেষ হল, পণ্ডিতজীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করে আমি শুতে চলে গেলাম ঘরে। ঘুম কিছুতেই এল না। একবার সোমানন্দজীর কথা একবার সচ্চিদানন্দজীর কথা ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে ভীড় করে এল। আমি তাঁদেরই স্মৃতিচারণ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। আজও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক রশ্মিপথ, আমি সেই রশ্মি অনুসরণ করে দেখতে পেলাম গুপ্তেশ্বর মহাদেবের গুহাভ্যন্তর আলোকিত হয়ে উঠেছে। আমার শরীর পড়ে রইল, শরীর থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমি, নিজের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লাম। আমার শরীরটা এত হাল্কা এবং ক্ষুদ্রাকৃতি হল কি করে? যাইহোক আমি সেই শরীরেই গুটি গুটি পায়ে অগস্ত্যি গুহার দ্বারদেশে এসে পৌঁছলাম। গুহার ভেতরে উঁকি মেরে দেখি সেখানে বসে আছেন প্রলয়দাসজী। স্তব পাঠ করছেন তিনি। তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত মন্ত্র শোনবার জন্য উৎকর্ণ ও একাগ্র হতেই ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার উপরে উঠে বসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। সারা শরীর ঘর্মাক্ত, উঠে বসতে পারলাম না। চুপ করে শুয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম, যা ঘটে ঘটুক, উপর্যুপরি দু'দিন যখন স্বপ্নে প্রলয়দাসজীকে অগস্ত্যি গুহার দ্বারদেশে দেখলাম, তখন ঐখানে একবার যেতেই হবে

পণ্ডিতজী গুহা সম্বন্ধে যখন ভয়াবহ ধারণা পোষণ করেন, তখন তাঁর কাছে আমার সংকল্পের কথা না বললে হবে। আমি তাঁর কাছে একেবারে বিদায় নিয়েই চলে যাব। জানালা দিয়ে দেখলাম, তখনও পরিষ্কারভাবে সকাল হয়নি, গাছপালার অন্ধকার জড়িয়ে আছে। ঘরের দরজা খুলে দিতেই ঘরের ভেতরে ততটা আর জমাট অন্ধকার থাকল না। আমি কম্বলাদি গাঁঠরীর মত করে বেঁধে ফেললাম। সব বাঁধা-ছাঁদা করেই বাইরে বেরিয়ে আসতেই পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি তাঁকে জানালাম, তিনদিন এখানে থাকা হয়ে গেল। আজ আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। আপনি প্রসন্নমনে অনুমতি দিন। ঐ সময় ব্রাহ্মণীমাও পণ্ডিতজীর জন্য তামাক সেজে নিয়ে বাইরে এসেছিলেন। তাঁরও আশীর্বাদ চাইলাম। পণ্ডিতজী বললে — আপনি পরিক্রমাবাসী, পরিক্রমায় বাধা দেব না। তবে মণ্ডলেশ্বরের পূজা করে এখানে বেলা দশটার মধ্যে ভিক্ষা গ্রহণ করে যাত্রা করলে আমরা মনে খুব শান্তি পাব। ব্রাহ্মণীমা তাঁর কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন — ন, সাড়ে ন'কা অন্দর হমরা রসুই সমাপ্ত হো যাবে গা, হিঁয়াসে আপকো যানে পড়ে গা মহেশ্বর। ইহ্ দূর নেহি। দুপহরমেঁ বুড়ী খুশীসে আপ্ উধর পৌঁছ্ সকতে হৈ।

অগত্যা আর কী করা যায়। এই ধার্মিক দম্পতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। আমি শৌচাদি সেরে নর্মদাতে নামলাম স্নান করতে। স্নান তর্পণাদি সেরে মন্দিরে গেলাম মণ্ডলেশ্বরের পূজা করতে। কমণ্ডলুর জলে মহাদেবকে স্নান করিয়ে চন্দন ঘষতে বসলাম। আজ খানিকটা চন্দন ঘষে শিবলিঙ্গটিকে চন্দনে ঢেকে দিলাম। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দেখি, উচিত শর্মা পৌঁছে গেছেন পূজার আয়োজন করতে। একটু পরেই পণ্ডিতজী এলেন পূজা করতে। আমি মন্দিরের চারদিকে শিবস্তোত্র পাঠ করতে করতে মহাদেবকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলাম। একটু দুটি করে ভক্তেরা আসতে সুরু করেছেন মন্দিরে। আমি পণ্ডিতজীর বাসায় এসে বসে রইলাম। বেলা প্রায় নটা নাগাদ রামদয়াল আমাকে ডেকে নিয়ে গেল খাওয়ার জন্য। খাওয়ার পর সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি ব্রাহ্মণীমার কাছে বিদায় নিয়ে রামদয়ালের সঙ্গে পুনরায় গেলাম মন্দিরে। পণ্ডিতজীর সঙ্গে যদি চোখাচোখি হয় এই আশায় মন্দিরের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি তখন অত্যন্ত সমাহিত চিত্তে পূজা করে চলেছে, তাঁর একাগ্র দৃষ্টি মণ্ডলেশ্বরের দিকে। অগত্যা মণ্ডলেশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করে আমি হাঁটা সুরু করলাম। কমলভারতীজীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাশ দিয়ে আমি পাথর গিরিজীর আশ্রমের ধারে এসে পৌঁছলাম। এইখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম অগস্ত্যি গুহা কোন দিকে। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালার অন্তরালের জন্য পাহাড়ের চূড়া স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও অনুমানের উপর নির্ভর করে আমি এগোতে লাগলাম উত্তর পশ্চিম দিকে। পথে পর পর দুজন লোকের দেখা পেলাম। মনে হল তারা এই মহল্লারই অধিবাসী। কিন্তু ঐ গুহাকে কেন্দ্র করে মহল্লাবাসীর মনে এমন ভয়ের সংস্কার দানা বেঁধে আছে যে আমি গুহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই তাদের মনে অহেতুক কৌতূহল দেখা দেবে এবং গত তিন দিনের মধ্যে তাদের কেউ যদি আমাকে মন্দিরে বা পণ্ডিতজীর বাসায় দেখে থাকে, তাহলে কথাটা পণ্ডিতজীর কানে পৌঁছে যেতে পারে এবং স্নেহবশেই হয়ত পণ্ডিতজী দৌড়ে এসে আমাকে ঐ ভয়ঙ্কর গুহায় যেতে নিবৃত্ত করতে পারেন। কাজেই কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। তাছাড়া তখন পাহাড়ের

চূড়া আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে। গুহামুখ লক্ষ্য করে আমি হাঁটতে লাগলাম। কোন সময় এদিকে আসার রাস্তা হয় ভালই ছিল কিন্তু বহু বছর ধরে এদিকের পথ পরিত্যক্ত হওয়ার পথ কঙ্করময় এবং ছোট ছোট গাছ লতাগুল্মে ঢাকা পড়ে গেছে। হাঁটতে লাগলাম খুব সাবধানে ও ধীরে ধীরে। পণ্ডিতজী বলেছিলেন, পথ মাইল খানেক। কিন্তু সেই এক মাইল পথ হাঁটতেই আমার এক ঘন্টারও বেশী সময় লেগে গেল। সারা পথই পাথরের চাঙড়ে ভর্তি, বর্ষার পর বলে কিংবা পণ্ডিতজী যে বলেছিলেন গুহাভ্যন্তর থেকে একটা ঝর্ণা বয়ে আসছে পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে; সেজন্যই স্থানে স্থানে পাথরের চাঙড় ঘেরা জায়গায় জল জমে আছে। সে সব ডিঙিয়ে কোথাও বা ঘুরপথে সেই সবকে এড়িয়ে পাহাড়ের তলায় গিয়ে পৌঁছে গেলাম। বাঁধানো সিঁড়ির চিহ্ন রয়েছে , কোথাও ঈষৎ ভগ্ন কোথাও অভগ্ন, সোজা উঠে গেছে পাহাড়ের উপরের দিকে; বুঝতে পারলাম গুহামুখের দিকেই গেছে। গুপ্তেশ্বর মহাদেব এবং নর্মদামায়ীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমি সিঁড়ি ভেঙে চড়াই-এর পথে উঠতে লাগলাম। গোটা পাহাড় রৌদ্রে ঝলমল করছে। সিঁড়ির ধারে ধারে পাহাড়ের যেসব গাছপালা আছে তাদের শাখা-প্রশাখা বেড়ে এসে সিঁড়ির উপর ঝুঁকে পড়েছে। সাবধানে গুণে গুণে প্রথম অষ্টাশীটা সিঁড়ি অতিক্রম করে একবার পেছন দিকে তাকালাম। দূরে মণ্ডলেশ্বর মহল্লা ও মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। কতকগুলো গরু মহিষ চরছে কিন্তু মানুষজনের কোন নিশানা চোখে পড়ল না। নর্মদার ধারাও ভালভাবে দেখতে পেলাম না। আমাকেও কেউ নীচের উপত্যকা অঞ্চল থেকে দেখতে পাবে বলে মনে হচ্ছে না। কেন না আমি যেন ঘন বনের মধ্যে ঢুকে হারিয়ে গেছি। এখানকার ধাপে ধাপে সিঁড়ির গঠন থেকে কেবলই গয়ার ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের কথা মনে পড়ছে, তফাতের মধ্যে সেখানে পাহাড়ের গাছপালা এত ঘন নয়। সেখানে যেমন কিছুদূর উঠে যাবার পর একটা চবুতারা আছে; এখানেও সেইরকম পর্বতারোহীর বিশ্রামের জন্য একটি ছোট নাটমন্দির আছে। আমি সেখানেই মিনিট দশেক বসলাম। নির্জন নিশুতি, গা ছম্‌ছম্ করছে, কোন বন্য প্রাণীরও দেখা পাচ্ছি না। এই পর্যন্ত সিঁড়িগুলো মোটামুটি ভাল। কিন্তু তারপর যতই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলাম, ততই সিঁড়িগুলি ভাঙা দেখলাম, সিঁড়ির উপর দিয়েই ঝির্‌ঝির্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ে চড়ার নিয়ম অনুসারে পর্যায়ক্রমে কোণাকুণি করতে লাগলাম। পা টিপে টিপে। সিঁড়িগুলো ক্রমে পিচ্ছিল হচ্ছে, কোন এক সময় সুন্দর পথ ছিল তা দেখলেই বোঝা যায়। তখন নিশ্চয়ই ভক্তদের আনাগোনা ছিল, কিন্তু ক্রমে তা বন্ধ হতেই সিঁড়িগুলো ক্রমেই ভাঙাচোরা হয়ে গেছে। ধারের গাছপালা ঝাঁপিয়ে পড়ায় সিঁড়ির চাতালের যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে সেখানেই পা ফেলে উঠতে লাগলাম। কেবলই মনে হতে লাগল হাতে লাঠি না রেখে যদি একটা টাঙি বা কুঠার রাখতাম, তাহলে এ সময় খুব কাজে দিত। সিঁড়ির উপর ঝুঁকে পড়া ছোট ছোট ডাল ছেঁটে চলার সুবিধে করে নিতে পারতাম। টাঙি বা কুঠারের প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল তারাপীঠ ভৈরব বামাক্ষ্যাপার শিষ্য শ্রীমৎ তারাক্ষ্যাপার কথা। উগ্রতেজা এই মহাপুরুষের হাতে সব সময়েই একটা কুঠার থাকত। ১৯৪৪ সালে আমি যখন দশম শ্রেণী ছাত্র সেই সময়ে আমি বাবার সঙ্গে বহরমপুরে 'উমাবনম' নামক আশ্রমে মহাত্মা তারাক্ষ্যাপাকে দর্শন করতে যাই। প্রথম দর্শনেই তাঁর অস্বাভাবিক তেজোদীপ্ত চোখ ও হাতের কুঠার দেখে আমি চমকে উঠি। সেদিন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত

অশোকনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, ডাঃ প্রবোধ বাগচী, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি বাংলার দিকপাল মনীষীবর্গ। সেদিন তাঁদের মধ্যে যোগদর্শন নিয়ে যে সব উচ্চকোটির আলোচনা হয়েছিল, তা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নি, কিন্তু যেভাবে তাঁর অগ্নিদৃষ্টি ফেলে বার বার আমার দিকে তিনি সেদিন তাকাচ্ছিলেন, আমার মনে হচ্ছিল তিনি যেন তাঁর দৃষ্টি দ্বারাই আমার অন্তঃস্থল পর্যন্ত সব কিছুই দেখে নিচ্ছিলেন। বাবার কাছে শুনেছিলাম, ইনি সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর এক পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন — 'তোমার কর্মক্ষেত্র ইউরোপের রণাঙ্গনে, সেখানেই তোমাকে যেতে হবে।' শুনেছি, এর পরেই সুভাষচন্দ্র নাকি বৃটিশ গুপ্তচরদের চোখে ধূলো নিক্ষেপ করে ইউরোপে চলে যান এবং ভারতবাসী সুভাষচন্দ্রকে আই. এন. এ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে নেতাজীর নূতন রূপের পরিচয় পান। যাইহোক ১৯৪৫ সালে মহাত্মা তারাক্ষ্যাপার দেহান্ত ঘটেছে, কিন্তু প্রথম দর্শনেই কুঠারধারী ঐ বিচিত্র সাধকআমার মনের মধ্যে এমন ছাপ ফেলেছিলেন যে আজ এতদিন পরে নর্মদাতটের দুর্গম পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কথাই আমার মনে পড়ে গেল।

যাই হোক, এখন ত আমার হাতে কুঠার নেই। মাথা ঝুঁকিয়ে, ডাল-পালার ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে পা ফেলে ফেলেই আমাকে গুহামুখে উঠতে হবে। আমি এগিয়ে চললাম চড়াই এর পথে। ২৯৯টি সিঁড়ি ভেঙে আমি যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, সেইখানে সিঁড়ির ধাপগুলো অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার থাকলেও সিঁড়ির পাশেই পাথর ভেদ করে যে গাছটি উঠেছে, তার ডালে দেখতে পেলাম একটা থালার মত বড় বোলতার চাক্। তারা বন্ বন্ শব্দে ঘুরছে। এই মারাত্মক কীট একটি মাত্র দংশন করলে আর রক্ষে নেই! অথচ সেই চাকের তলা দিয়েই আমাকে যেতে হবে। বড় ভাবনায় পড়লাম। পণ্ডিতজী গল্প করেছিলেন, বাঘের আক্রমণে বা অশরীরী ভূতপ্রেতের আক্রমণে নাকি এই পাহাড়ে মানুষ মারা গেছে। কৈ তিনি ত একবারও এই ভয়ঙ্কর বোলতার কথা বলেন নি! এখনও পর্যন্ত ত কোন হিংস্র বন্যজন্তু বা অশরীরীর উপদ্রব দেখলাম না, এখন এই বোলতার হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাই? ভাবতে ভাবতেই মা নর্মদাকে স্মরণ করে যতদূর সম্ভব দ্রুত বেগে সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলে উঠতে লাগলাম উপরের দিকে লাঠি ঠুকে ঠুকে। অনেকগুলো সিঁড়ি এই ভাবে বেয়ে উঠে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হতে লাগল। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম কোন বোলতা আমাকে অনুসরণ করে আসছে না। আমি নিশ্চিন্ত মনে কিছুটা কমণ্ডলুর জল পান করলাম। উপরের দিকে তাকিয়ে বিশাল গুহামুখ স্পষ্টভাবে এভাবে দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে গুহাটা যেন মুখব্যাদন করে আছে আমাকে গ্রাস করার জন্য। পরক্ষণেই মনে পড়ল, এরকম আঁকাবাঁকা ভাবে ভাবনা করা উচিত নয়। ওখানে আছেন গুপ্তেশ্বর মহাদেব, যিনি সদা মঙ্গলময়, তাছাড়া এটা যদি ঋষির তপস্যাস্থলী হয়, তাহলে তা অভয় ও বরদ হয়। নিজেও ত দেখলাম, এতক্ষণ ধরে এই দুর্গম পাহাড়ে হাঁটছি, এখানে বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, চিতা ত থাকারই কথা, কিন্তু কেউ এ আমার উপর এখনও পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়েনি। আমি গুপ্তেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। এখন সিঁড়িগুলো আর ভাঙাচোরা নয় তবে জলের ধারা কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। সিঁড়িতে পা রাখা যাচ্ছে না। অতিকষ্টে পা টিপে টিপে লাঠির উপর ভর দিয়ে দিয়ে ৪৪৪ টি সিঁড়ি অতিক্রম করে একটা সিঁড়ির অপেক্ষাকৃত শুকনো অংশে পা রেখে দাঁড়ালাম। গুণে দেখলাম আর মাত্র ৫টি সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই

গুহাদ্বারে পৌঁছে যাব।

মিনিট খানেকের মধ্যেই গুহার ভেতরে একটা বাঘ প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল। মনে হল, সমস্ত গুহা এবং এই পাহাড় প্রকম্পিত হয়ে উঠল। এই আচম্বিত প্রচণ্ড গর্জনে আমার গাঁঠরী ও ঝোলা বগল থেকে খসে পড়ল, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আমি মুখ থুবড়ে বসে পড়লাম। মিনিট খানেক যেতে না যেতে আবার প্রচণ্ড গর্জন, মনে হচ্ছে গুহাটা ফেটে পড়বে। হাতের লাঠি ছিটকে পড়েছে, কমণ্ডলুটা কাত্ হয়ে পড়ে গেছে। আমি দিওয়ানাজী প্রদত্ত হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হতে পরিত্রাণকারী মহামন্ত্রটা স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে এল না। আমি চোখ বন্ধ করে 'বাবা-বাবাগো' বলে কাঁদতে থাকলাম। গলাও শুকিয়ে গেছে ভয়ে। বারেকের জন্য মনে হল দু'দুটো বাঘ যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার উপর, আমার গা হতে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তাদের গায়ের তীব্র বোটকা গন্ধও যেন আমার নাকে ঢুকছে।

কতক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলাম জানি না, শুনতে পেলাম বাবার কণ্ঠস্বর। তিনি যেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন — আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। ভয় কিরে! বাঘ কোথায়? মাথা তুলে উঠে দাঁড়া! আমার ইষ্টদেবের বরাভয় পেয়ে আমারে জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেলাম না বটে তবে ধীরে ধীরে লাঠিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারলাম। ভাবলাম কাজ নেই আর গুহায় ঢুকে, সূর্যকে মাথার উপর দেখে বুঝলাম বেলা এখন বড়জোর একটা হবে। এখন যদি নেমে যাই স্বচ্ছন্দে নেমে যেতে পারব। বেলা থাকতে থাকতেই পৌঁছে যাব পণ্ডিতজীর বাসায়। তাঁর কাছে সরলভাবে সব ব্যক্ত করে আজকের রাতটাও না হয় তাঁর বাড়ীতেই নিরাপদে কাটাব। গাঁঠরী, ঝোলা ও কমণ্ডলু কুড়িয়ে নিয়ে গুপ্তেশ্বর মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে নেমে আসার জন্য ঘুরেছি, সেই সময়ে, ঠিক সেই মুহূর্তে গুহার অভ্যন্তরে কারো কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলাম। তিনি ভাবগদ্গদকণ্ঠে বলছেন — ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ, ওঁ ঈশানায় সূর্যমূর্তয়ে নমঃ। গুহার মধ্যে বসে এমন সময়ে মহেশ্বরের অষ্টমূর্তির উপাসনা কে করছেন? এই কণ্ঠস্বর যেন আর কোথাও শুনেছি, বড় পরিচিত বলে মনে হচ্ছে, মুহূর্তে মন থেকে ভয় চলে গেল। ফিরে যাবার সংকল্প ত্যাগ করে গুহার আরও কাছাকাছি যাবার জন্য আমি আরও দুধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। এবার আরও স্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম মেঘমন্দ্র কণ্ঠে মন্ত্রধ্বনি —

ওঁ মুক্তাম্ কুন্দেন্দু গৌরাম্ মণিময় মুকুটাম্ রত্নতটোঙ্কযুক্তাম্।
অক্ষস্রক-পরশুপুষ্পহস্তাম্ অভয়বরাকরাম্ চন্দ্রচূড়াম্ ত্রিনেত্রাম্॥
নানালঙ্কারযুক্তাম্ সুরমুকুটমণিম্ জ্যোতিষাং মধ্যপীঠাম্।
সানন্দাম্ সুপ্রসন্নাম্ ত্রিভুবনজননীম্ নর্মদাং চিন্তয়ামি॥

আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। ও যে আমার পরম প্রিয় মহাত্মা প্রলয়দাসজীর কণ্ঠস্বর! বুকে তখন আমার শতহস্তীর বল। দুই লাফে আমি চারটে সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে দরজায় পৌঁছে গেলাম। গুহার ভেতর অন্ধকার, রোদ থেকে সহসা উঠে এসেছি বলে অন্ধকারটা আরও জমাট দেখাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি ঝোলা থেকে টর্চটা বের করে গুহার মধ্যে আলো

ফেললাম। আমার নয়নানন্দই বটেন! সেই একইভাবে 'সমকায়-শিরোগ্রীব'হয়ে বসে আছেন আর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করছেন। আমি চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়তেই বললেন — আ যাও বেটা, ইয়ে হ্যায় নর্মদামায়ীকা ধ্যানমন্ত্র, তুমভি বলো......। এই বলে তিনি ধীরে ধীরে মন্ত্রটি পাঠ করালেন। বললেন, ইস্, মহামন্ত্রকা মতলব এহি হ্যায়.......বলে যা অর্থ বললেন বাংলায় তার সারমর্ম হল, মা নর্মদা চিরমুক্তা, তাঁর গাত্রবর্ণ অমলধবল, শিবপুত্রীর গায়ের রং তার পিতারই মত, কুন্দ পুষ্প এবং চন্দ্রের মত শ্বেতজ্যোতির্মণ্ডিত। কটিতে রত্নময় কোমরবন্ধনী। মা আমার চতুর্ভূজা। তাঁর একহাতে রুদ্রাক্ষ ও চন্দনমালা, একহাতে কুঠার, একহাতে লীলাকমল এবং আর একহাতে বরাভয়মুদ্রা, তাঁর কপালে অর্ধচন্দ্র। ত্রিনেত্রধারিণী। নানা মণিময় অলঙ্কারে সুশোভিতা জননী, দেবতাদের মধ্যমণিস্বরূপা। ত্রিলোকের যাবতীয় জ্যোতির্ময় দিব্য বস্তু সারাৎসার জ্যোতির মধ্যে তিনি নিত্য প্রকটিতা আছেন। মা আমার আনন্দময়ী, সদৈব সুপ্রসন্না। এহেন ত্রিভুবনজননী নর্মদাকে আমরা ধ্যান করি এস।

'ধ্যান করি এস' বলে তিনি সেই যে ধ্যানে ডুবলেন, ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল, সেই ধ্যান আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। বেলা প্রায় পাঁচটা নাগাদ তাঁর দেহে স্পন্দন দেখা গেল। ঘরের মধ্যে এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘনিয়ে এল যে কাছাকাছি বসে থেকেও তাঁর দেহটাও দেখতে পাচ্ছি না। গুহার শেষ প্রান্তে অত্যন্ত মৃদু এক ক্ষীণ আলোর শিখা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, একটা বড় পাথরের চাঙড়ের আড়ালে ঐ চাঙড় ভেদ করেই প্রায় একফুট দীর্ঘ এক স্বয়ম্ভুলিঙ্গ উত্থিত আছেন। গোটা শিবলিঙ্গ চন্দনে বিভূষিত, তাঁর শীর্ষদেশে একটি বিল্বপত্র, সেখান থেকে এক অপূর্ব সুরভি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গন্ধটা এমনই মিষ্টি যে আমি বার কয়েক নিঃশ্বাস টেনে টেনে বুকভরে গন্ধটা নিলাম। দেখে আশ্চর্য হলাম যে শিবলিঙ্গের পেছন দিক দিয়েই ঝিরঝির করে জল উঠছে। এই জলই তাহলে ঝর্ণার উৎস। গুহার একদিকের দেওয়াল ঘেঁসে জল গুহামুখ দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়িগুলোকে প্লাবিত করে চলেছে। আমি সাষ্টাঙ্গে গুপ্তেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করলাম। এমন সময় পেছন দিক থেকে প্রলয়দাসজী বলে উঠলেন — দর্শন করলিয়া? মহাদেব ইধর অগস্ত্যজীকা প্রতাপসে প্রকট হুয়া। কোই বখৎ অগস্ত্যজী ইধর থে, ইসমে কোই সন্দেহ নেহি হ্যায়, হমারা অনুভব ভি এ্যায়সাই হ্যায়।

আমি তাঁর কাছে এসে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম — কৃপা করকে অগস্ত্যজীকা বারেমেঁ কুছ বাতাইয়ে।

— আরে উনকা পহেলে আপ্ সোমানন্দজীকো বারেমেঁ থোড়া শুন লিজিয়ে। আপ্ উনকো দো দফে যো সুপনমেঁ দেখা ঔর আপ্ শোচতে হো, উনোনে চোলা ছোড় দিয়া, ইস্‌লিয়ে হম্ দেখতা হৈ তুমহারা অন্তঃকরণ বিচ্ বিচ্‌মেঁ দুঃখাতা হৈ। সোমানন্দজী বহাল্ তবিয়ৎমেঁ হৈ। উনোনে যোগকা প্রতাপসে প্রকৃতি-বশীত্ব কর লিয়া হৈ। আভি সীতাবনমেঁ রহ্ কর উনোনে আনন্দ লেতে রহেঁ।

অন্তর্যামী মহাপুরুষের অন্তর্ভেদী বাক্য শুনে আমি খুশী হলেও স্তম্ভিত হলাম না। কেননা, ওঁকারেশ্বরে এঁর তপস্থলীতে থাকার সময়েই এঁর ঐইরকম অন্তর্যামিত্বের বহু অভ্রান্ত প্রমাণ পেয়েছিলাম।

— তুমহারা কমণ্ডলু মুঝে দিজিয়ে, উস্‌মে পানি নেহি, হম্ উসমেঁ পানি ভর দেতে

হায়। আমি কোন কথা বলার পূর্বেই আমার কমণ্ডলুটা নিয়ে যেদিকে গুপ্তেশ্বরজী বিরাজমান সেদিকে চলে গেলেন এবং কমণ্ডলু ভরে জল এনে আমার সামনে রাখলেন। আমি বললাম ওঁকারেশ্বরে আপনার গুহাতে যে আশ্চর্য প্রদীপটি দেখেছিলাম, সেটি আপনার সঙ্গে থাকলে খুব ভাল হত, তাহলে এখন অন্ধকারে থাকতে হত না, সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি জ্বলে উঠত।

একথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রলয়দাসজী বললেন —- অগস্ত্যজী কা বারেমেঁ মহাভারত ঔর পুরাণো মেঁ বহোৎ কহানী, বহোৎ কিস্যা আপনে পড়া হৈ। যো আপ্ নাহি শোনা, উহ্ বাত্ আপ্‌কো হম্ বোলতা হুঁ, শুন্ লিজিয়ে। তিনি আমাকে জানালেন যে, অগস্ত্য ছিলেন বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা এবং উদ্‌গাতা। ঋগ্বেদের ১৬৫ হতে ১৯১ সূক্ত পর্যন্ত ২৬ টি সূক্তের প্রায় সমুদয় মন্ত্রই অগস্ত্য ঋষির দৃষ্ট। ১৭৯ সূক্তের ৬ নম্বর মন্ত্রটিতে তাঁর বর্হির্জীবন ও আন্তরজীবনের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মন্ত্রটি হল —

অগস্ত্যঃ খনমানঃ খনিত্রৈঃ প্রজামপত্যং বলমিচ্ছমানঃ।
উভৌ বর্ণৌ ঋষিরুগ্র পুপোষ সত্যা দেবেষু আশিসো জগাম॥

মন্ত্রটির সরলার্থ হল, সেই উগ্রঋষি অগস্ত্য উপযুক্ত সাধনপন্থা অবলম্বন করে পুত্র ও বলকামনায় প্রণয়সুখসম্ভোগ এবং তপজপ সাধন, এই উভয় ধর্মই পোষণ করেছিলেন অর্থাৎ ইহজগতে অভ্যুদয় এবং পরজগতে নিঃশ্রেয়স্ লাভ করে দেবতাদের নিকট সত্যোপলব্ধির আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। এই মন্ত্রে অগস্ত্যকে বলা হয়েছে 'ঋষিরুগ্র' অর্থাৎ উগ্রতেজা ঋষি। তিনি নিঃশ্রেয়সের অধিকারী। যেসব ঋষি নিঃশ্রেয়স লাভ করেন, তাঁরা সত্য সংকল্প। তাঁদের মনে কোন সংকল্প উদয় হলেই তা সঙ্গে সঙ্গে কার্যে পরিণত হয়। এইজন্য তাঁকে নিজেকে কোন যোগবিভূতির আশ্রয় নিতে হয় না। অগস্ত্য ঋষির নিত্যস্থিতি নক্ষত্রলোকে অর্থাৎ নিত্যজ্যোতির্ময় লোকে। জাগতিক কোন কামনা বাসনা ত দূরের কথা মায়িক জগতের কোন স্মৃতি তাঁদের মনে উদিত হতে পারে না। তবু যে ইষ্টদেবের সাধনা করে তাঁরা সিদ্ধকাম হন, সেই ইষ্টলোকে তাঁর গতি হলে এমন কি ইষ্টের সঙ্গে লীন হয়ে গেলেও যে ইষ্টদেবের বিগ্রহকে কেন্দ্র করে তাঁরা সাধনা করে গেছেন, সেই জাগ্রত ইষ্ট বিগ্রহের চিদ্‌রশ্মির সঙ্গে নিজের স্থূল সাধন দেহস্থিত চিদ্‌রশ্মি একাত্মতা লাভ করলে তবেই তাঁদের পরাগতি লাভ হয়। মহর্ষি অগস্ত্য ছিলেন একাধারে মহাশৈব ও মহাশাক্ত, শিব স্বরূপ মহাযোগী। তাঁর নিত্য পূজার বস্তু ছিলেন এই গুপ্তেশ্বর মহাদেব, অর্থাৎ অদূরে বিরাজ করছেন যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গটি। ইনিই তাঁর ইষ্টবিগ্রহ। তাই এখনও এই বিগ্রহের চিদ্‌রশ্মি ধরে এই গুহায় কখনও কখনও তাঁর অবতরণ ঘটে থাকে।

হর নর্মদে, হর নর্মদে, যুক্তকরে উঠে দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও ঐ যে তিনি এসে গেছেন। ইষ্টমন্ত্র জপ কর। অত্যন্ত চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে কথা কয়টা বলেই তিনি শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত হাতজোড় করে ঝট্‌পট্ করে উঠে দাঁড়ালাম, গুপ্তেশ্বর মহাদেব যেখানে সেই দিকেই আমি অন্ধকারের মধ্যে তাকাতে লাগলাম। পরম বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম, সমগ্র গুহাটি আবছা আলোকে ধীরে ধীরে ভরে উঠল। গুহার মধ্যে যেন একক জ্যোৎস্নার উদয় হয়েছে। সেই মৃদু ও স্নিগ্ধ আলোতে আমি প্রলয়দাসজীর দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। তিনি বিড়বিড় করে যেন কোন

মন্ত্র পড়ছেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেছি, অন্য কারও আবির্ভাব হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না, তবে গুহার মধ্যে যে মৃদু আলোর আভাস জেগেছে, তাতো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। মহাত্মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেছেন, তাঁর চোখের সামনে হয়ত কোন অতীন্দ্রিয় জগতের উন্মোচন ঘটেছে, কিন্তু আমার মূঢ় মন তখন গুহার দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাপ করতে ব্যস্ত। মনে হল গুহাটি বোধ হয় পঞ্চাশ ফুট পূর্ব পশ্চিমে লম্বা ও ত্রিশ ফুট চওড়া। গুহার দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁসে ঝর্ণার একটা অতি সংকীর্ণ ধারা ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে আর উত্তরদিকের দেওয়ালের উত্তরপূর্ব কোণ ঘেঁসে একটি পাথরের হোমকুণ্ড আছে। আমি যখন প্রলয়দাসজীর উচ্চারিত নর্মদার ধ্যানমন্ত্র শুনে গুহার মধ্যে প্রথম প্রবেশ করি, তখন গুহাতে ছিল জমাট অন্ধকার, যার জন্য টর্চ টিপে আমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়েছিল। তখন গুহার অভ্যন্তরভাগ নিরীক্ষণ করতে পারিনি, কিন্তু এখন গুহার মধ্যে স্বতোদ্ভাসিত কাকজ্যোৎস্নায় সবই স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি।

পূজনীয় প্রলয়দাসজীর শরীরে বার তিনেক শিহরণ দেখা দিল। আমি সাবধান হলাম। ধীরে ধীরে তিনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েই সজোরে আমার ডান হাতটা চেপে ধরে টেনে নিয়ে গেলেন সেই হোমকুণ্ডের ধারে। আমাকে অনুচ্চ কণ্ঠে ভ্রূকুটি করে বললেন — তুমি একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে থাক, আমি হোম করতে থাকি। আমি গায়ত্রী মন্ত্রেই হবন করছি। সর্বশ্রেষ্ঠ পাবক ও তারক মন্ত্র গায়ত্রী বিশ্বামিত্র ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট হলেও অগস্ত্যও ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের অন্তর্গত ১৮৮ সূক্তে তাঁর নিজের দৃষ্ট মন্ত্রে বলেছেন,

পুরোগা অগ্নির্দেবানাং গায়ত্রেণ সমজ্যতে।
স্বাহাকৃতীষু রোচতে॥ ১১

অর্থাৎ দেবগণের অগ্রগামী অগ্নি গায়ত্রীচ্ছন্দে লক্ষিত হয়ে থাকেন এবং অগ্নিরূপ স্বাহা প্রদানের সময় তিনি দীপ্ত হন।

কাজেই আমি গায়ত্রী মন্ত্রেই হবন করার মনস্থ করেছি। তবে বিশ্বামিত্র দৃষ্ট গায়ত্রী নামক সুপরিচিত মন্ত্রে নয় অর্থাৎ উপনয়নকালে তোমরা যে গায়ত্রী মন্ত্র আচার্যের কাছে পেয়ে থাক, সেই মন্ত্রে আমি হবন করছি না। বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবের পূর্বে প্রাচীন ঋষিকুল যে গায়ত্রী মন্ত্রে জপ করতেন আমি সেই মন্ত্রেই হোম করব। এইটাই প্রকৃত গায়ত্রী মন্ত্র। এই মন্ত্রের দেবতা সবিতা, 'তৎসবিতুর্বরেণং' ইত্যাদি মন্ত্রেরও দেবতা সবিতা। বিশ্বামিত্র দৃষ্ট মন্ত্র গায়ত্রী নামে প্রসিদ্ধ হলেও এটি সাবিত্রী মন্ত্র। আচার্য সায়নের মতে উদয়ের পূর্বে ভর্গদেবতার যে প্রকাশ তা হলেন সবিতা, আর উদয় হতে অস্তগমন পর্যন্ত তাঁর যে প্রকাশ তা হলেন সূর্য।

এই বলে তিনি হোমকুণ্ডের উপর গুণে গুণে পাঁচবার 'ওঁ নমো ভগবতে শ্যাবাশ্বায়','ওঁ নমো ভগবতে শ্যাবাশ্বায়' বলে তুড়ি মারলেন তারপর সজোরে নিঃশ্বাস টেনে কুম্ভক করে স্থির হলেন। আমি ভাবছি, একটু আগে অগস্ত্যদেবের আবির্ভাব হয়েছে বলে তিনি যখন দণ্ডায়মান অবস্থায় যুক্তকরে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আমি তখন যে মনে মনে গুহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পরিমাপে ব্যস্ত ছিলাম আমার সেই অন্যমনস্কতার জন্যই বোধ হয় ঊর্ধবাহু হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকার দণ্ড দিলেন। যাইহোক এই ঋষির আদেশ শিরোধার্য করে আমি

বিশ্বামিত্র কর্তৃক প্রকটিত আমার জানা গায়ত্রী মন্ত্রটি জপ করছি তদবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে, সহসা তিনি এক দীর্ঘ প্রলম্বিত শ্বাস ফেললেন সোজা হোমকুণ্ডের মধ্যস্থলে। কিঞ্চিৎ হবিঃ উড়ে গিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — অগ্নিদেব প্রকট হয়েছেন, আমি প্রাচীন ঋষিকুলের পরমারাধ্য গায়ত্রী যা দ্রষ্টা-ঋষি শ্যাবাশ্ব প্রকট করে গেছেন তা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে ঘৃতাহুতি দিচ্ছি তুমিও আমার সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাক। কমণ্ডলু হতে একটু ঘি ঢাললেন, আগুনের দীপ্তি বেড়ে উঠল, তিনি উদাত্ত-কণ্ঠে বলতে লাগলেন,

ওঁ তৎসবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্।
শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি॥

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ হিরণ্যপতিমূর্তয়ে স্বাহা। ওঁ তৎসবিতুর্বৃণীমহে স্বাহা। ওঁ বয়ং দেবস্য ভোজনম্ স্বাহা। ওঁ শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং স্বাহা। ওঁ তুরং ভগস্যধীমহি স্বাহা। শ্যাবাশ্ব দৃষ্ট মূল গায়ত্রী মন্ত্রটি তিনি বারবার উচ্চারণ করার ফলে মন্ত্রটি আমার মনে গেঁথে গেল। তাঁর হোমাগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা রইল না। চোখ দুটোকে কেউ যেন আঠা দিয়ে এঁটে দিয়েছে। আমি মুদ্রিত নয়নে জপ করে চলেছি —

ওঁ তৎসবিতুর্বৃনীমহে........ভর্গস্য ধীহমি ইত্যাদি।

ক্রমে মনে হল মন্ত্রটি আমি জপ করার চেষ্টা না করলেও আমার মস্তিষ্ককোষে মন্ত্রটি স্পন্দিত হচ্ছে গায়ত্রী ছন্দের তালে তালে। আমি মন্ত্রের রস ও আনন্দে বিভোর হয়ে গেলাম।

বহু, বহুক্ষণ পরে আমার বুকে তাঁর স্পর্শ অনুভব করলাম। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, চোখ খোলার চেষ্টা করো না, চেষ্টা করলেও খুলতে পারবে না, ঐ অবস্থাতেই শুনে নাও এই মন্ত্রের নিগূঢ় অর্থ। তৎসবিতুর্বৃণীমহে ইত্যাদি মন্ত্রে ঋষি বলেছেন — 'সকলের সংভজনীয় (ভগ) দ্যোতনশীল (দেব) শ্রুতিপ্রসিদ্ধ (তৎ) সবিতার সর্বভোগপ্রদ (সর্বধাতম) উৎকৃষ্ট (শ্রেষ্ঠ) অজ্ঞানরূপ শত্রুনাশক (তুর) স্বকীয় জ্ঞানাত্মক ধন (ভোজন) আমরা প্রার্থনা করছি'। যাস্কের নিরুক্তে মন্ত্রোক্ত ভোজন শব্দ 'ধন' নামে পঠিত হয়েছে। বাগ্‌দেবীকেই লক্ষ্য করে এই ধনার্থক 'ভোজন' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে কারণ জগতে বিদ্যা বা বাগ্‌দেবী ব্যতীত এইরকম আর কোন ধন নেই, যাকে 'তুর', 'শ্রেষ্ঠ' এবং 'সর্বধাতম' বলা যেতে পারে এই 'বাক্' প্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম।

বিশ্বামিত্র দৃষ্ট গায়ত্রী মন্ত্রে সাবিত্রী উপদিষ্টা হলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মাই উপদিষ্ট হন ; কারণ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মাই সাবিত্রী। এ ছাড়া গায়ত্রীর আবাহনাদি মন্ত্রগুলি অর্থাৎ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকে ষড়বিংশ অনুবাকে একথার সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। প্রাচীন ঋষিগণ গায়ত্রী মন্ত্র জপের পূর্বে ভূর্ভুবঃস্ব — এই তিনটি ব্যাহৃতির উচ্চারণ করতেন। এই তিনটি ব্যাহৃতি স্বয়ম্ভুর বেদময়ী বাসনার উপলক্ষণ বলে এগুলিকে মহাব্যাহৃতি বলা হয়। বেদ বাঙময় বলে, 'ওঁকারো বৈ সর্বাবাক্', 'একাক্ষরা বৈ বাক্' ইত্যাদির শ্রুতির তাৎপর্যানুসারে ঋষিরা ওঁকার উচ্চারণ করে তাতেই সমাহিত হতেন। এইজন্য বেদাচার্য ভগবান মনু প্রথমতঃ স প্রণব ব্যাহৃতির সঙ্গে গায়ত্রী পাঠের পরামর্শ দিয়ে সকল রকমের বেদময়ী উচ্চারণের ভাবনা ওঁকারে পর্যবসিত করার উপদেশ দিয়ে গেছেন। কেবল মনু কেন, যোগী-যাজ্ঞবল্ক্য, বৃদ্ধ আপস্তম্ব, বৃহৎ বিষ্ণু, বশিষ্ঠ বোধায়ন

এবং শঙ্খাদি শাস্ত্রকারগণ আমার বর্ণিত মতেরই সমর্থন করেছেন।

আমার বুক থেকে তাঁর অঙ্গুলি স্পর্শ সরিয়ে নিলেন বলে মনে হল। আর তাঁর কথা বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন শব্দ আমার কানে আসছে না। মস্তিষ্ককোষের মধ্যে মহর্ষি শ্যাবাশ্ব দৃষ্ট গায়ত্রীর ঝঙ্কার সুরু হয়ে গেল। আমার ভাবনায় জাগল, মহাত্মার অঙ্গুলি-স্পর্শ যেন গ্রামাফোনের Pin-point। পিনটি সরে যেতে আর রেকর্ড বাজছে না, তাঁর কথার রেকর্ড আর কর্ণগোচর হচ্ছে না। গায়ত্রী মন্ত্রের মধুর মূর্ছনা, তার মধুনিস্যন্দিনী আবেশ ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করছে। জ্যোতির প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু এই জ্যোতি গুহাভ্যন্তরের আলো, না আমার মস্তিষ্ককোষেই এর প্রকাশ ঘটেছে তা ভাল করে আর বোঝবার অবকাশ পেলাম না। চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। আমি ক্রমে জেগে উঠলাম ওঁকারে ....।

কতক্ষণ, কত ঘন্টা, কত প্রহর যে এভাবে কেটে গেল, আমার জানা নেই। সহসা আর একবার বুকের মাঝখানে মহাত্মার অঙ্গুলি-স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি বলছেন — উৎরাইয়ে, উৎরাইয়ে, ঔর চড়াই নেহি। বহুজন্মের সুকৃতির ফলে শিবভূমি নর্মদাতট পরিক্রমা করার অতুলনীয় সৌভাগ্য অর্জন করেছ। অজস্র শিবলিঙ্গ দর্শন ও তাঁদের পূজা করার সুযোগ পেয়েছ। কিন্তু শিবতত্ত্ব যথার্থভাবে না জানলে শিবপুত্রী নর্মদার করুণা কিভাবে পাবে? শৈব সাধনার গুহ্যসাধন তত্ত্ব জানতে হলে শৈবাগম দর্শনের রহস্য সাধক মাত্রেরই জানা দরকার। শৈবাগম দর্শনের মূলবক্তা স্বয়ং পশুপতি। শ্রোতা মহর্ষি দুর্বাশা। এইজন্য শৈবাগম দর্শনের অপর নাম পাশুপত-দর্শন। শৈবাগমের মতানুসারে পদার্থ তিন প্রকার — পশু, পাশ আর পশুপতি। পাদ অর্থাৎ সাধন চার প্রকার — বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্যা।

প্রথমে পশুপতির স্বরূপ সম্বন্ধে শোন। যিনি সর্বসমর্থ অর্থাৎ কোন কিছু করতে না করতে এবং তার অন্যথা করতে সদাই সমর্থ, যিনি নিত্য, নির্গুণ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বথা স্বতন্ত্র, পরম সর্বজ্ঞ, পরম ঐশ্বর্যস্বরূপ, নিত্যমুক্ত নিত্যনির্মল, নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহকারক এহেন ভগবান্ মহেশ্বর পরম শিবই অর্থাৎ একমাত্র শিবস্বরূপ পরমাত্মাই পশুপতি শব্দে নির্দিষ্ট। এই মহেশ্বরের পাঁচকৃত্য যথা — সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ। যে সব মুক্তজীব শিবসাধনায় শিবভাব প্রাপ্ত হন, শিবের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেন, তাঁরাও কিন্তু স্বতন্ত্র হন না, পরমেশ্বরের অধীন থাকেন। তাঁদের পারিভাষিক নাম বিদ্যেশ্বর, মন্ত্রেশ্বর ইত্যাদি।

উপাসনার সুবিধার জন্য যেখানে শাস্ত্রে পরমেশ্বর শিবের সাকার রূপের বর্ণনা আছে, সেখানেও তাঁর আকার প্রাকৃত নয়, তাকে নির্মল শক্তিস্বরূপ ও চিন্ময় বলে ভাবতে হবে। উপনিষদে মহেশ্বরের মন্ত্রময় বপুর বর্ণনা রয়েছে। শৈবদর্শনে একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে — 'মলাদ্যসম্ভবাৎ শাক্তং বপুঃ ন এতাদৃশং প্রভোঃ। 'তদ্বপুঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈ' ইত্যাদি।

পশূনাং পতি পশুপতি। এই পশু বলতে কাকে বোঝায়? যে পাশ দ্বারা বদ্ধ সেই পশু — পাশনাচ্চ পশবঃ। শৈবাগমের পরিভাষায় জীবাত্মা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞেরই নাম 'পশু', কারণ জন্মের পর থেকে নানা বন্ধনে সে জড়িয়ে আছে। যতকাল পর্যন্ত সে এইসব বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে স্বরূপে স্থিতিলাভ না করতে পারে, ততকাল পর্যন্ত জীব এই অর্থে পশুপদবাচ্য। বস্তুতঃ জীব অণু নয়, জীব ব্যাপক ও নিত্য। শিবদর্শনের স্পষ্ট ঘোষণা — আত্মানো বিভুনিত্যাঃ। জীবাত্মা পশুদশায় অর্থাৎ বন্ধন দশায় পরিচ্ছিন্ন ও সীমিত শক্তিযুক্ত থাকে বটে, কিন্তু যখনই

পাশমুক্ত হয়ে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই সে নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির অধিকারী হয়। পশু সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত জীবেরই এই অপূর্ব সুযোগ আছে। জীবের পশুত্ব কেবল পাশের জন্য, নানাবিধ বন্ধনের জন্য, এককথায় দ্বৈতভাবের জন্য। বিভিন্ন ও বিচিত্র পাশের জন্য পাশবদ্ধ জীব বা পশুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে — (ক) বিজ্ঞানাকল (খ) প্রলয়াকল এবং (গ) সকল।

(ক) যিনি পরমাত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে জপ, ধ্যান ও সন্ন্যাস দ্বারা অথবা ভোগের দ্বারা কর্মরাশির ক্ষয় করে ফেলেন এবং কর্মের ক্ষয় হওয়ার ফলে যাঁর শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কোনও বন্ধন থাকে না তাঁকে 'বিজ্ঞানাকল' বলা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানাকল জীবে (পশু) কেবল মলরূপী পাশ বা বন্ধন থেকে যায়। মল তিন রকম — আণবমল, কর্মজমল এবং মায়িকমল। বিজ্ঞানাকল পুরুষে কেবল আণবমল থেকে যায়। বিজ্ঞানাকল শব্দের অর্থ বিজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) দ্বারা অকল-কলারহিত অর্থাৎ কলাদি ভোগবন্ধন-সমূহ হতে মুক্ত।

(খ) যে জীবাত্মার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রলয়কালে লীন হয়ে যায়, যার ফলে তাঁর ভেতর মায়িকমল ত থাকে না, পরন্তু আণব ও কর্মজমল থেকে যায়। এইভাবে প্রলয়কালে অকল (কলারহিত) হন বলে তাঁকে প্রলয়াকল জীব বলা হয়।

(গ) যে জীবাত্মার উপর আণব, কর্মজ ও মায়িক — এই তিন রকমের মল থেকে যায়, তিনি কলা আদি ভোগবন্ধনে যুক্ত থাকেন বলে তাঁকে 'সকল বলা হয়। 'সকল' শব্দের অর্থ কলার সহিত বর্তমান।

বিজ্ঞানকাল জীব (পশু) আবার দু' শ্রেণীর হয়ে থাকেন যথা — (১) সমাপ্তকলুষ (২) অসমাপ্তকলুষ। জীবাত্মার দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রতি কর্মের লেপ মলের উপর জমতে থাকায় মলের পরিপাক হতে পারে না। পরন্তু যখন সমস্ত কর্মের ত্যাগ হয়ে যায়, তখন লেপ জমতে না পারায় মলের সম্পূর্ণতঃ পরিপাক হয়ে যায় এবং এইভাবে জীবাত্মার সমস্ত কলুষ সমাপ্ত হওয়াতে তাঁকে 'সমাপ্তকলুষ' নামে অভিহিত করা হয়। এই শ্রেণীর জীবাত্মা কর্ম, মল ও শরীর রহিত হন। সমাপ্তকলুষ জীবাত্মাকুলকে ভগবান্ সদাশিব আট রকমের 'বিদ্যেশ্বর' পদ প্রদান করে থাকেন। শৈবাগমের প্রাচীন গ্রন্থে এই বিদ্যেশ্বরদের নাম দেওয়া আছে —

> অনন্তশ্চৈব সূক্ষ্মশ্চ তথৈব চ শিবোত্তমঃ।
> একনেত্রস্তথৈবৈক রুদ্রশ্চাপি ত্রিমূর্তিকঃ।
> শ্রীকন্টশ্চ শিখণ্ডী চ প্রোক্তো বিদ্যেশ্বরা ইমে।।

অর্থাৎ (১) অনন্ত (২) সূক্ষ্ম (৩) শিবোত্তম (৪) একনেত্র (৫) একরুদ্র (৬) ত্রিমূর্তি (৭) শ্রীকণ্ঠ (৮) শিখণ্ডী — এই আটজন বিদ্যেশ্বর।

'সমাপ্তকলুষ' বলতে শৈবাগম-দর্শন কাকে বোঝাতে চায়, তার মোটামুটি আভাষ পেলে, এবার অসমাপ্তকলুষ বলতে কাদেরকে বোঝায়, তাও ভাল করে শুনে রাখ। যে সমস্ত বিজ্ঞানাকল জীবের কলুষরাশি এখনও সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত হয় নি, তাঁদেরকে অসমাপ্তকলুষ জীব বলা হয়। এইরকম জীবাত্মাকে পরমেশ্বর 'মন্ত্র' স্বরূপ প্রদান করে থাকেন। কর্ম ও শরীর রহিত কিন্তু আণবমলরূপী পাশ দ্বারা বদ্ধ জীবাত্মার নাম 'মন্ত্র'। এঁদের সংখ্যা সাত কোটি, এঁরাই অধিকারী সাধকের উপর কৃপা করে তাঁদেরকে সাধন পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে থাকেন।

'বিজ্ঞানাকল' জীবের মত 'প্রলয়াকল' জীবও দু' রকম — পক্বপাশদ্বয় এবং অপক্বপাশদ্বয়। যাঁদের মল এবং কর্মরূপী উভয় পাশের পরিপাক হয়ে গেছে, তাঁরা পক্বপাশদ্বয় জীব, তাঁরাই মোক্ষলাভে ধন্য হন। আর অপক্বপাশদ্বয় জীব পুর্যষ্টক দেহধারণ পূর্বক নানা রকমের শুভকর্ম করতে করতে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে থাকে।

'সকল' জীবও দুই প্রকারের — 'পক্ক-কলুষ' এবং 'অপক্ক-কলুষ'। যতই জীবাত্মার মল, কর্ম ও মায়ার পরিপাক বাড়তে থাকে, ততই ঐ সমস্ত পাশ বা কর্মবন্ধন শিথিল ও শক্তিহীন হতে থাকে। সে সময় এই সমস্ত পক্ক-কলুষ জীবাত্মা 'মন্ত্রেশ্বর' নামে অভিহিত হন। এঁদের সংখ্যা ১১৮। পূর্বোক্ত সাত কোটি মন্ত্রসংজ্ঞক জীববিশেষ হবার অধিকারী এই সকল মন্ত্রেশ্বর জীব।

আর যারা অপক্ক-কলুষ অর্থাৎ যারা বদ্ধ জীব তাদেরকে বারবার জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খেতে খেতে ভবযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

আমি তোমাকে শৈবাগম বা পাশুপত দর্শনের পরিভাষায় পশুপতি-তত্ত্ব পশু-তত্ত্ব, বিদ্যেশ্বর ও মন্ত্রেশ্বরাদির কথা সংক্ষেপে বিবরণ দিলাম। এবার শৈবাগমের ঋষিবৃন্দ 'পাশ' বলতে কি বোঝাতে চাইছেন তা শুনে রাখ।

পাশ পাঁচ রকম — (১) মলজ (২) কর্মজ (৩) বিন্দুজ (৪) মায়েয় এবং (৫) তিরোধান-শক্তিজ (অর্থাৎ নিরোধ-শক্তিজ)।

(১) মলজ পাশ — তুষ যেমন চালকে ঢেকে রাখে, সেই রকম যা আত্মার স্বাভাবিক দৃকশক্তি (জ্ঞান) ও ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছাদন করে রাখে, তারই পারিভাষিক নাম মল বা অজ্ঞান। এই মলরূপী পাশ কেবল আবরকই নয়, অধিকন্তু এ জীবাত্মাকে জোর করে দুষ্কর্মেও নিয়োজিত করে থাকে এবং সেই দুষ্কর্মই জীবাত্মার পক্ষে দেহান্তর-প্রাপ্তির কারণ। পুরাণে যে কোন কোন ঋষি পত্নীকেও দুষ্কার্যে রত হতে দেখা গেছে, তার একমাত্র কারণ এই মলজ পাশ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত এই মলজ পাশের টান এতই প্রচণ্ড যে তাঁর স্বামী নিত্যসিদ্ধ মহাসিদ্ধ হয়ে অনিকেতনবাসী হয়েও অর্ধাঙ্গিনীকে রক্ষা করতে পারেন না। ফলে পত্নী পথভ্রষ্টা ও পতিতা হন। স্মরণ কর, গৌতম পত্নী অহল্যার কথা, ভৃগুপত্নী পুলোমার কথা, স্মরণ কর বৃহস্পতি পত্নী তারার কথা। এই নর্মদাতটেও এক ঋষি-পত্নী মলজপাশের দুর্নিবার আকর্ষণে দুষ্কর্ম করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর তপ জপ ব্রতানুষ্ঠান সবই মুহূর্তে ভেসে গেছল নর্মদার জলে। আগামী ২২শে কার্ত্তিক তিন বছর হবে, তিনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে জটিল কর্মের আবর্তে ফেঁসে গেছেন। এই সব দৃষ্টান্ত তোমাকে শোনাচ্ছি, মলজ পাশের স্বরূপ বুঝতে।

(২) কর্মজ পাশ — ফলকাঙ্খায় অনুষ্ঠিত ধর্মাধর্মরূপ কর্মের নাম কর্মপাশ। শুভকর্মে শুভ, মন্দে মন্দফল, এ বিধান রোধে নাহি কারও বল। ফলতঃ এই কর্মপাশ বিচিত্র ফল-ভোগ প্রদান করে। এই 'কর্ম' প্রবাহ রূপে নিত্য। বীজাঙ্কুর ন্যায়ে যেমন আগে অঙ্কুর পরে বীজ, না আগে বীজ পরে অঙ্কুর এই প্রশ্নের যেমন মীমাংসা নেই, তাই তার স্থিতি যেমন অনাদি, তেমনি কর্মজ পাশেরও স্থিতি অনাদি।

(৩) বিন্দুজ পাশ — এই পাশ অপরামুক্তিস্বরূপ এবং শিবস্বরূপ প্রাপ্তির হেতু। সৎ চিৎ

আর আনন্দ যাঁর স্বরূপভূত বৈভব, সেই একমাত্র সর্বব্যাপী সনাতন পরমাত্মাই সমস্ত কিছুর কারণ এবং সম্পূর্ণ জীবকুলের পতিরূপে বিরাজিত আছেন। যা মনে উদিত হয় কিন্তু বাইরে যা প্রকট হয় না এবং যা সংসার বৈরাগ্য প্রদান করে আর দৃক্শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপে, যা স্বয়ংই নিত্য বিদ্যমান তারই নাম 'শৈবতেজ'। আর যে শক্তি দ্বারা সমর্থ হয়ে জীবের পরমাত্মার সন্নিধানে দিব্যভোগ সম্পন্ন হয় এবং পশুকোটি হতে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করে, পরমাত্মার সেই একান্ত স্বরূপা আদ্যাশক্তি 'চিদ্রূপা' নামে পরিচিত। চিদ্রূপা শক্তিদ্বারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত 'বিন্দু' দৃক (জ্ঞান) ও ক্রিয়াস্বরূপ হয়ে 'শিব' নামে প্রতিপাদিত হন। এই বিন্দু নিখিল তত্ত্বের কারণ, সর্বত্র ব্যাপক ও অবিনাশী। জীবের অন্তর্লীন ইচ্ছা আদি সম্পূর্ণ শক্তি ঐ বিন্দুবলেই চেতনতা প্রাপ্ত হয়ে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে থাকে। এই কারণে এই বিন্দুকে সর্বানুগ্রাহক বলা হয়েছে। জড় ও চেতনের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্যই বিশ্বসৃষ্টি করার সময় বিন্দুর প্রথম উন্মেষ 'নাদ' রূপে প্রকটিত হয়। এই নাদ শান্তি আদি গুণগণযুক্ত ও ভুবনস্বরূপ। এই শক্তিতত্ত্ব সাবয়ব। এ হতেই জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উৎকর্ষ বা অপকর্ষের প্রসার ও অভাব ঘটে থাকে। সুতরাং এই তত্ত্ব সর্বদা শিবরূপ। দৃকশক্তি তিরোহিত অবস্থায় থেকে ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে ঈশ্বর তত্ত্বের প্রকাশ হয়। ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্পূর্ণ মনোরথের সাধক। আর ক্রিয়াশক্তির তিরোভাব হয়ে জ্ঞানশক্তির উদ্রেক হলে 'বিদ্যা' তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। বিদ্যাতত্ত্ব সদাই প্রকাশধর্মী ও জ্ঞানস্বরূপ। নাদ বিন্দু ও সকল — এগুলি সৎ নামক তত্ত্বের আশ্রিত। আট বিদ্যেশ্বর ঈশ্বরতত্ত্বের এবং সপ্তকোটি মন্ত্র বিদ্যাতত্ত্বের আশ্রিত। এই সমস্ত তত্ত্ব 'শুদ্ধমার্গ' নামে অভিহিত। সৃষ্টিকার্যে ঈশ্বর সাক্ষাৎ নিমিত্ত কারণ এবং তিনি বিন্দুরূপে সুশোভিত হয়ে উপাদান কারণ হন।

সত্য কথা বলতে কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিচিত্র শক্তিগুণযুক্ত এক 'শিব' নামক তত্ত্বই বিরাজমান আছেন। তাঁতে অনন্তশক্তি নিহিত থাকাতে তিনিই প্রকৃত 'শাক্ত'। প্রভু শিব জড় ও চেতনের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য বিবিধ রূপ ধারণ পূর্বক অনাদি পাশবদ্ধ জীব সমুদয়ের উপর কৃপা বর্ষণ করে থাকেন। নিখিল প্রাণিবর্গের প্রতি দয়াবর্ষণকারী প্রভু শিব সম্পূর্ণ জীবকে ভোগ ও মোক্ষ এবং জড়বর্গকে নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হবার শক্তি সামর্থ্য দান করেন। ভগবান শিবসুন্দরের সমান রূপ প্রাপ্তিই শৈবাগম মতে মোক্ষ, চেতন জীবের উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ। কর্ম অনাদি হওয়াতে সর্বদা বিদ্যমান থাকে ; সুতরাং কর্মভোগ সমাপ্ত না হলেও ভগবৎ কৃপায় জীবের মোক্ষলাভ হয়ে থাকে ; এরই নাম 'দয়া'। এইজন্যই ভগবান শংকরকে 'দয়াল', বা 'অনুগ্রাহক' বলা হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের অনুভব —

> চিজ্জড়ানুগ্রহর্থায় কৃত্বা রূপাণি বৈ প্রভুঃ।
> অনাদিমলরুদ্ধানাং কুরুতেহনুগ্রহং চিতাম্।
> মুক্তিং ভক্তিং চ বিশ্বেষাং স্বব্যাপারে সমর্থতাম্।
> বিধত্তে জড়বর্গস্য সর্বানুগ্রাহকঃ শিবঃ॥

(৪) **মায়েয় বা মায়াপাশ** — এ কথা তুমি নিশ্চয় জান যে, সৃষ্টিকার্যে মায়া উপাদান। এই মায়া বেদান্তের 'মায়া' নয়, কোন মিথ্যা প্রহেলিকা নয়, শৈবাগম মতে জগৎ মায়া বা মিথ্যা নয়। এই দর্শনের মতে মায়া নিত্যা, এক, কল্যাণময়ী এবং আদি-অন্ত-রহিতা। এই মায়া নিজ শক্তিদ্বারা মনুষ্য ও জগৎসমূহের সামান্য কারণ। মায়া নিজ কার্যদ্বারা স্বভাবতঃ

মোহজনিকা হন। মায়ার এই রূপ হতে আর এক সূক্ষ্ম ও ব্যাপক রূপ আছে, তা 'পরামায়া' নামে প্রসিদ্ধ। মায়া যে শক্তিবলে মনুষ্য ও জগৎ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন কিংবা মোহ উৎপাদন করেন, সেই সকল বিকারযুক্ত কার্য হতে পরামায়া সর্বদা ঊর্ধ্বে থাকেন। পশুপতি ভগবান শিব জীবের কর্মরাশি দেখে নিজ শক্তিসমূহের দ্বারা মায়ার ভিতরে ক্ষোভ উৎপন্ন করেন এবং জীবের ভোগের জন্য মায়ার দ্বারাই শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহ সৃষ্টি করে থাকেন।

বিবিধ শক্তিময়ী মায়া প্রথমে কালতত্ত্বের সৃষ্টি করেন, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জগতের সংকলন ও লয় করেন। তদনন্তর মায়া নিয়মন-শক্তিস্বরূপা নিয়তির সৃষ্টি করে থাকেন। এই শক্তি সকলকে নিয়মে রাখেন বলে এঁর নাম নিয়তি। তারপর সম্পূর্ণ বিশ্বের মোহকারিণী আদান্ত রহিতা নিত্যা মায়া 'কলা'-তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। মনুষ্যকুলের মলের কলন করে তাদের মধ্যে কৃতিত্বশক্তি প্রকট করেন বলে তার নাম কলা। এই কলাই 'কাল' ও 'নিয়তির' সহযোগে এই মর্ত্যলোক পর্যন্ত সমূহ ব্যাপার নিষ্পন্ন করে থাকেন। ইনিই পুরুষকে বিষয়সমূহের দর্শন অনুভব করাবার জন্য প্রকাশ-স্বরূপ 'বিদ্যা' নামক তত্ত্ব উৎপন্ন করেন। 'বিদ্যা' নিজ কর্ম দ্বারা জ্ঞানশক্তির আবরণ ভেদ করে জীবাত্মাকে বিষয়রাশির স্বরূপ দর্শন করিয়ে থাকেন, এইজন্য বিদ্যাকে 'করণ' বলা হয়েছে। এই বিদ্যা ভোগ্য পদার্থ উৎপন্ন করেন, যার দ্বারা পুরুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ বিদ্যাশক্তির দ্বারাই মহৎ-তত্ত্ব আদিকে প্রেরণ করে ভোগ্য ভোগ ও ভোক্তার উদ্ভাবনা করে থাকেন। অতএব এই বিদ্যা পরম করণ। বিদ্যা ভোক্তা পুরুষকে ভোগ্যবস্তুর প্রতীতি করিয়ে থাকেন, এইজন্য বিদ্যাকে 'করণ' বলা হয়েছে। চেতন-জীব বুদ্ধিদ্বারা বিষয়ের যে অনুভব করেন, সেই অনুভবের নাম 'ভোগ'। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, বিষয়কারা বুদ্ধিই সুখ-দুঃখাদিরূপে পরিণত হয়। ভোগ্যবস্তুর অনুভব ভোক্তার নিজের থেকে — বিদ্যা তাতে সহায়তা করে মাত্র। যদিও বুদ্ধি সূর্যের মত সব প্রকাশ করে তবুও কর্মরূপ হওয়াতে বুদ্ধিতে স্বয়ং কর্তৃত্ব নেই। বুদ্ধি করণান্তরের সাহায্যেই পুরুষকে বিষয়সমূহের অনুভব করাতে সমর্থ হয়। পুরুষ স্বয়ংই করণ প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং ভোগের উৎকণ্ঠায় নিজেই বুদ্ধি প্রভৃতিকে প্রেরণ করে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে ঐসকল বুদ্ধি প্রভৃতির শুভাশুভ চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্তব্য ফলও তাকে ভোগ করতে হয়। এইকারণে শৈবাগমের ঋষিগণের মতে 'পুরুষ' সাংখ্যদর্শনের পুরুষের মত অকর্ত্তা নয় বরং পুরুষের কর্তৃক যে সিদ্ধ তা স্বীকার করতে হয়। যদি পুরুষের কর্তৃত্ব স্বীকার করা না হয়, তা হলে পুরুষের ভোগের কথা ব্যর্থ হয়ে পড়ে এবং পুরুষ দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়ে পড়ে। পুরুষ করণ প্রভৃতির প্রেরক না হলে এবং পুরুষে কর্তৃত্বের অভাব থাকলে, পুরুষ দ্বারা ভোগও অসম্ভব। অতএব এক্ষেত্রে পুরুষই প্রবর্তক। তার পক্ষে করণ প্রভৃতির প্রেরক হওয়া বিদ্যার দ্বারাই সম্ভব বলে স্বীকার করা হয়েছে।

পূর্বে যে 'কলা'র কথা বলেছি, ঐ কলা দৃঢ় বজ্রলেপসদৃশ রাগের (আসক্তির) উৎপত্তি করেন, যার ফলে উক্ত বজ্রলেপ-রাগযুক্ত পুরুষে ভোগ্যবস্তুর জন্য বিষয়-প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, এইজন্য এর নাম 'রাগ'। এই সমস্ত তত্ত্বদ্বারা যখন আত্মা ভোক্তৃত্বদশায় উপস্থাপিত হন, তখন তিনি 'পুরুষ' নাম ধারণ করেন। তৎপশ্চাৎ কলা হতেই অব্যক্ত প্রকৃতির জন্ম হয়; এই অব্যক্তপ্রকৃতি পুরুষের জন্য ভোগ উপস্থিত করেন এবং তিনিই গুণময় সপ্তগ্রন্থি বিধানের কারণ। কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা, রাগ, প্রকৃতি ও গুণ — এইগুলি সপ্তগ্রন্থি ; আন্তরিক ভোগ সাধনের মূলে এইগুলিই।

অব্যক্তে গুণসমূহের বিভাগ থাকে না। অব্যক্তই সপ্তগ্রন্থির আধার। এই অব্যক্ত হতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের আবির্ভাব ঘটে এবং বুদ্ধি গুণত্রয়ের দ্বারাই ইন্দ্রিয় ব্যাপারের নিয়মন ও বিষয়সমূহের নিশ্চয় করে থাকে। তিন রকমের গুণ হতেই তিন রকমের কর্ম হয়ে থাকে এবং তদনুসারেই বুদ্ধিও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে তিন রকমের হয়। মহৎ তত্ত্ব হতে অহংভাব বৃত্তিযুক্ত অহংকার উৎপন্ন হয়। অহংকার সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার — তৈজস, রাজস ও তামস অহংকার। তৈজস অহংকার হতে মন সহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্ত্বগুণের প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিষয়পঞ্চকের বোধ করিয়ে থাকে। ক্রিয়ার হেতুভূত রাজস অহংকার থেকে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়; আবার তামস অহংকার হতে পঞ্চতন্মাত্রার উৎপত্তি ঘটে। এই পঞ্চ তন্মাত্রাই আবার পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তির কারণ।

মন ইচ্ছাত্মক ও সংকল্পাত্মক অর্থাৎ সদাই দুটি বিকারযুক্ত। মনই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের রূপ ধারণ করে সব সময় ভোক্তার জন্য ভোগোৎপাদক হয়ে থাকে। মন হৃদয়ের ভিতর স্থিত থেকে নিজ সংকল্প বলে ইন্দ্রিয় সমূহে বিষয় গ্রহণের শক্তি উৎপন্ন করে। এইজন্য এর নাম অন্তঃকরণ। মন, বুদ্ধি ও অহংকার অন্তঃকরণের তিনভেদ; ইচ্ছা, বোধ ও সংরম্ভ (অর্থাৎ গর্ব বা অহংভাব), এগুলি অন্তঃকরণের বৃত্তি।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক — এই পাঁচটির নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ — এই পাঁচটি চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। বাক্ (বাণী) পাণি (হস্তদ্বয়) পাদ, পায়ু (গুহ্যদেশ) ও উপস্থ (লিঙ্গ) এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। কথন, গ্রহণ, চলন, মলত্যাগ ও মৈথুনজনিত আনন্দোপলব্ধির করণ এগুলি। কোন ক্রিয়া করণ ছাড়া অনুষ্ঠিত হতে পারে না। যে কোন রকমের কর্ম চেষ্টা ঐ দশ প্রকার করণ দ্বারাই সাধিত হয়ে থাকে। এইজন্যই এইগুলির নাম করণ।

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী — এদের প্রত্যেকেরই এক একটি বিশেষ গুণ আছে। সেই গুণগুলির জন্যই এই তত্ত্বগুলি প্রসিদ্ধ। শব্দ আকাশের মুখ্যগুণ; কিন্তু অপর চারটি ভূতেই সামান্য রূপে উপলব্ধ হয়। স্পর্শ বায়ুর বিশেষ গুণ; কিন্তু অন্যান্য চার ভূতেই এর বিদ্যমানতা অনুভব করা যায়। রূপ তেজের বিশেষ গুণ; কিন্তু তেজ, জল ও পৃথ্বীতত্ত্বেও বিদ্যমান। রস জলের বিশেষ গুণ, কিন্তু পৃথ্বীতত্ত্বের মধ্যেও তা উপলব্ধি করা যায়। গন্ধ নামক গুণটি কেবল পৃথ্বীতেই অনুভূত হয়। এই পঞ্চভূতের কার্য — অবকাশ, চেষ্টা, পাক, সংগ্রহ এবং ধারণ। বায়ুতে শীত স্পর্শও নেই, উষ্ণ স্পর্শও নেই ; জলে শীতল স্পর্শ ও তেজে উষ্ণ আছে। অগ্নিতে আছে ভাস্বর শুক্লরূপ এবং জলে অভাস্বর শুক্লরূপ। পৃথ্বীতত্ত্বে শুক্ল আদি অনেক বর্ণই আছে। রূপ কেবল তিনভূতেই বিদ্যমান। জলে কেবল মধুর রস কিন্তু পৃথ্বীতে আছে ছপ্রকারের রস। পৃথ্বীতে সুরভি অসুরভি ভেদে দু'রকমের গন্ধ উপলব্ধ হয়। তন্মাত্রাসমূহে তাদের ভূতগুলিরই গুণ থাকে। করণ ও পোষণ পঞ্চভূতেরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব নির্বিশেষ। ভূত পঞ্চকের যে পরিচয় দিলাম, এই পঞ্চভূত সকলদিকে পরিব্যাপ্ত। সমস্ত চরাচর জগৎই পঞ্চভূতময়। দেহের মধ্যে অস্থি, মাংস, কেশ, ত্বক, নখ ও দাঁত — পৃথ্বীতত্ত্বেরই অংশ; মূত্র, রক্ত, কফ, স্বেদ ও শুক্রে জলের স্থিতি; হৃদয়ে উভয় চক্ষুতে এবং পিত্তের মধ্যে তেজের স্থিতি। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানাদি প্রাণের

বিভিন্ন বৃত্তিতে বায়ুর স্থিতি এবং সম্পূর্ণ নাড়ীতে ও গর্ভাশয়ে আকাশ তত্ত্ব ব্যাপ্ত। কলা হতে আরম্ভ করে পৃথ্বী পর্যন্ত সমুদয় তত্ত্ব সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সাধন। প্রত্যেক শরীরেও এসকল বিদ্যমান, এইজন্যই বলা হয় — 'যাহা ভাণ্ডে, তাহা ব্রহ্মাণ্ডে'। এইভাবে নিয়তি ও কলা প্রভৃতি তত্ত্ব, কর্মবশপ্রাপ্ত সমস্ত শরীরে বিচরণ করে থাকে। একেই মায়াপাশ বা মায়েয় পাশ বলা হয়। এর দ্বারাই সম্পূর্ণ জগৎ আবৃত রয়েছে। এইজন্যই পৃথ্বী হতে আরম্ভ করে কলা পর্যন্ত তত্ত্ব সমুদয় 'অশুদ্ধমার্গ' নামে অভিহিত হয়েছে শৈবদর্শনে।

(৫) **নিরোধ-শক্তিজ পাশ** — এইবার পঞ্চম পাশের স্বরূপ অনুধাবন করার চেষ্টা কর। এই বন্ধনজাল ভূমণ্ডলে স্থাবর-জঙ্গমরূপে বিদ্যমান। পর্বত ও বৃক্ষাদি স্থাবর। জঙ্গমের তিন ভেদ — স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। চরাচর ভূতজগতে চুরাশী লক্ষ যোনি বর্তমান। ঐ সমস্ত যোনিতে পরিভ্রমণ করতে করতে জীব যখন কর্মবশাৎ মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য শরীর সর্বোত্তম ও সমস্ত পুরুষার্থের সাধক। কিন্তু এই মনুষ্য শরীর কিভাবে জন্মলাভ করে তার রহস্য বুঝলে নিরোধ শক্তিজ বা তিরোধান শক্তিজ পাশের প্রকৃতি বুঝতে পারবে। জন্মের প্রকার এইরূপ — প্রথমে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হয়, পরে রজ ও বীর্যের যোগে একটিমাত্র বিন্দু গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। উক্ত কিন্তু দ্বয়াত্মক; তাতে স্ত্রী আর পুরুষ উভয়েরই রজবীর্য্যের সংমিশ্রণ হয়। সে সময় রজের আধিক্য তাকলে কন্যার জন্ম হয় আর বীর্যের মাত্রা অধিক হলে পুত্রের উৎপত্তি হয়ে থাকে। উক্ত বিন্দুতে মল, কর্ম ও মায়া — এই ত্রিবিধ পাশ দ্বারা বদ্ধ কোন আত্মা জীবভাব প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মা তখন সকল নামে অভিহিত হয়।

মলকর্মাদি পাশেন কশ্চিদাত্মা নিয়ন্ত্রিতঃ।
জীবভাবংতদা তস্মিন্ সকলঃ প্রতিপদ্যতে॥ (শৈবাগম)

ঐ সকল জীবাত্মা গর্ভে বাস করার সময় মা যা কিছু খেয়ে থাকেন, তার দ্বারা পোষিত হয়ে তার শরীর দিন দিন বাড়তে থাকে। মাতৃগর্ভে থাকা কালে জরায়ু দ্বারা আবৃত থাকে এবং নানা রকমের দুঃখ-তাপের দুঃসহ দুঃখ ভোগ করে। তখন গর্ভস্থিত জীব নিজ অতীত জন্মের শুভাশুভ কর্মরাশি স্মরণ করে বারবার দুঃখমগ্ন ও পীড়িত হতে থাকে। পরে উপযুক্ত কাল ও লগ্নে উক্ত শিশু পীড়িত হয়ে মাকেও দুঃসহ যন্ত্রণা দিতে দিতে নিম্নমুখ হয়ে যোনিপথে বাইরে ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর ক্রমশঃ শৈশব, পৌগণ্ড, যৌবনাদি অবস্থা পার হয়ে ধীরে ধীরে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এই সময় নিজের পূর্বার্জিত কর্মের সঙ্গে বর্তমান জন্মে অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মের ফলও যুক্ত হতে থাকে। মাতা-পিতার শুদ্ধ সংস্কার থাকলে এবং তাঁদের আহার-বিহার বিশুদ্ধ ও সংযত হলে, নিরন্তর ঈশ্বর-স্মরণ ও তপে জপে নিরত থাকলে তাঁদের সন্তানরূপে শুদ্ধ ও প্রতিভাবান জীবেরই আবির্ভাব ঘটে নতুবা ফল বিপরীত হয়। 'অপক্কপাশদ্বয় প্রলয়াকল' জীব এবং 'অপক্ককলুষ সকল' জীব যে সমস্ত দেহ ধারণ করে, তাতে অন্তর্ভোগের সাধনভূত কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা রাগ, প্রকৃতি এবং গুণ — এই সাততত্ত্ব, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, দশ ইন্দ্রিয়, চার অন্তঃকরণ এবং পাঁচ শব্দাদি বিষয়, এই ছত্রিশ তত্ত্বের সংমিশ্রণ থাকে। একত্রে এই সকল নিগড় সদৃশ আবরণকে এক কথায় নিরোধ শক্তিজ পাশ বলা হয়।

এইভাবে মলজ, কর্মজ, বিন্দুজ, মায়েয় ও নিরোধ শক্তিজ পাশ বা বন্ধনের ফলে জীবের ঊর্ধ্বগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, সে ডুবে থাকে জৈব জীবনের ভোগ-সুখ কামনা-বাসনায়

পঙ্কিল কামকুণ্ডে। তার ফলে নিজের মধ্যে মহেশ্বরকে প্রকট করতে পারে না। শিবতত্ত্বে পরিস্নাত শিবাচার্য প্রদত্ত দীক্ষাই এই পাশোচ্ছেদের সর্বোত্তম উপায়। গুরুই বা কে, দীক্ষাই বা কি, কুণ্ডলিনী, পরকুণ্ডলী, নাদ, বিন্দু, জ্যোতিবাক্, পরাবাক্ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দেশে নানা উদ্ভট ধারণা এবং মনগড়া কল্পনা আছে। একমাত্র শৈবাগমের ঋষিরাই শিবত্বে জাগরণের সঠিক ও সর্বোত্তম অমোঘপন্থা দেখিয়ে গেছেন। তাঁদের মতে দীক্ষাকালে স্বয়ং সর্বানুগ্রাহক ভগবান শিব শিবাচার্যের শরীরে স্থিত হয়ে জীবকে শিবতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাধন কৌশল দেখিয়ে থাকেন। শৈবাগম বা পাশুপাত দর্শনে দীক্ষা বস্তুতঃ আত্মসংস্কারেরই নামান্তর। একটু আগে আণবমল, কর্মমল ও মায়িকমল এবং বিভিন্ন পাশ সম্বন্ধে যে আভাস দিলাম, ঐ সকলের দ্বারা সংসারী আত্মা আচ্ছন্ন থাকে। দীক্ষার দ্বারা মলিন আত্মার সংস্কার হয়ে থাকে। মন নিবৃত্তি ত হয়, নিবৃত্তির সংস্কার পর্যন্ত শান্ত হয়ে যায়।

দীয়তে জ্ঞানসদ্ভাবঃ ক্ষীয়তে পশুবাসনা।
দানক্ষপনসংযুক্তা দীক্ষা তেনেহ কীর্তিতা॥

অর্থাৎ যার দ্বারা শিবজ্ঞান প্রদত্ত হয় এবং পশুবাসনার ক্ষয় হয়, এই রকম দান ও ক্ষপনযুক্ত ক্রিয়ার নাম দীক্ষা। শক্তিপাতের তীব্রতানুসারে এবং শিষ্যের অধিকার বৈচিত্র্যানুসারে দীক্ষা নানা প্রকারের হয়ে থাকে। গুরুগতপ্রাণ শিষ্য ছাড়া আর কাউকে শৈবদীক্ষা শৈবগমের সাধকরা সাধারণত দিতেন না। কারণ, এই দীক্ষায় শিষ্যের চেয়ে গুরুর করণীয় কার্যই বেশী। দীক্ষাকালে গুরু শিবভাবে আবিষ্ট হয়ে শিষ্যকেই গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা অর্চনা করেন। আণবী, শাক্তেয়ী ও শাম্ভবী-দীক্ষার এই তিনটি প্রধান ভাগ থাকলেও বিখ্যাত শৈবাগম গ্রন্থ শারদা তিলকের পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রিয়াবতী দীক্ষা, বর্ণাত্মিকা দীক্ষা, কলাবতী দীক্ষা এবং বেধময়ী দীক্ষার কথা বলা হয়েছে। ক্রিয়াবতী দীক্ষা বাহ্য। বর্ণময়ী দীক্ষার প্রভাবে শিষ্যের দিব্যদেহ প্রাপ্তি ঘটে। গুরু শিষ্যের শরীরে তৎ তৎ স্থানে বর্ণসকল ন্যাস করেন এবং প্রতিলোমে সংহার করেন। এরই নাম বর্ণময়ী দীক্ষা। কলাবতী এ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। এই দীক্ষায় কলার উপযোগ করা হয়। বেধদীক্ষার তত্ত্বটি এই রকম ঃ গুরু শিষ্যের দেহে মূলাধারে চতুর্দলকমলে ত্রিকোণের মধ্যে বলয়ত্রয়যুক্ত তড়িৎকোটিসমপ্রভা চিদ্রূপা শৈবীশক্তি কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করবেন যেন ঐ শক্তি ষটচক্র ভেদ করে মধ্যপথে পরমশিব পর্যন্ত উত্থান করছেন। সঙ্গে সঙ্গে মূলাধারের চারটি বর্ণ ব্রহ্মাতে উপসংহৃত হচ্ছে এবং ব্রহ্মা ষড়দলময় স্বাধিষ্ঠানে যুক্ত হচ্ছেন। তারপর সাধিষ্ঠানের ছয়টি বর্ণ বিষ্ণুতে উপসংহৃত হচ্ছে এবং বিষ্ণু দশদলময় নাভিকমলে যুক্ত হচ্ছেন। অনন্তর মণিপুরের দশটি বর্ণ রুদ্রে সংহৃত হচ্ছে। এইভাবে সর্বান্তে সদাশিবকে 'হ' এবং 'ক্ষ'-ময় দ্বিদলে যুক্ত করবে। পরে ঐ দুটি বর্ণকে বিন্দুতে সংহার করবে। বিন্দুই শিব। তখন আর কোন বর্ণ নেই। বিন্দুকে যোগ করবে নাদে, নাদকে নাদান্তে এবং নাদান্তকে উন্মনীতে। উন্মনীকে যোগ করতে হয় গুরুবক্ত্রে। কলা নাদ নাদান্ত ও গুরুবক্ত্র এইসব ভ্রূমধ্যের উপরে চক্র সংস্থান। তাই সহস্রারকে দ্বাদশান্তও বলা হয়।

এইভাবে শিষ্যের জীবাত্মার সঙ্গে শক্তিকে শিবে বেধ করতে হয়। বেধ শব্দের অর্থ বিদ্ধকরণ বা ছিদ্রকরণ। শিষ্যের দেহে যেসব আধ্যাত্মিক চক্র আছে জন্মজন্মান্তরের কর্মমল তার উপর বজ্রলেপ সদৃশ আস্তরণ ফেলেছে। তার ফলে স্বয়ং মহেশ্বর তার মধ্যে বিরাজমান থাকলেও জীবের শিবজ্ঞান হয় না। শৈবাগমী গুরু চিৎসম্পাতের দ্বারা সেই বজ্রলেপকে

বিগলিত করে বদ্ধ নাড়ীর মুখকে উন্মোচিত করেন, ব্রহ্মনাড়ী, অপরা সুষুম্না ও উত্তরা সুষুম্নার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। শিবগুরুর চিৎশক্তি সম্পাত ব্যতীত এই বেধক্রিয়া নিষ্পন্ন হতে পারে না। বেধের ফলে শিষ্য ছিন্নপাশ হয়ে ভূপতিত হয়। পরে দিব্যবোধের স্ফুরণ ঘটে, ফলে তৎক্ষণাৎ শিষ্য 'সর্ববিৎ' হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ শিবভাব প্রাপ্ত হয়।

শৈবাগম সাধনায় সিদ্ধ, ঋষি সোমানন্দ তাঁর গুরুগতপ্রাণ শিষ্য কাশ্মীরবাসী উৎপলাচার্যকে এই বেধদীক্ষা দ্বারা শিবাত্মক করে ছিলেন, 'সর্ববিৎ' করেছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। উৎপলাচার্য প্রণীত 'ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা সূত্র' শৈবাগম সাধনার বিশিষ্ট গ্রন্থ। লক্ষ্মণাচার্য নামে একজন ভক্ত তাঁর যথাসর্বস্ব গুরুচরণে নিবেদন করে সম্পূর্ণ গুরুগতপ্রাণ হয়েছিলেন বলে উৎপলাচার্যও বেধদীক্ষাদ্বারা লক্ষ্মণকে 'তৎক্ষণাৎ' সর্ববিৎ করে তুলেছিলেন। তখন তাঁর নাম হয় লক্ষ্মণ দেশিক। এই লক্ষ্মণ দেশিক বাঙালী ছিলেন। বীরেন্দ্র বংশে কৃষ্ণবিজয় আচার্য নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে লক্ষ্মণাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রণীত শারদা তিলক শৈবসাধনা বিষয়ে একটি বিশিষ্ট আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শৈবাগমী গুরুসম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব, দীক্ষাতত্ত্ব, ও অনুষ্ঠান পদ্ধতির বিশদ বিবরণ আছে। খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দী গুরুশিষ্য উভয়েরই আবির্ভাব কাল। শিষ্য জন্মালেন বাংলাদেশে, গুরু জন্মালেন কাশ্মীরে। দুই দেশের এই দুস্তর ব্যবধান গুরুশিষ্য উভয়ের মিলনে কোন বাধা জন্মাতে পারল না। আধ্যাত্মিক জগতে এইরকম ঘটনা প্রায়শঃই ঘটে থাকে। ভৌগলিক ব্যবধান উভয়ের সাক্ষাৎকারে কোন অন্তরায় কস্মিনকালে সৃষ্টি করতে পারে নি। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ শুধু জন্মান্তরীণ নয়, এ সম্বন্ধ পতি-পত্নীর সম্বন্ধের মত। পত্নী যতই ভ্রষ্টা, পতিতা ও পতি-বিমুখ হোক না কেন, স্বামী প্রকৃত প্রেমিক হলে সে যেমন পত্নীকে স্বরূপে ও স্বধামে ফিরিয়ে আনার জন্য অবিরত চেষ্টা করে, তেমনি শিষ্যও যত অধঃপতিত ও কর্মজালে জড়িয়ে পড়ুক না, প্রকৃত গুরু তাকে খুঁজে বার করবেনই। শিষ্য স্বরূপে ও স্বধামে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত গুরুরও স্বস্তি নেই, বিশ্রাম নেই। এরই নাম 'দয়া', গুরুরূপে শিবকৃপা। কৃপার কোন ব্যাখ্যা হয় না।

যাইহোক, আবার দীক্ষা প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ষড়ম্বয় মহারত্ন নামক কাশ্মীরী শৈবাগমের আর একখানি অমূল্য গ্রন্থে আণবী দীক্ষার উল্লেখ আছে। আণবী দীক্ষা দশরকম, যথা — স্মার্তী, মানসী, যৌগী, চাক্ষুষী, স্পর্শিনী, বাচিকী, মান্ত্রিকী, হৌত্রী, শাস্ত্রী ও অভিষেচিকী।

স্মার্তী দীক্ষা — সমর্থ গুরু বিদেশস্থ শিষ্যকে স্মরণ করে ক্রমশঃ তার আণবমল, কর্মমল ও মায়িকমলের আবরণকে বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেন এবং লয়যোগাঙ্গবিধানে তাকে পরম শিবে যোজনা করেন।

মানসী দীক্ষা — শিষ্যকে নিজের কাছে বসিয়ে অন্তঃদৃষ্টিতে তার মলত্রয়কে অবলোকন করে, সেই মলত্রয়কে নিশ্চিহ্নকরণ।

যৌগী দীক্ষা — যোগোক্ত ক্রমে গুরু শিষ্য দেহে প্রবিষ্ট হয়ে তার আত্মাকে নিজের আত্মাতে যুক্ত করেন। এর নাম যৌগদীক্ষা।

চাক্ষুষী দীক্ষা — শিবোঽহং ভাবে সমাবিষ্ট হয়ে গুরু করুণাদৃষ্টিতে শিষ্যকে নির্ণিমেষ নেত্রে দেখতে থাকেন। তাতেই শিষ্যের মধ্যে অকস্মাৎ শিবভাবের বোধন ঘটে যায়।

স্পর্শিনী দীক্ষা — গুরু স্বয়ং পরমশিবভাবে ভাবিত হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁর হস্তই শিবহস্ত, তাঁর মুখই শিববক্ত্র। আনন্দ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত গুরু শিষ্যের উপযোগী বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তাঁর শিবহস্ত শিষ্যের মাথায় অর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নাদ ও জ্যোতি প্রকট হয়ে যায়।

বাচিকী দীক্ষা — গুরু তাঁর গুরুভাবে ভাবিত হয়ে নিজ দেহে স্বীয় গুরুশক্তির আবেশ ঘটান। নিজের বক্তৃকে তখন গুরুবক্তৃরূপে অনুভব করে শ্রদ্ধাপ্লুত অবস্থায় শিষ্যের নিকট দিব্যমন্ত্র প্রকট করে থাকেন। সেই সদ্যপ্রকটিত মন্ত্রের উপযোগী মুদ্রান্যাসাদি সাধন প্রণালীও শিখিয়ে দেন।

মান্ত্রিকী দীক্ষা — এই দীক্ষায় গুরু মন্ত্রন্যাসযুক্ত অবস্থায় স্বয়ং মন্ত্রতনু হয়ে শিষ্যকে মন্ত্রদান করে থাকেন। গুরু যে মন্ত্রতনু হলেন তা শিষ্য এই দেখে বুঝতে পারেন যে গুরুর ললাটে কিংবা বক্ষস্থলে শিষ্যের বীজ অত্যাশ্চর্য উপায়ে যেন খোদিত হয়ে জ্বলজ্বল করছে।

হৌত্রী দীক্ষা — গুরু কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন করে লয়যোগের ক্রমে শিষ্যকে দিয়ে প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রে ক্রমাগত আহুতি দেওয়াতে থাকেন। তাঁর সংকল্প থাকে শিষ্যের মলশুদ্ধি ও পাশমুক্তি। বেদমন্ত্রটি হল —

ওঁ অগ্নিং দূতং বৃনীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম॥ ★

হোম করতে করতে শিষ্য প্রথমে খুব জ্বলন বা তাপ অনুভব করেন। এই যজ্ঞাগ্নির তাপে শিষ্যের দেহাবস্থিত পাশ সমূহ দগ্ধীভূত হয়। তারপর শান্ত স্নিগ্ধ শীতলতার আবির্ভাব হয়। সেই স্নিগ্ধ অমৃতরসে শিষ্যের সকল সত্তা আপ্লাবিত হয়ে যায়।

শাস্ত্রী দীক্ষা — গুরু তাঁর যোগ্য শুশ্রূষু ভক্তকে যে সাধনায় সিদ্ধ করতে চান কিংবা যে তত্ত্ব তিনি তার মধ্যে প্রকট করতে চান, সেই তত্ত্ব বিষয়ক বা সাধনা বিষয়ক গ্রন্থ শিষ্যের হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তাঁর আশীর্বাদের ফলে সেই তত্ত্ব বা সাধনরহস্য শিষ্যের অধিগত হয়ে যায়। উপনিষদে গল্প আছে, আরুণি, উদ্দালক ও উপমন্যু প্রভৃতির গুরু সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁদের স্ব স্ব গুরুবর্গ কোন সাধনা না করিয়েও কেবল আশীর্বাদ করতেন — সর্ববিদ্যা তোমার অধিগত হোক, তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি কর, আর গুরুর অমোঘ আশীর্বাদের গুণে তাঁরা অচিরাৎ ব্রহ্মবিদ্যায় পারংগম হয়ে উঠতেন। এরই নাম শাস্ত্রী দীক্ষা।

আভিষেচিকী দীক্ষা — এই দীক্ষার অপর নাম শিবকুম্ভাভিষেক দীক্ষা। সাধারণতঃ একটি কুম্ভে শিব ও শিবানীকে পূজা করে শিষ্যকে মন্ত্রদান করা হয়। সাধারণ তন্ত্র গ্রন্থে এই বিধান। কিন্তু শৈবাগমের ঋষিদের মতে, শিষ্যকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুজা করে স্বয়ং গুরু তার দেহরূপ ঘটে আপন তপঃশক্তির বলে শিব ও শিবানীর আবেশ সঞ্চার করে দেন। সেটাই যথার্থ আভিষেচিকী দীক্ষা। অন্তররাজ্যে প্রবেশ করার জন্য গুরু কর্তৃক শিষ্যের এই হল অভিষেক ক্রিয়া।

শৈবাগম দর্শন বা পাশুপতদর্শনে যে ভাবে সাধন রহস্য এবং তা উপলব্ধির পথনির্দেশে আছে, তারই আভাষ দিতে গিয়ে তোমাকে বিভিন্ন দীক্ষা প্রণালীর গুহ্যতম কথা বললাম। পরিক্রমার শেষে কাশীতে ফিরে গিয়ে তুমি তন্ত্রালোক, শিবসূত্রবিমর্শিনী, শারদাতিলক, প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম, ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসূত্রম, রৌদ্রাগম, মতঙ্গাগম, প্রভৃতি গ্রন্থ অনুসন্ধান করে অবশ্যই পড়বে। কাশীশ্বর মহাদেব এবং সাক্ষাৎ শ্রীবিদ্যার করুণা পাবে। জয়দ্রথযামল

★ মন্ত্রটি ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের অন্তর্গত দ্বাদশ সূক্তের প্রথম মন্ত্র। এসাধিঃ অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সুসম্পাদক সর্বদেবগণের আহ্বানকর্তা, বিশ্বরহস্যের সর্বতত্ত্বজ্ঞ দেবদূত অগ্নিদেবকে আমরা ভজনা করছি। তিনি শিবের নিকট আমাদের আর্তি পৌঁছে দিন। তাঁর কৃপায় আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক, সার্থক হোক।

নামক আগমগ্রন্থে বহুসংখ্যক শিবজ্ঞান প্রবর্তক ঋষির নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে দুর্বাশা, সনক, বিষ্ণু, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, সংবর্ত গালব, গৌতম, উশনা, দধীচি, সনৎকুমার, যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, আপস্তম্ব, কাত্যায়ণ, ভৃগু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তবুও ব্রহ্মযামল ও জয়দ্রথযামলের শৈবাগম সাধনার প্রবর্তনার দুর্বাসার নামই অগ্রগন্য। কলিযুগে দুর্বাশাই আগমশাস্ত্রের প্রকাশকর্তা ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, দুর্বাশাই শ্রীকৃষ্ণকে চৌষট্টি অদ্বৈত কলা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করে ছিলেন। আগম সাহিত্যে 'ক্রোধভট্টারক' নামে দুর্বাশার পরিচয় পাওয়া যায়। নেপাল দরবারের গ্রন্থালয়ে সুরক্ষিত ত্রিপুরসুন্দরী মহিম্নস্তোত্র টীকাতে নিত্যানন্দ নাথ বলেছেন — সকলাগমাচার্যচক্রবর্ত্তী সাক্ষাৎ শিব এব অনুসূয়াগর্ভসম্ভূতঃ ক্রোধভট্টারকাখ্যো দুর্বাশা মহামুনিঃ। এখানে দুর্বাশাকে যেমন স্পষ্টতঃ 'ক্রোধভট্টারক' বলা হয়েছে, তেমনি তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি সকল আগমাচার্যদের মধ্যে চক্রবর্তী স্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে মহর্ষি অগস্ত্যদেবের কথাও অনুধ্যান করা কর্তব্য কারণ এই গুহা তাঁরই সাধন গুহা। মহর্ষি দুর্বাশা যেমন শিবজ্ঞান তথা আগমশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রচারকর্তা, তেমনি অগস্ত্য ছিলেন শাক্তাগমের প্রবর্তক। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি প্রায় সকল প্রাচীন শাস্ত্রেই অগস্ত্যের প্রসঙ্গ দেখা যায়। তিনি এবং তাঁর ধর্মপত্নী লোপামুদ্রা উভয়েই বৈদিক ঋষি হয়েও শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন।

ত্রিপুরাতাপিনী উপনিষদের টীকা হতে জানা যায় মহাশৈব দুর্বাশা স্বয়ং 'শিব এব' হয়েও শ্রীবিদ্যার ষড়ক্ষরী বীজের সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন আর অগস্ত্য ভগবান হয়গ্রীব হতে প্রাপ্ত পঞ্চদশাক্ষরী মহাবীজে শ্রীবিদ্যার উপাসনা করে পরমাসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অগস্ত্য রচিত শ্রীবিদ্যাভাষ্য এই পঞ্চদশী বিদ্যারই ব্যাখ্যা। তিনি 'শাক্তসূত্র' নামক সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বভূয়িষ্ঠ গ্রন্থেরও প্রণেতা। ব্রহ্মসূত্র ও শিবসূত্রের ন্যায় প্রাচীনকালে এই গ্রন্থেরও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ছিল। এই মূল্যবান গ্রন্থ চার অধ্যায় ও ৩০২ সূত্রে সম্পূর্ণ। বিন্ধ্যপর্বতের সঙ্গে অগস্ত্যের সম্বন্ধ সর্বজনবিদিত। প্রসিদ্ধি আছে, দক্ষিণ ভারতে এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির প্রসার মহর্ষি অগস্ত্যের প্রভাবে ঘটেছিল। একথা তুমি ধাবড়ী কুণ্ডে শুনে এসেছ। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ যে সুতীক্ষ্ণ মুনি ভগবান রামচন্দ্রকে গোদাবরী তটস্থিত অগস্ত্যাশ্রমের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে অগস্ত্যাশ্রমের পুণ্যস্থান এখনও আছে তবে এখানে এই নর্মদাতটবর্তী অগস্ত্যি গুহাও একসময় তাঁরই তপস্যাস্থল ছিল এবং এখনও যে এখানে তাঁর মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করার হেতু নেই।

সহসা প্রলয়দাসজীর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠে গেল। আমার চোখ পূর্ববৎ বন্ধই রইল, যেন কেউ আঠা দিয়ে এঁটে দিয়েছেন। তাঁর অঙ্গুলি স্পর্শে আমার মাথার মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর গ্রামোফোন রেকর্ডের মত বেজে চলেছে। তিনি হঠাৎ তাঁর আঙুলের টিপ্‌কে জোরালো করলেন অর্থাৎ আঙুলের খোঁচা মারতেই মস্তিষ্কাকোষে গ্রামোফোন রেকর্ড যেন গর্জে উঠল: তিনি বলতে লাগলেন — তুম্ কেঁও ন রোতে হো? মহামহেশ্বরাচার্য উৎপলদেব য্যায়সা কহা থা, এ্যায়সা কেঁও ন পুকারতে হো? বলো বেটা —

শক্তিপাতসময়ে বিচারণম্ প্রাপ্তমীশ ন করোষি কর্হিচিৎ।
অদ্য মাং প্রতি কিমাগতং যতঃ স্বপ্রকাশনবিধৌ বিলম্বসে?

অর্থাৎ হে সদাশিব! তুমি শক্তিপাতের সময়ে অর্থাৎ জীবের প্রতি কৃপা করার সময়ে

ন্যায়তঃ, উচিত হলেও কখনও পাত্র-অপাত্রের বিচার কর না। তবে আজ আমাতে এমন কি নূতন ব্যাপার ঘটেছে যার জন্য আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করতে এত বিলম্ব ঘটছে?

তিনি তিনবার মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন, তিনবারই বললেন 'বলো বেটা'। 'বলো বেটা' ত বলছেন কিন্তু আমার ঠোঁট দুটো এবং জিহ্বা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্থ। কেউ যেন অসাড় করে দিয়েছে। তিনি তাঁর আঙুল সরিয়ে নিলেন আমার বুক থেকে। তাঁর আঙুল সরে যেতেই মাথার মধ্যে গ্রামোফোনের বাজনা চকিতে বন্ধ হল। মহাকাশে বেজে উঠল দুন্দুভি দামামার অবিশ্রান্ত ঝঙ্কার। ক্রমে সেই ঝঙ্কার তড়িৎজড়িত হয়ে ওঁকারনাদে পরিণত হল। ধুনুরী তার তুলাধুনার যন্ত্রে টং টং শব্দ তুলে যেমন তুলার বাণ্ডিলকে পিঁজে ফেলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলার টুকরো যেমন হাওয়ায় উড়তে থাকে তেমনি ওঁকারের টঙ্কারে আমার মনে হল আমার শরীরের পিণ্ডীকৃত মাংস পেঁজা তুলার মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অত্যন্ত হাল্কা হয়ে উপরের দিকে ভেসে যাচ্ছে। বাতাসের প্রবল টানে হাল্কা মেঘ বা বাষ্পকুণ্ডলী যেমন ভেসে বেড়ায় আমিও তেমন ভেসে বেড়াতে লাগলাম দিগন্তহীন মহাকাশে। ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নালোক পরিবর্তিত হল শ্বেতজ্যোতিতে। শ্বেতজ্যোতির্মণ্ডিত সেই মহাকাশে কেবলই দোল খেতে লাগলাম। শ্বেতজ্যোতিমণ্ডিত মহাকাশ থরথর করে কাঁপছে......। মনে হচ্ছে যেন কোন অদৃশ্যশক্তি মহাকাশরূপী মহাসমুদ্রকে এক অদৃশ্য মন্থনদণ্ড দিয়ে মন্থন করছেন।

আবার গ্রামোফোন রেকর্ড বেজে উঠল। মাথাটাকে পেছন দিকে বাঁকাতে চেষ্টা করলে যেখানে টোল খায়, সেখানে মহাত্মার অঙ্গুলিস্পর্শ অনুভব করলাম। তাঁর আঙ্গুলের পিন ঐ স্থানে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম তাঁর কণ্ঠস্বর; মহাকাশের কম্পমান তরঙ্গও স্থির হল। তিনি বলছেন — সোজা উঠে যাও এই উত্তরা সুষুম্নার পথ ধরে। আঙ্গুলের খোঁচা মেরে বললেন — এইটাই যথার্থ দ্বিদল চক্র। এখান থেকেই আন্তঃবিষুব ক্ষেত্রে এবং কৈলাসের পথে যাত্রা করতে হয়,

ওঁ ভুবনেশ ত্বয়া নাস্য সাধকস্য শিবাজ্ঞয়া।
প্রতিবন্ধঃ প্রকর্তব্যঃ যাতুঃ পদমানময়ম॥

হে ভুবনেশ্বর! ভগবান শিবের আদেশানুসারে পরমপদের যাত্রী, এই সাধকের মার্গে কোন বিঘ্ন উপস্থিত করো না। এ এখন বাগীশ্বরীর ★ গর্ভে জন্মলাভ করেছে।

তিনি আঙুল সরিয়ে নিতেই সেই শ্বেতজ্যোতির্মণ্ডিত স্থির মহাকাশে আমার শরীরেরই অনুরূপ এক শুভ্র অবয়বের আবির্ভাব ঘটল। আমার তীব্র অনুভূতিতে জাগল ঐ সদ্য আবির্ভূত শরীর আমারই শরীর। আমি এগিয়ে চলেছি ঊর্ধ্বপথে। ওঁকারের নাদ এখন টঙ্কার বলার উপায় নেই, টঙ্কার শব্দটির মধ্যে গুরুগম্ভীর গর্জনের আভাষ রয়েছে, কিন্তু এখন যে ওঁ ওঁ ধ্বনি শুনছি তাতে আছে মহাসংগীতের মাধুর্য ও মাদকতা, তা এমনই মধুনিস্যন্দিনী যে অনাবিল শান্তি ও আনন্দে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি। সহসা সামনে ভেসে উঠল অনন্তসংগীতময় অর্ধচন্দ্রকলা।

অর্ধচন্দ্রকলার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারালাম।

★ শৈবাগম মতে বাগীশ্বরী বস্তুতঃ স্বতন্ত্রাশক্তিস্বরূপা পরাবাকের স্ফুরণ মাত্র। বাগীশ্বরী অর্থাৎ পরাবাকের স্পন্দন জাগলেই বুঝতে হবে প্রাক্তন ও ভাবী দু'রকম কর্মপাশেরই উচ্ছেদ ঘটল। ফলদানে উন্মুখ বর্তমান অথবা প্রারব্ধ কর্মের শুদ্ধির বিধান নেই। তা ক্ষয় করতে হয়।

কতক্ষণ যে এই অবস্থায় আমার কেটেছিল, তা আমার জানা নেই। হঠাৎ বম্‌বম্‌-বলম্‌-বম্‌ শব্দে আমার চেতনা এল। আমি ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। বুঝলাম, পড়ে আছি এক অন্ধকারময় গুহার মেঝেতে। মনে পড়ল আমি অগস্ত্যি গুহার মধ্যে পড়ে আছি। কিন্তু আমার চোখ দুটো ত আঠার মত এঁটেছিল, এখন স্বাভাবিকভাবে খুলল কি করে? আচ্ছা আমার ঠোঁট দুটোও আঁঠার মত এঁটেছিল, তা খুলেছে কি? প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙলেই আমি বলে উঠি — 'বাবা, বাবা'! সেই বরাবরের অভ্যাসমত আমি 'বাবা, বাবাগো' বলে উঠলাম। শব্দ দুটো স্বাভাবিকভাবেই আমি বলতে পারলাম। বুঝলাম — ঠোঁট দুটোও এখন স্বাভাবিক!

অন্ধকারের মধ্যেই প্রলয়দাসজী বলে উঠলেন — 'লেও বেটা, উঠ যাইয়ে, বিশ তারিখ এতোয়ার মেঁ ইস গুফামে আয়ে থে। পাঁচ রোজ বীত গয়া। আজ ভাদ্র মাহিনাকা পঁচিশ তারিখ শুক্রবার হ্যায়। গুপ্তেশ্বর মহাদেওকো প্রণাম করো।'

আমি ধীরে ধীরে গুপ্তেশ্বর মহাদেবের কাছে গিয়ে প্রণাম করে এসে তাঁকেও প্রণাম করলাম। শরীর ও মন এক অব্যক্ত আনন্দে ভরে আছে। গুহার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, প্রাতঃকালীন সূর্যের উদয়রশ্মি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের উপর। মহাত্মার কথায় আমার ধাঁধা লেগেছে। পাঁচ পাঁচটা দিন কেটে গেছে! ইনি বলেন কি? আমি ত কিছুই জানতে পারলাম না! এমন একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে কাটালাম যে, কাল, সময়, ঘন্টা, মিনিট, দণ্ড, পল যেন এই গুহার মধ্যে কি দ্রুততালে না আবর্তিত হয়ে গেল? এই রহস্যের কোন সমাধান আমার জানা নেই। ক্ষীণভাবে মনে পড়ছে যে আমি মহাত্মার আদেশে একপায়ে দাঁড়িয়েছিলাম ঊর্দ্ধবাহু হয়ে। তদবস্থায় পাঁচদিন থাকলে ত হাত পা জমাট হয়ে যাবার কথা! পাঁচদিন অর্থাৎ ১২০ ঘন্টা সময়টা ত আর কম নয়। হাত পা নাড়িয়ে দেখলাম, হাতে এবং পা-তে কোন ব্যথা নেই। শরীর বেশ তাজা এবং ঝরঝরে বলেই ত মনে হচ্ছে। পাঁচ পাঁচটা দিন ধরে শরীরের মধ্যে কোন প্রকৃতির বেগও ত অনুভব করি নি। খাওয়া দাওয়ার কথা ছেড়েই দিলাম। পায়খানা ও প্রস্রাবের কোন বেগও অনুভব করি নি, এখনও ত কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না। আমি কি কোনও ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালের প্রভাবে সাময়িকভাবে বোধ বুদ্ধিহারা হয়ে পড়েছিলাম! হবেও বা, তবে এইরকম ইন্দ্রজাল, যে ইন্দ্রজাল অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দে আপ্লুত করে রাখে, যার প্রভাবে সময় বা কালের অতীত ভূমিতে বিচরণ করবার সুযোগ এনে দেয়, সেইরকম অত্যাদ্ভুত ইন্দ্রজালের পরমাশ্চর্য প্রভাবে বারবার আচ্ছন্ন হতে ইচ্ছে করে যে!

— 'লেও পিজিয়ে, য়হ্‌ হ্যায় গুপ্তেশ্বর মহাদেওকা পঞ্চামৃতম্‌।'

মহাত্মার কথায় স্বগত চিন্তায় ছেদ পড়ল। তাঁর হাত হতে করঙ্গা নিয়ে পঞ্চামৃতটুকু গলায় ঢেলে নিলাম।

— "অভি চলিয়ে হমারা সাথ নর্মদামেঁ অস্নান করকে আয়েগা।"

তাঁর সঙ্গে স্নান করবার জন্য গুহা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে পাহাড় থেকে নামতে লাগলাম। হাতে আছে কমণ্ডলু, লাঠি এবং একটা গামছা। মনের তন্ময়ভাব এখনো যায়নি, একটা যেন ঘোরের মধ্যে হাঁটছি তাঁর পেছনে। মনের মধ্যে একই ধাঁধা, আমি গত রবিবার ২০শে ভাদ্র এই গুহাতে আসি, তখন সন্ধ্যার কিছু পরেই তিনি একপায়ে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে বলেছিলেন, আমিও বাঁ পায়ের উপর ডান

পা রেখে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তার আদেশ পালনে ব্রতী হয়েছিলাম, সেকথা আমার মনে পড়ছে। কিন্তু তার পরের অবস্থা আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। একটি অবর্ণনীয় আনন্দে আমার সমগ্র সত্তা ডুবে গেছল; 'কিছুক্ষণের' জন্য এইটুকুই শুধু মনে আছে। আর তিনি বলছেন — এই 'কিছুক্ষণ' মানে পাঁচদিন কেটে গেছে?

— 'হোঁশিয়ার, পায়ের ধাপ্‌কা উপর রাখিয়ে, বহোৎ পিছ্‌লা হ্যায়!

তাঁর কথায় আমি আরও সাবধানে পা ফেলে লাঠির উপর ভর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলাম। আমি যেন যন্ত্র, যন্ত্রী তিনি। তিনি যেমনভাবে বলছেন, আমি তেমনভাবেই তাঁকে অনুসরণ করছি। এটা বুঝতে পারছি, চড়াই-এর সময় যেমন কষ্ট হয়েছিল, এখন উৎরাইয়ের পথে তেমন কষ্ট হচ্ছে না। ক্রমে সিঁড়ির উপর ঝুঁকে পড়া সেই ডালটায়, যেখানে বোল্‌তা চাক বেঁধেছে, সেইখানটাও অবলীলাক্রমে মাথা নুইয়ে পেরিয়ে এলাম। তিনি বোঁ বোঁ শব্দে ভ্রাম্যমান ভয়ঙ্কর বোলতাগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না। ক্রমে পাহাড়ের তলদেশে নেমে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ অর্থাৎ অগ্নিকোণের দিকে হাঁটতে লাগলেন। মণ্ডলেশ্বর, মহল্লায় ঢুকে মণ্ডলেশ্বরজীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে দিয়ে নর্মদাতীরে এসে পৌঁছলাম।

প্রায় দেড় বা দু'ঘন্টা তাঁর সঙ্গে হেঁটে এলাম; তিনি কোন কথা বলেন নি। ঘাটে পৌঁছেই তিনি বললেন — আপ্ বড়ি খুশীসে থোড়া দের তক্ নাহাইয়ে। তর্পণাদি করিয়ে। হম অভি আতা হুঁ। এই কথা বলেই তিনি নর্মদাতে ডুব দিলেন। এখানে নর্মদা খরস্রোতা। আমি প্রায় পনের মিনিট জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু তাঁর কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। ওঁকারেশ্বরে এবং এখানে এই ভূতজয়ী মহাপুরুষের যে অসীম শক্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছি, তার জন্য তাঁর এই জলে ডুবে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে আমার মনে কোন উৎকণ্ঠা জাগল না। আমি পেছন ফিরে তাকাতেই গাছপালার আড়ালে শিবমন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম। অনুমান করলাম এখন বেলা বোধহয় বড়জোর ন'টা হবে। পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ ভার্গবজী নিশ্চয়ই এখন মণ্ডলেশ্বরজীর পূজায় রত আছেন। তাঁর বাড়ীতে থাকাকালে দেখেছি, তিনি এদিকে সাধারণতঃ আসেন না। মন্দিরের সামনের ঘাটেই সাধারণতঃ তাঁর স্নান-পানের প্রয়োজনে যাতায়াত করে থাকেন। তিনি যদি এসময়ে আমাকে এখানে দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি অবাক হতেন, আর আমিও লজ্জায় পড়তাম! ভাবতে ভাবতেই দেখলাম, এই মহল্লারই অধিবাসী একজন ঘাটে এলেন স্নান করতে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — ভেইয়া, অভি কোন্ মাহিনা চলতা হ্যায়?

— ভাদ্দর মাহিনাকী আজ পঁচিশ তারিখ হ্যায়।

এই বলে তিনি স্নান সেরে চলে গেলেন। লোকটির কথায় আমার বিস্ময়ের ঘোর বাড়ল, বৈ কমল না। সত্যিই তাহলে পাঁচদিন কেটে গেছে! মহাপুরুষ তাহলে ঠিক কথাই বলেছেন, তাঁর কথায় আমার অবিশ্বাস করা উচিত হয়নি। আমি মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। এইবার স্নান করতে নামলাম আমি। কোমর পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে অঞ্জলিভরে মাথায় জল ঢালতে লাগলাম। কয়েকবার কমণ্ডলু ভরেও মাথায় জল নিলাম। পুণ্যসলিলা নর্মদার জল এতই স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ যে বারবার অবগাহনের ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। পরিক্রমা সুরু করার সময়েই অমরকন্টকে মহাত্মা শঙ্করনাথ প্রতিজ্ঞা-বাক্য পাঠ করিয়েছিলেন যে — 'পরিক্রমাবাসীদের পক্ষে নর্মদার বেশী জলে যাওয়া নিষেধ, মাথা ডুবিয়ে স্নান নিষেধ, আমি

পরিক্রমাকালে তাঁর নিষেধবাক্য বরাবরই মেনে চলেছি। মহাত্মা প্রলয়দাসজী যে জলে ডুবে অন্তর্হিত হলেন, তার কারণ তিনি হয়ত কয়যুগ পূর্বেই, পরিক্রমা-পর্ব শেষ করেছেন। তাছাড়া তাঁর মত ঈশ্বরকোটির মানুষ অনিকেতনবাসী এবং অত্যাশ্রমী সকল আশ্রমের অতীত, সকল বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে।

যাইহোক, আমি স্নানতর্পণাদি শেষ করে নর্মদামাতাকে প্রণাম করছি, এমন সময় জল থেকে ভুস্ করে ভেসে উঠলেন প্রলয়দাসজী। আমার কাছে ঘাটের উপরে উঠে এসে বললেন পাঁচ রোজ তুমি কিছু খাওনি, আমিও খাইনি। কাজেই কিছু খাদ্য তুমি ভিক্ষা করে নিয়ে এস। পরিক্রমাবাসীর উচিত স্বপাকে আহার করা কিংবা মাধুকরী করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা। তুমি যতদিন পরিক্রমা করছ একদিনও ভিক্ষা করনি। নিজ হাতে রান্নাও করনি। ভিক্ষান্নে সাধুরা যাতে সারাদিন একবারও অন্তত শরীর রক্ষার্থে খাদ্য সংগ্রহ সহজে করতে পারেন, সেইজন্য ধার্মিক ও ধনাঢ্য গৃহস্তরা কত কত সদাবর্ত স্থাপন করেছেন এই নর্মদাতটে। চাতুর্মাস্য ব্রত পালনও পরিক্রমাবাসীর অবশ্য করণীয় কৃত্য। তুমি এখনও পর্যন্ত একবারও চার্তুমাস্য পালন করনি। সেইসব অপরাধ খণ্ডনের জন্য আজ তোমাকে ভিক্ষায় বেরোতে হবে। আমি অগস্ত্যি গুহার পাদদেশে গিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাকলাম। ভিক্ষান্ন বড়ই পবিত্র। যাও, এই মহল্লার মধ্যে ঘুরে ফিরে কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করে আন।

— মহারাজ ! আপনার আদেশ শিরোধার্য। আমি ভিক্ষা করতে যাচ্ছি। তবে দয়া করে আমার একটা নিবেদন শুনুন। ভিক্ষান্ন বা মাধুকরী বৃত্তি সন্ন্যাসীর ধর্ম। 'যতিধর্ম নির্ণয়' নামক গ্রন্থে এই বিধানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি ত সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিক্রমা করতে আসিনি। আমার মহাগুরু পিতৃদেবের ইচ্ছানুসারে আমি নর্মদা পরিক্রমা করছি। পূজনীয় শংকরাচার্য প্রবর্তিত সন্ন্যাস-ধর্ম এবং ভিক্ষা বৃত্তিই আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের শেষ কথা নয়। বৈদিক ঋষিরা গার্হস্থ্য ধর্মকে বর্জন করেননি। অধিকাংশ বৈদিক ঋষি গৃহী ছিলেন। চার্তুমাস্য ব্রত পালনও সন্ন্যাসীর কৃত্য। নর্মদার বরপুত্র মহামুনি মার্কণ্ডেয়, যিনি নর্মদা পরিক্রমার প্রবর্তক, তিনিও তাঁর গ্রন্থে কোথাও পরিক্রমাবাসীকে চাতুর্মাস্য পালন করতে হবে এমন কথা লেখেননি বা কোথাও বলেনি যে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস না নিয়ে কেউ পরিক্রমা করতে পারে না। আর একটা কথা, যদি ধৃষ্টতা ক্ষমা করেন, তাহলে আপনি যে 'ধার্মিক ও ধনাঢ্য' ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত সদাবর্তে গিয়ে ভিক্ষার কথা বললেন, ঐসব 'ধনাঢ্য'ব্যক্তিকে 'ধার্মিক' বলে আমি মনে করি না। চোরাকারবার ও চোরাচালানে লিপ্ত থেকে লুণ্ঠন বৃত্তিতে পটু যেসব তথাকথিত ধনাঢ্য ব্যক্তি কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করে জীবনের সায়াহ্নে বিবেকের পীড়নে, পাপ লাঘব করার কাতরতায় 'সব দেওতা খুশ রহে' নীতি অবলম্বল করে সদাবর্ত, মন্দির বা ধর্মশালা স্থাপন করে, সেইসব প্রবঞ্চক ও পাপাচারীদের প্রতিষ্ঠিত সদাবর্ত থেকে ভিক্ষা করে আমি উদর পূর্তি করিনি বলে আমার কোন অপরাধ হয়েছে বলে মনে করি না। আশাকরি একথা আপনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে নর্মদাতটে সদাবর্ত প্রতিষ্ঠাতা তথাকথিত 'ধনাঢ্য' ব্যক্তিদের কেউই পুণ্যবতী দানশীলা শিবতপস্বিনী অহল্যাবাঈ নয়।

এ বাত্ তো সহি হ্যায়। লেকিন্, মুঝে বহোৎ ভুখ্ লাগা। তুম্ ভিক্ষা করকে কুছ আহার্য লেকর আইয়ে।

এই কথা বলে তিনি আর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করলেন না। হন্ হন্ করে এগিয়ে গেলেন অগস্ত্যি গুহার দিকে। আমি মহা ফাঁপরে পড়লাম। যিনি ওঁকারেশ্বরে তাঁর তপস্থলীতে পর পর দু'দিন নর্মদাতে নারকেল ভেসে আসাতে দ্বিতীয় দিনের নারকেলটি হাতে তুলে নিয়ে সক্রোধে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন — ক্যা মাতাজী তুম দিল্লাগী করতে হো? বাচ্চা দো রোজ নারিয়েল চিবাকর রহেগা? এই বলে রাগে গরগর করতে করতে নিজে গুফার মধ্যে ঢুকে ছিলেন, তারপর আমি স্নান করে ফিরতেই গরম গরম পুরী ও পুষ্পান্ন এনে হাসিমুখে আমাকে বলেছিলেন —'মাতা নর্মদাজী তুম্হারা লিয়ে ইহ্ ভেজ দিয়া। পা লেও'। আজও সেই ঋষি কি ইচ্ছা করলেই আমার খাবার ব্যবস্থা করতে পারতেন না কিংবা যাঁকে ওঁকারেশ্বরে দিনের পর দিন কিছু খেতে দেখিনি, বরং তাঁর খাওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই যিনি বলেছিলেন — ইহ্ শরীরকো লিয়ে কোই পাঞ্চভৌতিক খাদ্যকা জরুরত নেহি হোতা হৈ — আজ তিনিই আমাকে বলছেন — 'মুঝে বহোৎ ভুখ্ লাগা'। বুঝতে পারছি, তিনি আমাকে আজ পরীক্ষা করছেন। এ পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। কাজেই সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে আমি ভিক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হলাম। যেদিকটায় রামদয়ালদের বাড়ী সেদিকে না গিয়ে অন্য পাড়া বা বস্তির দিকে এগোতে লাগলাম। একটা বাড়ী চোখে পড়ল, মনে হল, সেটি বেশ সম্পন্ন গৃহস্তের বাড়ী। সেখানে অনেক লোকের ভীড়। বাড়ীর অন্দরমহলে কীর্তনের শব্দ ভেসে আসছে। আমি ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর গেটে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরেই একজন প্রবীণ ব্যক্তি একটা নূতন গামছায় একটা পোঁটলা বেঁধে এনে আমার হাতে খুব শ্রদ্ধাভরে দান করলেন। তাঁর গলায় উপবীত দেখে এই ভেবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে, যাক্! আমার জীবনের প্রথম ভিক্ষা ব্রাহ্মণ বাড়ী হতেই সংগৃহীত হল! আমি 'জয় শিবশংকর' বলে অগস্ত্যি গুহা লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলাম। পাতলা গামছার ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, পোঁটলার মধ্যে একটা বড় মাটির সরায় আটা, কলা, লাড্ডু এবং একটা ভাঁড়ে বোধহয় ঘি আছে। আমি তাই নিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম অগস্ত্যি গুহার দিকে। মনে একবার ভাবনা হল, এই যে ভিক্ষা পেলাম এ দিয়ে ত রুটি করতে হবে। কিন্তু আমি রান্না ত দূরের কথা, উনুন ধরাতেও জানি না। মহাত্মা যদি এই দিয়ে রুটি করতে বলেন, তা হলেই ত গেছি! এর চেয়ে ঝোলা থেকে বের করে কন্দমূল খাওয়াটাই আমার পক্ষে সুখের হবে! যা হয় হবে, এখন ত তাঁর কাছে গিয়ে সব হাজির করি। আমি যেভাবে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম, তাকে ঠিক হাঁটা বলে না, দৌড়ানো বলাই ভাল। কিছুক্ষণ পরেই দূর থেকে দেখতে পেলাম পাহাড়ের তলদেশে সিঁড়ির শেষ ধাপে মহাত্মা বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে পোঁটলাটা রাখতেই গর্জন করে উঠলেন — ইহ্ ত শ্রাদ্ধান্ন হৈ। শ্রাদ্ধান্ন সে কোন্ কাম বনেগা? ইস্ সে রোটি বানাকর তনিকভর্ লেগা ত হমারা সমুচা জপতপ বিলকুল খতম হো জায়েগা। শ্রাদ্ধান্ন ভোজন পাপভোজন হৈ, বহোৎ অপবিত্র ঔর গন্ধা চিজ হৈ। যিন্ আদমী উহ্ পাতে হৈ, উহ্ তৎক্ষণাৎ পতিত হো যাতে হৈ। উন্‌কো ইষ্টদেবভি পরিত্যাগ করতা হৈ। যিস্ কোঠি মেঁ আপ্ ভিক্ষাকো লিয়ে গয়ে থে, উধর শ্রাদ্ধ হোতা হৈ। ইস্ অঞ্চলমেঁ এ্যায়সাই রীতি হৈ, শ্রাদ্ধবাসরমেঁ কোই সাধু ফকির ভিক্ষা কো লিয়ে আ গয়ে ত উন্‌কা পুরোহিত সাধুকো লিয়ে ভিক্ষা দেতে হৈ। পুরোহিত যাজক ব্রাহ্মণ ত জাদা পাপিষ্ঠ হৈ।

এই বলে তিনি সেই পোঁটলাটা পায়ে করে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন, আটা, লাড্ডু, কলা, ঘি সব ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর চোখগুলো তখন ভাঁটার মত জ্বলছে। সচরাচর তাঁর প্রায় যে মুদ্রিত শান্ত চোখ দুটি দেখা যায়, সেই চোখ এখন অগ্নুদ্‌গীরণ করছে। রাগে থরথর করে কাঁপছেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন — শৈলেন্দ্রনারায়ণ! মানব-ধর্ম-শাস্ত্রকী দশমা অধ্যায়মেঁ লিখ্যা হৈ —

প্রতিগ্রহাৎ শুধ্যতি জপ্যহোমৈঃ,
যাজ্যন্তু পাপং ন পুনন্তি বেদাঃ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রতিগ্রহ পাপজনক কর্ম। প্রতিগ্রহজনিত দোষ জপ হোমাদির দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু যাজনকর্মে যে দোষ উৎপন্ন হয়, তা দূর করা বেদেরও অসাধ্য। এইজন্য পৌরাণিক যুগে মহর্ষির মুখ দিয়ে পুরাণকার বলিয়েছেন,—

পৌরহিত্যমহং জানে গর্হিতং দূষ্যজীবিতং।
অকার্যং গর্হিতমপি তবাচার্যত্ব সিদ্ধয়ে॥

অর্থাৎ হে রাম! আমি জানি পৌরহিত্য গর্হিত কর্ম, ঘৃণ্য জীবিকা, তথাপি উপনয়ন সময়ে তোমার আচার্যলাভ করবার প্রত্যাশাতেই ঐ নিন্দনীয় বৃত্তি অবলম্বন করেছি।

শ্রাদ্ধকর্তা এক যাজক ব্রাহ্মণকে দিয়ে তোমার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়েছেন। শ্রাদ্ধান্নভোজী যাজক ব্রাহ্মণকে এমন যে দয়ালবাবা ভোলানাথ তিনিও ভুলে যান। আশুতোষ পাপী-তাপী, অনাচারী ব্যভিচারী সবারই দোষ ক্ষমা করেন, কিন্তু শ্রাদ্ধান্নভোজীকে তিনিও ত্যাগ করেন। শ্রাদ্ধান্ন ভোজীর নর্মদেশ্বরের পূজার অধিকারই থাকে না। যাক্ তুমি ভুল করেই শ্রাদ্ধবাসরে গিয়ে পৌঁছেছিলে, তোমার কোন দোষ নেই, এই অন্নের কিঞ্চিৎমাত্র ভোজন করলেই আমরা পতিত হতাম। মা নর্মদা আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এখন তুমি আর একবার ভিক্ষা করতে চলে যাও। মুঝে বহোৎ ভুখ্ লাগা। বুঢ্‌ঢা হো গিয়া। যাও বেটা কুছ্ অন্ন, শুদ্ধান্ন লে আইয়ে। ভুখ্‌কো তাড়নাসে মেরে কণ্ঠা ভি শুখ্ যাতা হৈ।

এই বলে মুখে তিনি এমন কাতর ভাব ফুটিয়ে তুললেন যে আমি ত্রস্তব্যস্ত হয়ে পুনরায় মণ্ডলেশ্বর মহল্লার দিকে ছুটলাম। কমণ্ডলু, লাঠি, আলখাল্লাও ভুল করে ফেলে এলাম। গামছাটা মাথায় বেঁধে শুধুমাত্র কাঠের কৌপীন পরে হাঁটতে লাগলাম আমি। ভেবে নিলাম এখন বোধহয় বেলা ১২ টা বাজে। একমাত্র পণ্ডিতজীর বাড়ীতে গেলেই এই সময় সহজেই ভিক্ষা জুটতে পারে, তবে এখনও আমি এখানে রয়েছি দেখে তিনি বিস্মিত হবেন। মনের মধ্যে এল তা তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলে অকপটেই সব বলব, নর্মদাতটে কোন কিছু চেপে যাবো কেন? এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই আমি মণ্ডলেশ্বরজীর মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। মণ্ডলেশ্বরজীকে প্রণাম করে সোজা তাঁর বাড়ীর উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম — ভগবতি! ভিক্ষাং দেহি মেঁ। ভিক্ষা করার সঙ্কোচ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই 'ভবতি' বা 'ভবতে' না বলে আমি যেন মা নর্মদাকে উদ্দেশ্য করে ভিক্ষা চাইছি, এই ভেবে 'ভগবতি' বলে সম্বোধন করে ফেললাম। ভিক্ষুকের বুলি এখনও আয়ত্ত হয় নি!

পেছন থেকে পণ্ডিতজী বলে উঠলেন — ভগবন্! স্বাগতম্। হে মহাভাগ! কৃপয়া ক্ষণং তিষ্ঠ! পেছনে তাকিয়ে দেখলাম পণ্ডিতজী, হয়ত তাঁর খামারের এক কোণে প্রস্রাব করতে গেছলেন, তাঁর কানে উপবীত তোলা আছে, হাতে জলের গাড়ু। সেই অবস্থায় উঠে এসে

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক পেড়ে ব্রাহ্মণী-মাকে বললেন — ওহো সৌভাগ্যম্। অতিথি-নারায়ণ পধারে সাধুকা রূপসে। তুরন্ত ভিক্ষা লেকর নিবেদন কর দিজিয়ে। ব্রাহ্মণীমা একবার উঁকি মেরেই ভেতরে চলে গেলেন। মিনিট দশেক পরেই একটা বড় মাটি সরায় কলাপাতায় ঢাকা দিয়ে কিছু খাদ্য আমার হাতে এনে দিলেন। আমি কলাপাতায় মুড়ে গামছায় বেঁধে 'হর নর্মদে' বলে সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলাম। গামছায় বাঁধার সময়ই হাতে গরম তাপ লেগেছিল। বুঝতে পারলাম, ব্রাহ্মণীমা যাই খাদ্য দিন, তা সদ্যই পাক করা হয়েছে। মনটা কিন্তু এই ভেবে মুসড়ে পড়ল যে, তিনদিন আমি এদের কাছ থেকে গেলাম, পাঁচদিন পরেই আমাকে ভুলে গেলেন। আমাকে আদৌ চিনতে পেরেছেন বলে মনে হল না। হয়ত এখানে থাকাকালে আমার আলখাল্লা গায়ে থাকত, আলখাল্লায় ঢাকা থাকত কাঠের কৌপীন। এখন নগ্নগাত্রে শুধু কৌপীন পরে সামনে এসেছি বলে হয়ত চিনতে পারছেন না কিন্তু তা কি করে সম্ভব হয়? এ হয়ত মহাত্মা প্রলয়দাসজীরই বিভূতি-বলেই সম্ভব হয়েছে।

গাছপালার ফাঁকে দিয়ে কখনও এঁকে কখনও বেঁকে, কখন মাথা সোজা রেখে, কখনও বা মাথা নুইয়ে ছোটবড় পাথরের চাঙর ডিঙিয়ে আমি অগস্ত্যি গুহার দিকে হাঁটতে লাগলাম। মানুষের চলাচলের যে পথ, সে পথ দিয়ে হাঁটলে পাহাড়ের শীর্ষদেশের গুহার কিছুটা অংশ কেবল চোখে পড়ে, কখনও বা সিঁড়ির কিছু কিছু অংশ। সিঁড়ির তলদেশকে কিছুতেই লক্ষ্য করা যায় না। অনেকটা কাছাকাছি আসতে দেখতে পেলাম প্রলয়দাসজী বসে আছেন 'সমকায়শিরোগ্রীব' হয়ে। মুখখানার দিকে তাকালে কে বলবে যে কিছুক্ষণ আগে এই মানুষটা ক্ষুধায় যেন কত কাতর হয়ে পড়েছেন, এই রকম একটা বিহ্বল ভাব দেখাচ্ছিলেন। দ্রুত হাঁটাহাঁটির ফলে আমি তখন একেবারে ঘেমে নেয়ে গেছি। মহাত্মার উপবেশনের ঋজু ও শান্ত স্থির ভঙ্গীটি দেখে শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের একটি শ্লোক মনে পড়ে গেল —

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেৎ বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি॥ (২/৮)

অর্থাৎ বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক — শরীরের এই তিন অংশকে সমুন্নত রেখে, সরল ও সমভাবে উপবেশন পূর্বক ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের সাহায্যে হৃদয় মধ্যে (দ্বিদলের কেন্দ্রে) নিরুদ্ধ করে বিদ্বান অর্থাৎ আত্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মরূপে ভেলাদ্বারা ভয়াবহ সংসার-স্রোত অতিক্রম করে থাকেন। আমি কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুললেন।

— মাগিয়া বেটা! ইহ্ বহুত শুদ্ধান্ন হৈ, সাধ্বী ব্রাহ্মণী নেক পাক মন মেঁ ইস্‌কো পাক কিয়া। এ্যায়সা শুদ্ধ আহারসেই সত্ত্বশুদ্ধি হো জাতা হৈ। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।

সিঁড়ির যেটুকু অংশ শুকনো সেখানেই তিনি বসেছিলেন। সামনেই ছিল একটা বড় পাথর। সেখানে কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন — এহি পথল কো উপর বৈঠকে ভোজন কর্ লিজিয়ে। আমার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করতে করতে বললেন — তুম পাঁচরোজ এক দানা পানি ভি নাহি খায়া। আহা! মুহ্ ভি শুখ্ গিয়া। যো কুছ্ মিলা ইসকো আধা রাখ দিজিয়ে। আধা পা লিজিয়ে। আমি তাঁর নির্দেশানুসারে গামছা খুলে দেখি ব্রাহ্মণী মা অনেকগুলো গরম গরম পুরী দিয়েছেন, তার সঙ্গে চারটে লাড্ডু ও শাকের তরকারী। আমি কলাপাতার অর্ধেক ভাগ নিয়ে বাকী অর্ধেক ভাগ সরায় রেখে দিলাম। হাতে

জোড় করে তাঁকে কিছু গ্রহণ করার জন্য অনুনয় করাতেই তিনি বললেন — বেটা, আপ ত জানতে হো, ইহ শরীর কভি কুছ্ আহার লেতা নেহি। ইস্ পৃথিবীকো কুছ্ খানাপিনা হমারা লিয়ে জরুরত্ নেহি হোতি।

তাহলে আমাকে খাওয়ানোর জন্যই এত বিভ্রাট! এত চোটপাট্ ! জীবনে ভিক্ষা করিনি, পোড়া পেটের জন্য ভিক্ষা করিয়ে ছাড়লেন! বা এর মধ্যে তার কি রহস্য আছে, আমার জানা নেই! খুব পরিতোষ সহকারে আমি খেলাম। কমণ্ডলু হতে জল খেয়েই তাঁকে হাসতে হাসতে বললাম — দয়া করে আর আমাকে ভিক্ষা করতে বলবেন না। এতদিন ত আমি নর্মদাতটে একদিনের জন্যও অভুক্ত থাকিনি। কিছু না জোটে ঝোলায় কন্দমূল আছে, তাই খেয়ে কাটাব। নর্মদার জল ও গাছের ফলের ত কোন অভাব হবে না।

— আপ্‌কো ভিখ্ মাংগা বানানো কে লিয়ে হমারা কোই অভিলাষ নেহি হ্যায়। নর্মদামাঈকো শরণ লেকর আপ্ পরকরমা করতে হো। ক্ষুদ্ মাঈ তুমহারা লিয়ে ইন্তেজাম করেগা।

এই বলে তিনি চীৎকার করে উঠলেন — ভৈরোঁ, ভৈরোঁ-ও ও!

মিনিট তিনেকের মধ্যেই এক বিরাট কুকুর বনবাদাড় ভেদ করে দৌড়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। তিনি সরার খাবার দেখিয়ে বললেন — শৈলেন্দ্র আপ্‌কো লিয়ে রাখ্যা হৈ। কালো মিশ্ মিশ করছে তার গায়ের রঙ, চোখগুলো জ্বলছে। সে খাবারগুলো গো-গ্রাসে গিলে নিয়েই মহাত্মার দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে। এবার আমাকে বললেন — অভি চলিয়ে গুফামেঁ। তিনি ধীরে ধীরে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি ভেঙে; আমিও লাঠি ঠুকে ঠুকে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলাম। সেই একই পথে প্রায় ঘন্টাখানেক হেঁটে অগস্ত্যি গুহায় পৌঁছে গেলাম। ঘর্মাক্ত কলেবরে আমি তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছি। কিন্তু মহাত্মার মধ্যে কোন শ্রান্তি বা ক্লান্তির ছিটে ফোঁটা লক্ষণও দেখতে পেলাম না। গুহায় ঢুকেই একটা জায়গা দেখিয়ে আমাকে বললেন — আপ্ বিস্তারা বিছাকর্ লেট্ যাইয়ে। অভি করীব সাড়ে তিন বাজ গিয়া হোঙ্গে। পাঁচ রোজ আপ্ বিনিদ্র থে। হম্ গুপ্তেশ্বরজী ভগবানকো পূজা মে বৈঠেগা। তখন আমার সত্যই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। আমি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে অচেতন।

গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভাঙল; আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে আমি শুনতে পেলাম ডম্বরুর ধ্বনি। ধূপ-ধুনার গন্ধে সারা গুহা সুরভিত হয়ে উঠেছে। আমি মহাত্মার স্তব মন্ত্র শুনতে পাচ্ছি —

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ য ইমাঁল্লোকান্ ঈশতঃ ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙজনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ।

যেহেতু একমাত্র রুদ্রই বর্তমান, সেই কারণে ব্রহ্মবিদগণ দ্বিতীয় আর কোনও বস্তুর অপেক্ষায় থাকেন না। যে রুদ্র নিজ শক্তিসমূহদ্বারা এই সমুদয় লোক শাসন করেন, তিনিই প্রত্যেক জীবের অন্তরে অবস্থিত। তিনি এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার প্রলয়কালে সংহার করেন।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

সেই নিয়ন্তাদের পরম নিয়ন্তা, ইন্দ্রাদি দেবতাদের পরম দেবতা, প্রজাপতিগণের পরম প্রভু, অক্ষর হতেও শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বের অধিপতি ও স্তবনীয় সেই স্বয়ংজ্যোতি-স্বরূপ স্বপ্রকাশ মহেশ্বরকে আমরা যেন জানতে পারি।

মাধুর্য ও আকুতি মিশানো মন্ত্রের গুরুগম্ভীর ব্যঞ্জনা যেন সমগ্র গুহায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আমি বিছানার উপর উঠে বসলাম। গুপ্তেশ্বর মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে এই মন্ত্র যেন কোথাও পড়েছি বলে মনে হল। মন্ত্রার্থ ভাববার চেষ্টা করছি, এমন সময় প্রলয়দাসজী 'বম্ বম্ ভোলানাথ' বলতে বলতে প্রদীপ হাতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন — ওহো, আপ্ জাগ গিয়া। আচ্ছাই হুয়া। হম্ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখাকী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌কী মন্ত্রো সে ভগবান গুপ্তেশ্বরজীকী অর্চনা করতে থে। তুম্ কাফি ঘুমায়া। আপ্ বহোৎ থক্ গয়ে থে। ইসীওয়াস্তে তুম্‌কো নিদ্রাকি মোকা দিয়া। নেহি ত ইহ্ নিদ্রাকী বখৎ নেহি, আভি রাত্রি এক বাজ গয়া। শ্রবণ, মনন, স্বাধ্যায় ঔর ধ্যান কী ক্ষণ এহি হ্যায়। কেঁওকী বেদমেঁ স্বয়ং ভগবান ধ্যান ঔর তপস্যাকী চারঠো প্রধান ক্ষণ নির্দিষ্ট কর দিয়া। কণ্বগোত্রীয় প্রগাথ ঋষি-দৃষ্ট একটি মন্ত্রে ভগবান বেদমুখে আদেশ করেছেন —

মম ত্বা সূর উদিতে মম মধ্যন্দিনে দিবঃ।
মম প্রপিত্বে অপিশর্বরে বসবা স্তোমাসো অবৃৎসত॥ (ঋ৮/১/২৯)

অর্থাৎ সূর্য উদিত হলে, তুমি আমার স্তোত্র সকল আবর্তিত কর। সূর্যোদয় কাল ধ্যানের প্রথম ক্ষণ। দিবসের মধ্যাহ্নে আমার স্তুতি আবর্তিত কর। মধ্যাহ্নকাল ধ্যানের দ্বিতীয় ক্ষণ। দিবসের অবসান হলে আমার স্তোত্র সকল আবর্তিত কর। কাজেই সূর্যাস্তকাল ধ্যানের তৃতীয় ক্ষণ। পাকড়ো ক্ষণ, করো সাধন। ক্ষণ ছোড়কে সাধন বেকার হ্যায়। 'অবৃৎসত' শব্দকী মতলব এহি যো শৈবাগমকী প্রণালীসে সাধন করতা হৈ, ক্ষণ পাকড়েকে ক্রিয়ামেঁ বৈঠ যানেসে সাধককী অন্দরমেঁ অধিকারকী অনুসার বাক্ ছন্দ, পরাবাক্ ছন্দ প্রগট্ হো যাতী হৈ। ওহি ছন্দকী তালমেঁ সুরতকী ঊর্ধাভিমুখীন্ গতি কা আবর্তন-প্রত্যাবর্তন নৃত্যকী তাল মেঁ সুরু হো যাতা হৈ। সদাশিবসে সহারা ভি মিলতি হৈ। বেটা! করনেবালা ত প্রভু সদাশিব হৈ। লেকিন্ বিনা যুক্তিসে মুক্তি নাহি মিলতি। সিদ্ধি কি লিয়ে ক্ষণ পাকড়ানো এক বিশেষ বৈদিক যুক্তি হ্যায়।

এই বলে তিনি পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে থাকলেন। নিশুতি রাত, এই নির্জন পাহাড়ে চারদিকে যেন থমথম করছে। হঠাৎ বললেন — গুফাকী বাহারমেঁ যাকর্ মুহ্ ঔর আঁখমেঁ পানি দেও। আকর হমারা পাশ বৈঠো। আমি তাঁর আদেশমত গুহার বাইরে গিয়ে কমণ্ডলুর জলে চোখ মুখ ধুয়ে এলাম। আসার পরেই বললেন — আচমন করো। শৈবাগম সাধনকা বারে মেঁ হম্ যো কুছ বোলা, মুঝে সব শুনাইয়ে। বাংলামেঁ বোলনেসে হম্ সমঝ্ লেগা।

এই গুহার মধ্যে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে একপায়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর অঙ্গুলিস্পর্শে আমার মধ্যে গ্রামাফোন রেকর্ডের বাজনার মত যা যা শুনেছিলাম, তা স্মরণ করে করে পুনরাবৃত্তি করতে থাকলাম। যেখানে যেখানে আটকে যাচ্ছিলাম বা ভুল বলছিলাম, তা তিনি ধীরে ধীরে শুধরে দিতে লাগলেন। উঠে গিয়ে তাঁর ঝোলা থেকে একটা দলা পাকানো হিন্দী ক্যালেণ্ডার এনে, তার যে পৃষ্ঠাগুলি সাদা, তাতে পেন্‌সিল দিয়ে সংস্কৃত উদ্ধৃতি এবং আকর গ্রন্থের নামগুলি প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় সব লিখিয়ে দিলেন।

'শৈবাগমকা বারেমে ঔর থোড়া কুছ্ শুন লিজিয়ে' — এই কথা বলেই তিনি ধ্যানাসনে বসে যা বলেছিলেন, বাংলায় তার সারমর্ম হল — 'মহাভারতের মোক্ষধর্মে দেখতে পাবে যে, শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি উপমন্যুর কাছে শৈবাগম শাস্ত্র অধ্যয়ন করে শিবাদ্বৈতবাদের জ্ঞানলাভ করেছিলেন। বৈদিক দৃষ্টিতে যেমন জ্ঞানের দুটি রূপ বর্ণিত হয়, একটি বোধাত্মক এবং অপরটি শব্দাত্মক, তেমনি প্রাচীন শৈবাগমেও বোধরূপ ও শব্দরূপ জ্ঞানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রত্যভিজ্ঞা বা ত্রিক নামে পরিচিত কাশ্মীরের শৈবমত একধরণের অদ্বৈতবাদ, কারণ এই মতে সর্বোচ্চ সত্য শিব, তিনিই নানা জীবাত্মারূপে বিরাজমান এবং শিব ভিন্ন অন্য কোন সত্য নেই। শিবকে বলা হয় অনুত্তর, পরিপূর্ণ সত্ত্বা এবং সর্বেশ্বর। এই শৈবাগম জগতের প্রকাশ সত্য কিন্তু অদ্বৈতবেদান্ত মতে জগৎ মিথ্যা।

পৌষ্কর আগম অনুসারে সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বা শৈবাগম বলতে দশটি শিবাগম এবং আঠারটি রুদ্রাগম — এই আঠাশটি আগম শাস্ত্র নামে পরিচিত। প্রতি আগমেই পশু, পাশ আর পশুপতি নামে তিনপ্রকার পদার্থ এবং বিদ্যা, যোগ, ক্রিয়া ও চর্যা নামে চারটি পাদ আছে। আগম সাহিত্য অতি বিশাল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার বহু গ্রন্থ লুপ্ত হয়েছে , যা আছে তা সমগ্রের কণামাত্রও নয়। বৈদিক ধারার মত শৈবাগমের ধারাও সুপ্রাচীন এবং এই জ্ঞানও দিব্য ও অপৌরুষেয়। মহর্ষি উশনা, দধীচি, ভৃগু ও সংবর্ত প্রভৃতি এই ধারার মহাসিদ্ধ আচার্য হলেও দুর্বাশাই যে কলিকালে আগমশাস্ত্রে সর্বপ্রথম প্রচারক, এ কথা তোমাকে পূর্বেই বলেছি।

পণ্ডিত ও সাধক জগতে একথা প্রায়শঃই শোনা যায় যে তন্ত্রসাধনা বৈদিক সাধনার মতই সুপ্রাচীন এবং সমান অব্যর্থ ফলপ্রদ ও অনুভব সিদ্ধ সাধন-ধারা। তন্যতে বিস্তীর্যতে আত্মজ্ঞানম্ অনয়া অর্থাৎ যে সাধন-ধারা অনুসরণ করে প্রত্যক্ষভাবে 'আত্মজ্ঞান' নিশ্চিতভাবে এই জীবনেই মানুষ লাভ করতে পারে, তারই নাম প্রকৃত তন্ত্র। এই দৃষ্টিতে শৈবাগমই প্রকৃত তন্ত্র। প্রাচীনশাস্ত্রে যেখানে যেখানে তন্ত্রের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, যেখানে যেখানে তন্ত্রের সাধনতন্ত্রের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে, সেখানে সেখানে 'তন্ত্র' শব্দে এই শৈবাগম সাধনাকেই বুঝতে হবে। তোমাদের বাংলাদেশ এবং আসামে প্রচলিত যে সমস্ত অর্বাচীন তন্ত্রশাস্ত্র এবং তথাকথিত সাধক মহলে যে পঞ্চ মকরাদির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তা হতে কাশ্মীরী শৈবাগম তন্ত্রের তত্ত্ব ও সাধনা সর্বাংশে পৃথক। বাংলা এবং আসামে কিংবা অন্যত্রও যে তান্ত্রিক এবং তন্ত্রাচার্য কৌল এবং কুলাবধূত, অঘোরী এবং কাপালিক নামক জীবদেরকে দেখা যায় তাদেরকে ভ্রষ্টাচারী এবং কামাচার্য বলাই সংগত। শৈবাগম বা শাক্ত্যাগমের প্রকৃত সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই।

তোমাকে পূর্বেই জানিয়েছি যে, শৈবাগমের পরিভাষায় পাশবদ্ধ জীবাত্মার নাম পশু। পাশবদ্ধ জীবাত্মা নিত্য, চেতন এবং অন্যান্য শিব ধর্মাক্রান্ত হলেও সংসারাবস্থায় ঐসকল ধর্মের বিকাশ তারা অনুভব করতে পারেন না। সর্বজ্ঞান-ক্রিয়া-রূপা শক্তি যেমন শিবের আছে তেমনি জীব বা পশুমাত্রেরই আছে। এরই নাম চৈতন্যশক্তি। শিবস্বরূপে এই সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বকর্তৃত্বরূপা-শক্তি সর্বত্র ও সর্বথা অনাবৃত। পশু বা পাশবদ্ধ জীবেও এই শক্তি সমরূপেই আছে বটে কিন্তু তার মধ্যে সর্বজ্ঞানক্রিয়ারূপা শক্তি অনাদিকাল হতে পাশসমূহের দ্বারা অবরুদ্ধ। মল, কর্ম ও মায়া এই তিন রকম পাশের কোন আত্মা একটি, কেউ দুটি, কেউ

বা তিনটি পাশেই আবদ্ধ আছে। এই পাশের বন্ধন, বা মলের তারতম্যানুসারে পশু বা জীবকে বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল, সকল প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এ সব কথা তোমাকে পূর্বেই বলেছি এবং তোমার পুনরাবৃত্তি শুনে এই বুঝে সন্তুষ্ট হয়েছি যে তুমি এসব তত্ত্ব ভালভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছ। কেবল 'বিজ্ঞানাকল' জীব সম্বন্ধে দু' একটা বাড়তি কথা তোমাকে জানাবার আছে। যে সকল আত্মার বিবেকজ্ঞানের ফলে কর্মক্ষয় হয়েছে, সেই সমস্ত শুদ্ধ জীবের নাম বিজ্ঞানাকল। তাঁরা বিজ্ঞানে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা কলারহিত অর্থাৎ ভোগবন্ধনাদি মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাই তাঁদের "বিজ্ঞানাকল' সংজ্ঞা। তাঁর বি-দেহ এবং বি-করণ হলেও তাঁদের মধ্যে আণবমল নামক মূল পাশটি থেকে যায়, একথাটি তুমি ভাল করে মনে রাখ।

বিজ্ঞানাকল জীবের বি-দেহ এবং বি-করণ অবস্থার মূল কারণ — বিবেকজ্ঞান। বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হলে অর্থাৎ চিদাত্মা যখন নিজেকে অচিৎ হতে বিবিক্ত বা পৃথক বলে বুঝতে পারে, তখন চিরদিনের জন্য অচিৎ সম্বন্ধ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিন্ময় নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থার নাম — বিজ্ঞানকৈবল্য। এইখানে একটি কথা ভাল করে মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞানকৈবল্য অবস্থায় কর্ম মায়াদি না থাকলেও আণবমল থাকে। এই আণবমল অপগত না হলে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না। আণবমলই শিবত্বের প্রতিবন্ধক।

আগম মতে, যতদিন পর্যন্ত এই মলের নিবৃত্তি না হবে, ততদিন পর্যন্ত পশুত্ব কিছুতেই ঘুচবে না, শিবত্বেরও বোধন ঘটবে না। মল দ্রব্যাত্মক, সুতরাং চক্ষুর পটলাদি যেমন অস্ত্র চিকিৎসকের ব্যাপারাদি দ্বারা অপসারিত হয়, তেমনি দীক্ষারূপ ঈশ্বরানুগ্রহের দ্বারা ঐ মল নিবৃত্ত হয়। আণবমলের নিবৃত্তি বা চিরতরে পশুত্ব মোচনের একমাত্র উপায় পরমেশ্বরের অনুগ্রহ শক্তির সঞ্চার এবং তন্মূলক দীক্ষা ক্রিয়া। এ ছাড়া মল নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই। দীক্ষা ছাড়া শুদ্ধবিদ্যার উদয় হয় না। স্বায়ম্ভুব আগমে আছে — দীক্ষৈব মোচয়েত্যূর্ধ্বং শিবং ধাম নয়েত্যপি। বস্তুত দীক্ষার দ্বারাই আত্মার বিশুদ্ধতম রূপ-পরমেশ্বরত্ব প্রকট হয়।

মল পরিণামযোগ্য হলেও; তা কখনই আপনা আপনি পরিণত হতে পারে না। কারণ অচেতন বস্তু সর্বদা ও সর্বথা চিৎশক্তির প্রযোজ্য। এই জন্য শৈবাগম ঋষিদের একটি বড় মূল্যবান কথা — অনুগ্রহ। এই পারিভাষিক শব্দটি গূঢ় ও গভীর ভাব ব্যঞ্জক। অনুগ্রহের সঞ্চার যাকে শক্তিপাত বলা হয়, তা ঘটলে তবেই সদ্‌গুরুলাভের ইচ্ছা জন্মে; তখন সদ্‌গুরু-ভ্রমে অসদ্-গুরুর নিকট গিয়ে বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত হবার মত অশুভ যোগ নষ্ট হয়।

আগম মতে সদগুরু দুই প্রকার — (১) সংস্কৃত (২) সাংসিদ্ধিক। যে গুরু অন্য শিবজ্ঞানসম্পন্ন অন্যগুরু হতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হন, তিনি সংস্কৃতগুরু। দেশিক পদবাচ্য (যেমন উৎপলাচার্যের শিষ্য লক্ষণ দেশিক) এইরকম সদ্‌গুরু কৃপাপূর্বক দর্শন, স্পর্শন ও শব্দের দ্বারা শিষ্যের দেহে শিবভাবের আবেশ উৎপাদন করতে সমর্থ —

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।
জনয়েৎ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশকঃ॥

'সমাবেশ' শব্দটির দিকে লক্ষ্য কর। দেশিকগুরু প্রদত্ত শাম্ভবী দীক্ষায় শিষ্যের দেহে শিবভাবে সমাবেশ ঘটে। শাম্ভবী দীক্ষা লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য অবশ্যই শিষ্যকে গুরুগতপ্রাণ হতে হবে, তার 'দ্বিচারিণী' হওয়া চলবে না।

আর সাংসিদ্ধিক গুরু তিনি যাঁর মধ্যেই স্বতঃই, আপনা-আপনি প্রাতিভজ্ঞানের উদয় হয়েছে। এইরকম সদ্‌গুরু পরমেশ্বরের সমান। তিনি বৈন্দব দেহের অধিকারী এবং ঐ বৈন্দবদেহে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি পশু অর্থাৎ জীবাত্মার প্রতি অনুগ্রহ ব্যাপার সম্পাদন করে থাকেন। কিরণাগমে আছে, তাঁর দ্বারা দীক্ষালাভ ঘটলে,

অনেকভবিকং কর্ম দগ্ধবীজমিবাগ্নিভিঃ।
ভবিষ্যদপি সংরুদ্ধং যেনেদং তদ্ হি ভোগতঃ॥

— বহুজন্মের সঞ্চিত কর্ম অগ্নিতে ভর্জিত বীজের ন্যায় দগ্ধ হয়। ভাবী কর্মের ফলোৎপাদিকা শক্তি রুদ্ধ হয় এবং যে কর্ম হতে ওই জন্ম হয়েছে, সেই কর্মের অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের ভোগদ্বারা ক্ষয় হয়।

সাংসিদ্ধিক সদ্‌গুরুপ্রদত্ত দীক্ষার ফলে বিশুদ্ধ সৃষ্টির মূল উপাদান যে বিন্দু, তার জাগরণ ঘটে। এই ঘটনার পারিভাষিক নাম বিন্দুর প্রসব বা প্রসরণ। এটি তিনটি পর্যায়ে ঘটে থাকে ; প্রথম নাদাবস্থা। এটি পরনাদ হতে পৃথক এবং সূক্ষ্মনাদরূপে পরিচিত। পরনাদ সৃষ্টির অতীত। পরমেশ্বরের সমবায়িনী শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখনও পরনাদ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু বিন্দুর দ্বিতীয় প্রসরণ, যাকে সাধারণতঃ অক্ষর-বিন্দু বলা হয়, তা সূক্ষ্মনাদের কার্য এবং পরামর্শ-জ্ঞানস্বরূপ। শব্দব্রহ্ম, কুণ্ডলিনী, মহামায়া, বিদ্যাশক্তি, অনাহত, ব্যোম ইত্যাদি নাম বিন্দুরই পর্যায়। শৈবাগম মতে যখন তমঃ ও অনাদিপ্রবৃত্ত মলের নিবৃত্তি ঘটে, তখন জীবের স্বতঃই কৈবাল্যমুখী ভাবের উদয় হয়। এই ভাব উদিত হলে জগদুদ্ধারপ্রবণ পরমেশ্বর অনু-আত্মায় অনন্ত দৃকশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি প্রকট করে দেন, এরই নাম অনুগ্রহ।

শক্তিপাতের তারতম্য ঘটে মলপাকের তারতম্যানুসারে। পরমেশ্বরের দিক দিয়ে বিচার করলে মলপাকের অপেক্ষা নেই সত্য, কিন্তু মলপাকের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে যে পশুমাত্রেরই মল আছে এবং সকল মলই কালপ্রবাহে এবং অন্যান্য কারণে অল্পাধিক নিরন্তর পাক হয়ে যাচ্ছে। পাকের যে মাত্রায় শক্তিপাত ঘটে, সেই মাত্রা পর্যন্ত পাক না হলে সেই আত্মা সদাশিবের কৃপাপ্রাপ্তির অধিকারী হয় না, দীক্ষালাভেও তার অধিকার জন্মে না। অবশ্য তখন হয় না কিন্তু কালান্তরে পাক সম্পন্ন হলে দীক্ষালাভের অধিকার জন্মে। সেই অমূল্য অধিকার লাভ, এ কল্পেও ঘটতে পারে, কল্পান্তরেও ঘটতে পারে।

একথা তুমি শাস্ত্রান্তরে নিশ্চয়ই পড়েছ যে, প্রলয়ে বিশ্ব লীন হয়ে যায়। তখন কার্যমাত্রই পরমকারণে অব্যক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য কোন কোনটি বীজসহ অব্যক্ত হয় এবং কোন কোন স্থলে বীজ দগ্ধ হয়ে অব্যক্ত অবস্থার প্রাপ্তি ঘটে। যেসব চিদ্ অণু অভিনব সৃষ্টিতে পুনরাবর্তনের বীজসহ প্রলয়-নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়ে, তাদেরকেই পূর্বে প্রলয়াকল বলা হয়েছে। কিন্তু যে সকল চিদ্-অণু জ্ঞানাদির দ্বারা দগ্ধ হয়ে প্রলয়ে স্থিত হয়, তারা বিজ্ঞানাকল নামে প্রসিদ্ধ। প্রলয়াকল জীব বিদেহ হলেও অভিনব সৃষ্টিতে পুনরাবর্তন করেন না। তাঁদের অবস্থাকেই বিজ্ঞান-কৈবল্য বলে। তাঁরা সংসারে আবর্তন করেন না সত্য তথাপি তাঁরা পূর্ণ নন। আগম তাঁহাদেরকে পূর্ণ বলেন না, কারণ তাঁরা পূর্ণত্ব অর্থাৎ শিবত্ব লাভ করেন নি। শুধু লাভ করেন নি বলাটাই যথেষ্ট নয়, আণবমল আছে বলে, তাঁরা পূর্ণত্বের পথেও পদার্পণ করতে পারেন নি।

মোটকথা জেনে রাখ, যা আগমসম্মত পরামুক্তি, তাই হল প্রকৃত পরামুক্তি। আগম মতে সাংখ্যের কৈবল্য, ন্যায়াদির অপবর্গ পূর্ণত্ব নয়। এমন কি, বেদান্তের মুক্তিও পূর্ণত্বলাভ নয়।

তন্ত্রালোক যখন পড়বে, তখন দেখতে পাবে, তন্ত্রালোকের টীকায় (৪/৩১) জয়রথ বেদান্ত প্রতিপাদ্য মুক্তিকে সবেদ্য প্রলয়াকল অবস্থার মত একটা মোহের অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। শৈবাচার্যগণ সাংখ্য ও যোগের 'পুরুষ' এবং বেদান্তের 'ব্রহ্মকে' আত্মার অ-পরাবস্থা বলে মনে করেন, পরাবস্থা ত দূরের কথা। তাঁদের মতে পরম শিবাবস্থাই আত্মার পরাবস্থা। বেদান্তে তাদৃশ অবস্থার বর্ণনা নেই।

যে পর্যন্ত জীবের আত্মব্যাপ্তি, বিদ্যাব্যাপ্তি এবং শিবব্যাপ্তি পূর্ণভাবে না হয়, সেই পর্যন্ত বেদান্ত-সাধনার দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি হলেও পরম শিবপদে প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা নেই --

'তে সর্বে ব্যাখ্যাতব্যাপকাত্মোপাসকাঃ শৈবেঽস্মিন্ অদ্বয়নায়
পরমশিবং ব্যাখ্যাতস্বরূপং ন গচ্ছন্তি, ন তন্ময়ী ভবন্তি।
সাংখ্যযোগ-বেদান্তবাদ্যাদয়স্তু অপরদশাবস্থা এব,
ইতি কেন তেষামিয়ৎ পদপ্রাপ্তি সম্ভাবনাঽপি ॥'

(স্বচ্ছন্দতন্ত্রের উপর ক্ষেমরাজকৃত উদ্যোতটীকা ৪। ৩৯১-৩৯২)

এহি উদ্যোত-টীকাকি অংশ হম্ ফিন্ বোলতে হৈ, আপ্ লিখ লিজিয়ে। এই বলে পুনরায় আবৃত্তি করে গেলেন। ক্যালেণ্ডারের কাগজে পেনসিলে আমি তা লিখে নিলাম। আমার লেখাও শেষ হল, প্রদীপটাও দপ করে নিভে গেল। গুহার মধ্যে তখন জমাট অন্ধকার। তিনি ধীরে ধীরে উঠে গেলেন গুপ্তেশ্বর মহাদেবের কাছে। আমি কম্বলের উপর বসেই রইলাম। প্রায় আধঘন্টা পরে আমাকে ডাক দিলেন। আমি গুপ্তেশ্বর শিবলিঙ্গের কাছে গিয়ে মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠে দেখি, শিবলিঙ্গ রাশিকৃত ফুল ও বেলপাতায় ঢাকা রয়েছে। সুগন্ধে ভরে আছে। আমাকে বললেন, বাহারমেঁ ঔর ইস্ গুফামে আভিতক্ আঁধেরা হৈ। লেকিন আভি পাঁচ বাজ গিয়া। এক ঘন্টা কী বাদ হিঁয়াসে হম্‌লোগ্ যাত্রা করেঙ্গে, হম্ চলেঙ্গে ওঁকারেশ্বরজী, তুম্ যাত্রা করেঙ্গে মহেশ্বর কা তরফ্। মহেশ্বর অতিক্রম করকে ক্রমশঃ যব শূলপাণিকা ঝাড়ি মেঁ প্রবেশ করেঙ্গে, তব হরবখৎ হোঁশিয়ার হোকর চলেঙ্গে। ইহ্ ঝাড়ি বহুৎ খতারনক হৈ। পঁচাশ ক্রোশ ব্যাপী ইহ্ ভয়ঙ্কর ঝাড়ি হৈ। শেরাদি হিংস্র জন্তুমেঁ উহ্ ঝাড়ি ভরা হুয়া হৈ। দুর্দান্ত ভীল ডাকু ভি হ্যায়। উত্তরতট দক্ষিণতট দোনো তরফ্ ঝাড়ি। নর্মদামায়ীকা ষড়ক্ষরী মহামন্ত্র যো আপ্‌কো ধাবড়ীকুণ্ড মেঁ মিলা হৈ, নেহি ত তুমহারা সপ্তাক্ষরী ইষ্টমন্ত্র — উহ্ হরবখৎ জপ্ করেগা। খ্যার, নর্মদামায়ী তুম্‌কে রক্ষা করেগা। উহ্ মুঝে পতা হৈ, মহাত্মা দিওয়ানাজীকা পাশ বন্যজন্তুকো কাজ করনেকে লিয়ে এক জানোয়ার দমন মন্ত্র তুম্‌হে মিল্ গিয়া। উহ্ মন্ত্র আচ্ছাই হৈ। লেকিন্ ইধর্ আনেকা বখৎ বোলতাকা বাঁক দেখনেসে ডরসে তুম্ উহ্ মন্ত্র ভুল গয়ে থে। প্রয়োগ করনেকে মোকা নেহি মিলা। আচানক শের দেখনেসে অ্যাপ্ ক্যা করেঙ্গে? উহ্ মন্ত্র এক পলকে লিয়ে ভুল যায়েগা ত, ফৌরন্ তুম্‌হারা জান চলা যায়েগা। ইস্‌লিয়ে মহর্ষি অগস্ত্যজীকে এহি গুফামেঁ তুম্‌কো অগস্ত্যজীকা দৃষ্ট এক বেদমন্ত্র হম্ শোনাতা হুঁ। ইহ্ মন্ত্র তুম্ কভি ভুলেগা নেহি। তুম্‌হারা দৃষ্টিকা অন্তরাল মেঁ শেরাদি হিংস্রজন্তু দোশ গজ দুরমেঁ আ যায়েগা কী এহি মন্ত্রকা স্পন্দন তুম্‌হারা মস্তিষ্ককোষকা অন্দর উৎপন্ন হো যাবেগা। এ্যায়সা ইস্‌কী প্রতাপ। ইহ্ বৈদিক মন্ত্র হৈ। ঋগ্বেদকা প্রথম মণ্ডলমেঁ ১৮৯ সূক্তকা ৫ নম্বর মন্ত্রমেঁ ইসকা জিকর আয়া। এইবলে আমার মাথায় কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে বলতে লাগলেন ----

ওঁ মা নো অগ্নেহব সৃজো অঘায়া. বিষ্যবে রিপবে দুচ্ছুনায়ৈ।
মা দত্বতে দশতে মাদতে নো মা রীষতে সহসাবন্ পরা দাঃ।।

পর পর পাঁচবার তিনি এই মন্ত্রটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে উচ্চারণ করলেন। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সমতালে সমচ্ছন্দে আরও তিনবার বলালেন। মন্ত্রটির অর্থ হল — হে অগ্নি! আমাদেরকে হিংস্রক, অন্নগ্রাসী, মাংসাশী রিপুর হস্তে অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদির মুখে সমর্পণ করো না; দন্তরহিতদের গ্রাসে অর্থাৎ দস্যুতস্করাদির হাতে সমর্পণ করো না।

মন্ত্রদানের পর শিবলিঙ্গের উপর থেকে রাশিকৃত ফুল সরিয়ে একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বের করে আমার হাতে দিলেন। তারপর আরও কিছু ফুল সরিয়ে গুপ্তেশ্বর মহাদেবের কণ্ঠ হতে একটি সাদা পাথরের মালা উঠিয়ে আমাকে বললেন — ইহ্ বহুৎ কিমতি চিজ্ হৈ। দুর্লভ বস্তু হৈ। ইস্‌কো শঙ্খস্ফটিক কহা যাতা হৈ। ইস্‌কো হরবখৎ কণ্ঠে ধারণ করেগা। আমি সশ্রদ্ধভাবে মালাটি হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললাম — আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। মালাটি সব সময় গলায় রাখতে পারব না! এটি কণ্ঠে ধারণ করলে যদি সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবের দেবদুর্লভ দর্শন মেলে কিংবা সঙ্গে সঙ্গে আমার দেবদেহ, শৈবদেহ কিংবা বৈন্দব দেহের প্রাপ্তি ঘটে, তবুও না। কারণ আমার মহাগুরু বাবা, উপনয়নের সময় যে উপবীত দিয়ে গেছেন, সেটি ছাড়া আর কোন কিছুই ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওঁকারেশ্বরে আপনি আমাকে যে একমুখী রুদ্রাক্ষ দিয়েছিলেন, তাও আমি গলায় বা হাতে ধারণ করতে পারি নি। ঝোলাতে রেখেছি। এ দুটি পবিত্র বস্তুও পরম শ্রদ্ধাভরে আমৃত্যু কাছে রেখে দেব।

আমার কথা শুনে তিনি আমার গালে একটা আদরের চড় মারলেন। আর কিছু মন্তব্য করলেন না। পুনরায় গুপ্তেশ্বর ভগবানকে প্রণাম করে শঙ্খ ও শঙ্খস্ফটিকের মালা হাতে নিয়ে উঠে এলাম সেখানে থেকে। গুহার বাইরে দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম, সকাল হয়ে গেছে। কম্বলাদির গাঁঠরী বেঁধে বসে রইলাম, আদেশের প্রতীক্ষায়। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে বম্ বম্ ববম্-বম্ ধ্বনি করতে করতে তিনি মহাদেবের কাছে হতে আমার কাছে, নিজের কমণ্ডলু এবং লাঠিটি হাতে তুলে নিয়েই বললেন — আভি চলিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গাঁঠরী কমণ্ডলু ও লাঠি হাতে নিয়ে আমিও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি সমগ্র বিন্ধ্যপর্বত সূর্যরশ্মিতে ঝলমল করছে। ভিজে ও পিচ্ছিল সিঁড়িতে সাবধানে পা ফেলে ফেলে নামতে লাগলাম নিচের দিকে। সিঁড়ির দুদিকে যেসব গাছের ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে, সেগুলো আগে ভাগে আমি সরিয়ে দিতে লাগলাম লাঠি দিয়ে। সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে নামতে ক্রমে সেই গাছটার কাছে এলাম যেখানে বোলতারা চাক বেঁধেছে। বোঁ বোঁ শব্দে অজস্র বোলতা ঘুরপাক খাচ্ছে। এই বিষাক্ত বোলতার একটি কামড়ালে যে ভীষণ যন্ত্রণা হবে, তাতে মানুষ ত কোন্ ছার, একটা বলশালী বাঘও যন্ত্রণায় ছট্‌পট্ করতে থাকবে। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি মৃদু হেসে বললেন — আভি অগস্ত্য ঋষিজীকা ওহি বেদমন্ত্র প্রয়োগ করো। হম্ পরখ্ করেগা, ক্যায়সে আপনে আয়ত্ত কিয়া।

বোলতাগুলো তখন আমাদের উভয়ের নাক, কান, মাথার চারদিকে বন্‌বন্ শব্দে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের যে কোন একটা প্রেমচুম্বনে মন্ত্রতন্ত্র মাথায় উঠবে। ভিমী খেয়ে চোখে সরষে ফুল দেখাতে হবে, এই সময় কোথায় যতদূর সম্ভব দ্রুত এখান থেকে সরে গেলে মঙ্গল, তা নয়, সেই চাকের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তাঁর মনে মন্ত্র প্রয়োগের শখ উঠল। কী আর করা যায়,

আমি তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে ত্রিষ্টুপ ছন্দে উচ্চারণ করলাম,

ওঁ মা নো অগ্নেহব সৃজো অঘায়া বিষ্যবে রিপবে দুচ্ছুনায়ৈ।
মা দত্বতে দশতে মাদতে নো মা রীষতে সহসাবন্ পরা দাঃ॥

মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম ইতঃস্তত উড্ডীয়মান বোলতাগুলো একে একে চাকে এসে বসতে লাগল। আর তাদের সেই বিক্রম ও গর্জন দেখা যাচ্ছে না। প্রলয়দাসজী হাসতে হাসতে বললেন — দেখিয়ে মন্ত্রকী প্রতাপ। হিংস্র জন্তুজানোয়ারকা ভি এ্যারসাহি গতি স্তব্ধ হো যায়েগা। উন্‌কা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিবশ হো যাবেগা এক ঘন্টাকে লিয়ে। দোবারা মন্ত্র প্রয়োগ কভি মৎ কর্‌না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে মন্ত্রের অত্যাশ্চর্য প্রভাব দেখে আমি নিজেও স্তম্ভিত হলাম।

আবার সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে লাগলাম তাঁর সঙ্গে। সামনে দেখা যাচ্ছে নর্মদাকে। তিনি বয়ে যাচ্ছেন পশ্চিমদিকে রত্নসাগরের দিকে। পাহাড়ের এই উচ্চতা থেকে নর্মদাকে দর্শন করেই তিনি মহোল্লাসে গান ধরলেন —

আদৌ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে ত্রিভুবনবিবরে কল্পদা সা কুমারী,
মধ্যাহ্নে শুদ্ধরেবা বহতি সুরনদী বেদ কণ্ঠোগ্রকণ্ঠৈঃ।
শ্রীকণ্ঠে কন্যরূপা ললিতশিবজটা শাংকরী ব্রহ্মশাক্তিঃ
সা দেবী বেদগঙ্গা ঋষিকুলতরণে নর্মদা মাং পুনাতু॥

তাঁর মধুর ললিত ছন্দে গানও শেষ হল, আমরাও পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের তলদেশে। নিচে অবতরণ করেই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে।

— আভি বিদা লেতে হেঁ, যব মাগেঙ্গে, ভেট হোগা, তত্ত্ববিযুব ক্ষেত্রমেঁ। হর নর্মদে। তুম মণ্ডলেশ্বর মহল্লা অতিক্রম করকে মহেশ্বর যাওগে। হম চলেঙ্গে হমারা পথমেঁ। আচ্ছিতরেসে শৈবাগম সাধনা কী যুক্তি স্মরণ মনন ঔর বহুৎ প্রযত্নসে অভ্যাস ভি করেগা। পহেলে যো বোল দিয়া, ফিন্ বোলতে হেঁ — করনেবালা প্রভু সদাশিব হ্যায়। লেকিন্ বিনা যুক্তিসে মুক্তি নেহি মিলতি। সাচ্চা যুক্তিসে সাধন করনেসে ইহ্ ঘোর কলিযুগমেঁ ভি প্রভুকী বেশক্ দর্শন মিলতি হৈ। এই কথা বলেই তিনি উত্তরদিকের পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন। দুমিনিট হেঁটেই আবার থমকে দাঁড়ালেন। হাতের ইসারায় আমাকে কাছে ডেকে বললেন — এহি হমারা অন্তিম বাণী হৈ —

হাস্ বোল খাপা ন হো কিসীসে।
দুনিয়াকা দুনী রীত, নাফা ন হো কিস্‌সীসে॥

অর্থাৎ এই জগতের অপর নাম দুনিয়া। দুনিয়ার অর্থ দুই নিয়া। দুই মানে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব এখানে থাকবেই। কাজেই দ্বন্দ্ব এড়িয়ে সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলবে। কারও কথায় ক্রুদ্ধ হবে না। কোন লাভের প্রত্যাশায় কারও সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে না। দুনিয়ার এইটাই ব্যবহারিক রীতি।

তিনি মৃদু হেসে হেঁটে চললেন। আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মনের মধ্যে হাহাকার যেন কত জন্ম জন্মান্তরের আপনজন চলে যাচ্ছেন আমাকে ছেড়ে। চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। যতই তিনি দূরে সরে যেতে থাকলেন, ততই তাঁর মাথার চারপাশে একটা প্রভামণ্ডল (Aura) স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তিনি দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। আমি মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে যুক্ত করে প্রণাম নিবেদন করে, হাঁটতে সুরু

করলাম দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছোটবড় পাথরের চাঙড় সাবধানে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে মণ্ডলেশ্বর মহল্লার পাশ দিয়ে হাঁটিতে লাগলাম। আজ আমার হাঁটার মধ্যে কোন গতি নেই। অলস ও মন্থরভাবে কোনমতে দেহকে যেন টেনে চলেছি আমি। মহাত্মা প্রলয়দাসজীর চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাঁর অযাচিত করুণার কথা বারবার আমাকে আমার স্নেহময় পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তিনি যেমন সব উজাড় করে আমাকে শেখাতে চাইতেন, কোন একটা বিষয়ের আদ্যন্ত শেখা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর যেমন স্বস্তি ছিল না, তাঁর দেওয়া জ্ঞান ভাল করে আয়ত্ত করতে পেরেছি কিনা, তা জানার জন্য যেমন বাবা পরীক্ষা নিতেন, তেমনি দুরূহ শৈবাগম তন্ত্রের সাধনা, তাঁর ভাষায় 'যুক্তি', আমি আয়ত্ত করতে পেরেছি কিনা, তা দেখার জন্য তিনিও সেইরকমভাবে আমাকে পুনরাবৃত্তি করাতে বাধ্য করলেন।